উৎসর্গ

কাশীর ছোটদি—শ্রীযুক্তা হরিবালা দেবী

ও

কাশীর দিদিমা—শ্রীযুক্তা মনোরমা দেবী-র

যুগলকরকমলে-

প্রথম খণ্ড

একাশী বছরে পা দেবার আগে কাশীতে পদার্পণ করব না যারা বলে তারাই পাথরের অক্ষরে খোদিত মানুষের মহত্তম প্রেমের কবিতা তাজমহল দেখবার জন্যে পূর্ণিমার প্রতীক্ষা করে। এই সব লোকেদেরই ধারণা তীর্থ করবার বয়স, ধর্ম করবার বয়স, পরকালের কথা চিন্তা করবার বয়স যথেষ্ট বয়স না হওয়া পর্যন্ত বুঝতে হবে কারুর হয় না। এদেরই কেউ কেউ দাঁত পড়ে গেলে নিদারুণ ভক্ত হয় নিরামিষের; অহিংসাই যে পরম ধর্ম বুঝতে সক্ষম হয় অচিরাৎ। অনেক লোকের তো বটেই; আরও অনেক বেশী অনেক স্ত্রীলোকেরও এই ফানি আইডিয়া কিছুতেই যাবার নয় যে, অল্প বয়স হচ্ছে শাড়ি, গাড়ি আর গয়নার; কিন্তু প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছনোর অব্যবহিত পরই অতঃপর সকলেরই পরকাল সম্পর্কে দরকার অবহিত হবার। এই মহৎ ইচ্ছার তলা দিয়ে যে পাঁকের ময়লার আর অস্বাস্থ্যের স্রোতস্বতী বয়ে যায় তা হচ্ছে যৌবনের ফুর্তি করার দাম দাও বয়স হলে পরলোকের চিন্তায় মন দিয়ে। অর্থাৎ কালোবাজার, ভেজাল অথবা অপকর্ম হোক যত গুরুভার তীর্থে তীর্থে তৈরী কর ধর্মশালা যাতে মরবার আগেই যুধিষ্ঠিরের পর দ্বিতীয়বার সশরীরে স্বর্গে যাবার পথ আটকাতে না পারে নিজের কিংবা অপরের বড় অথবা ছোট সম্বন্ধী।

কিন্তু অধর্মেরই বয়স হয়; ধর্মের কোনও বয়স নেই। ইহকালের কথা না ভাবলেও চলে; পরকালের কথা না ভাবলেই মানুষ অচল। আগামীকালের কথা যে ভাবতে পারেনি গতকাল সেই কেবল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছে মানুষের স্বখাত সলিলে ডুবে মরার আণবিক অস্ত্র; দানবিক অহঙ্কার। নরলোকে যা করবে পরলোকে তার জবাব দিতে হবে। একথা ভাবতে না পারলেই আর ইহকাল নেই; পরকালও গেছে। পরলোক বলে যদি কিছু নাও থাকে, ইহলোক বলেও তবে যার কিছু থাকে না আর তারই নাম মানুষ। এবং এই একমাত্র বিশ্বাস; এই একমাত্র ধর্ম; এই সেই একমাত্র সত্য যা মানুষকে দানবের চেয়ে নরম এবং দেবতার চেয়ে কঠিন করে গড়েছে; তাকে দিয়েছে মনুষ্যত্ব। আগামী-

কালও সূর্য উঠবে,—একথা আজ নিশ্চিত বলা তর্কের দৃষ্টিতে বেঠিক ; তবু এর চেয়ে সঠিক, এর চেয়ে সুনিশ্চিত প্রত্যয় আর কিছু মানুষের আছে ? যদি এ বিশ্বাসের সূর্য-মুখ মুহূর্তের জন্যে সংশয়ের মেঘে আচ্ছন্ন হয়ে দেখা না দিত আবার দ্বিগুণ দীপ্তিতে তাহলে কে নিশ্চিন্তে নিদ্রা যেতে পারত বরিষণ-মুখরিত শ্রাবণ-রাত্রে ? যদি মেঘই সত্য হতো আর সূর্য হতো অসত্য ; যদি অবিশ্বাস না হতো অলীক আর প্রত্যয় সুদৃঢ় ; যদি মানুষের পায়ের তলায় কঠিন মৃত্তিকা মুহূর্তে না সরে যেত মাথার ওপর অভাব হলে নিরুপম নীলের ; যদি আজকের 'কাল'-টাই কেবল একমাত্র কাল হতো,—গত এবং আগামীকালের সঙ্গে তার যোগ হতো বিচ্ছিন্ন তাহলে হয় হত্যায় নয় আত্মহত্যায় উদ্যত হতো বিশ্বলোক। অবিশ্বাসে নয় ; আশ্বাসে। প্রমাণে নয় ; প্রত্যয়ে। মৃত্যুতে নয় মৃত্যুঞ্জয়েই জীবনের জয়। অবিশ্বাসে যা হতো বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে ত্রিভুবনের বিস্ময়লোক,—মানুষের আবাসভূমি এই বিশ্বলোক অবিশ্বাসে যা হতে পারত বিষলোক, বিশ্বাসে তাই হয়েছে চিরকালের ত্রিভুবনের বিস্ময়লোক।

উজীরবাদ ; পুঁজিবাদ ; গণবাদ ; সাম্যবাদ নয় ; বাদ দিতে দিতে বরবাদ কোর না মানুষকেই। বাদ দেবে কেন ? যোগ কর। কর্মযোগ ; জ্ঞানযোগ ; রাজযোগ ; ভক্তিযোগ। যোগ কর ; তবেই যোগ্য হবে। ইহকালের ধনুতে পরকালের যোগ কর শর ; মানবীয় তনুতে যোগ কর ঈশ্বর এবং উদ্‌যোগ কর বয়স থাকতে থাকতেই। সকাল থেকেই সলতে পাকাও সন্ধ্যাকালের আলো জ্বালাতে। 'নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকা' তেল থাকতে-থাকতেই দীপ্ত হও ; উদ্দীপ্ত কর।

খুব অল্পবয়সে হাত দেখে বলেছিলেন এক জাতকের এক গণৎকার, জাতকের ঈর্ষাযোগ্য মৃত্যু হবে কাশীতে ; এবং মৃত্যুর পর সেই হেতু 'কূপে' মিলবে শিবলোকের ট্রেনে ; বার বার জন্মের অন্ধকূপে মরতে হবে না পচে। শুনে পরম নিশ্চিন্ত সেই জাতক অনুতাপহীন পাপের পর পাপ করতে করতে ভ্রূণহত্যার দায়ে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে মৃত্যুর বাসরে ডেকে পাঠাল সেই গণককে শেষ ইচ্ছা পূরণের সুযোগে ; গণকঠাকুর জাতকের মেসোমশাই ছিলেন সম্পর্কে। তাঁকে দেখে স্বাগত জানালো ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয়গানে উদ্যত সেই বজ্জাতক : মেসো, তুমিই আমার ফাঁসীর কারণ ! তুমি বলেছিলে আমার মৃত্যু কাশীতে ; —সেই ভরসায় যা ইচ্ছে তাই করতে করতে যা ইচ্ছে ছিল না আমার কখনও তাই করে জেলে এখন লটকাতে চলেছি ফাঁসীতে ;—তুমি কি এখনও আমার মৃত্যু কাশীতেই বলতে চাও ?

মেসো ঠাকুর বলেন : বাবা, ত্রিভুবন,—তোমার হাত ঠিকই দেখেছিলাম ; তোমার মৃত্যু কাশীতেই ছিলো। কিন্তু এত দুষ্কর্ম করলে বাপ আমার ইতিমধ্যে যে 'ক'-এর মুখ ফাঁক হয়ে 'ফ' হয়ে যাওয়ায় কাশীর বদলে ফাঁসীতে মারা যেতে হচ্ছে তোমায় ; আমি কি করব বলো।

আমরাই বা কি করতে পারি তাদের জন্যে—যারা একাশী বছর বয়স হলে তবেই কাশী যায় মরতে। কাশীতে মৃত্যু হলেও তারা যে কাশীতে মারা যাবার আগেই, অনেক আগেই মারা যায় সর্দি, কাশি, বাত, পিত্ত, অম্লশূলে,—একথা বোঝায় কে? এই কাশীতে যে মরতে চেয়েছে চিরকাল; একবার মরে বেঁচে যেতে চিরকালের মতো সেই হচ্ছে হিন্দু; কিন্তু কাশীতেই বেঁচে আছে যা কেবল—জগতের সব চেয়ে বড়, সব চেয়ে উদার, মানুষের সব চেয়ে মহৎ সেই ধর্মের নাম হিন্দুধর্ম।

এখনও পর্যন্ত বেঁচে আছে: কিন্তু আর থাকবে না। হিন্দুধর্মের মৃত্যু হবে; এবং তার শবের ওপর বসে যার উৎসব হবে তা হচ্ছে হিন্দীর অধর্ম। কাশীর চতুষ্পাঠীতে হিন্দুর ছেলে সংস্কৃত পড়বে না আর। বেনারসে বসে তার বদলে হাইস্কুলে, দশরথের চার ছেলের হিন্দী বলবে: দশরথ কি চৌবাচ্চা। হিন্দু বলতেই এখন আমরা লজ্জা পাই। হিন্দী বলতে নয়। হিন্দুস্থান হিন্দীস্থান হবার আগেই, জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহৎ মানুষ হিন্দুদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান কাশীর গান গাই; একাশীর কোঠায় পা দেবার আগেই জয়গান করি এ কাশীর যেখানে:

'আত্মার সাথে হ'বে আত্মার নবীন আত্মীয়তা,
মিলনধর্মী মানুষ মিলিবে; নহে এ স্বপ্নকথা।'

আত্মার সাথে আত্মার মিলন অবশ্য যেখানেই হোক ভারতবর্ষে আর তা হবার আশা তামাশা মাত্র; কারণ সিকুলার স্টেট স্বাধীন ভারত মাত্র মুখে; ভেতরে তার পিকুল্যার স্টেট। স্বাধীন ভারতে সেখানে হিন্দু বললেই জাত যায়; হিন্দী বললেই বজ্জাত পায় অর্ধেক রাজত্ব, পায় রাজকন্যা। সেখানে হিন্দুর আত্মা খাঁচা ছাড়া হবার আগেই রেখে যাই কাশীখণ্ড নয়; কাশী অখণ্ড।

কাশীর ইতিবৃত্ত। কাশীর যৎকিঞ্চিৎ নয়; কাশীর যথাসর্বস্ব। বরুণা থেকে অসি; গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেই বারাণসী; যৌবনের বরুণা থেকে জীবনের অসি পর্যন্ত মানুষের সমস্ত প্রশ্নের উত্তরবাহী যেখানে প্রাণগঙ্গা সেই পুণ্যভূমি কাশী,—পৃথিবীর প্রণতি গ্রহণ কর আজ।

কাশী কেবল বিশ্বনাথের নয়; বিশ্বের যতেক অনাথ, দুনিয়ায় কোথাও যাদের জায়গা নেই তারাও স্থান পেয়েছে বিশ্বনাথের বিশ্ববহির্ভূত এই আবাস-ভূমিতে। কাশী কেবল ধর্মের নয়, অধর্মেরও। এখানে যত ধর্মের ষণ্ড তত অধর্মের পাষণ্ড: এখামে যত সাধু তত অসাধু। যত পাণ্ডা তত দালাল। কাশীর অসংখ্য গলিত পাপের সঙ্গে পুণ্যের অনাদিকাল থেকে আশ্চর্য গলাগলি নয় ভিন্ন হবার; কিছুতেই নয় বিচ্ছিন্ন হবার। কিন্তু গঙ্গার ঘাট নয়; নয় বিশ্বনাথের মন্দির। হরিশ্চন্দ্রের স্মৃতি নয়; মণিকর্ণিকার মহাশ্মশান! ত্রৈলঙ্গের সাড়ে চারহাত বিশালাকায় মূর্তি; নয় বেনারস হিন্দু য়ুনিভার্সিটি। সারনাথের শান্ত পরিবেশ নয়; নয় ক্যাণ্টনমেণ্টের মেক-আপ-করা মুখ। কাশীর প্রাণের পরিচয় লক্ষকোটি মানুষের স্মরণাতীত কাল থেকে

পায়ে চলার এই গলিতেই শুধু সম্ভব। রূপকথার কথার কাহিনীতে রাক্ষসের প্রাণ রক্ষিত হয় দুর্গম অরণ্যের দুর্লভ বৃক্ষকোটরে; সিন্ধুর অতলে আত্মগোপন করে আছে যে অদৃশ্য মাছ তারই পেটে থাকে রাক্ষসের মারণাস্ত্র; আর নয় জনশূন্য পাহাড়ের চূড়ায় বহু যুগের ওপার থেকে কদাচিৎ উড়ে আসে যে নীলপাখি সুদীর্ঘ ব্যবধানে মাত্র একবার তারই বুকের পাঁজরে ধুকপুক করে দৈত্যের হৃৎপিণ্ড। কাশীর অপরূপ কথাও আর কোথাও নেই; তাও আছে, যদি কোথাও থাকে, কাশীর এই গলিতেই। গলির শেষ নেই; বিশ্বনাথের ভূমির বিস্ময়ও অশেষ।

বিশ্বনাথের গলিতেই নয় কাশীর চরম বিস্ময়। তার চেয়েও অন্ধকার, তার চেয়েও শীর্ণকায় এক গলিতে দেখেছি সেই পরমাশ্চর্যকে। তাঁকে দেখতেই আমার বার বার কাশী যাওয়া। বিশ্বনাথকে প্রণাম করলে অক্ষয় পুণ্য হয় কিনা জানি না; গঙ্গার জলে একবার অবগাহন করলেই অঙ্গচ্যুত হয় কিনা পাপের স্পর্শ বলা শক্ত; কিন্তু কাশীর গলিতে যাঁকে দেখামাত্রই পবিত্র হয় দেহ-মন তিনিই কাশীর দিদিমা। সত্তরের কাছে বয়স সারা কাশীর এই একমাত্র দিদিমার। ধনুকের মতো বেঁকে গেছে পিঠ, চোখ প্রায় অন্ধ। অর্থই যদি মানুষের একমাত্র সহায় হয় তাহলে নিদারুণ নিঃসহায় আমার এই কাশীর দিদিমা, প্রতিপত্তি যদি সাংঘাতিক সম্বল হয় আজ মানুষের তাহলেও কাশীর দিদিমা নিঃসম্বল ছাড়া নন কিছু। তবু অর্থের ওপর নিশ্চয়ই আছে আরও কিছু নির্ভর, না-হলে কেন তবে নিশ্চিন্ত সন্ধ্যাকাশের মতো শান্ত প্রশান্ত সেই আনন? কেন তবে সেই দুই চোখে ধ্রুবতারার মতো দীপ্তি, হাসিতে কেন মানুষের প্রতি অর্থহীন বিশ্বাস বিচ্ছুরিত।

লোকে যখন বলে বুড়ো বয়সে অর্থ-সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় কারুর বেঁচে থাকার কোনও অর্থ হয় না, তখনই আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। বলতে ইচ্ছে করে, দেখে আয় একবার আমার কাশীর দিদিমাকে। অর্থ, সম্বল, প্রতিপত্তি, প্রতিষ্ঠা, লোকমান কত ছোট কত কেঁচো হয়ে যায় চরিত্রের, হৃদয়ের, ব্যক্তিত্বের ঐশ্বর্যের কাছে। যৌবনের গ্ল্যামার আর ম্যাক্সফ্যাক্টরের মেক-আপ; নাইলনের শাড়ি, হ্যামিলটনের গয়না, লেটেস্ট মডেল স্ট্রিমলাইণ্ড বাতাস-নিয়ন্ত্রিত গাড়ি কেমন লজ্জায় মুখ ঢাকে সেই কোমর-পড়ে-যাওয়া, কাশীর দরজায় উপস্থিত, দরিদ্র হৃতসর্বস্ব, নিঃসঙ্গ মানুষটার সামনে, তাদের কাছে হুমড়ি খেয়ে পড়ে অন্তঃসারশূন্য সমস্ত বাহ্যাড়ম্বর। লোকে যখন বলে যৌবনের মতো কাল নেই তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান কাশীর দিদিমা। সন্ধ্যেবেলার আকাশের পাটে বসা সূর্যের শান্ত রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেছে সুগৌর আননে। মোহমুক্তির পরমাশ্চর্যে উজ্জ্বল চোখের নীলমণি; আর সেই সঙ্গেই একসঙ্গেই আবার ভুল করেছে সারা জীবনে, গিঁট পাকিয়ে ফেলেছে চলার গ্রন্থিতে, পায়ে পায়ে আটকে পড়ে গেছে পেছনে, ছিটকে গেছে সে দলছাড়া গোত্রছেঁড়া, নামহীন, পরিচয়হীন অন্ধকারের অতলে, সেই পতিত জীবনযাত্রীদের প্রতি সীমাহীন

সহানুভূতিতে সজল দু'চোখের কোণে চিকচিক করছে সব-ভোলার সমস্ত ক্ষমা করার অপার করুণা।

যৌবন যে মানুষের একমাত্র সুসময় তার মতো হতভাগ্য আর কে? প্রথম-দিনের সূর্য, প্রভাতের প্রথম সূর্য, মধ্যদিনের প্রজ্বলন্ত দিবাকরে উত্তর নেই সত্তার প্রথম আবির্ভাবে সেই প্রশ্নের, কে তুমি? দিবসের শেষ সূর্যেও হয়ত তার জবাব নেই; কিন্তু সেখানে আছে।

'আমার গানের মধ্যে সঞ্চিত হয়েছে দিনে দিনে
সৃষ্টির প্রথম রহস্য,—আলোকের প্রকাশ,
আর সৃষ্টির শেষ রহস্য,—ভালোবাসার অমৃত।
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন
সকল মন্দিরের বাহিরে
আমার পূজা আজ সমাপ্ত হলো।
দেবলোক থেকে মানবলোকে
আকাশে জ্যোতির্ময় পুরুষে
আর মনের মানুষে আমার অন্তরতম আনন্দে।'

মানুষের যৌবন দেবতার বর; কিন্তু মানুষের দীর্ঘজীবন জীবন-দেবতার আশীর্বাদ।

সমাজে যারা অনর্থক বড় তাদের অকারণে আরও বড় কারবার দুর্মানসে লোকে তো বটেই স্ত্রীলোকেও অশীতিপর বৃদ্ধাকে চির-তরুণ তৈরী করে। আমাদের ধারণায় তারুণ্যেই কেবল গরিমা আছে; এমন ভাবার কারণ বার্ধক্যের মহিমা আমরা জানি না তাই। আশীর ওপর যার বয়স তখনও যদি তাকে তরুণ বলতে হয় তাহলে তার চেয়ে করুণ আর অবস্থা কার? আশীতেও যে প্রবীণ নয় দীর্ঘজীবন তার পক্ষে নয় আশীর্বাদ। যৌবনের আছে ভার; যৌবনের কেবল জ্বালা। বার্ধক্যের আছে শান্তি; বার্ধক্যের রয়েছে নির্লিপ্ততা। যৌবনের কেবল রূপ; বার্ধক্য অপরূপ। যৌবনের ভুল বার্ধক্যে না পৌঁছতে পারলে ফুটে ওঠে না ফুল হয়ে; যে ফুলের চেয়ে অনেক বিউটিফুল আমার কাশীর দিদিমা। দিনের প্রান্তে পৌঁছে তবেই পূর্ণের, সম্পূর্ণের পদপরশ পড়েছে যার ওপর তা কেবল অসাধারণ যৌবনের নয়; তা জীবনের ধন।

আরেক দল আছেন যাঁরা, এই প্রসঙ্গে তাঁদের বক্তব্য উত্থাপনযোগ্য, আবার বলেন একদম জানান না দিয়ে মরার মতো শান্তি আর নেই। ঘুমের মধ্যেই, অথবা শরীরটা একটু খারাপ লাগছে বলার আধ ঘণ্টার মধ্যেই সটকে পড়ার মতো মধুর মৃত্যু হতে পারে না আর কিছুই। কথাটা অশীতিপরকে চিরতরুণ বলার মতোই নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কি? এই কথা যখন কেউ বলে তখন আমার সামনে এসে দাঁড়ান, ধনুকের মতো বেঁকা পিঠ, প্রায় অন্ধ চোখ এবং সত্তর থেকে ততদূরে আশী থেকে যত কাছে, কাশীর দিদিমা। নির্বান্ধব

দৈত্যপুরীতে, অর্থ, সামর্থ্য সহায়, সম্বল, প্রতিপত্তিহীন লোকমানবিহীন সেই বৃন্ধার জীবনের পথ, দিনের প্রান্তে এসে নিশীথের পানে গহনে হারাবার আগের উচ্চারণ করছে :

'ম্লান দিবসের শেষের কুসুম তুলে
এ-কূল হইতে নবজীবনের কূলে
চলেছি আমার যাত্রা করিতে সারা।'

এ কেবল রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয় ; মানব-জীবনের মর্মবাণী।

মানুষের মুখে এই কবিতা মুদ্রিত হয় না সহজে। জীবনে অনেক দুঃখ এক জীবনে বহন করবার দুর্যোগ ঘনঘোর করে না এলে দিবসের শেষ সন্ধ্যায় কেউ যোগ্য হয় না সেই গৌরবের, সেই গর্বের ;—বীরের যে গৌরব, যে গর্ব তাকে মহৎ জীবনের দেয় অক্ষয় অধিকার। যৌবনের সুখ চাই, কিন্তু বয়স হলে অসুখ চাই না. একথা কেবল তারাই বলতে পারে সমুদ্রে ঝড় উঠলে যারা সব চেয়ে আগে পরিত্যাগ করে ফুটোজাহাজের নিরাপদ আশ্রয় ; সকলের আগে। তারা পুরুষ নয় কোনওকালে, তারা চিরকাল কাপুরুষ। 'যে কেবল ভোগের আনন্দ জানলো, দুর্ভোগের উত্তেজনায় হলো না রোমাঞ্চিত ; যে কেবল যোগের আসনে বসে মনে করলে ঈশ্বর আছেন শুধু ঠাকুরঘরে, দুর্যোগের দুঃশাসনে দ্রৌপদীর বস্ত্র ধরে টান দিলে দু'হাত তুলে যে না হলো পূর্ণ নির্ভর যতক্ষণ না দেখা দিল শঙ্খচক্রগদাপদ্মবিভূষণ ততক্ষণ ঈর্ষার যোগ্য নয় তার মানবজন্ম। সে হতভাগ্য জানে না, দুঃখের বরষায় চক্ষের জল না নামলে বক্ষের দরজায় থামে না বন্ধুর রথ।

তাই কাশী নয় কেবল ; কাশীর দিদিমার কাছে চলো। যৌবনে রাজার দুলালী ছিলেন তিনি ; দেখতে কেমন ছিলেন জানি না। তবে যত ডাকসাইটে রূপই তাঁর থাকুক সেদিন আজকের মতো এমন অপরূপ ছিলেন না জানি। শুনেছি বিরাট জমিদার রাতারাতি বিবাহ করে নিয়ে যান দিদিমাকে : তাঁর বয়স তখন বারো। জমিদার নিজের বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন স্বজনপরিবারকে : এবার মৃগয়ায় বেরিয়ে কি এনেছি দেখো। দেখবারই মতো বটে ; হাঁ করে চেয়ে দেখবার মতো। মৃগের চেয়ে মানুষের চোখ কত বেশী কত সুন্দর মৃগনয়ন হতে পারে কাশীর দিদিমার প্রায় অন্ধ হয়ে আসা চোখেও আজও এই মুহূর্তেও তা পড়তে পারা যায় জীবনের অন্তিম প্রদোষ আলোকে যখন চোখ তোলেন তিনি নীরব জিজ্ঞাসায় : কে এলি বাপ আমার ? বোস বাবা, ঠাণ্ডা হ ; হ্যাঁ রে, ঘরে যে আজ দেবার মতো নেই কিছু—

বলতে ইচ্ছে করে জড়িয়ে ধরে সেই পড়ে যাওয়া কোমর :—তোমার ছাড়া আর কার আছে দিয়ে না ফুরোবার এমন সমুদ্র হৃদয়।

এই কাশীর দিদিমার আজ কিছুই নেই ; আজ কেউ নেই। ছেলেরা বাইরে চাকরি করে। একমাত্র মেয়ের বাস সুদূর বোম্বাই শহরে ; পতিগৃহে। একমাত্র

ভাই সদ্য পরলোকগত। তবু যদি আশা দেবার কারণে কেউ বলে কখনও, দিদিমা, আপনাকে দেখবার মতো আরেকজন কেউ হলে ভালো হতো, না? দিদিমা হাসেন; অন্তরের অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে আসে অদৃষ্টকে অস্বীকার করা মেঘমুক্ত দিনে আকাশের প্রসন্ন বন্ধুর হাসি: হলে ভালো; না হলে আরও ভালো।

নীলোৎপলনয়ন দেবীর পারে রেখেছিলেন শ্রীরামচন্দ্র; নিঃস্বার্থ ছিলো না সেই প্রণাম কিন্তু; ছিলো সীতা উদ্ধারের সাহায্য প্রার্থনা। দেবী বলেছিলেন তথাস্তু। সীতা উদ্ধার হয়েও কিন্তু হয়নি রাজরমণী; মাটির তনয়া আর কারুর তো নয়; মাটির বুকেই ফিরিয়ে নিয়ে গেছেন তাঁকে দেবী দুর্গা।

মহিষাসুর প্রার্থনা করেছিলো: ত্রিভুবনে দেব-দানব মানব কারুর কাছে তার হবে না হার;—সে প্রার্থনাও পূরণ হতে দেরি হয়নি; দেবীর আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিলো তার বিনাশের কারণে; মহিষের প্রিয়া হয়েছিলো দেবীর গলার হার।

মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রার্থনা উচ্চারিত হয়েছে ৺চণ্ডীর স্তবে: রূপং দেহিং; জয়ং দেহি। মহাচণ্ডী রূপ দিয়েছেন; জয়দান করেছেন; যশোদান করেছেন; শত্রুকে দিয়েছেন পরাজয়। কিন্তু তারই সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছেন মারণাস্ত্র; সে অস্ত্রে সে নিজের মৃত্যুর আয়োজনকেই শান দিয়েছে শেষ পর্যন্ত।

কিন্তু এ প্রার্থনা পেঁৗছেছে কখনও মর্ত্যলোক থেকে অমর্ত্যলোকে: হলে ভালো; না হলে আরও ভালো।

হলে ভালো; এ পর্যন্ত শোনা অথবা না শোনা দাতার ওপর নির্ভর করে। কিন্তু না হলেও যার সমান ভালো তার মন্দ করে এমন কে আছে ত্রিভুবনে?

এই কাশীতে গেছি যতবার ততবার কাশীনাথের আগে, সর্বাগ্রে দৌড়েছি কাশীর দিদিমার কাছে। আর প্রত্যেকবার শুনেছি তাঁর মুখে তাঁর একটি মাত্র বলবার, বার বার বলে না ফুরোবার সেই অর্ধ-কালীর কাহিনী। কাশীর দিদিমারই বংশে একাদশ পুরুষ আগে এসেছিলেন অর্ধেক মানবী অর্ধেক ঈশ্বরী পরমাশ্চর্য এক নারী। তাঁর কথা বলতে বলতেই কাশীর দিদিমার ক্লান্তি নেই: তাঁর কথা বলতে বলতেই কাশীর দিদিমা আর প্রায় অশীতি-বরষের বৃদ্ধা থাকতেন না; অন্ধ দু'চোখ তাঁর জ্বলে উঠতে দেখেছি আলোয়। দেহের গঙ্গায় দেখেছি দুকূল ছাপিয়ে ডাকতে জীবনের বন্যা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত প্রত্যক্ষ করেছি রোমাঞ্চিত হতে। তাঁর নয় আমারও কাঁটা দিয়েছে প্রত্যেকবার যতবার শুনেছি অর্ধ-কালীর কাহিনী; ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করলে মানুষের কি হয় পুঁথির পাতায় তো লেখা নেই কোথাও; ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করলে সংসারের সঙ্গ ত্যাগ করে যারা সং সেজে আনন্দ পায় সেই বকোমধ্যে হংস হয় মানুষ; ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করলে

বকোমধ্যে হংস হয় ; ঈশ্বরপ্রসঙ্গ করলে হয় পরমহংস। ঈশ্বরসঙ্গ করেছেন। ক্ষণকালের জন্যেও এমন ক্ষণজন্মার মুখে ঈশ্বরপ্রসঙ্গ শুনে থাকে যদি কেউ তবে কেবল সে-ই অনুভবে আনতে সক্ষম হবে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর কাহিনী-শুনতে কেন এমন হয় ; সূর্যের শেষ আলো মুখে এসে পড়লে কাশীর সেই অন্ধকার গলির একফালি আরও অন্ধকার ঘর আলো হয়ে যায় কখন্ ; কখন ভরে যায় রজনীগন্ধার সৌরভে ; বয়ে যায় কখন সেই ঘরের ওপর দিয়ে সুরের সুরধুনী ; আর কাশীর দিদিমার কণ্ঠে অর্ধ-কালী আবির্ভূত হন যখন, মনে হয় ফিরে গেছি অন্ধকারে আশ্চর্য আলো করা আনন্দানন বাল্মীকির মুখে যেখানে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে রামায়ণগান সেই সংখ্যা গণনার অতীত এক না-প্রত্যুষ, না-প্রদোষে।

তিনশো বছর আগেকার কথা। ঢাকার মানিকগঞ্জ মহকুমায় মিতরা গ্রামের পদ্মনাভ-বংশোদ্ভব শ্রীগোবিন্দরাম ভট্টাচার্যের পুত্র শ্রীরাঘবরাম ভট্টাচার্য তাঁর শিক্ষাগুরু মৈমনসিংহ জেলার মুক্তাগাছার প্রতিবেশী গ্রাম পণ্ডিতবাড়ির সাধক দ্বিজদেবের টোল থেকে শিক্ষা সমাপনে প্রত্যাগমন করছেন নিজের গ্রামে নৌকায়। নদীর জল সন্ধ্যার অন্ধকারেও আলো হয়ে আছে ; সহস্র পদ্মের গন্ধকে হার-মানানো এ কোন্ আশ্চর্য সৌরভ আসছে নৌকার অন্ধবিবর থেকে ? স্বগ্রামীণরা অপেক্ষা করছে স্তব্ধ বিস্ময়ে সঙ্গে করে কী এনেছেন রাঘবরাম ? পুঁথির পাতায় তো এত আলো নেই ; নৌকার দেহ তো নয় চন্দনকাঠের ; তবে ? রাঘবরামও নেমে আসতে পারছেন না নৌকা ছেড়ে সহসা। রহস্য নিবিড় হয়ে এলো মিতরার বুকের ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া নদী-তীরে রাঘবরাম আর তাঁর গ্রাম-বাসীদের ঘিরে। তারপর কোন্ সময়ে যে উঠে গেছে যবনিকা সেই পরমের চরমনাট্যের ; নিজেই আবির্ভূতা হয়েছেন রাঘবরামের পরমরমণী জয়দুর্গা ; কেউ জানে না। এ কি অপরূপ আবির্ভাব। ঘোমটায় মুখ ঢাকা ; যেন মেঘে ঢাকা পূর্ণশশী ফেটে পড়তে চাইছে আলোর ভার বইতে না পেরে ! কিন্তু সেই অঙ্গের যেটুকু হয়েছে দৃশ্যমান তার বর্ণ নয় বর্ণনীয় বিষয়। অর্ধেক তার ঘনশ্যাম আর অপরার্ধ অপরিসীম গৌর। নৌকায় উঠে দাঁড়াতেই জয়দুর্গা যেন দুলে উঠল ত্রিভুবন ; সিংহের ওপর যেন আরূঢ়া হলেন জগদ্ধাত্রী। রাঘবরামের মুখে নিঃসরণ হলো না একটি বাক্যও ; গ্রামবাসীরাও নির্বাক্। ছলাৎ ছলাৎ করে বয়ে যেতে গিয়ে কেবল মিতরা গ্রামের নামহীন সেই নদী, থেমে গেছে বুঝি মুহূর্তের জন্যে ; তারপর বয়ে গেছে আবার দ্বিগুণ বেগে যেমন বয়ে চলেছে সে চিরকাল।

রাঘবরমণী জয়দুর্গা সাধক দ্বিজদেবের কন্যা। জয়দুর্গার আবির্ভাবের আগে দ্বিজদেব দীর্ঘকালব্যাপী বহু সাধনায় বহুতর আরাধনায় দেবী যোগমায়াকে ডেকেছিলেন দেখা দেবার জন্যে একবার। আবির্ভূত হয়েছিলেন দেবী যোগমায়া ; বলেছিলেন : বর চাও : বর চেয়েছিলেন সাধক দ্বিজদেব।

অর্থ নয় ; সামর্থ্য নয়, নয় তুচ্ছ লোকমান। চেয়েছিলেন যোগমায়া আসুন তাঁর ঘরে। অদৃশ্য থেকে নয় ; অন্তরালে থেকে নয়। নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল যে ভুবনমনোমোহিনীরূপে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন দ্বিজদেবের গানের ওপারে সেই বিচিত্র রূপে আসুন দ্বিজের কুটীরে।

দেবী যোগমায়া পূরণ করেছিলেন ভক্তের প্রার্থনা এই বলে : তাই হবে তবে। আমি কলির চার হাজার সাত শত বর্ষ পর অর্ধ-কালী মূর্তিতে প্রমূর্ত হবো তোমারই ঘরে ; আমার অঙ্গ একাংশ হবে কৃষ্ণ এবং অপরাংশ গৌরবর্ণ হবে। পদ্মনাভ বংশের বিশুদ্ধচেতা গোবিন্দচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাঘবরামের সঙ্গে আমার বিবাহ উদ্‌যাপিত হবে যথাসময়ে।

দেবী অন্তর্হিতা হবার আগেই তাঁর দৈববাণীর সমর্থনে জয়ধ্বনি করলেন দেবলোক। সিদ্ধকাম শুনতে পেলেন গান উঠেছে দিকে দিকে : ওই মহামানব আসে। দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে।

স্বপ্ন দেখলেন দ্বিজদেবের ভার্যাও ; ত্রিনয়নে তাকিয়ে আছে নগেন্দ্রবালা বিশ্ববিমোহিনী দৃষ্টিতে, নিমেষহারা যেমন তাকিয়ে থাকে মায়ের মুখের দিকে মায়ের কোলে শুয়ে শিশুকন্যা।

স্বপ্ন সত্য হলো। যথাসময়ে আবির্ভূতা হলেন জগজ্জননী সাধক দ্বিজদেবের ঘর আলো করে। বিচিত্ররূপিণীর নাম রাখলেন তাঁর বাপ-মা ; জয়দুর্গা। অর্ধেক অঙ্গ যাঁর কালো আর অর্ধেক যাঁর আলো, সেই অপরূপ বালিকা যখন ছোট্ট হাত বাড়ালো নাগালের অনেক বাইরের ফুল পাড়তে তখন সঙ্গিজন দেখলো অবাক-বিস্ময়ে পুষ্পভারনম্র বৃক্ষ নত হলো যেন প্রণত হয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিলো জয়দুর্গার পায়ে।

যথাসময়ে দ্বিজদেবের টোলে নিজে এসে দেখা দিলেন দেবী-নির্দিষ্ট বর স্বয়ং রাঘবরাম ছাত্র হয়ে। শিক্ষা সমাপন হলে গুরুদক্ষিণার সময় আসে। গুরুপ্রাণ শিষ্য রাঘবরাম নিবেদন করেন দ্বিজদেবকে : কি দক্ষিণা, আদেশ করুন ; দ্বিজদেব বলেন : তোমাকেই চাই রাঘবরাম। আমাকে ? হতবাক্ রাঘব-রামের নিমেষহারা নয়ন জানতে চায় তার মতো অকিঞ্চিৎকরকে দিয়ে কি কাজ হবে ঈশ্বরের প্রতীক মর্ত্যলোকে, শ্রীগুরুর। তোমাকে চাই তোমার জন্যে নয় ; আমার একমাত্র কন্যা জয়দুর্গাকে দিতে চাই তোমার হাতে। না না, তীব্র প্রতিবাদে মুখর হলেন শিষ্য শ্রীগুরুবাক্যের ; এ কখনও হয়নি ; এ কখনও হয় না, গুরুকন্যা ভগিনীতুল্যা, তাকে বিয়ে করতে পারবেন না রাঘব, স্বয়ং দ্বিজদেব আদেশ দিলেও। হয় ; নিশ্চয়ই হয় ! আগেও হয়েছে, এখনও হয়, পরেও হবে ! দ্বিজদেব নাছোড়বান্দা। অনেক তর্ক ; অনেকতর বিতর্ক ! শাস্ত্রের বিচার বিশ্লেষণ, নজীরের শেষে শেষ পর্যন্ত দ্বিজদেবই জয়ী হয়। অবশ্য সেদিন রাঘবরামের তাই বোঝবারই কথা ; কারণ তিনি গুরুকন্যাকে বিবাহ করতে চাননি কিন্তু বিবাহ করতে বাধ্য হচ্ছেন, কাজেই তাঁর বিচারে সেদিন তাঁরই হার।

কিন্তু জয়দুর্গাকে বিবাহ করায় জীবনযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন তিনি সেকথা উপলব্ধি করার সময় তখনও তাঁর হয়নি। এবং সময় না হওয়া পর্যন্ত পৃথিবীতে কিছুই হবার নয়; দুর্গার আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মহিষাসুরকেই মনে হয় সর্বশক্তিমান। পুরাণের এই প্রমাণ পুরানো হলেও মিথ্যে প্রমাণ হয় না আজও। আজও জগৎসংসারে যারা অন্যায় করে আরামে আছে সেই রাবণকে যে শেষ পর্যন্ত দুঃসময় হলে রামে মারবে, সময় হয়নি বলেই আমরা তাতে আস্থা রাখতে পারছি না।

জয়দুর্গা,—যাঁর অঙ্গে শ্যাম ও গৌরবর্ণের সমান সমারোহ সেই বিচিত্র-রূপিণী যখন মৃদু হেসে নিজে এসে জীবনের সিংহদ্বার খুলে দেখা দিলেন তখন রাঘবরামের সংসার অন্ধকার করে এলো নিদারুণ সামাজিক সমস্যা। একে রাঘবরাম বিবাহ করবার সময়ে সময় পাননি স্বগ্রামীণ কাউকে জানাবার; তায় নতুন বউয়ের অপূর্ব রূপও কিছুটা বিরূপ করবে তাদের। তারা নতুন বউয়ের হাতে প্রথমান্ন গ্রহণ করতে আপত্তি করল। অনেক অনুনয়ে, অনেক বিনয়ে এক সময়ে গ্রামের সমাজের শুকনো হৃদয় করুণাধারায় গললো! তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলো রাঘবরামের গৃহে 'নববধূ-ভাতে'-র অনুষ্ঠানে পাত পাড়বার।

বিধাতার মনে কি ছিলো কে জানে, দমকা হাওয়ায় উড়ে গেলো মাথার ঘোমটা অন্ন-পরিবেশনরত নববধূ জয়দুর্গার। মাথা নীচু করে অন্ন মুখে তুলছেন সার সার নিমন্ত্রিতেরা; সকলের অলক্ষ্যে জয়দুর্গার অঙ্গে আবির্ভূত হলো যোগমায়ার আরও দুই হস্ত। নিমেষে মাথার ঘোমটা টেনে দিয়ে চতুর্ভুজা হলেন আবার দ্বিভুজা; যোগমায়া আবার জয়দুর্গা।

সকলের অন্নগ্রহণ সমাপ্ত হলে, চলে গেলে সবাই, ঠাকুরঘরে ক্লান্ত জয়দুর্গা যখন একা, তখন ফিরে এসেছে একজন নিমন্ত্রিত; সঙ্গে এনেছে এক জোড়া নয়, দু জোড়া শাঁখা। এসে বলেছে জয়দুর্গাকে সেই শাঁখা পরতে। দুটি শাঁখা দু হাতে পরে জয়দুর্গা জিজ্ঞেস করেছেন: দু হাতের জন্যে চারখানা শাঁখা কেন?

কেন?—পায়ে লুটিয়ে পড়ে বলেছে ভক্ত: তুমি দ্বিভুজা নও যে মা: তুমি চতুর্ভুজা—

দেখে ফেলেছিস?

একবার দেখেছি মা; আরেকবার দেখতে চাই। তুমি দাঁড়াও তোমার ভুবনমনোমোহিনী মূর্তিতে—ভক্তের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ, সম্পূর্ণ করতে বিধাতার অভিলাষ, জয়দুর্গা দাঁড়ান চতুর্দিক আলো করে চার হাতে পরিধান করে চার শাঁখা। ভক্ত অনিমেষ লোচনে দেখে অর্ধশ্যাম অর্ধগৌর জয়দুর্গাকে নয়; ৺অর্ধ-কালীকে।

মূর্ছিত হয়ে পড়ে সে। রূপসংবরণ করেন যোগমায়া। গ্রামের সকলের

সমবেত চেষ্টাতেও কিন্তু মূর্ছা ভাঙে না ভক্তের ; জয়দুর্গা হাসেন : এ মূর্ছা ভাঙবার নয় যে, মর্ত্যবাসীর কানে গেছে যে অমর্ত্যলোকের মূর্ছনা !

দিনের অন্তিম আলো আকাশের আঙিনায় মিলিয়ে গেলে, কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধ-কালীর এই কাহিনী শুনতে শুনতে—হোন আপনি যত সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত—আপনার মনে হবে আপনি কাশীর দিদিমার মুখে রূপকথা শুনছেন না ; শুনছেন মানবজীবনের অপরূপ কথা ।

॥ দুই ॥

"The temple is lit by naked electric bulbs that hang from the ceiling and throw a harsh light on the sculpture, but where they do not penetrate render darkness more mysterious. The impression you take away with you, notwithstanding that vast, noisy throng, or may be because of it, is of something secret and terrible."

—*A Writer's Notebook* [Page 290]

৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী পর্যন্ত ; ৺মা কালী থেকে ৺বিশ্বনাথ পর্যন্ত তেত্রিশ কোটি দেবদেবীকে দেখতে যায় যারা তাদের অনেকের মুখে প্রায় শুনবেন ভারতবর্ষের হিন্দু মন্দির ভারি অন্ধকার ; ভারি অপরিষ্কার । এখানে পাণ্ডাদের আর যাত্রীদের ভিড়ে ভয়ংকর অস্বস্তি হয় ; ভালো করে দেখা যায় না মূর্তির মুখ । পূজা করা যায় না প্রাণ ভরে ; নিভৃতে নির্ভয়ে করা যায় না মন্ত্রোচ্চারণ । পৃথিবীর দূরপ্রান্ত থেকে যারা আসে ভারতবর্ষের মহা-মানবের মন্দির-প্রাঙ্গণে তারাও উদ্‌ভ্রান্ত হয় এই দেখে ; ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে ফিরে যায় নিজের দেশে । সেখানে গিয়ে বই লেখে ; সে বই পড়ে আবার আমরাই মূর্ছা যাই । লজ্জা পাবার চেষ্টা করি দেবদাসীর নৃত্যের কথা লেখা আছে দেখে । অথবা আমাদের মন্দির নয় কেন মুক্ত ভিড় আর অন্ধকার আর অপরিষ্কারের কলংক থেকে তাই নিয়ে দৈনিকপত্রের 'মতামতের জন্যে সম্পাদক দায়ী নন' কলামে খোলা চিঠি লিখে জন্ম সার্থক করি । ভুল বলেছি । ৺কালীঘাট থেকে ৺কাশী ; ৺মা কালী থেকে ৺বিশ্বনাথ । কোথাও, কাউকেই দেখতে যায় না এরা ; দেখাতে যায় । নিজেদের জাহির করতে যায় জগতের সর্বত্র । কত তীর্থ ঘুরেছে তারই সচিত্র সচল বিজ্ঞাপন এরা । এদের লেখা বইতেই পাবেন কেবল ৺কাশী কলিকাতা থেকে কতদূর ; এখানে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কি কি দেখবার অথবা কেনবার আছে : হোটেল, ধর্মশালা অথবা যাত্রী-নিবাসের সংখ্যা কত ; ইত্যাদি । ওদের বইতেই পাবেন ৺কাশীর এরিয়া কত

মাইল-গজ-ফুট-ইঞ্চিতে। পাবেন না কেবল ৺কাশী ভারতে হিন্দুর কাছে কি এবং ৺কাশীর মন্দিরে আসা লোকে আর অগণিত মানুষের পায়ের ধুলোয় অপরিচ্ছন্ন অপরিসরে যিনি স্মরণাতীত কাল থেকে অচল হয়ে আছেন সেই ৺বিশ্বনাথ হিন্দুধর্মের কে ?

মন্দিরের বাইরে থেকে যে চলে যাবে না ; প্রবেশ করতে পারবে কেবল মন্দিরের মধ্যে নয়,—মূর্তির অন্তরে কেবল সেই জানবে জানতে পারবে হিন্দুরা যায় আরাধনা করছে যুগে-যুগান্তরে সে মাটির পুতুল নয় ; প্রাণের প্রতিমা। পৌত্তলিক বলে যারা হিন্দুদের উপহাস করেছে তারা জানেনি যে সে মাটিকে হিন্দুরা মাটি করেনি কোনও দিন। 'মাটির' মূর্তি থেকেই হিন্দুর হৃদয়ে চিরকাল মূর্ত হয়েছে 'মা'-টিই ; প্রমূর্ত হয়েছেন তিনি। যার প্রাণে একবার গেছে এই বার্তা, যার প্রাণে একবার বেজেছে এই বাঁশী কেবল সেই জেনেছে যে মানুষের পায়ে মন্দির-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার হয় না ; পবিত্র হয়। হিন্দুর মন্দির য়ুরোপের আর্ট-গেলারি নয় ; কনোসুয়ার অথবা ক্রিটিক ছাড়া সেখানে আর সকলের জন্যই অলিখিত নির্দেশ ঝুলছে : নো অ্যাডমিট্যান্স। হিন্দুর মন্দির নয় আধুনিক ভারতের ড্রয়িংরুম যেখানে কার্পেটের ওপর চার ধারের সোফার মাঝখানে বেতের টেবিলের ওপর কাগজের ফুলে আর ঘরের কোণে এক দেওয়াল যেখানে আরেক দেওয়ালের ডিসটেম্পার্ড মুখে চুম্বন করছে সেখানে সযত্নে দাঁড় করিয়ে রাখা মাটির তৈরী ঘোড়া অথবা ভাঙা কুঁজোয় ভারতীয় সংস্কৃতির উজ্জ্বল উদাহরণ উপস্থিত, কৃষ্টির আর আঁতেলেকতুয়াল দৃষ্টিতেই কেবলমাত্র।

৺বিশ্বনাথের মন্দির এর চেয়ে অনেক বড়। এখানে রাজা আর প্রজা ; জ্ঞানী এবং মূঢ় ; পাপী এবং পুণ্যাত্মার আসন পাশাপাশি। এর অন্ধকারকে যারা শুধু বিদ্যুৎ-আলোর অভাব মনে করে তাদের চোখ আছে তবু দৃষ্টি নেই। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ নেই কিন্তু ভিতরের দৃষ্টি আছে সে জানছে যে এই অন্ধকারের উৎসব হতে যে আলো অনন্তকাল ধরে নিত্য-উৎসারিত সেই দিব্যালোকে ৺বিশ্বনাথের অঙ্গ আলোকময়। অগণিত অসংখ্য মানুষের পায়ের ধুলোয়, জলে-কাদায় পাঁকে যে দেখে মন্দির-প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার সে দু'বেলা চোখ ধোয় তবু তার দৃষ্টি পরিষ্কার নয়। কিন্তু এমন কেউ যদি কোথাও থাকে যার বাইরের চোখ বোজা কিন্তু অন্তরের দৃষ্টি পরিচ্ছন্ন সে এই অন্ধকারের মধ্যে জ্যোতির সমুদ্র দেখতে পায় ; এই পাঁকের মধ্যে পায় পদ্মগন্ধ। তার কণ্ঠে অবারিত হয় সুরের সুরধুনী ; এই জ্যোতি সমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে, তারই মধুপান করেছি ধন্য আমি তাই।

অচল ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে অন্ধকারে আলো করে এমনই একদিন এসে দাঁড়িয়েছিল এই ৺কাশীতেই একজন, লোকে আদর করে আজও যাঁর উদ্দেশে

দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে বলে : সচল ৺বিশ্বনাথ। ৺বিশ্বনাথের মন্দিরে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার উত্তাল তরঙ্গে, কখনও তার সূর্যস্নাত তীরে, কখন বন্ধদ্বার প্রকোষ্ঠের অন্ধকারে, সুধা ও বিষ্ঠাকে, মেঘ ও রৌদ্রকে, শীত ও গ্রীষ্মকে, সুখ ও দুঃখকে, পরম পাওয়ার গভীর আনন্দ এবং চরম না-পাওয়ার সুগভীর বেদনাকে তিনি সমজ্ঞান করেছিলেন। সুখে তিনি বিগতস্পৃহ; দুখে তিনি নিরুদ্বিগ্ন। বীতরাগভয়ক্রোধ তিনি। তাঁর কথা না বললে আগে, সর্বাগ্রে স্মরণ না করলে ৺কাশীর কথা বলা হয় না।

এই ৺কাশীতেই ৺কালীমন্দিরে দাঁড়িয়ে এই সচল ৺বিশ্বনাথ একদিন প্রস্রাব করে ছিটিয়ে দিতে লাগলেন ৺কালীর গায়ে। সঙ্গে ছিলেন আরেক মহৎ জীবনজিজ্ঞাসু। তিনি এরকম আশ্চর্য দুঃসাহস দেখে স্তম্ভিত। তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে জবাব লেখা হলো মাটিতে : গঙ্গোদকং। কিন্তু ৺কালীর গায়ে তাকে ছিটিয়ে দেওয়া কেন? তার উত্তর আরও বিস্ময়কর; আরও বিশ্বাসের বাইরে : পুজো।

প্রস্রাব যাঁর কাছে গঙ্গাজল; মূত্র যাঁর পুজোর মন্ত্রপূত বারি কেবল তাঁকে জানলেই ৺কাশীকে জানা হয়। তাঁর নাম জানলেই প্রণাম করা হয় ৺বিশ্বনাথকে ৺কাশীতে মৃত্যু হলে কেন হিন্দুরা বিশ্বাস করে যে শিবলোক-প্রাপ্ত হয় মানুষ তার জন্যে যেতে হয় ৺কাশীতে নিজের জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যিনি ৺বিশ্বনাথ কেবল অন্ধের দৃষ্টিতেই অচল; মোহান্ধের চোখেই সে মন্দির অন্ধকার; মানুষের পায়ের ধুলায় সে প্রাঙ্গণ অপরিষ্কার। সুদীর্ঘ-কালব্যাপী এই সচল ৺বিশ্বনাথ বসে ছিলেন অচল ৺বিশ্বনাথের পায়ের কাছে। যেখান থেকে আবির্ভূত হয়েছিলেন, মিলিয়ে গেছেন একদিন সেখানেই। মিলিয়ে যাবার আগেই নিজের দুঃসাধ্য সাধনা দিয়ে আর জ্যোতির্ময় আরাধনা দিয়ে মিলিয়ে দিয়ে গেছেন মানুষের প্রশ্নের উত্তর। কেন একজন দুঃখ পায় আর আরেকজন পায় সুখ। আবার এমন একজনও কেন থাকতে পারেন যিনি সুখে দুঃখ এবং দুঃখে অনুভব করতে পারেন সুখ। যিনি শীতকে উষ্ণ; উত্তাপকে নির্বাণ; রূপকে অপরূপ; মূত্রকে মন্ত্রপূত বারি মনে করতে পেরেছিলেন ৺বিশ্বনাথের মন্দির প্রবেশ করবার আগে অনুপ্রবেশ করতে হবে তাঁরই অলৌকিক জীবনের অন্তর্লোকে। অলৌকিক কিন্তু এতটুকু অলীক নয় যাঁর দিব্য ইতিহাস সেই ত্রৈলঙ্গস্বামীর নাম করে তাঁকে প্রণাম করে আরম্ভ করছি এই কাশীরই কাণ্ড। এই ৺কাশীর কথা অমৃতসমান; যে শোনাচ্ছে এবং যিনি শুনছেন, সেই দুয়ের ওপরই বর্ষিত হোক সেই একের আশীর্বাদ। সেই এক হয়েছিলেন একদিন এই ৺কাশীতে সেই ৺একজন,—সেই ত্রৈলঙ্গ স্বয়ং সহায় হোন। তাঁর কথা তিনিই বলুন যিনি মূককে বাচাল করেন, পঙ্গুকে দিয়ে করান পর্বতলঙ্ঘন। অয়ম্ আরম্ভঃ শুভায় ভবতু।

ঝড় উঠবার আগে যেমন কৃষ্ণবর্ণ আকাশ থমথম করতে থাকে আতঙ্কে, আশঙ্কায় ; আশ্বিনের আকাশ যেমন নিরুপম নীলে আসন পাতে আসন্ন ৺মহাপূজার ; তেমনই মহামানবের সময় হলে আবির্ভাবের দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে। অমর্ত্যলোক থেকে মর্ত্যলোকে আসেন এই মহামানবরা ; যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূত। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বীর যারা বিষিয়ে দিয়েছে বায়ু. নিভিয়ে দিয়েছে আকাশ উবুড় করা আলো তাদের দিকে তাকিয়ে ক্ষমাসুন্দর হাস্যে বলেছেন : ক্ষমা করো ; ভালোবাসো। বিদ্বেষ বিষ নাশো। সকল যুগের সব সাধকের ধারা ধেয়ানে মেলাতে চেয়েছেন যাঁরা তাঁরা এসেছেন কখনও রাজগৃহের দুগ্ধ-ফেননিভ শয্যায় ; কখনও দীন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে। কখনও অবহেলায় আর অবজ্ঞায় সকলের অগোচরে আরম্ভ হয় তাঁদের জ্যোতির্ময়ী তপস্যা। লোক উপহাস করে। উপহাসের উত্তরে হাসেন তাঁরা যেমন হেসেছেন ধনীর দীনতায়, জ্ঞানীর মূঢ়তায় চিরকাল। আকাশ-অন্ধ-করা দুর্যোগের কালো মেঘে ঘেরে ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা। প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। তরুণ বালক উন্মাদ যন্ত্রণায় পাথরের পায়ে নিষ্ফল মাথা কোটে ; কবির কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হয় ; বাঁশি হয় সঙ্গীতহারা। অমাবস্যার অন্ধকার লুপ্ত করে গানের আর আলোর ত্রিভুবন, অশ্রুজলে শুধায় নিপীড়িত মানবাত্মা : যারা তোমার বিষিয়েছে বায়ু আর নিভিয়েছে আলো, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ, তুমি কি বেসেছ ভালো ?

সেই জিজ্ঞাসায় টলে ধ্যাননিমগ্ন ধূর্জটির আসন। অভয়ংকর আনন সহসা হয় রুদ্র, দীপ্ত ভয়ংকর। ধেয়ে আসে ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে বাধাবন্ধ-হারা ; মেঘে মেঘে ডম্বরু বাজে নটরাজের, দধীচির অস্থি নামে অভিশপ্ত অসুরলোকের শিরে বজ্র হয়ে। ধূর্জটির আসন টলে আর দুলে ওঠে পৃথিবী ; গর্জে ওঠে আকাশ কলমন্দ্ররোলে। প্রস্তুতি পূর্ণ হয় কুরুক্ষেত্র পর্বের ; সুদর্শনচক্রের দেখা মেলে আর শোনা যায় শঙ্খের মুখে : সম্ভবামি যুগে যুগে। দুর্জনের. দুর্যোধনের বিনাশ ; আর ধর্মের, ধর্মরাজের প্রতিষ্ঠাকল্পে আবির্ভূত হচ্ছি আবার। গীতা, উপনিষদ্. বেদ, পুরাণ, শাস্ত্র, পুঁথি, পাঁজি, উপদেশ, তর্ক. বিচার, বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা, টীকা, ব্যাকরণ, দর্শন, তত্ত্ব, তথ্য, স্মৃতি, কারুর শরণ নেওয়ার প্রয়োজন নেই আজ ; স্মরণ কর শুধু আমাকে। মামেকং শরণং ব্রজ। যিনি ব্রজ হয়ে দুর্জনের দুর্যোধনের বিনাশ করেন, তিনিই ব্রজরূপে রক্ষা করবেন ধর্মকে ধর্মরাজকে।

আবির্ভাব-মুহূর্তে যেমন রোমাঞ্চিত হয় মর্ত্যভূমি, এঁদের তিরোভাবের লগ্ন আসন্ন হলে তেমনিই অবারিত হয় সমুখে শান্তিপারাবার। যাবার সময়ে এঁদের খসে পড়ে তারা। চলে গেলে আকাশে উজ্জ্বল হয় একটি নীলাঞ্জনরেখা।

শতাব্দীকাল কি তারও আগে দাক্ষিণভারতে এসেছিলেন এমনই এক ভগবানের দূত। সংসারজীবনেই তাঁর নাম ছিলো শিবরাম। তাঁকে কেবল দীর্ঘকায় বললে ভুল হয়। তিনি ছিলেন সুদীর্ঘকায়। সাধারণ মানুষ দৈর্ঘ্যে সাড়ে তিনহাত হয়; মরে গেলে ওই সাড়ে তিনহাত জমিরই দরকার হয় তার! কিন্তু জীবন যে মৃত্যুর চেয়ে ঢ্যাঙা তাই প্রমাণ করবার জন্যেই যেন শিবরাম এক হাত অতিরিক্ত দৈর্ঘ্য নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁর মর্ত্যলীলায়। এই শিবরামই উত্তরজীবনে ত্রৈলঙ্গস্বামী হলে,—বারাণসীর লোকেরা তাঁকে বলতো সাড়ে চারহাত সাধু। সুদীর্ঘাঙ্গ নয়, সুদীর্ঘায়ুও বটে। কেবল কাশীধামেই তাঁর লীলা দেড়শত বৎসর ধরে অব্যাহত ছিলো। আয়ু নয়, মানুষের আয়ু এত হয় না। ত্রৈলঙ্গস্বামীর হয়েছিলো; তার কারণ আয়ু নয়; আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,—যা কেবল যোগীতনুতেই সম্ভব।

সুদীর্ঘকাল ধরে লৌকিক দৃষ্টির সামনে অনেক অলৌকিক অঘটনের নায়ক এই পরমযোগী নিজের জীবন দিয়ে যে বাণী উচ্চারণ করেছেন তা সনাতন ভারতের বাণী। আমরা যাকে অলীক বলতে না পেরে বলি অলৌকিক আসলে তা মোটেই অস্বাভাবিক নয়। পশুর শক্তি দেহে; মানুষের, মনে। এই মন দিয়ে সে এমন বস্তু নেই যাকে না মুহূর্তে তৈরী করতে পারে সর্বসমক্ষে; এই মন নিয়ে সে চোখের পলক পড়বার আগে নেই দুরধিগম্য স্থান যেখানে না উপস্থিত হতে পারে, এই মন দিয়ে সে এমন মন নেই যার খবর না সংগ্রহ করতে পারে ইচ্ছে করলেই। মানুষের মধ্যে এই শক্তি আছে: কেবল তাকে যুগের পর যুগ কাজে না লাগানোর কারণেই, অবশ অঙ্গের মতোই, হয়েছে অকার্যকরী।

ত্রৈলঙ্গস্বামীর অনন্ত জীবনকর্ম থেকে মাত্র দুটি অধ্যায় উপস্থিত করছি এখানে; এই দুটি দৃষ্টান্তই উজ্জ্বল উদাহরণ, কেন ত্রৈলঙ্গকে না জানলে ৺বিশ্বনাথকে জানা অসম্ভব, সেই উক্তির। ত্রৈলঙ্গর আবির্ভাব অথবা এই দুই ঘটনার কিংবা তাঁর তিরোধানের সময়-তারিখ উল্লেখ করছি না। কারণ ত্রৈলঙ্গদেবের অবস্থান সময়ের ঊর্ধ্বে, তাই। প্রথম ঘটনাটি ঘটে কাশীর গঙ্গায়।

ভারতবর্ষের প্রবল প্রতাপান্বিত এক ভূপতি সপার্ষদ বরুণা থেকে অসি গঙ্গা যেখানে উত্তরবাহিনী সেখানে নৌকাবিহার করছেন একদিন; আর দেখছেন ভীমকান্তি এক নরদেহ গঙ্গার বুকের ওপর দিয়ে ভেসে যাচ্ছে; একখণ্ড বিশাল কালো শিলা যেন ভেসে যাচ্ছে আকাশের নীলনদীতে। দিনের আলো কাশীর গঙ্গায় তখন সবেমাত্র এসেছে। ঘাটে ঘাটে সন্ধ্যার জ্বালা দীপ নেভবার অপেক্ষায়। ঘাটের পর ঘাটের গায়ে দাঁড়ানো আকাশ-উদ্ধত বাতিগুলোর গায়ে সাদা-কালোর ছায়া, নৌকায় ভরে গেছে গঙ্গার বুক। সেদিনকার কাশীর গঙ্গাবক্ষের বর্ণনায় বলছেন এক বিদেশী লেখক যার ভাষান্তর সম্ভব; কিন্তু ভাবান্তর অসম্ভব:

"Benares···Then in the morning before the sun rises you drive through the city, the shops still and men under rugs lyings asleep on the pavement; a scattering of peopole are going down to the river, with brass bowls in their hands, for their prescribed bath in the sacred water. You get on to a houseboat, manned by three men, and slowly row down by the *ghats*. It is chilly in the early morntng. The *ghats* are unevenly peopled. One, I don't know why, is crowded. It is an extraordinary spectacle···

"It is a moving, a wonderful thrilling spectacle; the bustle, the noise, the coming and going give a sense of seething vitality; and those still figures of the men in contemplation by contrast seem more silent, more still, more alooffrom human-intercourse."

এমনই এক মনোরম সকালে রাজার নৌকার দিকে ভেসে আসছিলেন জলবিহাররত ত্রৈলঙ্গস্বামী। নৌকার কাছ বরাবর হতে রাজতরণীতে যারা কাশীর লোক ছিলো তারা সাড়ে চার হাত সাধুকে চিনতে পারলো; রাজা সেই সিদ্ধযোগীকে সাদর আহ্বান জানালেন তাঁর নৌকায়। সানন্দচিত্তে, কখনও বালকবৎ, কখনও জড়বৎ, কখনও উন্মাদবৎ মুক্তপুরুষ উঠে এলেন জল ছেড়ে কাঠের ডাঙায়। আসন গ্রহণ করিলেন কিন্তু কথা বললেন না নির্বাক্ সাধু! নিস্তব্ধ নৌকাকে নিয়ে বয়ে যেতে লাগলো শান্ত সুরধুনী। জবাকুসুমসংকাশ সর্বপাপঘ্ন দিবাকর উদিত হলেন পূর্বদিগন্ত অপূর্ব আলোকে দীপ্ত করে। রাজার তরবারি চেয়ে নিলেন যোগী; তারপর নিক্ষেপ করলেন গঙ্গাবক্ষে। চক্ষের নিমেষে সেই মহার্ঘ্য অস্ত্র নয়—রাজ-অলংকার অন্তর্হিত হলো উত্তর-বাহিনীর অতলে। হায়! হায়! করে উঠলো পার্শ্বচর। সূর্যের রক্তিমাভা ছড়িয়ে গেলো রুষ্ট রাজ-নয়নে। তরবারি ব্যবহারের বস্তু ছিলো না; ছিলো মর্যাদার প্রতীক। ইংরেজ সরকার দেশী রাজার প্রভুভক্তিতে সন্তোষের নিদর্শন দিয়েছিলো, তরবারি উপলক্ষ্য।

হীরকাঙ্গুরীয় ফেলে দিলে উত্তপ্ত হতেন না এতটুকুও। একটা গেলেও দশটা আসতো। কিন্তু এ তরবারি আবার কে দিতে পারে তাঁকে!

৺কাশীর ঘাটে ভিড়লো কাঠের নৌকা। রাজা কি ভয়াবহ শাস্তি সাধুকে দেন তারই আসন্ন আশংকায় সমস্ত জগৎ নিঃশ্বাসবায়ু সংবরণ করে মহা আতঙ্ক জপ করছে যখন মৌনমন্ত্রে, তখন ত্রৈলঙ্গ জলের অতল থেকে দু'হাত দিয়ে তুলে আনলেন তরবারি; একখানা নয়; দুটি তরোয়াল। রাজার হাতে যমজ সেই অস্ত্র তুলে দিয়ে বললেন: 'বেছে নাও; কোন্‌টা তোমার?' হতবুদ্ধি রাজা

চিনে উঠতে পারলেন না সেই বস্তু ; যা নিজের একান্ত গর্বের একমাত্র বস্তু খোয়া গেছে বলে রণহুঙ্কার দিচ্ছিলেন তিনি তা ফেরত পেয়েও ফেরত পাচ্ছেন না। রাজা তাকালেন মহাযোগীর ধ্যানাচ্ছাদিত চোখে ; মহাযোগী তাকালেন শান্ত-সমাহিত দৃষ্টিতে রাজার চোখে। সেই দৃষ্টি স্মরণ করিয়ে দিলো যে কত মিথ্যে মানুষের অহঙ্কার। যে মানুষ জন্মমুহূর্তে বাছুরের মতো হাম্বারবে জানায় : হাম, হাম ; অর্থাৎ সব হামারা হ্যায়। আর সবার বেলায় হায় হায় করে ওঠে বাছুরের অন্ত্রের মতো ধুনুরীর হাতে : তুঁহু! তুঁহু! সব তুমি সব তুমারা হ্যায়।

রাজার ধন রাজাকে ফিরিয়ে দিয়ে ফিরে যান যোগী অতল জলের আহ্বানে। নিজের তরবারি নিজের নয় জেনে রাজা তাকে জলে নিক্ষেপ করেন কিনা সেকথা আজও অলিখিত রয়ে গেছে ইতিহাসে।

দ্বিতীয় ঘটনাটিই আসলে অদ্বিতীয়। উলঙ্গ সাধুকে ধরে নিয়ে এসেছে আদালতে সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের আজ্ঞায় মোসাহেবের দল। সাধুর হয়ে কয়েকজন বললেন সাধুর বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত ; অতএব আচ্ছাদন এবং আচ্ছাদনের অভাব দুয়েই এঁর সমান অনাসক্তি। সাহেব জিজ্ঞেস করলেন : খাদ্যের বেলায় ? উত্তর হলো : সুধা ও বিষ্ঠায় সমান আসক্ত অথবা সমান নিরাসক্ত ; রুচিও আছে ; অরুচিও আছে। বেশ,—সাহেব আদেশ করেন,—সাহেবের খাদ্য যা হিন্দুর অখাদ্য তা-ই আজ খেয়ে দেখাতে হবে যোগীকে যে কিছুতেই কিছু এসে যায় না তাঁর।

সাধু কথা বললেন এতক্ষণে : তার আগে আমার খাদ্যও তোমাকে খেয়ে দেখাতে হবে যে তোমার খাদ্য যেমন আমি খেতে পারি, আমার খাদ্যও তুমি খাবার ক্ষমতা রাখো।

সাহেব বললেন : তথাস্তু। হিন্দুরা নিরামিষাশী, এই জেনেই হ্যাঁ দিয়েছিলেন সাহেব।

ত্রৈলঙ্গস্বামী মলত্যাগ করলেন হাতের তালুতে, তারপর তা গ্রহণ করলেন মুখবিবরে। গ্রহণ করলেন সেই পরমপ্রসন্নাননে যে আনন্দে মাতৃস্তনে মুখ দিতে উন্মুখ হয় সদ্যোজাত। সর্বচরাচর ব্যাপী যিনি অনলে আছেন অনিলে আছেন ; যিনি একই সঙ্গে চলিষ্ণু এবং যুগ যুগ ধরে অপেক্ষমান ; যিনি চৈতন্যের আশীর্বাদ চৈতন্যে জড়ত্বের অভিশাপ, যিনি একই সঙ্গে মূক এবং মুখর ; যিনি আদি যিনি অনাদি, যিনি অন্তে আছেন ; অনন্তে আছেন—যিনি একই অঙ্গে নররূপে এবং সিংহরূপে অপরূপ, আজ তিনিই বিষ্ঠায় বয়ে এনেছেন মধুগন্ধ। মধ্যে যাকে ধরেছেন তাকে সীমিত দৃষ্টি দেখছে মনুষ্য শরীরের আবর্জনা বলে ; তার থেকে নির্গত হচ্ছে নিদারুণ দুর্গন্ধ।

কিন্তু অসীমে যার দৃষ্টি অবারিত সে জেনেছে এ মল নয়; পরিমল। এখানেও এই মুহূর্তে উপস্থিত তিনি যিনি অনুপস্থিত হলে সূর্যের দীপ্তি, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোতি, তারার আলো, অশ্বত্থের পাতা, কৌস্তুভের কান্তি, মহাকালের আবর্তন অপহৃত। এখানেও এই মুহূর্তে তাঁরই অবস্থান যিনি উপস্থিত থাকলে তবেই অগ্নিতে উত্তাপ, বায়ুতে বেগ, শরীরে প্রাণ, আকাশে সকাল-সন্ধ্যা হয়।

দক্ষিণ ভারতের এই মহাযোগীর কাছে গিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর থেকে আরেক উদ্‌যোগী। গঙ্গার ঘাটে বসে আছেন ত্রৈলঙ্গ; হিমালয়ের শিখরে যেন উমানাথ। রামকৃষ্ণ প্রশ্ন করেছেন আঙুলের সাহায্যে ঈশ্বর এক না অনেক? অঙ্গুলি-সংকেতে উত্তর এসেছে তার। মহৎ জীবন জিজ্ঞাসার মহত্তরউত্তর: যিনি এক তিনিই অনেক; অনেকের মধ্যে তিনি একাকার।

ত্রৈলঙ্গর এই দিব্যজীবন যুক্তি-তর্ক-বিচার-বিশ্লেষণের বস্তু নয়। বিশ্বাসের বিষয়। ভগবান জ্ঞান দেন; বুদ্ধি দেন। বিশ্বাস দেন না! জ্ঞান-বুদ্ধি-বিচার-বিশ্লেষণে যা হয় না; বিশ্বাসে তাই হয়। বিশ্বাসে যা হয় তা বিশ্বাসের বাইরে। এই বিশ্বাস যে পায়নি সে পায়নি দিব্যজীবনের নাগাল। এবং এই বিশ্বাস তাঁর অহৈতুকী কৃপা। কৃপা ছাড়া এক পা এগুনোর উপায় নেই বিশ্বাসের পথে। কার ওপর ভর করবে এই নিঃসংশয় নির্মল বিশ্বাস তা নির্ভর করে কেবল তাঁর ওপর যাঁর করুণায় মূক হয় কথায় উন্মুক্ত; পঙ্গু পার হয় পাহাড়। সে কোন্ ধ্রুব বিশ্বাস যার কথা এখন বুঝবার ব্যাপার নয়; হৃদয়ে বাজবার বীণা। এমনই একটি বিশ্বাসের প্রজ্বলন্ত মূর্তি দেখা গেছে একবার সুদূর মিশরে।

মিশরে সেবার বৃষ্টি হয়নি। রৌদ্ররুক্ষ মরুভূমির সীমাহীন ঊর্ধ্বে আকাশের নীলে শকুনির মিছিল; তার পাখার ছায়ায় দুর্ভিক্ষের কৃষ্ণ পতাকা উড্ডীন। জীবনের জয়যাত্রা ব্যাহত; মহাকালের চাকা অচল। রাস্তায় গরু-বাছুর ধুঁকছে। মাঠের শ্যামলিমা মুছে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। শস্যশ্যামলা হয়েছে বিশুষ্ক কঠিন। সব বুভুক্ষু সন্তানের রক্তিম চোখের মণিতে জ্বলছে 'ম্যয় ভুঁখা হুঁ'-র পদ্মরাগমণি। মায়েরা যাপন করেছে বিনিদ্র রাত্রি আকাশের দিকে তাকিয়ে; কখন বৃষ্টি নামবে। আকাশের নীল বুক চিরে দেবতার অশ্রু কখন ফোঁটায় ফোঁটায় নামবে বৃষ্টিবিহীন বৈশাখী দিনের বুক ভরে দিতে করুণাধারায়। বধির আকাশের দেবতা। ধূলির কান্না পৌঁছয় না গিয়ে তাঁর কানে। তাঁর চোখে আনে না তৃষ্ণার বারি। ধু-ধু করে মরুভূমির কঠিন বুক। বিস্তীর্ণ জনপদ জুড়ে কেবল মরীচিকার আমন্ত্রণ; মৃত্যুর আলিঙ্গন।

দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি ভীত মানুষের মিছিল নীলনদীর তীরে বৃষ্টির জন্যে বেরিয়েছে প্রার্থনা করতে রাত্রির অন্ধকারে। মিশরের আবালবৃদ্ধবনিতার সঙ্ঘবদ্ধ প্রার্থনায় উচ্চারিত হয় : নীল অঞ্জন ঘন পুঞ্জিত ছায়া সম্বৃত অম্বর হে গম্ভীর। বৃষ্টির গানে বৃষ্টিহীন রাত কাঁপতে থাকে। মাটির তৃষ্ণা যার বক্ষ জুড়ে সেই ধরিত্রীর আর্তনাদ ওঠে দিক-দিগন্তরে : জল দাও। আকাশের বধির কর্ণে ব্যর্থ ধ্বনি ফিরে আসে প্রতিধ্বনির ব্যঙ্গে।

নিঃশব্দ সেই মিছিল চলেছে এগিয়ে। কারুর মুখে কথা নেই। হাওয়া বন্ধ ; মহাকালের রথের চাকাও অচল হয়ে গেছে বুঝি। একটি বালক এই মিছিলের সঙ্গে চলেছে ছাতা নিয়ে সঙ্গে। সমস্ত মিছিলে কেবল তারই হাতে ছাতা। একজন তাই দেখে বলতে ছাড়েনি : ছাতা কি হবে রে, পাগলা ? এতটুকু অপ্রতিভ না হয়ে উত্তর করেছে মিশরীয় সেই বালক : বাঃ, তোমরাই তো বললে প্রার্থনার পর বৃষ্টি পড়বেই— ?

অবোধ সেই মিশরীয় বালকের এই অসংকোচ উত্তরে সেদিন নাইল নদীর বুকে নিঃসীম ছায়া পড়ে আছে যার সেই হৃদয়হীন আকাশের চোখে দু'ফোঁটা জল টলমল না করে পেরেছে ?

॥ তিন ॥

ভ্রমণ কথাটার গোড়াতেই কেন ভ্রম শব্দটা বসানো কে জানে ; কিন্তু ঠিক শব্দটাই ঠিক জায়গায় বসেছে।

বাঙলায় যেসব ভ্রমণ-কাহিনী বেরোয় এবং জীবনচরিত তার প্রথমটায় ভ্রম এবং দ্বিতীয়টায় বিভ্রম ছাড়া আর কিছু উৎপাদনের প্রচেষ্টা থাকে কদাচ। এর জন্যে বাঙালী লেখকদেরই কেবল দায়ী করে লাভ নেই ; পাঠকের দায়িত্বও কম নয়। ভুল বললাম। বাঙলা বইয়ের পাঠক আজও আসেনি ; বাঙলা বইয়ের পাঠক যারা আজও তারা সবাই আসলে পাঠিকা। সেই পাঠিকাদের মনোরঞ্জনের কারণেই দুধে ভ্রমের জল মেশানো। বাঙলা জীবনচরিতে জীবন ছাড়া আর সবই উপস্থিত। যারা বলে বাঙালী উপন্যাস লিখতে পারেনি একখানা আজও, তারা আজও একখানাও বাঙলা বিওগ্রাফি পড়েনি, —তাই এমন কথা বলে। জীবনচরিতের ক্ষেত্রে বাঙালী অনায়াসে ফ্যাক্টের পরিবর্তে ফিকশন চালায় এবং পাঠকরা তা গলাধঃকরণ করে উইদাউট শ্লাইট ফ্রিকশান। ভ্রমণের ক্ষেত্রেও যা দেখেছে সে তার চেয়ে অনেক বেশী যা দেখেনি, যা দেখা যায় না, যা দেখা যাবে না কোনওদিন তারই উচ্ছ্বসিত বর্ণনায় পাতার পর পাতা অপব্যয় না করা পর্যন্ত আর যাই হোক রমণীয় ভ্রমণ-কাহিনী হলো না। বাঙালী পাঠিকা তথা পাঠকদের কৃপায় যদি ভ্রমণ-কাহিনীকে বেষ্ট সেলার হতে হয় তাহলে মনের কথা

চাই বেশি ভ্রমণের কথার চেয়ে : সে কথায় যত মণ ভ্রম তত মনোযোগ পাঠকের, থুড়ি, —পাঠিকার।

এইজন্যেই হিমালয়ের কথাতেই কেবল হিমাচল-ভ্রমণের বই অচল। শুধু কুয়াশার কথায় হিমালয়ের কথা লিখলে সে বই পোকায় কাটে ; আধ্যাত্মিক কু-আশায় আবৃত করতে পারলে হিমালয় বৃত্তান্তের আপাদমস্তক, তখনই সে বই খদ্দেরে কাটে। তখনই হিমালয়ের বইয়ের আদর হিমালয় থেকে নিরাপদ দূরে অবস্থিত কলকাতার বাঙালী আলয়ে। শুধু গাইড-চালিত হলে বাঙলা ট্রাভেলর চলে না : প্রয়োজন হয় পথ দেখিয়ে দিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া ভৈরবী মিস-গাইডের। অথবা লেডি কেরাণীর সঙ্গে আনতে হয় রাজপুত্রের আনরোমান হলিডে-র আরব্যোপন্যাস ; ছড়াতে হয় হুইসপ্যারিং ক্যাম্পেন, সে পাঠক তো বটেই হিমালয়ে যাদের আজন্ম বাস, বেশির ভাগ সময়ে উপবাস এবং অপমৃত্যু তারাও জানতে চেয়েছে একে ? এ কেরাণীকে ? জানতে চাইবেই তো! তুষারমানব পর্যন্ত শোনা গেছে ; তুষারমানবীর কাহিনী বাঙলা হিমালয়কাণ্ড ছাড়া, এমন প্রকাণ্ড মিথ্যা আর কোথাও খুঁজে পাবে না তা জানি—সকল দেশের রাণী সে যে আমার লেডি কেরাণী।

এই গেলো এক ; এর ওপর আছে আবার আরেক। গোদের ওপরবিষফোড়া ; বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; দেশে-বিদেশে চালু অলীকবাবুর গপ্পোর ওপর মেরুতীর্থ-পর্যটকের অলৌকিক অর্ধভূত অর্ধেক-ভুত আর অর্ধেক অদ্ভুত। বাঙালী যেমন যতক্ষণ না কেউ বাপ-চৌদ্দপুরুষের রেখে যাওয়া যথাসর্বস্ব উড়ে ফুঁকে দিয়ে নীল রক্ত লাল করছে, ততক্ষণ তার জীবনী পড়তে নারাজ ; তেমনই যে জায়গায় যেতে হলে রক্তবমি না হয় অন্তত একজনের ; কয়েকজনের যদি দুর্গন্ধযুক্ত এমন 'অতীত' না থাকে যা স্বীকার না করা পর্যন্ত মেরুতীর্থ-পরিক্রমার পুণ্য অনর্জিত থাকে ; যদি না এর ওপরেও বাকী সব ক'জনের মাথা খারাপ হয় তাহলে সে বই-এর আশা নেই পাঠিকার মন কাড়ার। পুস্তক-প্রিয়াদের পছন্দ নয় সে বই। যে বই বর্তমানে যত বিকৃত সে বই-ই বর্তমানে তত বিক্রীত।

কাশী হচ্ছে ভারতের সেই একমাত্র তীর্থকেন্দ্র যা এই দুই দুর্ভাগ্য সুখবঞ্চিত। কল্পনার বুরকায় ঢাকা নয় তার আপাদমস্তক। অসূর্যম্পশ্যা নয় ৺বিশ্বনাথধাম ; দিবালোকের মতো স্পষ্ট ; বাঙালীর ওপর অবাঙালী সর্বভারতের পুঞ্জিত ক্রোধের চেয়েও সুস্পষ্ট। কাশীর কোথাও ধোঁয়া নেই। পেঁছবার কষ্ট নেই কাশীতে। কাশীর [illegible] হোক [illegible] ঘোরালো ; তার মন্দিরে হোক যত অল্প আলো ; সেখানে [illegible] ঢুকতে কাউকে [illegible] করতে হয় না রক্তবমন অতীত-দুষ্কার্যের রুশীয়-স্বী[illegible] না উচ্চারণ করা তক[illegible] অথবা সে গলিতে সম্ভাবনা নেই হঠাৎ-স[illegible]তর, দেখা-না-দেখায় [illegible] কোন বিদ্যুল্লতার'। সেখানে যারা যায় [illegible] হয় ধর্ম, নয়, অধর্ম করতে যায় ;
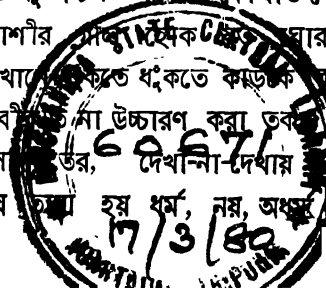
সেখানে যারা ঘুরে বেড়ায় তারা হয় ধর্মের ষণ্ড, নয়, যতেক অধর্মের দারুণ পাষণ্ড। কিন্তু ধর্মে অধর্মে, ষণ্ডে পাষণ্ডে, বিশ্বনাথ এবং বিশ্বের যতেক অনাথ নিয়ে কুহেলিকামুক্ত কাশী ভারতের মধ্যে মহাভারত। এই মহাভারত কথা যিনি পরিবেশনে উদ্যত তিনি কাশীরামদাস নন; অতএব তা অমৃতসমান নয়। যিনি শোনাচ্ছেন তিনি ধন্য হতে চান না; যিনি পড়বেন তাঁর পুণ্যবান না হলেও চলবে; কিন্তু পড়তে পড়তে চোখ কান খোলা না রাখলে চলবে না।

চলবে না যে তার কারণ কাশীকাণ্ড কেবল পড়বার নয়; দেখবারও। কাশীতে যাবার পথেই প্রয়োজন সজাগ দৃষ্টি অসতর্ক কানের। যদিও কাশীতে যেতে ঘোড়া অথবা উটের পিঠের দরকার নেই; যেমন দরকার নেই নৌকা, স্টিমার অথবা জাহাজের। উড়ো-জাহাজের পিঠে অবশ্য চাপা যায়; পৌঁছনোও যায় কয়েক ঘণ্টারও কম সময়ে; কিন্তু পৌঁছনোও যায় না কোনও দিন সেই মানুষের কাছে যে মানুষ সমস্ত মন্দিরের চেয়ে বড়, গীর্জার চেয়ে অনেক উঁচু তীর্থস্থান। সকল কালে সকল দেশে সমস্ত দেবতার চেয়ে যে পবিত্র, প্রণম্য; সকল যুগের সাহিত্য আর ইতিহাসের সে অপরিবর্তনীয় একমাত্র উপাদান। সেই মানুষ যার মধ্যেই কেবল রাম আর কৃষ্ণ কখনও আলাদা আলাদা আধারে, কখনও একই সঙ্গে সভ্যতার চরম দুর্দিনের আঁধারে পরমাবির্ভূত স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ। সেই যে মানুষ দনুজবেশে কখনও দলিত; আবার দুর্গা বলতে যার কখনও কখনও নীলোৎপল দু'চোখ বেয়ে ভক্তি অশ্রু উদ্বেলিত।

আমার এই কাশীর কথাও কল্পিত ভ্রমণ-কাহিনীর অকল্পিত রূপকথা নয়; মানুষেরই অপরূপ কথা। সেই মানুষ যাদের বিশ্বাস,—কাশীতে মরলে শিবলোক-প্রাপ্ত হয়; আর ব্যাসকাশীতে মরলে পরাধীন ভারতে যে গর্দভ হতো; স্বাধীন ভারতে আজ সে বাঙালী হয়। কাশী উপলক্ষ্য মাত্র; সেই লক্ষ কোটি মানুষই আমার লক্ষ্য কেবল।

হেঁটে গেলেই সব চেয়ে ভালো হয়; কারণ:

উড়ে যেতে চাও উড়ে যেতে পারো
মেশিন-পক্ষীরাজে;
যেতে চাও কাদা ছুঁড়ে যেতে পারো
মোটর-যানে তা সাজে।
সস্তার হারে টুরে যেতে চাও
ট্রেনের টিকিট কাটো;
মানুষকে যদি কাছে পেতে চাও
সবার সঙ্গে হাঁটো।

আজকের গতির যুগে হেঁটে যাও মানেই হঠে যাও। অবশ্য এই দূরের গতির বাকী এখনও অনেক দূর; অনেক দুর্গতির বাকী তার। তবুও হেঁটে নয় কিছুতেই। কিন্ত হেঁটে নয় যেমন. তেমনই নয় উড়ো-জাহাজে 'দেশে দেশে

চলি উড়ে' বলতে আমার আপত্তি দারুণ ; কারণ আমি কেবল বাঙালী নয় — আমি নিদারুণ প্রভিন্সিয়াল মাইণ্ডেড। এবং বাঙালী মাত্রকেই নিজেকে 'ডেড' না মনে করতে হলে বাঙালী মাইণ্ডেড মনে করতেই হবে নিজেকে। উড়ে যাবার দরকার কেবল তারই যাওয়া-আসা যার ব্যবসা : আসা-যাওয়া যার নেশা সে কোন্ দুঃখে তাড়া করতে যাবে এত ; অত তাড়াতাড়িতে বাড়াবাড়িতে যাবার তার দরকার কি। আস্তে আস্তে হাসতে-হাসতে ভাসতে-ভাসতে যাবে সে। যেমন সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের স্রোত যখন বাঁকা তখন যেমন উড়ে চলে, অনেক ওপর দিয়ে নীল নদীর জলে যেমন মরাল, তেমনই বলাকারা, মুখে নিয়ে সৃষ্টির প্রথম বাণী ; হেথা নয় ; হেথা নয় ; অন্য কোথা ; অন্য কোনখানে। উড়ে যাওয়া হচ্ছে পরীক্ষার পড়া ; রবীন্দ্রনাথের কবিতাও যার ফলে নীরস টিউটরিয়েলে পর্যুদস্ত। জলে জাহাজে এবং ডাঙায় জাহাজে চেপে যাওয়া হচ্ছে ভাষাতত্ত্বের মতো বিশুষ্ক বিষয়ও রবীন্দ্রনাথের হাতে পড়ে সকলের বিস্ময়।

তাই ট্রেনে চাপো। ফার্স্ট ক্লাসে অথবা শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরায় নয় ; তৃতীয় শ্রেণীতে। গান্ধীর মতো নামে থার্ড, আসলে ফার্স্ট ক্লাসের চেয়েও আরামপ্রদ নয়। যে গাড়িতে তোমার সঙ্গে আপামর জনসাধারণ চলেছে দুর্গন্ধযুক্ত ল্যাভাটরির লজ্জা, ছারপোকার দংশন, অন্ধকূপ-হত্যার আশঙ্কার সহযাত্রী হয়ে, স্বাধীন ভারতে যার জনগণ মন অধিনায়ক, ভাগ্য বিধাতা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাস করেন অতি অল্প সপরিবারে অসংখ্য কামরাযুক্ত প্রাসাদে আর যার আবালবৃদ্ধবনিতারা উপবাস করে অসংখ্য লোকে মিলে অতি স্বল্প স্থানে বাস করার দুর্ভাগ্যের স্বর্গে, এবং সে প্রাসাদে রাজপ্রাসাদের বাস আরও কতকাল যে অব্যাহত থাকবে বলা অসম্ভব,—কারণ রবীন্দ্রনাথ অনেক আগেই বলে গেছেন ; হে রাজেন্দ্র তব হাতে অন্তহীন কাল। স্বাধীন ভারতের ট্রেনে চাপো যার গায়ে অলিখিত নির্দেশ সর্বদাই ঝুলছে ঃ বত্রিশ জন বসিবেক ; চৌষট্টি জন দাঁড়াইবেক ; একশত আটাশ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক ; এবং দুই শত ছাপ্পান্ন জন ঝুলিবেক।

এই ট্রেনের তৃতীয় শ্রেণীতে চাপো যদি স্বাধীন ভারতে হতে চাও জীবনের সহযাত্রী।

এই তৃতীয় শ্রেণীর কামরাতেই, কাশী যাবার পথে আমার সুদর্শন রায়ের সঙ্গে হঠাৎ আলাপ। অদ্বিতীয় সুদর্শন রায়। কাশী বললেই যেমন কাশীর দিদিমার কথা মনে পড়ে তেমনই যার কথা সঙ্গে সঙ্গে না মনে পড়ে পারে না, তারই নাম সুদর্শন। ধর্মের সঙ্গে অধর্মের ; ষণ্ডের সঙ্গে পাষণ্ডের ; বিশ্বনাথের সঙ্গে বিশ্বের যতেক অনাথের যেখানে দেখা মেলে চোখ খুললেই ; সে চোখ না খুললেও মেলাই দেখে মেলে এমন বৈপরীত্যের সেই কাশীর উত্তর মেরু হলো যদি কাশীর দিদিমা, তবে তার দক্ষিণতম প্রান্ত হচ্ছে সুদর্শন নিঃসংশয়ে। কিন্তু রাবণ ছাড়া একা রামে জমে না রামায়ণ ; কেবল যুধিষ্ঠিরে আধুনিক নিউ

রিয়ালিসটিক ফ্যাসনে তোলা আন্তর্জাতিক পুরস্কারপ্রাপ্ত বিরসতম অখাদ্য গল্পের নামে ইনহিউম্যান দলিল চিত্র হয়; দুর্যোধনের বিনা যুদ্ধের সূচ্যগ্র মেদিনী না দেবার প্রতিজ্ঞা ছাড়া অসম্ভব হয় কুরুক্ষেত্রের নাটক। শুধু কাশীর দিদিমাতে কাশীকাণ্ডর প্রকাণ্ড ফাঁক থেকে যায়। মেঘ ছাড়া রৌদ্রের ছায়াবিহীন আলোর, কালোহারা সাদার; দ্বন্দ্বহীন স্বাচ্ছন্দ্যে জীবনহীন জীবনের দলিল হয়; জীবননাট্য হয় না। তাই সুদর্শন রায়কেও উপস্থিত করা চাই। কাশীর মাহাত্ম্য খর্ব করবার জন্যে নয়; কাশীর কাব্যকে উপস্থিত মহাকাব্যে উত্তীর্ণ করবার কারণ; কাশীর রূপকে অপরূপ কন্ট্রাস্ট দেবার অভিলাষে।

সুদর্শন রায় বলে যার কথা এখন বলতে যাচ্ছি; সুদর্শন তার নাম নয়—'রায়' নয় তার পদবী। নাম আর পদবী বানানো বটে; তবে যার কথা বলতে যাচ্ছি সে লোকটা সত্য। কাশীর দিদিমার মতোই জ্যান্ত তার চেয়েও জলজ্যান্ত এই মানুষের কথা বলতে বসে তার নাম, পদবী, ধাম বাধ্য হচ্ছি পালটে দিতে; কারণ লোকটা বেঁচে আছে আজও। এবং আমার দৃষ্টিকোণ থেকে, মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিলে ন্যায় না হলেও, বাঁচার ওপর যে কোনও ঘা দিলেই, তা আরও অন্যায় হয়। অবশ্য সুদর্শন রায় আজ কেবল বেঁচেই আছে তার স্বনামে। বেঁচে মরে আছে কোনও রকমে; মরে বেঁচে যাবার আশায় ওই কাশীতেই। সুদর্শন রায় একদিন অবশ্য জীবিত ছিলো, প্রতি মুহূর্তে জীবিত। এই মরার, এই আধমরার দেশে ঘা মেরে বাঁচাবার মন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিলো সে; ময়ূর যেমন মেঘ হলে পেখম তোলার নিয়ে আসে প্রেরণা জন্মমুহূর্তেই, কর্ণর অঙ্গে যেমন ঝলমল করত সহজাত কবচকুণ্ডল; সুদর্শন রায় এই ভেজাল নাম আর পদবীর আড়ালে যে মানুষটা বাস করত; করত একদিন, আজ আর করে না, সেই মানুষটা ঠোঁটের কোণে তেমনই ভূমিষ্ঠ হবার লগ্নেই সঙ্গে করে এনেছিল নির্ভেজাল হাসি।

সুদর্শনের হাসিকে কেবল হাসি বলে ছেড়ে দিলে রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'-কে আরেকখানি বই মাত্র বলার অপরাধ হয়; অথবা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয়, প্রথম দুজন বাঙালী গ্রাজুয়েটের অন্যতম, মাত্র এই হয়ে দাঁড়ায়। সুদর্শনের হাসি,—আমি তো ছেলেমানুষ, কাশীর এই মহাভারতে যদি স্বয়ং কাশীরাম লিখতেন তা হলেও শক্ত হতো তার যথার্থ বর্ণনা করা; কারণ তা বর্ণনার বিষয় নয়; শোনবার বিস্ময়। উচ্চকিত উচ্ছ্বসিত সেই হাসি যেন শিবের জটা থেকে মর্ত্যাভিমুখে অবতরণরত প্রাণগঙ্গার কলমন্দ্ররোল। দুঃখের বরষায় তার সেই হাসির দমকে মেঘ কেটে বেরিয়ে পড়ে সূর্যের প্রসন্নানন; জলে ধোয়া আকাশের বুকে ঝকমক করে বর্ষার রৌদ্রের পদ্মরাগমণি।

কিন্তু তবুও তা হাসি নয়; কান্নার মুখোশ মাত্র। একদিন সেই হাসির মুখোশ সরে গিয়ে উন্মুক্ত না হলে তার অশ্রুমুখ, জীবনের মুকুরে না হলে প্রতিবিম্বিত,—সুদর্শন রায়ের কথা, কাশীর কথা বলতে বসে, লেখা সবচেয়ে

সিরেরিয়াস কলমেও বিড়ম্বনা ছাড়া আর কি হতো ? নিছক অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া কি হতো আর তা। সুদর্শন নয় কেবল। গোটা মানবজীবনটাই হাসি-কান্নার মুখোশ মাত্র। কান্নাকে চাপবার কারণে মানুষের হাসি এবং পরের পতনে অন্তরের হাসিকে কুমীর-ক্রন্দনে আবরণ দেওয়ারই ছদ্মনাম জীবন। লাইফ ইজ এ ব্রিফ ক্যান্ডেল নয় ; লাইফ ইজ এ লং স্ক্যাণ্ডাল। হাসিকে কান্না এবং কান্নাকে হাসি করার চেয়ে স্ক্যাণ্ডলাস আর কি আছে। আয়ুর বাল্‌ব কত ক্যাণ্ডাল-পাওয়ার,—এ প্রশ্ন শেক্সপীয়ারসঙ্গত ; মানুষের আয়ুর বাল্‌ব কত স্ক্যাণ্ডাল-পাওয়ার তাই হওয়া উচিত কিন্তু আসলে জীবনসঙ্গত জিজ্ঞাসা।

সুদর্শন রায়ের সঙ্গে সেবার দেখা কাশী যাবার পথে নতুন করে আবার। সুদর্শন সেই সুদর্শনই আছে। সেই হাসি সেই বেপরোয়া বোহেমিয়ান সুদর্শন রায়—যার মতে বাঁচার উদ্দেশ্য মাত্র দুটি। একটি মদ ; অপরটি মেয়েমানুষ। কিন্তু সেখানেও, সেই চরম অধঃপতনের পথে প্রথম অগ্রসর সুদর্শন রায়কে শ্রদ্ধা না করে উপায় নেই। কারণ কোনটাই তার লুকোবার চেষ্টা নেই। বাইরে বৈরাগ্যের বেশ পরে আত্মীয়-অনাত্মীয়-ঘরে লুকিয়ে নোংরামী করার প্রবৃত্তি নয় তার ; দুশ্চরিত্রতার সমস্ত রকম রাস্তা জানা থাকলেও ঘর নষ্ট করার মন্ত্রে তার অরুচি ছিলো। পরস্ত্রী, কুমারী, কি বিধবার সঙ্গে প্রণয় অনেক দূরের কথা ; পরিচয় পর্যন্ত সে এগুতো না। কেন জানতে চাইলে, বলত সুদর্শন রায়ের দোষ অগুণতি ; গুণ একটি। সে দুশ্চরিত্র পুরুষ ; কিন্তু কোনও অবস্থাতেই কাপুরুষ নয়। তার প্রচুর মদ্যপান এবং প্রচুরতর সেই স্ত্রীলোকের সঙ্গ সমাজের অভিধানে যাদের সংজ্ঞা পতিতা, তাকে নিশ্চয়ই সমাজের সেই সব জীবদেহ পরিভাষায় সর্বনেশে লোক বলে অভিহিত করেছিলো অথবা করবে চিরকাল যারা ড্রিঙ্ক করেও মাতাল হয় কদাচ ; এবং যারা সময়ে সরে পড়তে জানে বলে বড় বড় ঘরের বড় বড় স্ক্যাণ্ডালের জনক হওয়া সত্ত্বেও মরে যাবার পর ওবিচুয়ারি পায় প্রথম শ্রেণীর দৈনিকপত্রের আধকলম জুড়ে যার মধ্যে মোটা লাইন দাগানো কথাগুলো হচ্ছে : স্বভাব এবং আদর্শচরিত্রের গুণে তিনি ছিলেন সকলের অনুকরণযোগ্য।

ওবিচুয়ারি ঠিকই লেখে। যে সমাজে একদিন সবাই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় পেত না,—সে সমাজ নয় ; যে সমাজে আজ কারুরই অন্যায় ছাড়া আর কিছু করতেই ভয় ; সেই সমাজে এইজাতীয়, এই বঙ্গজাতীয় জীবেরাই সে সকলের অনুকরণযোগ্য বিবেচিত হবে, তা আর বিচিত্র কি।

সুদর্শন রায় অবশ্য চিরকাল এরকম ছিলো না। তার ঘর ছিলো ; মনের মতো ছিলো ঘরনী ; এবং রাজকন্যার মতো এক মেয়ে। প্রচুর বিত্ত সেদিনও ছিলো ; আজও যেমন আছে। সুদর্শন ছিলো সেই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধপূর্ব

কলকাতার মধ্যমণি। তার বাড়ি ছিলো কালচারের পীঠস্থান। বারো বছর ঘর করবার পর তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে একদিন চলে যায় মেয়ের মাস্টারের সঙ্গে। কেন যায় তা অন্য কেউ জানেই না, সুদর্শনের আজও পর্যন্ত তা অজানা। এবং চলে যাবার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত তার স্ত্রী, যার নাম দিলাম এখানে আলেয়া, এমনও কারণ ঘটায়নি যা থেকে, নাকি কল্পনা করা যায় এতবড় দুর্ঘটনার ভগ্নাংশ পর্যন্ত। মেয়ের যে মাস্টার সে যে কেবল অর্থেই দরিদ্র তা নয়, স্বাস্থ্যেও হৃতসর্বস্ব। তার মধ্যে আট বছরের মেয়ের মা কি দেখলো তা সেই জানে; চলে যাবার পর তবেই ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে বেরুতে লাগলো চিঠির টুকরো; প্রেমের প্রমাণ। সেই টার্ন নিলো সুদর্শন। মদ আর মেয়েমানুষ; মেয়েমানুষ আর মদ। ডুবে গেল সে অধঃপতনের অতলে। জেগে রইলো তখনও কেবল তার যৌবনের ভগ্নাবশেষ, —হাসির ডগাটুকু।

কাশী যাবার ট্রেনে হঠাৎ দেখা সুদর্শনের সঙ্গে কত বচ্ছর বাদে বলা অসম্ভব; অর্থাৎ ইট্স এজেস সিন্স আই লাস্টস হিম। ফাস্ট ক্লাসের প্যাসেঞ্জার সুদর্শন নিয়ে গেলো তৃতীয় শ্রেণী থেকে হতভাগ্য আমাকে প্রতি মুহূর্তের চেকারতাড়িত হবার রিস্কের মধ্যে। থার্ড ক্লাস থেকে আমাকে টানাটানি করে নামিয়ে নেবার আগে কিছুক্ষণ তাকে থাকতে হয়েছিলো গান্ধীর ক্লাসে বাধ্য হয়ে। সেখানে তখন জোর তর্ক চলছিলো মানত করার মানে হয় কিনা। একজনের মতে এর প্রত্যক্ষ ফল পাওয়া যায় হাতে হাতে। আরেকজনের অভিমতে, এ সবই অন্ধ-কুসংস্কার নয় কেবল; নিজের স্বার্থের জন্যে পাঁঠা মানত করা রীতিমত নিষ্ঠুর পৈশাচিকতা। অন্য আরেকজন তর্কের ধার দিয়ে গেলো না; সে শুরু করে দিলো এক গল্প। মুহূর্তে কলহে রূপান্তরিত হতে পারত যা তা নেমে এল সাগ্রহ উৎকর্ণতায়। সবাই ঘেঁষে বসলো; গল্পবলিয়ের কাছ ঘেঁষে।

মা কালীর কাছে গেছে মধ্যবিত্ত উকিল বাপ ছেলের চাকরির জন্যে; সওয়া পাঁচ আনার পুজো দিয়ে বলেছে: আমার অবস্থা পাড়ার বটু ঘোষের চেয়ে অনেক খারাপ; শুনেছি সে পাঁচসিকের পুজো দিয়েছে; মানত করেছে ছেলের চাকরি হলে জোড়া পাঁঠা দেবে; তার কথা শুনো না মা; তার ছেলের চাকরি না হলেও চলবে। তার পাঁচসিকে পুজোর জায়গায় আমার সোয়া পাঁচ আনা পুজো দেওয়াতেই তো বুঝছ যে আমার কি অবস্থা এবং আমার ছেলের চাকরি হওয়া কত দরকার। মা কালী বলেন: তা যদি বলো তো তোমার পাড়ারই আরেকজন এসেছিলো আজ সকালে তার ছেলের চাকরির জন্যে; সে এক পয়সার পুজোও দেয়নি; মানতও করেনি এক কানাকড়ির কোন কিছু। অবস্থা ভেবে চাকরি দিলে তো তার ছেলেকেই দিতে হয়। উকিল থচে যায় সাংঘাতিক; এডজোর্নমেণ্ট গ্রাণ্ট না করা জাজের ওপর রাগের মতোই মা কালীর মেজাজের ওপর সব নির্ভর করে জেনে বিমর্ষ হয়ে চলে যাবার আগে স্বগতোক্তি করে:

তাহলে তোমার যা ইচ্ছে তাই করো! শুনে মা কালী কিন্তু রাগ করেন না; ভক্তের প্রতি অনুরাগের একগাল হাসি হেসে বলেন: তাই তো করি; তোরা যে কেন মাঝে থেকে মানত মেনে মরিস, সেইটেই শুধু স্বয়ং মা কালী হয়েও আজও বুঝতে পারি না।

মানতের বিপক্ষে যারা তাদের হাসির গমকে অথবা স্টেশনে পৌঁছবার কারণে মনে নেই ট্রেন থামতেই এক ঝটকায় আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে তার কামরায় তোলে সুদর্শন। যত বাধা দিই ততো বলে চেকার ধরলে টাকার জন্যে ভাবনা নেই; তার জন্যে আছে সুদর্শন রায়। বুঝি সুদর্শন কিছু বলতে চায়; এমন কিছু যা বলা যায় না হাটের মধ্যে; তাই চুপ করে যাই।

কিন্তু সুদর্শন রায় প্রথম শ্রেণীর অভিজাত নিভৃতে যেকথা প্রথমেই বলে সেকথায় আর চুপ করে থাকা যায় না, চমকে উঠতে হয়। সুদর্শন আমার দু'হাত চেপে ধরে বলে: ও গল্পে কান দিও না; মানত সত্য বলে জেনো; মানতে কাজ হয় –! থাকতে না পেরে উচ্চকণ্ঠে না বলে পারি না: দাও টুরুটাশ? মুহূর্তে সেকথা চাপা দিয়ে সুদর্শন এবার আরো চমকে দেয়: জানো, আলেয়ার সঙ্গে দেখা হয়েছে আমার? কোথায়?—আমার কণ্ঠে কৌতূহলের বান ডেকে যায়। কাশীতেই একদিন দেখা হয়ে যায় সুদর্শনের তার বারোবছরের বিবাহিত জীবনের বৃন্তচ্যুত বউয়ের সঙ্গে। যেভাবে দেখা হয় তা বানানো গল্পের খাতিরেও বিশ্বাস করা অসম্ভব হতো। কিন্তু জীবনের কাছে জীবন্ততম উপন্যাসও অলৌকিকত্বে কিছু নয়। তাই। সুদর্শন এসয়ুস্যাল কাশীতেও ধর্মস্থানের চেয়ে অধর্মস্থানের প্রতিই আকর্ষণ অনুভব করে বেশী। পতিতালয় থেকে পতিতালয়ে বাঈজীর সুর থেকে সুরে; সুরার পাত্র থেকে সুরার পাত্রে সুরবিহার এবং সুরাবিহার করে বেড়ায় সুদর্শন। সেই সময়ে দালাল একদিন নিয়ে যেতে চায় তাকে এমন এক পতিতার কাছে যে পতিতা হয়েও নয় সম্পূর্ণ অধঃপতিতা। তার ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য সান্নিধ্য যা নির্ভর করে অর্থের ওপর নয়; তার মেজাজের ওপর। কৌতূহলী হয়ে যায় সুদর্শন। সুদর্শনের কথা ও দালালের মুখে শুনে দাঁড়ায় এসে সেই 'নহে মাতা নহে বধূ' ঊর্বশী সুদর্শনের সম্মুখে।

সুদর্শনের মুখ দিয়ে বেরোয়: আলেয়া?

আলেয়া শুধু বলে: তুমি?

চুপ করে যায় সুদর্শন। আলেয়ার কথা চাপা দিতে মানতের কথাই তুলি আবার: সুদর্শন,—মানতের কথা কি বলছিলে? বলতে বলতে থেমে গেলে কেন? সুদর্শন হাসে! থেমে যাইনি; সেকথায় আসবার জন্যেই আলেয়ার কথা পেড়েছিলাম। তুমি এতক্ষণ ভাবছিলে মাল খেয়ে কথার খেই হারিয়েছি,—তাই না? সুদর্শনের খোঁচা গায়ে না মেখে জিজ্ঞেস করি: মানত করেছ কখনও?

করেছি,—বলে সুদর্শন। কাশীতে বিশ্বনাথের মন্দিরে মানত করেছিলাম—

কিসের জন্যে ?

আলেয়ার সঙ্গে একবার দেখা করিয়ে দেবার প্রার্থনা জানাতে গিয়েছিলাম বিশ্বনাথের কাছে ; বিশ্বনাথ তাঁর কথা রেখেছিলেন ; এখন ভাবি কথা রাখার চেয়ে কথা না রাখাই তাঁর ভালো ছিলো—

কি মানত করেছিলে ?—একটু চুপ করে থেকে জানতে চাই আমি।

চোখের জল ! জবাব করে সুদর্শন রায়।

মানে ?

প্রতিজ্ঞা করি, জীবনে কোনও বেদনায়, কোনও আঘাতে, কোনও বিচ্ছেদে কোনও দিন চোখ দিয়ে বার করব না এক ফোঁটা চোখের জল !

বলেই হা-হা করে পাগলের মতো অর্থহীন হাসে সুদর্শন।

আমার কাছে সে মুহূর্তে তার হাসি কিন্তু অর্থহীন মনে হয় না। শুধু সুদর্শনের নয় ; তার হাসির মধ্যে দিয়ে সকল কালে সব মানুষের হাসির অর্থ কুড়িয়ে পাই আমি। চোখের জল ঢাকা ছাড়া মানুষের হাসির অর্থ নেই আর কিছু।

॥ চার ॥

ভ্রমণ-কথাটার গোড়াতেই চোখে-না-পড়া-অসম্ভব দুটি অক্ষরে জ্বলজ্বল করছে যা তা হচ্ছে ভ্রম। শুধু কাশী-কাঞ্চি-গোদাবরী প্রত্যক্ষ করবার কারণেই নয় ; মনের ভ্রম, মানসিক সর্বপ্রকার বিভ্রম দূর করবার কারণেও বটে,—দূরের ট্রেনে চাপা চাই। ট্রেনই স্বাধীন ভারতবর্ষে আজ সবচেয়ে বড় ট্রেনিং-এর জায়গা। ট্রেনে চাপলে অন্য আর কোন ভুল না ভাঙুক একটা ভ্রম যে কাটেই এবিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আজও,—স্বাধীন ভারতে যারা মনে করে যে ভারত ঠিক স্বাধীন হয়নি,—তাদের ভ্রম দূর করবার জন্যেই অন্তত দূরপাল্লার ভ্রমণে ট্রেনে চাপা দরকার অথবা ভারত সরকারের টাকায় ট্রেনে চাপানো দরকার তাদের সর্বাগ্রে। বাসে ট্রামে চাপলেও হয় ; তবে ট্রেনে চাপলে সব চেয়ে বেশী, সব চেয়ে আগে যে জ্ঞান অতি অবশ্যই হয়—তা হচ্ছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। এরোপ্লেনের কথা বলতে পারিনে ; আমরা যারা প্লেনে আছি তাদের কথা বলছি। উড়োজাহাজ কেন, শুধু জাহাজের কথাও বলতে পারা সহজ নয় আমাদের মতো যারা আদার ব্যাপারী তাদের পক্ষে। সেই স্বাধীন ভারতে পাবলিক ম্যানের কৃপায় আমাদের মতো পাবলিক যাদের সর্বাঙ্গ লিক করছে সর্বদাই তাদের ঠুলিপরা আঁখিপদ্মেও প্রতিভাত হয় নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল এ বার্তা, ট্রেনে পা দেবার মুহূর্তেই যে স্বাধীনতা তো বটেই স্বাধীনতার চেয়ে

একটু বেশীই আমরা পেয়েছি নেহেরুরাজের কৃতিত্বে। স্বাধীনতা পেয়েছে ঘানা; স্বাধীনতা পাবে আলজিরিয়া। আমরা কেবল স্বাধীনতায় সন্তুষ্ট হইনি। স্বা-ধী-ন-তা-র সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে আমরা যে অপূর্ব বস্তু আজ লাভ করতে চলেছি তার নাম : তা-ধিন্-তা!

স্বাধীনতা নয়; তা-ধিন্-তা-ই প্রত্যক্ষ করছি সর্বত্র। রাজনীতি থেকে সুরু করে ভায়া অর্থনীতি,—নীতিহীন নীতির সর্বক্ষেত্রে রীতিকে বরবাদ করে জয়যুক্ত করছি যাকে জীবনের সর্বত্র তা ওই তা-ধিন্-তা-ও নয় তা আসলে হচ্ছে তা দিন,—তা! অর্থাৎ যে তা দিতে জানার ফলে মুষ্টিমেয় কয়েকজনের কপালে ষোলো অশ্বশক্তির বাতাস নিয়ন্ত্রিত লেটেস্ট মডেল স্ট্রীমলাইণ্ড কার,—আর সবাকার কপালে ঠিক সময়ে ঠিক তা না দিতে জানার কারণে অশ্বডিম্ব। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা বলছে তাই; বলছে,—তা ধিন্-তা! বলছে,—তেরে কেটে-তাক্! অর্থাৎ তেড়ে ধর; দু' কান কেটে ফেল; আর তাক্ কর! ঠিকই বলছে। অসংখ্য শহীদের ত্যাগে আসে স্বাধীনতা আর তাকে থাকে, তাগ করে থাকে ঠিক সময়ে গদিতে গদা হাতে বসবার জন্যে শহীদ সুরাবদীরা! কি পূর্ব কি অপূর্ব ফাঁকিস্তান।

ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস ভারতের আজ সবাই স্বাধীন। সবচেয়ে বেশি স্বাধীন, ট্রামে, বাসে, ট্রেনে। না। ট্যাক্সিতে। কলকাতার রাস্তায় সন্ধ্যেয়, রাতে, অথবা কখনও কখনও দিনের আলোতেও এমন 'প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর'-পোজে আজকাল লোককে যেতে দেখেছি। স্ত্রীলোক সঙ্গে যে সন্ধ্যে হয়, ইভনিং ইন প্যারী না ইভনিং ইন ক্যালকাটা, রমণীয় বেশী কে। ভারতীয় ছবির পর্দায় চুম্বন-দৃশ্য দেখানো যায় না; হিন্দী ছবিতে যা-ও বা দেখানো যায় বাঙলা ছবিতে তা-ও না। অতি অধুনা ছবির বিজ্ঞাপনেও নিষিদ্ধ হয়েছে কোনওরকম উত্তেজক ইলাস্ট্রেশান। কিন্তু ট্যাক্সিতে জোড়ায় জোড়ায় সুখের পায়রাদের সান্ধ্যবিহার আর বন্ধ হবার নয়। আমরা স্বাধীন হয়েছি যে। ম্যাসাজ হোম বন্ধ; হোটেলেও মাঝে মাঝে রেড হয়; অতএব রেড রোডের নির্জন অন্ধকারে ট্যাক্সিতে অল্প পরিসর বিবরে বেপরোয়া হও। ট্যাক্সি চালায় যে সে এতে আপত্তি করে না। আপত্তি করলে ট্যাক্সি চলবে কিন্তু মিটার চলবে না দ্রুত! এই রকম খদ্দের তার লক্ষ্মী এবং সরস্বতী দুই-ই। লক্ষ্মী কারণ পয়সা বেশি দিতে তার আপত্তি অল্প অথবা একেবারেই নেই; সরস্বতী কারণ তার কৃপায় বেবি ট্যাক্সির চালক সাংসারিক অভিজ্ঞতায় বেবি নেই আর।

এই এক আশ্চর্য দেশ! ছবিতে বিসদৃশ কিছু ঘটনার আগেই সেন্সার [হিন্দি ছবি না হলে]! কিন্তু ট্যাক্সিতে তার আসল ছবি আরও বিসদৃশ হোক বলবার নেই কেউ! সেন্সার কর আর যাই কর,—স্বাধীন ভারতে যারা শাসন করছে আর যারা শাসিত হচ্ছে তাদের কারুর মধ্যেই আর সেন্স নেই। হ্যাঁ, সত্যিই বলছি; No Sense Sir!

কলকাতার রাস্তায় যারা গাড়ি চাপে কেবল তারাই নয়, যারা পথ চলে তারাও স্বাধীন এতদূর যে গাড়ির শিঙা ফুঁকলে অথবা নিজের জীবনের শিঙা ফোঁকবার অবস্থা হলেও তাদের প্রাণে ভয় নেই এতটুকু। এমনভাবে তারা রাস্তা হাঁটে আজকাল যে মনে হয় রাজা-মহারাজা কেউ ফুলবাগিচায় সান্ধ্যভ্রমণে বেরিয়েছে। এক্সিডেণ্ট হলে আজকাল গাড়ি পোড়ানো এবং গাড়ির চালককে আধমরা করাই রীতি। কিন্তু কলকাতার রাস্তায় গাড়ির দুর্ঘটনায় যারা প্রতিদিন পড়ে তাদের মধ্যে কতজন গাড়ি চালাবার দোষে আর কতজন পথ চলতে না জানার অথবা জেনেও বাহাদুরী করবার কারণে সেকথা বলা প্রশান্ত মহলানবীশের পক্ষেও রীতিমত শক্ত।

মোড়ে মোড়ে, 'রাস্তা পেরুবার সময় দেখে পেরুন' লিখে কার কাজ হচ্ছে কলকাতায় জানেন? স্কুলের ছাত্রদের! দশটার সময় যে ক্লাস হবার কথা, সে ক্লাসের ছেলেরা স্কুলে গিয়ে পৌঁছুচ্ছে এগারোটায়। প্রশ্ন করলে মাস্টারের হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে গিয়ে পড়িয়ে দিচ্ছে পথ চলবার নিশানা; School Ahead; Go Slow!

বেনারসের কথা বলতে বেনারস এক্সপ্রেসের এত বাজে কথা কেন বলছি এ নিয়ে মাথাব্যথিয়ে কোনও লাভ নেই। ধান ভানতে শিবের গীত থেকেই সাহিত্য-শিল্প-সঙ্গীতের জন্ম। ধান ভানতে বসে কেবল ধানই ভানলে মানুষের সঙ্গে কলুর ঘানির বলদের কোনও তফাত থাকত না। বেনারসের কথা লিখতে বসে কেবল বেনারসের কথাই লিখলে তা বিনা রসের গোল্লা হয়; রসগোল্লা হয় না কিছুতেই। দীর্ঘ পরিশ্রম করে নাটক লিখে নিয়ে একজন গেছে সমালোচকের কাছে। সমালোচক রায় দিয়েছেন: It's all work and no play. তাই কাশীর ঈশ্বর শিবের গীত গাইতে বসে ধান ভানছি যে আমি তাতে বৈয়াকরণদের বিধান ভাঙছি বটে কিন্তু সেই সঙ্গে স্মরণ করছি 'বাজে কথা'র রবীন্দ্রনাথকে। তিনি বলেছেন, 'বলার কথা না থাকলেও বলতে যেজন পারে, ওস্তাদ সে সেলাম করি তারে।'

বার্ধক্যের বারাণসীর কথা বলার হচ্ছে বেনারস; বলার কথা আমার তার আগে বেনারস এক্সপ্রেস।

কারণ বেনারস এক্সপ্রেসেই আমার দাদুর সঙ্গে দেখা। দাদুর চেহারাটি বেশ। নবকার্তিক। চুল পেকেছে কিন্তু পড়েনি। থার্ড ক্লাসে যাবার সাজ নয়; রীতিমত সৌখীন। সকলের সমান বয়সী দাদুকে নিয়ে আমরা মেতে উঠলাম। দাদুর ঠিক উল্টো দিকে বসা নাতির বয়সী এক ছোকরা লাইটার জ্বলাবার চেষ্টা করছে বারবার দুরন্ত ঝড়ের মধ্যে। বারবার ব্যর্থ হয়। রবার্ট ব্রুসের ছাত্র বলে নয়; মার্কিন ট্রাউজার [নাইয়ের ওপরে যার ট্রাউজার

বলতে কিছু নাই] পরা বাঁহাতের কনুয়ের কাছে রিস্টওয়াচ বাঁধা, মুখে ম্যারিক্যান সিগ্রেটের কল্যাণে তার ভারতীয় ঠ্যাং ভাঙে তবু মচকায় না। দাদু অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিলেন; আমরাও। ফস করে দাদু চেন টানবার জন্যে হাত বাড়াতেই আমরা হা-হা করে উঠেছি; হাহাকার করে উঠেছি: কারণ কি? পঞ্চাশ টাকা ফাইন বিনা-কারণে চেন টানলে তা জানেন?—দাদু রিটর্ট করেন: কিন্তু চেন টানছি এমনই নয়; কারণ আছে। কি কারণ? দাদু প্রশ্নের জবাব না দিয়ে সেই ছোকরাকে বলেন: ভাই, তুমি খুব হাওয়ার মধ্যেও সিগারেট ধরাতে পার আমি জানি; কিন্তু এখন তার দরকার নেই। আমি চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে দিচ্ছি, তুমি লাইটারটা জ্বালিয়ে নাও?—আমাদের হাসি আসবার আগে, পকেট থেকে দেশলাই বার করে কাঠি জ্বালিয়ে এগিয়ে দেন দাদু: এই নাও এই আগুনে লাইটারটা জ্বালাও—? নাও, নাও, লজ্জা কোর না।

ইতোমধ্যে দাদুর পায়ের ওপর একজন দাঁড়িয়েই আছে। দাদু অনেকক্ষণ বাদে বলেন: নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই বুঝি। দণ্ডায়মান ব্যক্তির ভ্রূক্ষেপও নেই দাদুর কথায়। রাগেন দাদু এবারে: চোখে কি অন্ধ গুঁজেছ না কি? আস্ত একখানা পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে টের পাচ্ছ না; তাতে যখন নেমে দাঁড়ায় না সেই লোক: তখন দাদু আর না পেরে বলেন: কি হে, শুনতে পাও না না-কি কানে?

বোঝা যায় এতক্ষণে; শুনতে পায়ই না কানে; সত্যিই পায় না। তাই পরের পায়ের ওপর দাঁড়িয়েছে; নিরুপায়। কিন্তু শুনতে পায় না সেকথা কাউকে বুঝতে দিতে চায় না; তাই বলে দাদুর মুখের দিকে লক্ষ্য করে: আমাকে কিছু বলছেন?

দাদু বললেন: আজ্ঞে হ্যাঁ; আপনাকেই বলছি—

এবারে ভদ্রলোক আশ্বস্ত হন: আমি ভাবছি, বুঝি আমাকে কিছু বলছেন।

ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই থাকে অতঃপর দাদুর পায়ের ওপর। দাদু সরিয়ে নেন না পা।

কিন্তু এরপর দাদু যা করলেন তা বলার অতীত।

সারা গাড়ি যাতে অধুনা অনির্দিষ্ট নোটিশ সর্বদাই ঝুলছে: ৬৪ জন বসিবেক; ১২৮ জন দাঁড়াইবেক; ২৫৬ জন বেঁকিয়া দাঁড়াইবেক, এবং ৫১২ জন ঝুলিবেক, সেই গাড়ির এক প্রান্তে একজন বসে ছিল; সে উঠল একেবারে অপর প্রান্তের বাথরুমে যাবার জন্যে। অর্থাৎ South Pole থেকে North Pole! ভিড় ঠেলে, দাদুর কাছ বরাবর পৌঁছতে দাদু পথ আটকালেন। সে যত এগুবে, দাদু ততই কাছা চেপে ধরেন। কি ব্যাপার। ভদ্রলোক বলে: ছাড়ুন দাদু—। দাদু নাছোড়বান্দা; আমরা সবাই মিলে দাদুকে বলি: ওকে যেতে দিন

বাথরুমে। দাদু সমান জোরে বলেন : না ; যেতে হবে না—। আমরা পুনঃ প্রশ্ন করি : কেন, যেতে হবে না কেন? কেন আবার,—দাদুর উত্তর তৈরীই আছে : কারণ, যেতে যেতে, বাথরুম পর্যন্ত পেঁছিতে বেনারস এসে যাবে যে ভাই।

হাসির হররা ওঠে। যেরকম হাসি বাঙলা ছবিতে সব চেয়ে করুণ দৃশ্যে উত্তম অভিনয় ছাড়া হাসা অসম্ভব!

কাশীতে যে-হোটেলে উঠব বলে ঠিক করেছিলাম সে-হোটেলের একজন পার্মানেণ্ট বোর্ডারের নামে পরিচয়পত্র দিয়েছিলো যে তার নাম ইয়ে মল্লিক। ইয়ে মল্লিক হচ্ছে রিডার্স ডিজেস্টের ফিচারের ভাষায় : দ্য মোস্ট আনফরগেটেবল ক্যারেক্টর আয়াভ এভার মেট। তার চিঠি নিয়ে কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটিতে ঢোকবার মুখে দেখি রাস্তার ওপর রকেই হাঁটুর ওপর কাপড় তুলে বসে আছে একজন। চিঠি বার করে জিজ্ঞেস করি : এখানে জ্যোতিষ দত্ত রায় বলে কেউ থাকেন? চিঠির ওপর আবার চোখ নামাই ; জ্বলজ্বল করছে সেখানে ইয়ে মল্লিকের হস্তাক্ষরে : জ্যোতিষ দত্ত রায়। জ্যোতিষ দত্ত রায় বলে এ হোটেলে কেউ থাকে না শুনে আশ্চর্য হই না যে তার কারণ ওই ইয়ে মল্লিক। আমি নয় ; ইয়ে মল্লিককে যারাই চেনে তারাই আশ্চর্য হবে না কেউ। আর ইয়ে মল্লিককে কলকাতায় চেনে না কে? ফ্রম টালা টু টালিগঞ্জ? বালি টু বালিগঞ্জ? চেনে অবশ্য ইয়ে মল্লিক বলে নয় ; চেনে,—ইয়ে মামা। ইয়ে মামা য়ুনিভার্সাল মামা। তার ছেলে তাকে কি বলে ডাকে জানি না, আর সবাই ডাকে মামা বলেই ; বেশির ভাগ ইয়ে মামা বলেই।

সেই ইয়ে মামা একা নয় ; তার বাড়ির সবাই এক ব্যাপারে বিস্ময়ের ব্যাপার। কেউ নাম রাখতে পারে না কারুর। ইয়ে মামাদের বাড়ির সবাইকেই লোকে, এমনকি স্ত্রীলোকেও, এক কথায় ইয়ে মামার বাড়িকেই তারা ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলে অভিহিত করে থাকে। করার কারণ, কেউ নাম মনে না করতে পেরে, 'ইয়ে' দিয়েই কাজ সারে। তারই ফলে সেই বিখ্যাত বাড়ি। সেখানে জজ আছেন, উকিল, ডাক্তার, এমনকি ভারত-বিখ্যাত আবিষ্কারকও এবাড়িতে অতীতে এসেছেন একবার। নাম করবার মতো এই সব লোকেরাও কিন্তু অন্যের নাম করার বেলায় নাম ভুলে গিয়ে, 'ইয়ে' দিয়ে ইশারায় সারে সব। নিজেদের বাড়ির লোকেদের নামও মনে থাকে না এদের।

ইয়ে মল্লিকদের বাড়িতে নিম্নলিখিত সংলাপ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক দুর্ঘটনা!

—এই যে ইয়ে, ইয়ের কিছু হলো?

—না, ইয়ের এখনও ইয়ে কিছু হয়নি—

—ইয়ের কাছে যে নিয়ে গিয়েছিলে ইয়েকে তা ইয়ে কি বলল?

—ইয়েকে পরীক্ষা করে ইয়ে বলল যে ইয়ের এখন ইয়ে হতে কি বলে গিয়ে বেশ কয়েক ইয়ে দেরী আছে !

এমন লোকদের একসঙ্গে বারোমাস যে বাড়িতে বাস তাকে লোকে ইয়ে মল্লিকদের বাড়ি বলবে, এ আর বিচিত্র কি !

ইয়ে মামার চিঠির ওপর চোখ বুলিয়ে বুঝি, নাম ভুল করেছে ইয়ে মামা। তখন ইয়ে মামার মুখে শোনা হোটেলের সেই স্থায়ী বাসিন্দার হুবহু বর্ণনা দিতে, রকে বসা হোটেলের সেই ভদ্রলোক বলেন : আপনি যাকে খুঁজছেন, তার নাম ক্ষিতীশচন্দ্র সেন ; জ্যোতিষ দত্ত রায় নয়। কে পাঠিয়েছে আপনাকে চিঠি দিয়ে ? ইয়ে মামা ?

নীল আকাশ থেকে বাজ পড়লে অথবা জহরলালের মুখে : 'পাকিস্তান অন্যায় করেছে,' শুনলেও এতটা স্তম্ভিত হতাম না।

আমাকে বাক্যাহত অবস্থা থেকে উদ্ধারের আশায় আবার শক দেন রকে বসা ভদ্রলোক : ইয়ে মামা, কেউ হয় আপনার ?

আজ্ঞে না, আমি বলি : এক পাড়ায় থাকি ; মামাদের বন্ধু, তাই ইয়ে মামা বলে ডাকি—

আপনার নাতির এক গেলাসের হলেও, আপনি ইয়ে মামা বলেই ডাকতেন ! এবং আমার বাবা বেঁচে থাকলেও ইয়ে বলে ডাকতে গিয়ে, ডাকতে পারতেন না ; মুখ দিয়ে বেরিয়ে যেতই,—ইয়ে মামা—

রকে বসা হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা, ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি : ইয়ে মামাকে কতদিন চেনেন আপনি ?

তা ইয়ে দীর্ঘকালের, জবাব আসে ; কি রকম আলাপ তাহলে বলি শুনুন—

ভদ্রলোক বলেন ; আমি শুনি।

ভদ্রলোক বলেন : কাশীর এই গ্র্যান্ড হোটেলে এসে উঠেছেন আপনার চুড়ো মামা সেবার। একদিন সকালে আপনাদের ইয়ে মামার ঘরে ঢোকবার আগে, সারপ্রাইজ দেবার জন্যে ইয়ে মামার ভাল নাম ধরে ডেকেছি। বিমলচন্দ্র মল্লিক আছেন ?—বলব কি মশাই,—ইয়ে মামা এসে ঘাড়ের ওপর বাঘের মতো লাফিয়ে পড়ে চুমু খেয়ে অস্থির।

কী ব্যাপার ?—আমি জিজ্ঞেস করি।

বাঁচিয়েছিস ভাই—ইয়ে মামা বলে।

কি রকম ?

এই দ্যাখ, বলে একটা ফর্ম দেখায় ইয়ে মামা ;—খাটের ওপর পড়ে ছিল ফর্মটা। তুলে নিয়ে বলে -এখানে সই দিতে বলেছে ; নিজের পুরো নাম—কিছুতেই মনে করতে পারছিলাম না, আজ তুই আমার ভালো নাম ধরে ডাকতে আমার মনে পড়ল ; তুই বাঁচালি ভাই !

রকে বসা ভদ্রলোকের গল্পের নটেগাছ কিন্তু তখনও মুড়োয়নি। তিনি বলেন : এর পরেও আছে। ইয়ে মামা ফর্মে নাম সই করতে গিয়ে থেমে গেল আবার ; ফর্ম থেকে চোখ তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করল : এই ইয়ে, আমার ভালো নামটা কি যেন বললি রে—!

॥ পাঁচ ॥

কাশীতে পা দেবার আগে ট্রেনে আরেকটি ঘটনা ঘটেছিল, আরেকটি দুর্ঘটনা,—যে কথাটা না বলে নিলে এখানে আর বলবার স্কোপ পাওয়া যাবে কিনা বলা শক্ত। কাশীযাত্রার কাহিনী যেমন বিচিত্র কাশীযাত্রীর ভ্যারাইটিও তেমনই কম নয়। ধর্মের ষণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের এই কাশীতে একই সঙ্গে এক গলিতে এমন গলাগলি করে বাস যে কাশীতে কেবল নিরামিষ-ভোজীদেরই একচ্ছত্র অধিষ্ঠান এমন মনে করলে কাশীর প্রতি না হক কাশী-যাত্রীদের প্রতি পক্ষপাত প্রদর্শনের দোষ হবে। কাশী কেবল ধার্মিকদের তীর্থ নয় ; অধর্মের বিদ্যালয়ে যারা আজীবন সতীর্থ কাশী তাদেরও সমান আকর্ষণ ক্ষেত্র। কাশী বিশ্বনাথের ; বিশ্বের যতেক অনাথের, কাশী ধর্মের ষণ্ডের এবং অধর্মের পাষণ্ডের। কাশী কেবল গলির নয় ; বরুণা এবং অসির, পুণ্যের করুণা এবং কলঙ্কের মসির একই-সঙ্গে গলাগলির এই কাশী। আলোছায়ার ; মেঘ ও রৌদ্রের ; রাগ ও অনুরোগের ; সাদা-কালোর ; হাসি-কান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা এই কাশী কেবল ভারতের নয় ; মহাভারতের। যে মহাভারত একা পাপের অথবা পুণ্যের ক্ষেত্র নয় ; কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দ্বে আলোড়িত মানব-জীবনের মহৎ কুরুক্ষেত্র। যে মহাভারতে দুর্যোধনের পরাজয় আর যুধিষ্ঠিরের জয় কালের বিচারে তুল্যমূল্য। কাশী, আজকের এই মহাভারতের সঙ্গে স্মরণের অতীত এক প্রত্যুষ-প্রদোষের মহাভারতের, শেষ সেতু ; অশেষ যোগসূত্র।

এবং কাশী যদি না হতো তাই তাহলে কাশীকাণ্ড হতো প্রকাণ্ড একটা মিথ্যা। বর্তমান কলম অন্তত উদ্যত হতো না এই কাশীর ইতিবৃত্ত গ্রথনে। কাশী ভাল এবং মন্দের ; শুভ এবং অশুভের, সুন্দর এবং অসুন্দরের। কাশী জ্ঞানী এবং মূঢ়ের ; রাজা এবং প্রজার ; অন্নপূর্ণের এবং নিরন্নের। কাশীর যিনি অধীশ্বর তিনি শুধু শিব নন ; তিনি নটরাজ। তাঁর নৃত্যোন্মত্ত দুপায়-এর দিকে যদি তাকাই তবে দেখব জীবন এবং মৃত্যু, আনন্দ এবং বেদনা, বিচ্ছেদ এবং মিলন, অমৃত এবং হলাহল একই সঙ্গে, একই অঙ্গে এত অপরূপ যা বিশ্লেষণের বিষয় নয় ; যা ব্যাখ্যার অতীত ; যা মস্তিষ্ক দিয়ে বুঝবার নয় ; অন্তরের অন্তস্তলে বার বার বাজবার।

যার এক ঘাটের প্রাচুর্য অতিরিক্ত আর আরেক ঘাটের অবস্থা অতি রিক্ত তারই নাম কাশী।

এই কাশী এক প্রান্তে রৌদ্রালোকিত দ্বিপ্রহরেও অসংখ্য অন্ধগলিতে নিশীথ রাত্রির নিঃসীম অন্ধকার। অন্যপ্রান্তে উত্তর-অবাহিনী গঙ্গার দুতীরে দুবেলা অনাদি অনন্তকাল থেকে জবাকুসুমসংকাশ কত কোটি কোটি দিবাকরের উদয়-অস্ত মহিমায় এই পুণ্যভূমি অনিমেষলোচন। জলের অতল থেকে এর ঘাটে ঘাটে উঠে গেছে আকাশ-উদ্ধত শির প্রাসাদ আর মন্দিরচূড়া। শাঁখ কাঁসর ঘণ্টা ধুপধুনা চন্দন-চর্চিত এই কাশীতেই অনতিদূরে শ্রুত হচ্ছে শিল্পীর পায়ে সুরের আলাপ; অসুরের কানে তা বহন করে আনার বদলে সঙ্গীতের সুধা ধ্বনিত করছে কলুষ কামনার বিরামহীন নূপুরনিক্কণ। এই সেই কাশী যেখানে নিত্যকালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকায় চলেছে অন্নকূটের উৎসব, আর তার একটু দূরেই পড়ে রয়েছে অজ্ঞাত, অবজ্ঞাত কত ত্রৈলঙ্গ, কত বিজয়কৃষ্ণ, কত নিজের পরিচয় দিতে পরাঙ্‌মুখ মহাত্মার শব।

এই কাশী যাবার পথেই ট্রেনে আমার সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা—যার কথা যথাসময়ে আমার লেখা হয়নি। ভদ্রলোকের নামধাম কোনটাই জানিনে; জানলেও জানাতে পারতাম কিনা বলা শক্ত। এবং হেরম্ব মৈত্র না হয়েও আমাকে জিজ্ঞেস করলে বলতে বাধ্য হতাম: জানি; কিন্তু বলব না। মিথ্যে বলতে পারিনে, এ কারণে নয়; কারণ, কারণে অকারণে কেবল মিথ্যেই এখনও বলতে পারি; আর কোনও কথাই বলব-বলব করেও বলে উঠতে পারিনে: কখনও আইনের ভয়ে কখনও লোকে, না কি স্ত্রী-লোকে কি ভাববে সেই ভয়। আমি যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। আমি যে বাঙালী। ভগবান আছেন কিনা জানিনে; থাকলে, আমার একটি কথাই জানাবার আছে: বারান্তরে বাঙালী করে পাঠিও না; পাঠালে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক করে পাঠিও না।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক আজ বিধাতার অভিশাপ ছাড়া আর কিছু নয়। আজ পশ্চিমবঙ্গে রাজনীতি বলে কিছু নেই; যা আছে তার নাম হওয়া উচিত আজনীতি। যদিও নীতির সঙ্গে আজ আর কি ব্যক্তির, কি জাতির, কি যুগের কিছু মাত্র যোগ নেই, তবুও একে বলছি যে আজনীতি; তার কারণ এ নীতির ইংরেজি 'মরাল' নয়; 'পলিসি'। একদিন আমাদের রাজনীতিতেও অনেস্টি ইস দ্যা বেস্ট পলিসি বলত; আজনীতি আজ বলে ডিসনেস্টি ইস দ্য বেস্ট পলিসি। কেবল কংগ্রেস বলে যে তা নয়; দেশের যারা ডিসগ্রেস তারাও বলে; অর্থাৎ সেই লেফটিস্ট পার্টি বলে যারা পরিচিত হতে চায় পশ্চিম নয় পশ্চাৎ বঙ্গে, এবং আসলে যারা সার্কাস পার্টির চেয়েও অধম; কেননা সার্কাস পার্টিতে দু'-একটা বাঘ-সিংহ এখনও থাকে কিন্তু রাজনৈতিক সার্কাস পার্টিতে পশ্চিমবঙ্গে যারা নেতা, অর্থাৎ অভিনেতা, তারা কেউ বাঘ-সিংহ নয়; কেবল ক্লাউন। বামপন্থী নয়; আমাদের যারা বামে তারা আসলে বামপন্থী। আমাদের লেফটিস্টরা বিশ্বাসে

নয় ; এক্সিডেণ্টে লেফটিষ্ট। দুর্ঘটনায় ডান হাত কাটা গেলে যারা ল্যাটা হতে বাধ্য হয় তাদেরই মতো কংগ্রেসে ঢুকে গদিতে আসীন হয়েই গদা ঘুরোবার সুযোগ পায়নি যারা তারাই এদেশে লেফটিষ্ট। পশ্চিমবঙ্গে নয় ; সারা ভারতবর্ষের যারা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক তাদের সেই গল্পের পাতা জলে পড়ে কুমীর হয়েছে—নাম কংগ্রেস ; ডাঙায় পড়ে হয়েছে বাঘ ; নাম লেফটিস্ট ; আধখানা ডাঙায় পড়লে কি হতো তারই উত্তর দেবার জন্যে নির্বাচনের মুখে দেখা দেবে স্বতন্ত্র পার্টি ; পেঁয়াজের খোসা ছাড়ালে, কম্বলের লোম বাছলে, ভারতবর্ষ নামে এক গাঁয়ের ঠক বাছলে যা থাকে মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের ইতিবৃত্ত থেকে প্রত্যাহার, প্রতিমুহূর্তের 'জ্বালা' বাদ দিলে, বরবাদ করলে তার চেয়ে খুব বেশি থাকে কি ? না। আজকের ভারতবর্ষে বাঙালী হয়ে জন্মানোই একটা অপরাধ ; তারপর মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক হয়ে আসাটা গোদের ওপর বিষফোড়া ; বোঝার ওপর শাকের আঁটি ; অথবা তার চেয়ে একটু বেশীই,—ভারতবর্ষের সবচেয়ে দুর্ভাগ্যপীড়িত প্রদেশ, এই বাঙলার জনসাধারণের স্কন্ধে একগাদা। [কম্পোজিটরের কাছে নিবেদন, 'দার' জায়গায় 'ধা' করবেন না যেন ; করলে বর্তমান লেখকই বিপদে পড়বেন ; কেননা 'দা'র জায়গায় 'ধা' পড়লে, যা দাঁড়ায় এরা সত্যিই তাই ; উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে দেবার ক্ষেত্রে এদের লালফিতাও হঠাৎ শম্বুকগতি ত্যাগ করে ; তাই] মন্ত্রীর ওপর আবার গাদা গাদা উপমন্ত্রীর সঙ্গেই বোধ করি তার একমাত্র তুলনা চলে।

লক্ষ্য করবেন, শুধু বাঙালীর কথা বলছি না ; মধ্যবিত্ত বাঙালী 'ভদ্রলোক'-এর কথা বলছি। শুধু বাঙালী বললে, 'ভেগ' কথা বলা হয়। কারণ স্যার অমুকও বাঙালী ; আবার মাসিক পাঁচ হাজারী চাকরে ভুলেও যে বাড়িতেও একটা বাঙলা কথা বলে না, কাঁটাচামচে ছাড়া খায় না, যাদের ছেলেমেয়েরা বাবাকে ড্যাডি, মাকে মাম্মি ছাড়া ডাকে না ; ঠাকুরের বদলে বাবুর্চি ; চাকরের পরিবর্তে বয় ; জলযোগের জায়গায় ব্রেকফাস্ট, মধ্যাহ্নাহারের বিকল্পে লাঞ্চ এবং নৈশাহারের নামে ডিনারই যাদের রেওয়াজ, আদমসুমারীতে তারাও বাঙালী ছাড়া আর কোন [বজ্] জাত বলুন ? আবার আপনি তিনি আমি, আমরাও বাঙালী, আমরা যারা বিত্তহীন এর লজ্জা ঢাকবার জন্যে নিজেদেরকে বলি মধ্যবিত্ত ; আমরা যারা, আজ বাঙলা মাসের কত তারিখ জিজ্ঞেসা করলে বলি, জানুয়ারী এত তারাও তো, 'একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিল জয়' তাদেরই বংশধর।

বড়লোক এবং একেবারে নীচতলার লোক এদের কারুর কথাই নয় ; কারণ এদের কাউকেই ভদ্রলোক সাজতে হয় না। তাই এদের একদলের জ্বালা বলতে বুঝি, জালার মতো ভুঁড়ি নিয়ে সহজে চলতে ফিরতে না পারার জ্বালা ; আর আরেকদলের কার্য উপযুক্ত পারিশ্রমিক ছাড়াই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের জ্বালা ভুলতে সন্ধ্যেবেলায় তাড়ির জালার পাশে গিয়ে তাড়াতাড়ি বসতে না পাওয়া। এরা

সব কালে সব দেশে সব প্রদেশে,—এক ; এদের কথা নয়। এদের কথা বলবার জন্যে আমাদের দেশেও কংগ্রেস আছে ; কম্যুনিস্ট আছে। যাদের কথা বলবার জন্যে কেউ নেই, আমি সেই মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের কথা বলছিলাম। তাদের জ্বালাই রিয়্যাল জ্বালা ; দাঁড়কাকের ময়ূর সাজতে যাওয়ার যেমন জ্বালা। বিত্তহীন হয়েও মধ্যবিত্ত সাজার কাটা ঘায়ে, ভদ্রলোক হবার নুনের ছিটের মর্মান্তিক জ্বালা।

বড়লোকের বিয়েবাড়ীর দিকে তাকিয়ে দেখুন। পত্রের দ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটিই নয় শুধু ; নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে, আমাদের অবস্থার অতিরিক্ত মূল্যের প্রেজেণ্টেশান বাগিয়ে নিয়ে এক কাপ কফি আর একমুঠো কাজু বাদামের বড়লোকী কার্পণ্য পর্যন্ত আমরা মার্জনা করি। কারণ আমরা যে মধ্যবিত্ত, আর ওঁরা যে বড়লোক। সর্বহারাদের বস্তির দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করুন একবার দয়া করে। তাদের ছেলেমেয়ে দুই-ই আছে। কিন্তু অন্নপ্রাশন, উপনয়ন নেই। বিবাহ আছে, কিন্তু পণের টাকা অথবা লোক খাওয়াতে উদ্বাহবন্ধনের উদ্বন্ধনে পরিণত হবার কোনও রেকর্ড নেই। মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে অর্থাৎ নিজের দিকে তাকান অতঃপর। ভিখারীর চেয়েও দুরবস্থা [না কি একটি জায়গায়,--দুরাবস্থা, ব্যাকরণ অসঙ্গত হয়েও জীবনসঙ্গত হবার কারণে বিদ্যাসাগর-বারণ সত্ত্বেও আর্ষ প্রয়োগ] যে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের তার অবস্থা বর্ণনার অতীত। ভিখারীর আছে তবু তার চাইতে লজ্জা নেই ; মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নেই, তবু দিতে না পারার আছে দুস্তর লজ্জা।

মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোকের নেই কি ? ছেলেমেয়ের অন্নপ্রাশন থেকে আরম্ভ করে শ্রাদ্ধ পর্যন্ত একগাদা পয়সার [ধার করে ; বাঁধা দিয়ে ; ভিক্ষে এবং চুরি হলেও] শ্রাদ্ধ করা, কারণ এসবই তার পরিবারের মতো, জীবনে একবার তো, বার বার নয়, অতএব। বার বার মরা, শ্রাদ্ধ যে একবার এ তো অভ্রান্ত বেদবাক্য ; এ সন্দেহ যার সে নয় মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক। এর ওপর আছে। ছেলেমেয়েকে পড়িয়ে শুনিয়ে, বিবাহ দিয়ে ছেলেমেয়ের বাপ করে আবার মধ্যবিত্ত বাঙালী ভদ্রলোক না তৈরী করা পর্যন্ত যার রেহাই নেই, কেবল সেই তো আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী মধ্যবিত্ত ভদ্রলোক। অধুনা আবার তার ছেলেমেয়েদের কিণ্ডারগার্টেনে না পড়ালে, যেখানে মাইনে মাসে বিশ, সিণ্ডেরেলা প্লের জন্যে ড্রেস বাবদ অতিরিক্ত পঞ্চাশ, দুমাস, বড়জোর তিন মাস অন্তর, তেইশখানা খাতা। ছেচল্লিশখানা বই, এবং পড়া শেষে বাঙলা না শেখার কারণে বাঙালী ছেলেমেয়ের বুড়ো বয়সে আবার বাঙলা শেখানোর জন্যে প্রাইভেট ট্যুটার মারফত কেঁচে গণ্ডূষ।

বাঙালীর অধঃপতনের এই চিত্র যখনই আমার আঁখিপদ্মে প্রতিভাত হয় তখন অতীত বাঙালীর প্রাতঃস্মরণীয় কীর্তির কথা মনে পড়ে না। রামমোহন, বিদ্যাসাগর, স্যার আশুতোষ। কারুর কথা নয়। রবীন্দ্রনাথের কথা অবশ্য

মনে পড়ে; মনে পড়ে, তিনি সাত কোটি সন্তানকে একদা বাঙালী না করে মানুষ করতে চেয়েছিলেন, আজ বেঁচে থাকলে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ নিজেই তাঁর কথা প্রত্যাহার করে বলতেন: মানুষ না করে তাদের আবার বাঙালী করে দাও। মানুষ হতে গিয়ে সাত কোটি আড়াই কোটিতে এসে ঠেকেছে; অবিলম্বে আবার বাঙালী হতে না পারলে আড়াই কোটি দূরের কথা; কটিদেশে কাপড় পর্যন্ত আর থাকবে কিনা বলা শক্ত!

কাশীর কথা উঠলে আমার যেমন ত্রৈলঙ্গ, শ্যামাচরণ, অথবা গোপীনাথ কবিরাজের কথা অতি অবশ্যই মনে জাগে বটে কিন্তু তার আগে, অনেক আগেই যার কথা মনে না হয়ে পারে না, তিনি অখ্যাত অবজ্ঞাত কাশীর দিদিমা। তেমনি আজকের অধঃপতিত বাঙালীর কানে নবজাগরণের বাণী উচ্চারণ করবার কালে যাঁদের জয়ধ্বনি করি তাঁরা নিশ্চয়ই রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ এবং সব শেষে উল্লেখ করলেও সর্বপ্রথম, সর্বপ্রধান বাঙালী রবীন্দ্রনাথ; কিন্তু তাঁদেরও, অর্থাৎ এই সব প্রাতঃস্মরণীয় পূর্বসূরীদেরও পূর্বে যার কথা, যার জয়ধ্বনি আমার জিহ্বায় সর্বাগ্রে ডানা ঝাপটায় সে একজন কুখ্যাত সুজ্ঞাত গুণ্ডা। তার নাম বেয়াকুফ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেক আগে সিদ্ধার্থশংকর রায় সেকালে বিধানসভায় এবং উত্তমকুমার ছবির পর্দায় হাজির ছিলেন না; নূ্য এম্পায়ারের শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহে নবনাট্যান্দোলন, নাটকের বদলে আলোক-আভিসম্পাত অথবা স্বাধীনতার দাম মাত্র আট পয়সা হয়নি তখনও; সেই যে কালে একটি অক্ষরও না জেনে এদেশে কাগজের সম্পাদক কিংবা চিরস্থায়ী সহকারী সম্পাদক হওয়া চালু হয়নি অথবা যখন লোকে চুরি করলে জেল খাটত, কিন্তু তখন জেল খাটলে চুরি করার অক্ষয় অধিকার অর্জন করত না; একুশ বছর বয়স হলেই ভোট দিতে পারার একুশে আইন যেদিন চালু হয়নি ভারতবর্ষে; অথবা হিন্দু স্ত্রীর বিবাহ যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন [?] দেশে জীবনে একবারই হতো,—বার বার হতে পারত না সেই প্রাগৈতিহাসিক কালে বেয়াকুফের নাম আজকের দিনে কোনও রাজনৈতিক নেতার চেয়ে কম কুখ্যাত ছিল না।

ধর্মতলায় অধর্মের হেডকোয়ার্টার ছিল বুদ্ধিমান বেয়াকুফের। কলেজ স্কোয়ারের আশেপাশেই যেমন লেখক-প্রকাশক-পাঠকদের প্রাণকেন্দ্র, কারণ এদেশে ওই তিনপ্রকার লোকেরই [স্ত্রীলোকের কথা বলছি না; আমার ঘাড়ে একটাই মাথা] প্রায়ই কলেজের সঙ্গে কোনও রকম যোগ ছিল না। এখন নেই, ভবিষ্যতে থাকবে কিনা বলা শক্ত; তেমনই অধর্ম করবার জন্যে ধর্মতলার চেয়ে উপযুক্ততর নামের রাস্তা, যেখানে গলির নাম ইংরেজী স্ট্রীট, স্ট্রীটের বিকল্প এভেন্যু, পাঁচতলা বাড়ির নাম স্কাইস্ক্র্যাপার, মেসের লেটারহেড ম্যানসন, এক ছটাক ওপেন স্পেসের পরিচয় পার্ক, বেকারের ক্রিডেন্সিয়াল ফ্রিলান্স জার্নালিস্ট। পুরস্কারের অথবা পেনসনের প্রত্যাশায় সরকারের পদলেহনকারীর

নাম সাহিত্যিক ; এবং নোটলেখা, খাতা না দেখে নম্বর দেওয়া, অন্য কালেজে পার্টটাইম এটেন্ডেন্স এবং প্রাইভেট টুাসানের কারণে ইউ-জি-সি গ্রাণ্টপ্রাপ্ত কালেজে আসলে লেক্‌চারার কিন্তু কমান্‌ এরারের মহিমায় অধ্যাপকের বিজ্ঞাপন যেমন এডুকেশানিস্ট বলে, সেই এই কলকাতায় সেদিনও ছিলো না ; আজও নেই।

সেই সে কলকাতার কুখ্যাত গুণ্ডা বেয়াকুফের কাছে গেছেন সেদিনকার এক সওদাগরী অফিসের বড়বাবু। ডেলী প্যাসেঞ্জার সেই ভদ্রলোক বড়বাবু হবার পর ইন্টার ক্লাস ছেড়ে সেকেন্ড ক্লাসে পা দিয়েই বিপদে পড়েছিলেন। প্রায়ই সাহেবরা সেদিন সেকেন্ড ক্লাসে বাঙালী কালাচামড়াদের আশা করত না ; যদি দৈবাৎ কেউ তাদের সহযাত্রী হতো তো তাদের তামাশা করত। নির্দোষ তামাশা নয় ; থুতু, পা তোলা, কখনও কখনও গায়ে হাত তোলাও ছিলো, এই বিনে পয়সার তামাশা দেখতে কখনও কখনও ভিড় করত যারা, স্বজাতির হেনস্থায় সব চেয়ে সুখী সে [বজ]-জাতের নাম বাঙালী, তাদের ফাউ ; অর্থাৎ অতিরিক্ত আইটেম। আমাদের কাহিনীর নায়িকা [!] ভীরু বড়বাবু যে গাড়িতেই উঠতেন, বিশেষ দুজন সাহেব খুঁজে খুঁজে সেই কামরায় উঠে রোজ রোজ সেই একই পালার পুনরাবৃত্তিতে উদ্যত হতো নিঃসংকোচে : বড়বাবু টাইম পালটেও সুবিধে করতে না পেরে এলেন ধর্মতলায় বিখ্যাত বেয়াকুফের কাছে।

বেয়াকুফের এই বিখ্যাত আড্ডা সেদিন কলকাতা শহরে কারুর অজানা ছিল না ; সম্ভবত পুলিশের ছাড়া। পুলিশের ছাড়া এইজন্যে বলছি যে আজকের কলকাতাতেও তাহলে লালবাজার সত্ত্বেও কেন তবে কালোবাজারের জয়যাত্রা অব্যাহত। কালোবাজার প্রকাশ্য বাজার নয় বলেই সব সময় হয়ত লালবাজারের পক্ষে তার গায়ে হাত দেওয়া সম্ভব হয় না। কিন্তু প্রকাশ্যে যেসব বেআইনী বাজার বসে তার সম্পর্কে আমরা জানি ; কিন্তু লালবাজার নিশ্চয় জানে না। উজ্জ্বল উদাহরণ কলকাতাময় ছড়িয়ে। খুব সম্প্রতি লেডি চ্যাটার্লীর লাভার শ্লীল বলে স্বীকৃত হওয়া সত্ত্বেও আমাদের দেশ তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে, আপনারা জানেন। কিন্তু সেই সব নিষিদ্ধ পুস্তক যা প্রকাশ্যেই অশ্লীল তা হলে কি করে সুরেন বাঁড়ুজ্জে রোড ধরে কর্পোরেশনের বাড়ির লাল অঙ্গে প্রকাশ্যে দিনের পর দিন 'বিকৃত' হয় ? এই সব স্টলে শেক্সপীয়ারের বই বিক্রীত হবার জন্যে গাদা করা থাকে ; কিন্তু বিকৃত হবার জন্যে যারা এখানে আসে তাদের দোকানদার ফিসফিস করে বলে : সেক্স বুক চাই বাবু ? যে কেউ যেকোনও দিন সন্ধ্যায় এখানে গিয়ে এক মিনিট অথবা এক মিনিটও নয়, দাঁড়ালেই জানতে পারেন। কিন্তু পুলিশ নিশ্চয়ই জানে না ; জেনেও পুলিশ কিছু বলবে না অথবা জানি কিন্তু বলব না—বলার মতো কিছু প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি নন পুলিশও।

ছায়াছবির অশ্লীল পোস্টার নিয়ে হৈ-হৈ-এর শেষ নেই অথচ এই কলকাতার প্রকাশ্য দিবালোকে, সন্ধ্যার অন্ধকারে, নির্জন রাস্তায় ভিড়াক্রান্ত

আলোকোজ্জ্বল রাজপথেই কখনও বা, ট্যাক্সিতে যে অবস্থায় যেতে-আসতে দেখা যাচ্ছে নরনারীকে, তা কি অশ্লীল পোস্টারের চেয়ে কম জীবন্ত ? ম্যাসাজ হোম বন্ধ হয়েছে, কিন্তু সেই ম্যাসাজ হোমের এবং কখনও কখনও রীতিমত ভদ্র হোমেরও মেয়েদের এসে দাঁড়ানো বন্ধ হয়নি ল্যাম্পপোস্টের তলায় সন্ধ্যা হতে। এরা সব পতিত নয় ; অথচ ভদ্রজীবন থেকেও বিচ্যুত,—এদের দেখে আমার কেন জানি না অবধারিত রবীন্দ্রনাথ মনে পড়ে। 'ঘরেও নহে, পারেও নহে, যেজন আছে মাঝখানে, সন্ধ্যাবেলা কে ডেকে নেয় তা'রে ?'—এদের কথা আপনারা জানেন, আমরা জানি, কিন্তু আরক্ষাবাহিনী নিশ্চয়ই জানে না।

এ ছাড়া আরও যা জানি তা আপনারাও জানেন ; কিন্তু আপনারাও বলেন না ; আমরাও, না। কখনও কখনও কেউ কেউ বইতে লেখেন গল্পের ছলে ; কিন্তু তার আগে, গোদা টাইপে ; এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর সঙ্গে বাস্তব জগতের কারুর সঙ্গে এতটুকু মিল নেই ; যদি থাকে তবে বুঝতে হবে তা একান্তই অনিচ্ছাকৃত,—লিখে দিতে ভোলেন কদাচ।

দেখে শুনে আমার মনে হয়েছে, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবই আমাদের সব অনর্থের মূল ; এবং আমাদের, মধ্যবিত্তদের নির্মূল হবার কারণও হবে ওই, অর্থের নয়, প্রতিবাদের অভাবেই। রবীন্দ্রনাথের, অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে, তারা উভয়েই বিধাতার রুদ্ররোষে সমানভাবে জ্বলে যায়,—এই জীবনে এখনও কবিতা হয়ে আছে বলেই যে আমরা ভয় পাই প্রতিবাদ করতে তা নয় ; আসলে আমরা ভয় পাই, তার কারণ আমাদেরও এই আলেকজাণ্ডার উবাচ, 'সত্যিই কি আশ্চর্য এই দেশে' পুলিশকে যদি কোনও তথ্য দেবার দুঃসাহস করেন তাহলে আসামীর আগে আপনার সাজা হয়ে যাবে। পুলিশ তৎক্ষণাৎ বলবে, আপনি কি করে জানলেন যে এমন হয়। আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আছেন। ব্যস ! হয়ে গেল আপনার ! বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা : পুলিশে বাগে পেলে সে-আঠার বাঁধন খুলবে কে ?

গোটা ভারতবর্ষেই তো আজ আসামীদের সাজাই সব চেয়ে কম হয় অথবা একেবারেই হয় না। তাই সেকথা থাক ; তার বদলে এখন বেয়াকুফের কথা হচ্ছিল, তার কথাই হোক !

বেয়াকুফের আড্ডার সামনেটা হোটেল্ ; পেছনটায় তার আসল কারবার। সেখানে হোটেলের মেনুর মতো কার্ডে ছাপা রয়েছে তার রেট খদ্দেরের জন্যে : পুরো খুন—হাজার টাকা ; আধমরা : পাঁচশো ; সামান্য শিক্ষা : একশো। সেকেণ্ড ক্লাসের ডেলি প্যাসেঞ্জার বড়বাবু সামান্য শিক্ষাই দিতে চাচ্ছিলেন সাহেবদের ; বেয়াকুফের নির্দেশমতো একশো টাকার নোট একখানা এবং একখানা সেকেণ্ড ক্লাস টিকিটের দাম গুঁজে দিলেন।

পরের দিন ট্রেন ছাড়বার মুহূর্তে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে উদয় হয় কলকাতার কুখ্যাত বেয়াকুফ, বড়বাবু এবং সাহেবদের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায়। সাহেবরা

আরও অবাঞ্ছিত আগন্তুককে দেখে বিস্মিত হয় কিন্তু বুঝতে দেরি হয় না তাদের যে এ নিরীহ ভদ্রলোক নয় ; দুর্দান্ত সন্তান। চুপ করে যায় সাহেবরা। কিন্তু একটু বাদে চুপ করে আর থাকা যায় কতক্ষণ ? এতদিনের অভ্যাস। অতএব সাহেবরা এসয়ুস্যাল বুলি করতে আরম্ভ করে, বেয়াকুফকে বাদ দিয়ে বড়-বাবুকেই। থুতু দেয় ; পা তুলে দেয় বড়বাবুর বুকে। বেয়াকুফ আঙুল ইশারা করে বড়বাবুকেও সাহেবদের বুকে পা তুলে দিতে বলে। বড়বাবু পারবেন কেন ? ছাপোষা বাঙালী ; দুর্দান্ত সাহেবের বিয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকে পা তোলার মতো পা কোথায় তার। কথা বড়বাবু শুনছে না দেখে বেয়াকুফ গেঞ্জির তলায় রাখা ছোরা দেখায় ; অর্থাৎ কথা না শুনলে সে এবার বড়বাবুকেই ফাঁসাবে। বড়বাবু চোখ দুটো বুজিয়ে ফেলে, দুর্গানাম জপতে জপতে সাহেবের বুকে তুলে দেয় পা !

সাহেবরা প্রথমটা এত শক্‌ড্‌ হয় যে বুঝতেই পারে না কি হয়েছে,—তারপর সংবিৎ ফিরে পেতেই গর্জন করে ওঠে ঃ হোয়াট ? ডার্টি নেটিভস ? কাওয়ার্ড বেঙ্গলীস ?

বেঙ্গলীস বলতেই উঠে পড়ে বেয়াকুফ ; ঝাঁপিয়ে পড়ে সাহেবের বুকের ওপর ; চীৎকার করে বলে বেয়াকুফ ; হোয়াট ? বেঙ্গলীস ? প্লুর‍্যাল জেন্ডার ? [অর্থাৎ একজন বাঙালী না বলে তুমি প্লুর‍্যাল নাম্বার বললে কেন] চীৎকার করে বেয়াকুফ, আর সমানে হাত চালায়। সাহেবদের মুখ ফাটিয়ে নেমে যায় বেয়াকুফ, সেই কলকাতার কুখ্যাত গুন্ডা, ট্রেন পরের স্টেশানে পুরো হল্ট করবার আগেই।

সাহেবরা শুধু গোঙায় ; বড়বাবু নামবার আগে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে সরিয়ে দিয়ে যায় ষাঁড়ের ডালনা খাওয়া চলচ্ছক্তিরহিত চতুষ্পদকে [দুই সাহেবের দু পা প্লাস দু পা ইকোয়াল টু ওয়ান চতুষ্পদ]।

বেয়াকুফ গুন্ডা শিক্ষিত ছিলো না ; কিন্তু তার gender sense ছিলো ঠিকই ! আমাদের শিক্ষা হয়েছে কিন্তু gender sense হয়নি আজও।

এই আমার এক দুরারোগ্য দোষ। এই,—এক কথা বলতে, একের কথা বলতে বলতে আরেকের কথায় কলমের যখন-তখন নাক গলানো। দোষ আমার নয় ; দোষ আদি ও অকৃত্রিম বাঙালীত্বর। শীল থেকে শীলে, ব্রজেন শীল থেকে পঞ্চশীল, গিরিশ ঘোষ থেকে দ্বারিক ঘোষ যেতে আমাদের মুহূর্তের তর সয় না। বলতে সুরু করেছিলাম অসমাপ্ত ট্রেন-পর্বের যে-ভদ্রলোকের কথা তিনি মধ্যবর্তী বয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালীই। ট্রেনে তাঁর সঙ্গে চলেছিলো আর যারা তারা সবাই কাশীতে বাঈজী পাওয়া যেত একটা কেমন এবং এখন কেমন যেন তাদের আর দেখতে পাওয়া যায় না যে, তাই নিয়ে আলোচনায় উন্মত্ত

হয়েছিল। ভদ্রলোক শুনতে শুনতে আর শুনতে পারলেন না। বললেন, লোকে কাশী যায় ধর্ম করতে না অধর্ম করতে বলা শক্ত। আলোচনারত যুবকেরা তাঁর কথায় কর্ণপাত করে না দেখে রাগে ফেটে পড়লেন: বাঈজীর অভাব নেই ভারতবর্ষে; তার জন্যে কাশীকে কলঙ্কিত করবার অর্থ কি? যুবকদের যে দলপতি সে বলল: আমার কথাও তাই; এদেরকে আমি কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে মেয়েমানুষ, সেই সব মেয়েমানুষ যারা দেহের ব্যবসা করে তারা ক্যালকাটা টু কাশী, অবিকল এক। তার জন্যে কাশীতে গিয়েও কেবল ডালকামুণ্ডিতে 'মুণ্ড' মণ্ডনের অর্থ, একমাত্র অকর্মণ্য অতিরিক্ত অর্থ ছাড়া আর কি হতে পারে!

কিন্তু যুবকের যূথপতি যতই বলুক মোগলদের হাতে পড়ে তাকেও শেষ পর্যন্ত খানা খেতেই হলো কাশীতে। অর্থাৎ সদলবলে যেতে হলো ডালকা-মুণ্ডির ভুবনবিখ্যাত পতিতা-পাড়ায়। সেখানে মধ্যরাত্র পর্যন্ত বাঈজীসঙ্গে কাটিয়ে যখন বেরুচ্ছে তারা তখন কে একজন বললে নতুন এক মেয়েমানুষ এসেছে ডালকামুণ্ডিতে যার নাম ডালিয়া,—যাকে একবার দেখে না এলে কাশীতে আসার মানে হলেও ডালকামুণ্ডিতে আসার মানে হয় না কোনও। পীড়াপীড়িতে রাজী না হয়ে উপায় থাকে না অসুর দলপতি বৃত্রের। সেই মধ্যরাত্রে এ-দোর ও-দোর করতে করতে ডালিয়ার ঘরের ঠিকানায় ঠুক ঠুক করতে দেখা গেল দরজা ভেতর থেকে বন্ধ; অর্থাৎ লোক আছে। অত্যন্ত উত্তেজক ছবি দেখতে এসে উদগ্র দর্শকের 'হাউসফুল' বোর্ড ঝুলতে দেখে মনের যে অবস্থা হয় তারই মতো অথবা তার চেয়েও হতোদ্যম যুবকেরা যখন চলে যাবার জন্যে পা বাড়িয়েছে ক্ষুণ্ণতর মনে তখন খুট করে আওয়াজ হয়ে দরজা খুলে গেল। সবাই মিলে হুড়মুড় করে ডালিয়ার ঘরের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালো এক লাফে। কেবল দলপতি সেই 'কাপ্তান' নয়; বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সে তখনও।

বাইরে দাঁড়িয়ে সে লক্ষ্য করছিলো একজনকে। সেই একজন,—সেই মুহূর্তে ডালিয়ার ঘর থেকে যে নিষ্ক্রান্ত হয়ে সন্তর্পণে আপাদমস্তক চাদরে আবৃত করে বেরিয়ে যাচ্ছিল ডিঙি মেরে মেরে যাতে ডালকামুণ্ডির অপবিত্র মাটির অশুচি তাকে স্পর্শ না করে, সে ছাড়া আর কেউ নয়। মুখটা দলপতির ভারি চেনা। তবুও তাকে থামিয়ে লজ্জা দিলো না কাপ্তান। ট্রেনে মরাল-লেকচার দেওয়া সেই মধ্যবয়স অতিক্রান্ত মধ্যবিত্ত বাঙালী,—'কাশীতে যায় যারা তার ডালকা-মুণ্ডিতে যায় কেন', তার অর্থ খুঁজে পেলেন কিনা জিজ্ঞেস করবার ভারি ইচ্ছে করছিলো বটে কাপ্তানের, তবুও চেপে গেল সে। চেপে গেলো কারণ, কেন বলা শক্ত, তবুও তার সে মুহূর্তে মনে না হয়ে পারেনি যে ভদ্রলোকও তাকে চিনতে পেরেছেন। একটু পরে দলপতি গুনগুন করে একটি গানের সুর, যা নাকি পলায়নরত ভদ্রলোকের গাইলে ঠিক হতো, নিজেই ভাঁজতে ভাঁজতে ঢুকলো

গিয়ে ডালকামুণ্ডিতে নবাগত তারকা ডালিয়ার ঘরে। গানটা রবীন্দ্রনাথের সেই : এ পথে আমি যে গেছি বার বার !

এই কাশীর এক দিক ; কিন্তু তার আর এক দিকও আছে। সেই একদিন যেমন কাশীর এক দিকের ছবি পেয়েছি তেমনই তার আর 'এক' দিকের ছবির জন্যে চলুন যাই আর 'এক' দিন-এর কাছে।

সেই আর-'এক'দিন-এ সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামীর সম্মুখে গিয়ে নত হয়ে, প্রণত হয়ে দণ্ডায়মান হই আসুন। শিবের জটামুক্ত জাহ্নবী যেখানে উত্তরবাহিনী সেই কাশীর গঙ্গার তখন কর্মক্লান্ত দিনের অবসানে অবগাহন-উদ্যত হয়েছে সর্বপাপঘ্ন সহস্রাংশু জবাকুসুমসংকাশ দিবাকর। দিনের আলো অন্তর্হিত হয়নি আর এসে উপস্থিত হয়নি তখনও তারাদের ফুলতোলা আকাশের আঙ্গিনায় রমণীয় রাত্রি। পরমাশ্চর্য সেই প্রদোষালোকে গঙ্গার তীরে বসে আছেন মর্ত্যভূমিতে অমর্ত্যভূমির আভা ;—ত্রৈলঙ্গস্বামী। ধ্যাননিরত ধূর্জটি—শিষ্যরা অবলোকন করছে সেই হিমালয়শিখরে করুণার তুষার গলে গলে পড়ছে। এমন সময়ে সঙ্গিজন-সমভিব্যাহারে দেখা দিয়েছেন অদূরে ধুতি-চাদর-পরা ছড়ি হাতে বাঙালী এক বাবু। এসে দাঁড়াতেই ধ্যানভঙ্গ হয় ধূর্জটির। হিমালয়ের আনন থেকে সূর্যালোকে অপহৃত হয় তুষারশুভ্র আবরণ। ত্রৈলঙ্গ উঠে দাঁড়িয়ে আলিঙ্গনে আবদ্ধ করেন বাঙালী আগন্তুককে। একজনের অঙ্গে কটিবাস : আরেকজনের সর্বাঙ্গে সম্পন্ন সংসারীর ভেক। আলিঙ্গনান্তে একটি কথারও বিনিময় হয় না। দুজনে দুজনের কাছ থেকে বিদায় নেন নীরবে।

আগন্তুক বিদয় নেবার পর বিস্ফারিত দৃষ্টিতে শিষ্যদের বিস্ময়ের কারণ, ত্রৈলঙ্গ কাউকে এমন আপ্যায়ন করেন না। ত্রৈলঙ্গ অপনোদন করেন বিস্ময়ের ছায়া শিষ্যদৃষ্টির অরণ্য থেকে ঃ কাঠের লেঙটি পরে যোগীরা যাঁর অন্ত পান না অনন্তকাল ধরে, চটি-চাদর-ধুতি-পাঞ্জাবিপরা এই গৃহস্থ সংসারে বাস করেই সন্ধান পেয়েছেন সেই 'সার'-এর।

কাশীর আর 'এক'দিন আর 'এক' 'দিক' এই আগন্তুক-এর নাম ঃ শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

॥ ছয় ॥

নন্দাদেবী পাহাড়ের ওপারে সূর্য অস্ত যাচ্ছে সেদিন। অবসান আসন্ন হয়েছে নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল এক দিনের। চলে যাবার, সরে যাবার মুহূর্তে জ্বলে উঠছেন সর্বপাপঘ্ন, জবাকুসুমসংকাশ মহাদ্যুতি দিবাকর দ্বিগুণতর দীপ্তিতে। কলকল্লোলিনী মহাসমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে চির-নিরুত্তর

দেবতাত্মা হিমালয় অক্লান্ত প্রহরীর মতো অদূরে দণ্ডায়মান 'সেই অম্বরচুম্বিত ভাল হিমাচলে' এসে পড়েছে বেলাশেষের আলো ; সে আলো জ্বলজ্বল করছে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির প্রসন্নাননে ; সে আলোয় ছলছল করছে 'ভুবন-মনোমোহিনী' এই ভারতবর্ষের 'অনিলবিকম্পিত' অরণ্যের 'শ্যামল অঞ্চল'। সে আলোয় টলমল করছে 'নীলসিন্ধুজলের' সুনীল ; সেই আলো যার আশীর্বাদ মাথায় করে রাত্রির অতল অন্ধকার থেকে উত্তীর্ণ হচ্ছে নদী—নবপ্রভাতের অকূল আলোতে।

এই অপরূপকে দুটি নয়ন মেলে দেখছে সেদিন এক তরুণ বাঙালী। ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামরিক পূর্তবিভাগের সঙ্গে যুক্ত সে, তখনও জানে না দাসত্ব থেকে প্রভুত্বে, 'সামান্য' থেকে 'অসমান্যে' উত্তীর্ণ হবার কি 'অনন্তমুহূর্ত' আসন্ন হয়েছে সেই এক পরমাশ্চর্য প্রদোষে। মেঘে মেঘে রঙের কুসুম তুলে অস্তাচলে ঢুলে পড়ার সূর্যালোকে উদ্ভাসিত এক তরুণ সত্তা কোন অনির্বচনীয়ের আভাস পাচ্ছে কে জানে ! প্রতি রোমকূপে এ কিসের রোমাঞ্চ ; বুকের মধ্যে কেন শিবের ডমরুধ্বনি ; কানে বাজে কার বীণা ; নাসিকায় আসে গন্ধমাতাল-করা কিসের পারিজাত-বাস ; জিহ্বায় ক্ষরিত হতে থাকে অমৃতনিস্যন্দ ; সুধায় ভরে যায় সমস্ত বসুধা।

হঠাৎ কেঁপে ওঠে তার অন্তরাত্মা, অরণ্যাত্মা দুর্গম পর্বত-কন্দর কেঁপে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। তার নাম ধরে কে ডাকে এই অজানা, এই অচেনা দ্রোণগিরির নির্জন অন্ধকারে ! এ কার কণ্ঠস্বর ? ভীষণ চেনা ; তবু অচেনা। জন্মজন্মান্তরের জানা : তবু অজানা। এ আহ্বানের কেবল আওয়াজ নেই ; আলোও আছে। এ কেবল জিজ্ঞাসা নয় ; জবাব। মৃত্যুরোগের শয্যাপার্শ্বে জীবন-আরোগ্যের বুঝি এই ডাক তার ! এই দুরন্ত ডাকে সাড়া না দিয়ে উপায় আছে কার ? এই ডাকে যে জেগে ওঠে তামসনিদ্রার লজ্জাকর আরাম থেকে আত্মবিস্মৃত কুম্ভকর্ণ। এই ডাকে যে পঙ্গু দুপায়ে হঠাৎ জেগে ওঠে উত্তুঙ্গ গিরি-অতিক্রমের উদ্দাম উপায়ে : এই ডাকে যে চিরমূক হয় অতীব-মুখর।

তবু কিংকর্তব্যবিমূঢ় তরুণ-অধরে কিছুতেই সাড়া জাগে না ; 'উত্তর দিতে অসমর্থ' হয় সে দিনের আলো মিলিয়ে যাওয়া আকাশের আঁচল দেখা দেওয়া চুমকির দলের একটি নক্ষত্র যদি এসে পড়ত তার হাতের মুঠোয় সে মুহূর্তে তবুও দ্রোণগিরির নিঃসঙ্গ অন্ধকার থেকে তার নাম ধরে উঠে আসা এই ডাকে সে যেমন অবাক হয়েছে এমন হতবাক হয়েছে। চলমান মুহূর্তের দল দাঁড়ায় না ; নদীর জল বয়ে যায় যেমন বয়ে গেছে সেচিরকাল তরতর করে ; অন্ধকার গাঢ় হয়ে আসে অরণ্যে-পর্বতে। বনে বনে গান ওঠে শুধু ; 'ওপারে মুখর হলো কেকা ঐ, এপারে নীরব কেন কুহু হায় ?'

আহ্বানের কেকাধ্বনি যদি বা জাগে, সমর্পণের কুহু তবু কেন প্রতিধ্বনি করে না, কে জানে ? আবার উচ্চারিত হয় আহ্বান। শ্যামাচরণ ? অতল

অন্ধকার থেকে অকূল আলোতে আসে সে ডাক : আকাশে বাতাসে অরণ্যে পর্বতে, তরুণ সেই পূর্ত-কর্মচারীর অন্তরের অন্তস্তল স্পর্শ করে সে আহ্বান : শ্যামাচরণ। তবু চরণ স্থাণুর মতো অচল হয়ে থাকে ; এক পাও এগোয় না। এমন সময় আহ্বানের খেয়া বেয়ে এসে দাঁড়ান স্বয়ং আহ্বানকর্তা। বিস্ময় বিস্ফারিত দুটি তরুণ চোখ তাকিয়ে দেখে সময়ের চেয়ে বয়সে পর্বতের চেয়ে মহিমায়, নদীর চেয়ে স্বচ্ছতায় বড় জটার অরণ্যে আবৃত তবু জ্যোতির্ময়, এক আনন পৃথিবীতে এই প্রথম সুশীতল বারির আধার অচল কূপ নিজে থেকে হেঁটে আসে তৃষ্ণার্তের কাছে।

সন্ন্যাসীর আননে ছড়িয়ে পড়ে প্রসন্নতা হাস্যের দীপ্তি ; শ্যামাচরণ আ গয়া ? হ্যাঁ। নিরুত্তর তরুণ আননে পড়তে পারেন অনায়াসে সময়ের সুবার্তা, তিনি সময়ের চেয়েও যিনি প্রাচীন, হ্যাঁ নদী এসে পড়েছে সিন্ধুমুখে ; রাত্রির তিমির উপস্থিত ঊষার সম্মুখে ; শ্যামাচরণে এসে পড়েছে, রক্তজবা।

তবু ঘোর কাটেনি স্বপ্নাচ্ছন্ন তরুণ চোখে, তাই সন্ন্যাসী অঙ্গুলিনির্দেশে আকর্ষণ করেন। তরুণদৃষ্টি পূর্ত-কর্মচারী শ্যামাচরণ দেখে ; পর্বতগুহার অন্ধকারে ব্যাঘ্রাসন, দণ্ড আর কমণ্ডলু। দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বিস্মৃত অতীতকে আকর্ষণের অভিপ্রায়ে সন্ন্যাসীকণ্ঠে উচ্চারিত হয় ; শ্যামাচরণ, এসবই যে তোমারই গতজন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসঙ্গী,—দেখো তো চিনতে পার কিনা না ? দেখো তো মনে পড়ে কিনা, এইখানে বিগতজীবনে তুমি তপস্যা-নিরত ছিলে !

শ্যামাচরণ ফিরে যেতে চেষ্টা করেন বিগতজীবনের নানা রঙের দিনগুলোতে কিন্তু কিছুতেই পারেন না গত জন্মের অতীতকে কথা কওয়াতে। বার বার ধাক্কা দেন স্মৃতির বন্ধ দ্বারে ; সিংহদ্বার তবু উন্মুক্ত কই ? শ্যামাচরণকে হঠাৎ ছুঁয়ে দেন সন্ন্যাসী। বিবেকানন্দকে যেমন একদিন ছুঁয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। অহল্যার পাষাণে যেমন পদস্পর্শ করেছিলেন শ্রীরাম। তেমনই দ্রোণগিরির জনমানবহীন অন্ধকারে রূপকে স্পর্শ করে অপরূপ মুহূর্তে যা ছিলো বিগত জন্মের বিস্মৃতির শব মাত্র সেখানে জেগে ওঠে একের পর এক পূর্বাপর স্মৃতির উৎসব। মনে পড়ে। হ্যাঁ। মনে পড়ে যায় সব পূর্ত-বিভাগের তরুণ বাঙালী সেই কর্মচারীর। মনে পড়ে, দ্রোণগিরির এই গুহায় বসে ঠিক এর আগের জন্মে অনন্তের আরাধনা শেষ হবার আগেই তার দেহান্ত ঘটে। মনে পড়ে, এই ব্যাঘ্রাসন, এই দণ্ড, এই কমণ্ডলু, এই সবই তার গত জন্মের ফেলে রেখে যাওয়া সাধনসহচর। আর মনে পড়ে, যিনি আজ আহ্বান করে এনেছেন এখানে অতি প্রবীণ অথচ অতি নবীন সন্ন্যাসীই ছিলেন তার গত জন্মের গুরু। মনে পড়া মাত্র বোঝেন এতকাল ধরে এই সব রক্ষা করে তারই অপেক্ষায় বসে ছিলেন বাবাজী মহারাজ। এখন সময় হয়েছে ; অসমাপ্ত আরাধনা সমাপ্ত করবার সুসময় হয়েছে সন্নিকট। তাই জীবন তৃষ্ণার্ত করে

নিজেই পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনতৃষ্ণার ক্ষান্তি মুক্তির জীবন্তকূপ, যাঁর পরিচয়ের পরিমাপ হয় না দেশে কালে, সেই বাবাজী মহারাজ।

নত হলেন শ্যামাচরণ। আর তাঁরই সঙ্গে সন্ন্যাসীর উদ্দেশে প্রণত হলো যেন প্রাচীন অরণ্য-পর্বত।

আমি জানি। আমি জানি। এ কাহিনী পড়তে পড়তেই সংশয়ের ছায়া পড়বে সতর্ক দৃষ্টিতে। তাঁরা বলবেন এ বিশ্বাসের অযোগ্য ; অলীক। যাঁরা অতদূর বলতে চাইবেন না স্বভাবের গুণে, তাঁরাও বলবেন, এ বিশ্বাসের বাইরে ; অলৌকিক। না। এ অভিজ্ঞতা অলীকও নয় ; অলৌকিকও নয়। সেই বিখ্যাত উক্তির পুনরুক্তি করে যাঁরা বলবেন ; দেয়ার আ' মো' থিংগস ইন হেভেন এণ্ড আর্থ, দ্যান আ' এভা' ড্রেমট অফ ইন ইয়া' ফিলসফি, অথবা এ হচ্ছে সেইরকম অভিজ্ঞতা, বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা চলে না, তাদের উদ্দেশে বলি ঃ না ; এ বুদ্ধি, বিদ্যা, অথবা বিশ্বাসের অতীত ব্যাপার নয়। এর চেয়ে লৌকিক এর চেয়ে বাস্তব অভিজ্ঞতা বরং বর্ণনা করা শক্ত।

আমার কথা বিশ্বাস করতে বলি না। বিবেকানন্দর কথা বলি ঃ

'অবিশ্বাস করা অন্যায় ; নিজের বিচারশক্তি ও যুক্তি খাটাইতে হইবে ; কার্যে করিয়া দেখিতে হইবে যে শাস্ত্রে যাহা লিখিত আছে, তাহা সত্য কিনা। জড়-বিজ্ঞান শিখিতে হইলে যেভাবে শিক্ষা কর, ঠিক সেই প্রণালীতেই এই ধর্ম-বিজ্ঞান শিক্ষা করিতে হইবে।' [রাজযোগে]

এবং প্রমাণ দিতে গিয়ে বলছেন ঃ

'উদাহরণ স্বরূপ দেখ কয়েক মাস সাধনের পর দেখিবে যে তুমি অপরের মনোভাব বুঝিতে পারিতেছ, সেগুলি তোমার নিকট ছবির আকারে আসিবে, অতি দূরে কোন শব্দ বা কথাবার্তা হইতেছে, মন একাগ্র করিয়া শুনিতে চেষ্টা করিলেই হয়তো উহা শুনিতে পাইবে। প্রথমে অবশ্য এসকল ব্যাপার অতি অল্প অল্পই দেখিতে পাইবে। কিন্তু তাহাতেই তোমার বিশ্বাস, বল ও আশা বাড়িবে। মনে কর, যেন তুমি নাসিকাগ্রে চিত্তসংযম করিলে, তাহাতে অল্প দিনের মধ্যেই তুমি দিব্য সুগন্ধ আঘ্রাণ করিতে পাইবে ; তাহাতেই তুমি বুঝিতে পারিবে যে, আমাদের মন কখন কখন বস্তুর বাস্তব সংস্পর্শে না আসিয়াও তাহা অনুভব করিতে পারে।' [রাজযোগ]

বিবেকানন্দ বলেছেন বলেই একথা 'সত্য নয়'; সত্য বলেই 'একথা' বিবেকানন্দ বলেছেন।

বিবেকানন্দের কথায় অন্ধবিশ্বাসের প্রয়োজন নেই। আপনার আমার

দৈনন্দিন জীবন থেকেই খুঁজে পাওয়া যাবে হাজার হাজরে দৃষ্টান্ত যা থেকে প্রমাণিত হবে, আমরা যাকে অলৌকিক মনে করি তা আরেকজনের কাছে সম্পূর্ণ লৌকিক। আজকের দিনেও এমন লোক আপনার, আমার সকলেরই জানা, বেঁচে আছেন যাঁরা তাঁদের ছাত্রজীবনে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, হাওড়া থেকে শেয়ালদার কোনও কলেজে দুবেলা হেঁটে এসেছেন পড়তে, এবং পড়া শেষ হলে, বাড়ি ফিরে গেছেন হেঁটে। আগে আমরাও এতদূর হাঁটা নিজেরা কল্পনা না করলেও, অনেকেই একদা পারতেন এবং এখনও কেউ কেউ পারেন। একথা অবিশ্বাস করি না। কিন্তু আমাদের পরের ডিজেনারেশান [জেনারেশান কথাটা ব্যবহার করতে পারলাম না ; ক্ষমা করবেন। আমরা যারা বাঙালী তাদের আগে 'জেনারেশান' হতো ; এখন 'ডি-জেনারেশান', হচ্ছে।] যখন পাশের বাড়ি যেতে অথবা নিজের বাড়ির এঘর ওঘর করতেও পায়ের বদলে যান্ত্রিক উপায়ে কাজ সারবে তখন হেঁটে ভবানীপুর থেকে প্রেসিডেন্সী কলেজ, অথবা হাওড়া থেকে রোজ শেয়ালদার কলেজে যাওয়া-আসার বিবরণ শুনলে কি বলবে না যে সে-বৃত্তান্ত হয় অলীক নয় অলৌকিক ?

বলবে কিনা আপনারাই বলুন ?

এ প্রশ্ন অথবা সন্দেহ যাদের মনে জাগবে না তাদের মনে আরেকটি জিজ্ঞাসা মাছের মতো মাঝে মাঝেই মাথা তুলতে পারে। সেটি হচ্ছে,—কাশীর কথা বলতে বসে শ্যামাচরণের কথা কেন ? এ সন্দেহের ফণা যদি কেউ তোলে তাহলে আমার এ ছাড়া যে উত্তর নেই তা হলো ঃ বার্ধক্যে বারাণসী, এহেন ব্যক্তি যদি কেউ থাকে, তার জন্য বিরচিত নয় ; অর্থাৎ এর জন্য সেই স্ত্রী বা পুরুষের 'কাপ অফ টি' নয় কিছুতেই। কাশী মানে আমার কাছে কেবল কয়েকটি ঘাট, অসংখ্য মন্দির নয়। এই ঘাটে, এই মন্দিরে যাঁরা দেহকে করেছিলেন দেহাতীতে দেউল, তাঁদের আবির্ভাব ছাড়া কাশীর সব হতো শব মাত্র ; তাঁরা এসেছিলেন বলেই কাশী হতে পেরেছে বিশ্বের, বিশ্বনাথের আবির্ভাব উৎসব। এঁদের জীবনেই জ্যান্ত হয়েছেন তিনি ; মাটি থেকে হয়েছেন 'মা'-টি। আরোও একটি কারণে এঁদের কথা বলি। আমার কাছে নেপোলিঁও অথবা নেহেরু কেউই কর্মী নয় ; আমার কাছে কর্মী মানে রবীন্দ্রনাথ ; কবি মানে রামকৃষ্ণ।

নেপোলিঁও সম্পর্কে অতিকথার মাহাত্ম্য চালু হয়েছে যে তিনি মাত্র চার ঘণ্টা ঘুমোতেন ; তাও ঘোড়ার পিঠে। এই শুনে নেপোলিঁও সম্পর্কে শ্রদ্ধা জানাতে যাদের চোখে ঘুম নেই, আমি তাদের একজন নই। ওই মহাশয় ভদ্রলোক যদি আর কয়েক ঘণ্টা বেশী ঘুমোতেন ; ঘোড়ার পিঠে নয়,—শয্যার বুকে তাহলে এমন কিছু ক্ষতি হতো কার ? তা না করে, 'রণং দেহি'-র স্বপ্নে

চোখের ঘুম উবে যাওয়ায় মস্কোর পথে কয়েক হাজার লোককে তুষার-সমাধি দেবার প্রচেষ্টায় তিনি যা করে গেছেন তার ক্ষতিপূরণ সম্ভবত আজও হয়নি।

আর এই স্বাধীন ভারতের Jobহরলাল। পলাশীর প্রান্তরে অস্তমিত ভারতের দিবাকরকে মণিপুরের প্রান্তে আবার উদিত করবার জন্যে উদ্যত নেতাজী ভারতে পদার্পণ করলে 'ঢাল নেই তলোয়ার নেই', এই নিধিরাম সর্দার লাঠি নিয়ে না লড়া পর্যন্ত এঁর ঘুম ছিল না। আজ বেরুবাড়ি পাকিস্তানের হাতে তুলে না দেওয়া পর্যন্ত এঁর ঘুম নেই। ইনি সব সময়ই কাজ করেন; কারণ আরাম হারাম হলে সব সময় কাজ-কাজ,—কামের এই ব্যারাম তবে 'হারামজাদা' হায়!

কর্মী হচ্ছেন কেবল তাঁরাই যাঁরা জীবনকর্মী। যেমন শ্যামাচরণ লাহিড়ী।

রবীন্দ্রনাথকে যেমন বর্ষার কবি, উপনিষদের কবি, ইত্যাদি নানারকম নামে লেবেলায়িত করার হাস্যকর চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ জন্মাবার শতবর্ষ পরেও বন্ধ হবার নয় তেমনই জীবনকর্মীকে হঠযোগী, রাজযোগী, কর্মযোগী, ইত্যাদি ভূষণে ঘোষণা করবার প্রবৃত্তি নিবৃত্ত হবার নয়। কিন্তু এঁদের যোগ, সে হঠ, রাজ, কর্ম অথবা ভক্তি যাই হোক এঁদের যোগ সেই; 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো, সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো'—বিশ্বযোগ, বিস্ময়যোগ ছাড়া কিছু নয়। জাগরণে এবং নিদ্রায় এঁদেরই কেবল বিশ্রাম নেই। মানুষকে নিরন্তর 'মান' এবং 'হুঁস' দেবার যোগ চলছে এঁদের; মানবত্বকে বিশ্বমানবত্বে উত্তীর্ণ করবার উদ্‌যোগ।

মহাভারতের গাণ্ডীবে ছিলো শর; স্বাধীন ভারতে মাইকে কেবল কণ্ঠস্বর। এরা বিয়োগ করে বেশী; যোগ করে কম। এরা অকাজ করে বেশী; কাজ করেন কেবল তিনিই,—যাঁর শর এবং স্বর,—সবই ঈশ্বর। কারণ শ্রীমদ্ভাগবত গীতা স্পষ্টতই বলেছেন ঈশ্বর-বিস্মৃত ভালো কাজ মন্দ ছাড়া কিছু করে না!

সংসার ত্যাগ করে ঈশ্বর খুঁজতে বেরোয় যারা তারা ঈশ্বরকে পায় না অনেকেই; খুঁজে পায়,—কেবল সার দেবার নাম করে ছাই মেখে সং সেজে গৃহস্থকে অভয় দেবার পরিবর্তে ভয় দেখিয়ে কিছু বাগাবার উপায়। শ্যামাচরণ লাহিড়ী সংসারে থেকেই খুঁজে পেয়েছিলেন সার। কাশীতে যেতে হয়নি এমন যোগী ভারতে আসেননি প্রায়ই। কিন্তু তাঁদের সকলের 'ভাব' কাশীশ্বরের সঙ্গে হলেও, তাঁদের সকলের আবির্ভাব কাশীতে নয়। কিন্তু শ্যামাচরণের দৈহিক আবির্ভাবও কাশীতে; জীবনের অনেকটাই—বারো মাস বাসও কাশীতে; এবং কাশীতেই একদা ঘটেছিলো তাঁর তিরোভাব।

তাই কাশীর সঙ্গে সব চেয়ে নিবিড় যোগ 'ক্রিয়াযোগ'-এর কবি শ্যামাচরণের।

কুরু এবং পাণ্ডব-গুরু দ্রোণ ফিরিয়ে দিয়েছিলেন একলব্যকে তার বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গুরুদক্ষিণা হিসেবে নিয়ে,—মহাবীর অর্জুনকে কণ্টকমুক্ত করবার কারণে। দ্রোণগিরির নির্জন অন্ধকারে শ্যামাচরণের গুরু কিন্তু অপেক্ষা করেছিলেন জন্মান্তর পর্যন্ত। শ্যামাচরণকে একলব্য করবেন বলে নয়; তাঁকে একলভ্য করবেন বলে। সেই এক যিনি লভ্য হলে সব লোকসান হয়ে দাঁড়ায়; বাসনার শব দাহ হয়ে জেগে ওঠে শবাসনার উৎসব।

বাবাজী মহারাজ যখন শ্যামাচরণের বিগতজন্মের সাধনসঙ্গী দণ্ড, কমণ্ডলু ইত্যাদি আগলে অপেক্ষা করছিলেন দ্রোণগিরির নিঃসঙ্গ পর্বতকন্দরে, তখন শ্যামাচরণের থাকার কথা পাঁচশো মাইলেরও বেশী দূরে। কারণ শ্যামাচরণের কর্মস্থল দানাপুর থেকে তিনি বদলী হয়ে আসেন রাণীক্ষেত এবং রাণীক্ষেত থেকে কয়েক মাইল দূর দ্রোণগিরিতে আসা এই 'বদলীর' অর্ডার না হলে যা অসম্ভব হতো, বাবাজী মহারাজের ইচ্ছাশক্তিতেই সম্ভব হয়েছে। নাহলে শ্যামাচরণের পরিবর্তে আসলে সে-সময়ে আসার কথা ছিলো আরেক জনের এবং দ্রোণগিরিতে শ্যামাচরণের দীক্ষা সমাপ্ত হওয়া মাত্রই আবার তাঁর কর্মস্থলে যে শ্যামাচরণকে ফিরে যেতেই হবে তা বাবাজী মহারাজের বলে দিতে দেরি হয়নি।

কয়েক দিনের মধ্যে দীক্ষিত শ্যামাচরণকে ফিরে আসতে হয় তাঁর কর্মস্থল দানাপুরে।

কর্মস্থলে শ্যামাচরণের কর্তা বড়সাহেব শ্যামাচরণকে ডাকতেন 'চিদানন্দ বাবু' বলে। এই নামে ডাকবার কারণ শ্যামাচরণের মধ্যে আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাব বিদেশী এবং অন্যধর্মী বড়সাহেবের চোখ এড়ায়নি। তাঁর অধীনে সাধারণ কর্মে নিযুক্ত শ্যামাচরণ যে কত অসাধারণ, তার পরিচয়ও শ্যামাচরণ দীক্ষিত হয়ে ফেরার কয়েক দিনের মধ্যেই পেলেন। সে ঘটনা স্বর্ণাক্ষরে লিখবার মতো। কিন্তু সেই ঘটনার আগেই শ্যামাচরণ যে এ জগতের কর্মী হয়েও আরেক জগতের 'কবি' তা অনুভব করতে সাহেবের ভুল হয়নি। শ্যামাচরণকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন।

এবারে যোগী শ্যামাচরণের সঙ্গে পাঠকের বর্ণপরিচয় করানোর কারণে স্বর্ণাক্ষরে লিখে রাখার মতো ঘটনাটি উল্লেখ করি। দানাপুরে যোগী মহারাজের কর্মস্থানের অধিকর্তা সাদা-চামড়া বড়সাহেব একদিন বিষণ্ণচিত্তে বসে আছেন তাঁর ঘরে। সাহেবের স্ত্রী বিলাতে গুরুতর পীড়িত, তাঁর কোনও খবর না পেয়ে দানাপুরে শ্যামাচরণের বড়সাহেব বড় উদ্বিগ্ন। শ্যামাচরণ লাহিড়ী সাহেবকে আশ্বাস দিলেন মেমসাহেবের খবর তিনি এনে দিচ্ছেন একটু বাদেই। সাহেব মুখে কিছু বললেন না বটে, কিন্তু মনে মনে নিশ্চয়ই হাসলেন। লাহিড়ী বাবুকে তিনি 'চিদানন্দ বাবু' বলেন, লাহিড়ীবাবুকে তাঁর আত্মসমাহিত একটি অনন্যভাবের জন্যে শ্রদ্ধা করেন। একথাও ঠিক। এমনকি ভারতীয় কেউ কেউ 'অলৌকিক' কিছু-কিছু শক্তির অধিকারী,—এও ঠিক। তবু শ্যামাচরণ লাহিড়ী

নিশ্চয়ই কিছু তাঁদের একজন নয়, যে বলতে পারে হাজার-হাজার মাইল দূরের একজনের অসুখের অবস্থার সঠিক বিবরণ। মনে মনে আস্থা স্থাপন করতে না পারলেও মুখে অনাস্থার ভাব প্রকাশ করলেন না বড়সাহেব।

অফিসের মধ্যে একটি নির্জন প্রকোষ্ঠে সদ্যদীক্ষিত শ্যামাচরণ তাঁর গুরু বাবাজী মহারাজকে স্মরণ করলেন। ধ্যানভঙ্গের পর সাহেবকে বললেন: ভয় নেই; মেমসাহেব সুস্থ হয়ে উঠে শীগ্‌গির চিঠি দিচ্ছেন সাহেবকে।' মাত্র এইটুকু বলবার জন্যে ক্রিয়াবান-কবি শ্যামাচরণ শরণ নেননি অনাদিপুরুষ তাঁর গুরু বাবাজী মহারাজের। মেমসাহেব যে ভাষায় চিঠি দিচ্ছেন সেই অদৃষ্টপূর্ব পত্রের প্রতিটি অক্ষর, প্রতিটি কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপ পর্যন্ত অবিকল আবৃত্তি করে গেলেন সাহেবের কাছে।

কয়েক দিন পর, সাহেব সেই 'চিঠি' পেয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও বিস্মায়াপন্ন তো হলেন; কিন্তু বিস্ময় হবার পরও, অশেষ বিস্ময়ের কিছু বাকী ছিল তখনও।

কয়েক দিন বাদে মেমসাহেব নিজেই এলেন দানাপুরে সাহেবের সঙ্গে মিলিত হতে। সাহেব একদিন মেমসাহেবকে নিয়ে এলেন সটান অফিসের মধ্যেই, সকলের সঙ্গে তাঁদের boss-এর যিনি বস,—তাঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে। শ্যামাচরণের কাছে এসে থেমে গেলেন মেমসাহেব। বলে উঠলেন: 'বিলাতে আমার অসুখের সময়ে এঁকেই আমি একদিন আমার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াতে দেখেছিলাম।' এরপর আর মেলাবার প্রয়োজন ছিল না; তবু দেখা গেল হিসেব করে ঠিক যে তারিখে যে সময়ে শ্যামাচরণ ধ্যানে খবর এনে দেবার জন্যে গুরুর শরণ নিয়েছিলেন, ঠিক সেই সময়ের সেই তারিখের কথাই বলছেন মেমসাহেব।

মেমসাহেবের বিস্ময়বিস্ফারিত দৃষ্টির প্রত্যুত্তরে শ্যামাচরণ শুধু হাসেন।

এ হাসি কেবল বহুবিজ্ঞাপিত দাঁতের মাজনের কল্যাণে মুক্তোর মতো দাঁতে হাসা যায় না। এ হাসি হাসতে পারেন,—আত্মার পরমাশ্চর্য আলো এসে পড়ায় হেসে উঠে দলের পর দল মেলে যাঁর জীবন-শতদল,—শুধু তিনি-ই!

দানাপুরে এসে পেঁাছবার আগেই, দ্রোণগিরিতে দীক্ষার পর, মোরাদাবাদে শ্যামাচরণ আরেকটি আমাদের অনভ্যস্ত ও অবিশ্বাসীর দৃষ্টিকোণ থেকে অলৌকিক ঘটনা ঘটান। মোরাদাবাদে যে-বাড়িতে তিনি দু-একদিন থাকবার জন্যে ওঠেন, সে-বাড়িতেই একদিন কয়েকজন মন্তব্য করলেন যে আজকের ভারতে সত্যিকারের সাধু একজনও নেই। বাবাজী মহারাজের কাছে দিব্যজীবনের পাবকবাণীর স্পর্শে প্রদীপ্ত প্রাণের শিখা শ্যামাচরণ প্রতিবাদ না করে পারলেন না। তিনি রাণীক্ষেতে বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সেই পরমাশ্চর্য সাক্ষাতের এবং দীক্ষার চরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতার জীবন্ত বর্ণনা দিলেন। তবুও অবিশ্বাসীদের পাষাণে বিশ্বাসের প্রাণসঞ্চার হলো না। শ্যামাচরণ লাহিড়ী অতঃপর ভারতীয়

যোগাভ্যাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে প্রস্তুত হলেন। বললেন, স্মরণ করা মাত্র তাঁর গুরু বাবাজী মহারাজ এখন সশরীরে উপস্থিত হবেন মুহূর্তের মধ্যে।

শ্যামাচরণকে বাবাজী কথা দিয়েছিলেন তেমন প্রয়োজন হলে শ্যামাচরণ স্মরণ করামাত্র তাঁর দীক্ষাগুরু তাঁকে দেখা দেবেন। বন্ধ ঘরের মধ্যে মাটিতে আসীন শ্যামাচরণের আহ্বানে মর্ত্যশরীরে আবির্ভূত হলেন দ্রোণগিরির অমর্ত্য-আভা স্বয়ং বাবাজী মহারাজ। কয়েকজনের সখের কৌতূহল মেটাবার কারণে গুরুকে আহ্বান করায় শ্যামাচরণের ওপর বাবাজী খুশী হতে পারলেন না; তবে দেখা না দিয়ে তাঁর উপায় ছিল কই? তিনি যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ।

অবিশ্বাসীর দলের প্রত্যেকের প্রতি রোমকূপে রোমাঞ্চের শিহরন; শ্যামাচরণ যে ঘরে বসে ডেকেছিলেন দ্রোণগিরির গুরুকে সেই বন্ধ ঘরের দরজা খুলে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সাধুদের সততায় সন্দিহানদের মনের দরজাও খুলে গেল। সন্দেহের অন্ধকারে এসে পড়ল সত্যের অরুণালোক। সবাই একে একে শুধু দেখে গেল যে তাই নয়; স্পর্শ করে গেল দর্শন-স্পর্শনের অতীত যোগী মহারাজ শ্যামাচরণের গুরু বাবাজী মহারাজকে।

অন্তর্ধান করবার আগে শ্যামাচরণের কাছে এবারে তাঁর গুরু তাঁকে আর স্মরণ করতে বারণ করে বলে গেলেন, প্রয়োজন হলে বাবাজী মহারাজ অতঃপর নিজেই উদয় হবেন।

এবং এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই সে প্রয়োজন হলো।

লাহিড়ী মশায় সেদিন দৈনন্দিন ভ্রমণে বহির্গত হয়ে দেখলেন, পথের ধারে গঞ্জিকাপানোন্মত্ত এক সাধু। দেখে তাঁর মন ধিক্কারে ভরে গেল। এই ধরনের সাধুদের এই অসাধু আচরণই যে প্রকৃত সাধুকেও সাধারণের চোখে অসাধু প্রতিপন্ন করে তা উপলব্ধি করে এদের প্রতি বিরাগ আরও বৃদ্ধি পেল। চলে যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন শ্যামাচরণ। যেতে পারলেন না আর। যা দেখলেন তা তাঁর বুদ্ধির অগোচর। মনে হলো দুঃস্বপ্ন দেখছেন। চোখ মুছে দু'হাতে আবার দেখলেন। না। ঠিকই দেখছেন তিনি; ভুল নয়। সেই গেঁজেল সাধুর পাশে বসে শ্যামাচরণের গুরু স্বয়ং বাবাজী মহারাজ তার লোটাটা দু'হাতে মেজে ঝকঝকে করে তুলছেন।

সর্বজীবে যিনি জীবনদেবতার ছায়া দেখতে পান তিনিই যোগী,—শ্যামাচরণ তাঁর গুরুর কাছে এই শিক্ষাই পেলেন।

এই শিক্ষার মধ্যে আমাদের মধ্যে আরেকটি শিক্ষা অনুক্ত আছে। এখন তার কথা বলি। আমরা যাদের ভণ্ডতপস্বী বলি সত্যিকারের তপস্বী তাকেও ঘৃণা করেন না। গীতা যেমন বলেছেন যে আমাদের বিচারে যেগুলি সৎকর্ম সেগুলি ঈশ্বর-বিস্মৃত হয়ে করলে যেমন অসৎ কর্ম ছাড়া আর কিছু নয় তেমনই মহাজ্ঞানী মহাজনেরা বলে গেছেন ধর্মের ভান করাও শেষ পর্যন্ত 'ধর্ম' করায়। ভণ্ড-তপস্বীর জীবনেও ভান করতে করতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায় যার সব কখনও কখনও।

হংস-মধ্যে সে ছিলো একদিন 'বক-ধার্মিক' ; আরেক দিন বকো মধ্যে সে হয়ে দাঁড়াতে পারে হংস,—একথা বলেছেন একটি সুন্দর গল্পে—সিদ্ধ-জীবন স্বয়ং বামাক্ষ্যাপা।

শ্যামাচরণকে যেমন একদিন মোরাদাবাদে কয়েকজন দম্ভ করে বলেছিল, আজকালকার সাধু মাত্রই ছাই-মাখা ভণ্ড, আসলে অসাধু ; —বামা ক্ষ্যাপাকেও একদিন কয়েকজন ঠিক অনুরূপ ভাষা ও তাচ্ছিল্যের ভঙ্গীতে বলতে চেয়েছিলেন, সাধুর ছদ্মবেশে অসাধুরাই কলিযুগের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বামা ক্ষ্যাপা বললেন : না। তবে শোন—

রাজার বাড়িতে শৌচাগার পরিষ্কার করতে গেলে এক মেথরের চোখে পড়ে যায় রাণীর অপরূপ রূপ। মেথরের মুখে বাসনার ছায়া পড়েছে দেখে বিচলিত হয় তার স্ত্রী,—সতীসাধ্বী এক মেথরাণী। মেথরের মুখে সে কেবল শুনতে পায় একটি কথা : এমন স্ত্রী, ভাগ্য না হলে হয় না। স্বামীর জন্যে পারে না এমন কাজ মেথরাণীর জানা ছিলো না। দুরন্ত সাহসের দু'পাখায় ভর করে সে রাণীর কাছে আবেদন করে ভুবনমনোমোহিনীরূপে একবার নির্জনে তার স্বামীকে সাক্ষাৎকার দানে স্বীকৃত হতে। বামনের চাঁদে হাত বাড়ানোর স্পর্ধায় রাণী না রেগে বরং অসীম উদারতায় বলেন : তথাস্তু ; কিন্তু তোমার স্বামীকে বলো, রাজবাড়িতে সাধুর ছদ্মবেশে এসে বসতে ; নাহলে রাণী হয়ে কি বলে তোমার স্বামীর কাছে আমি যেতে পারি ? মেথরাণীর মুখে রাণীর প্রস্তাব শুনে রাতের ঘুম ছুটে যায় মেথরের। সকাল না হতেই সাধুর ছদ্মবেশে মেথর গিয়ে বসে রাজবাড়ির সামনে। নবীন সন্ন্যাসীর সংবাদ রটে যায় মুহূর্তের মধ্যে। রাজধানীর লোক ভেঙে পড়ে মেথরের পায়ে। গভীর নিশীথে বন্ধ্যা রাণী রাজার অনুমতি নিয়ে দেখা করতে এলেন মেথরের সঙ্গে,—সন্তানের জন্যে বর প্রার্থনার অছিলায়। মেথর বসে আছে নির্জন রাত্রির নিঃসঙ্গতায়। রাণী এসে দাঁড়ালেন। দু'চোখে দুরন্ত কটাক্ষ। দু'গালে হাসলেই টোল খাচ্ছে। ঠোঁটের ওপর বাঁদিকে ছোট্ট তিল,—সে তিলের জন্যে সমরকন্দ দিতে চেয়েছে কবিরা যুগে যুগে। ভুবনমোহিনী সেই রূপ নিজে থেকে এসে দাঁড়িয়েছে কামনার জাগ্রত শিখার সবুজ পোকাকে ঝাঁপ দিয়ে মরবার জন্যে আমন্ত্রণ জানাতে।

কিন্তু মেথর তখন আর সাধুর ছদ্মবেশ পরে নেই শুধু ; সাধুরও ওপরে চলে গেছে সে। রূপ থেকে অপরূপে উত্তীর্ণ এখন তার কাম 'না' হয়ে গিয়ে জেগেছে অন্য কামনা। রত্নাকর দস্যুর মধ্যে আবির্ভূত হয়েছে সমস্ত কাব্যের শ্রেষ্ঠ রত্নের আকার রামায়ণকার আদিকবি বাল্মীকি।

রাণীকে একান্তে পেয়েও, নারীকে পেয়ে নির্জনে, ভণ্ড সন্ন্যাসীর তবু চঞ্চল হয় না তার মন। তার মনে হয় সাধুর ভান করতেই যখন আহ্বান না করতেই আসে সবাই, আসে স্বয়ং রাণী, তখন না জানি সত্যিকারের সাধু হলে হয়তো এসে দাঁড়াবেন স্বয়ং ভুবনেশ্বরী ; এই জগতের যিনি রাজরাণী !

এ গল্প রাস্তায় শুধু পাথর ঘেঁটে বেড়ায় যে ক্ষ্যাপা, তার নয় ; পাথর ঘাঁটতে ঘাঁটতে যে পেয়ে গেছে পরশপাথর,—এ কাহিনী কেবল তাঁর মুখেই মানায় ; যিনি কেবল ক্ষ্যাপা নন ; যিনি স্বয়ং বামা ক্ষ্যাপা।

বামা ক্ষ্যাপার এই গল্পকে যিনি শিষ্যের জীবনে জীবন্ত করে তুলেছেন একদা তিনি স্মরণের অতীত, অতি সুদূরের রাম অথবা কৃষ্ণ নন ; তিনি আমোদের অত্যন্ত আপনার ঘরের লোক, শ্রীরামকৃষ্ণ। মাতাল শিষ্যর বিরুদ্ধে অভিযোগে কান ঝালাপালা হবার উপক্রম হলে রামকৃষ্ণ একদিন শিষ্যকে ডেকে বলেন : মদ খাস কেন ? আমোদের জন্যে তো ? তাহলে মদে যে বিষ আছে সেটা আমাদের ব্যাঘাত করে যখন, তখন বিষটুকু 'মা'-কে নিবেদন করে দিয়ে শুধু সুধাটুকু নিজে নে না রে !

শিষ্যের গুরুবাক্যে আস্থা অসীম। রোজ পুজোয় বসেই মা-কে বলেন : এই সুরার সব বিষটুকু শুষে নিয়ে আমাকে শুধু সুধাটুকু পান করতে দাও। কয়েকদিন পর পর মাকে এইভাবে ভোগ দেবার পর হঠাৎ মনে হয়, একি ? যাকে 'মা' বলি, বিশ্বাস করি মাটি নয়, আসলে আমার 'মা'-টিই বলে,—তার মুখে ছেলে হয়ে বিষ তুলে দিই কি করে ? সুরাপান ত্যাগ করে মাতাল শিষ্য মাতৃনামের সুরাপানে উন্মত্ত হয় পরমুহূর্তে !

॥ সাত ॥

'ইয়ে' মল্লিকের চিঠি নিয়ে গিয়েছিলাম কাশীতে হোটেলে জায়গা পাবার ব্যাপারে সুনিশ্চিত হবার কারণে : আগে বলেছি। চিঠি নিয়ে গিয়ে ভালোই করেছিলাম। পুজো পেরিয়ে গেলেও পুজোর ছুটি তখনও অনেকেরই পেরোয়নি। তাদের ছুটোছুটি অব্যাহত তখনও ; দু'দিন কাশী ; দু'দিন লখনউ ; কয়েক দিন হরিদ্বার হয়ে তবে কলকাতায় ফিরবে বেশীর ভাগ। কাশীর গ্র্যাণ্ড হোটেল যেটি সেটি তখন রবিঠাকুরের সোনার তরীর মতো বলতে চায় কেবলই : ঠাঁই নাই ; ঠাঁই নাই। ইয়ে মল্লিকের চিঠিতে যার নামে চিঠি তার নামই ভুল হওয়ায় শেষ পর্যন্ত শাপে বর হলো। হোটেলের রকে হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা যে ভদ্রলোকের সঙ্গে ইয়ে মল্লিকের ভুল-নাম দেবার কল্যাণে আলাপ তাঁর রেকমেণ্ডশানে অনেক বেশী কাজ হবার কথা যে হোটেলে জায়গা পাবার পর তা জেনেছিলাম ; ভদ্রলোক হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা এবং অন্যতম অংশীদার। সে সময়ে ঝগড়া চলেছিলো হোটেলের অবাঙালী অংশীদারের সঙ্গে। নিজের পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে চলে যেতে চাইছিলেন ভদ্রলোক। অবাঙালী অংশীদার গায়ে হাত বুলিয়ে মাঝে মাঝে থোক টাকা হাতে তুলে দিয়ে যাবার পথ আগলে

দাঁড়িয়েছিলেন। অন্তরে অপার করুণা বাঙালীর প্রতি একজন অবাঙালীরও আজ ভারতবর্ষে আছে এমন দুর্নাম অবাঙালী যাদেরকে তাদের পরম শত্রু মনে করে সেই বাঙালীও দিতে পারেন না। আসল কথা বাঙালী ভদ্রলোক চলে গেলে কাশীর গ্র্যান্ড হোটেল গ্র্যান্ড সেল-এ উঠবে। তাই সময় কাটাচ্ছিলেন অবাঙালী মহাপ্রভু। প্রথমে গায়ে হাত বুলিয়ে আরও কয়েকটা দিন কাটাতে পারলে পরে মাথায় হাত বুলিয়ে নামে মাত্র টাকায় হোটেলের অংশ বাগিয়ে নিয়ে বাঙালীকে বার করে দিলে, বাঙালীরা ততদিনে যে ভুলে যাবে যে, এ হোটেল একদিন বাঙালীর ছিলো এবং এখন অবাঙালীর, এ ধারণা আসাম এবং বেরু-বাড়ির পরও অনেক বাঙালীর কাছে নতুন শোনালেও, বাঙালী চরিত্র সম্পর্কে এই অবাঙালীয় সে স্পেকুলেশন অনেক দিনের এবং প্রায় অব্যর্থ রকমের কারেক্ট স্পেকুলেশন।

বাঙালী সেই ভদ্রলোকের আসল নাম কিন্তু কাশীর অনেকেই হয়তো আজও জানে না। ভদ্রলোক কাশীর আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার বড়বাবু। এই ডাকনামেই তাঁর নামডাক। বড়বাবু,—এই এক নামের মহিমা এমন সারা কাশী জুড়ে যে একডাকে সাড়া না দেবে এমন অবাঙালী একজনও নেই ; এমন বাঙালীও এক-আধজনের বেশী নয়। বড়বাবুকে প্রথম যেদিন দেখি সেইদিন কেন জানিনে ছবির হেমিংওয়ে বলে মনে হয়েছিলো অবিকল। খোঁচা-খোঁচা দাড়ি সজারুকণ্টকে আবৃত আননের মধ্যে বাঘের মতো জ্বল-জ্বলে দুটো দারুণ বড় চোখে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের ছায়া। নিদারুণ ভিরাইল সে তা একনজরেই চেনা যায় যার নজর আছে তার কাছে তো বটেই ; যার নজর নেই তার কাছেও হয়তো। লম্বা চওড়া, অতিপুরুষ বড়বাবুর বুকের ছাতি তার দুর্জয় মনের প্রতীক। চোখে নেশার রক্তিম ছটা কখনও ছাড়ে না। মুখে মুহুর্মুহু গাঁজার টান সিগারেটের অনির্বাণ কলকেয়। সুখটানের সঙ্গে ভক ক'রে ধোঁয়াছাড়ার বহর মেল ট্রেনের নিশ্বাস-উদ্‌গিরণের মতোই। আশপাশ কিছুক্ষণের জন্যে কালোয় কালো। হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা প্রায় সময়ই। ওপর গায়ে ফতুয়া সম্বল। তার ফোকর দিয়ে লোমের ঘন বন থেকে আলোয় গাছপালার উঠে দাঁড়াবার। কণ্ঠস্বর গনগনে হৃদয়ের উত্তাপে গমগমে ; চড়া পর্দার ভাবে। এক কথায় আজকের পরিভাষায় সভ্য মানুষ নয় অর্থাৎ তাদের একজন নয় যারা যা বলে তা বিশ্বাস করে না বলে এবং যা বিশ্বাস করে তা বলে না বলেই কেবলমাত্র সভ্য।

বুনো, জংলী এই বড়বাবু কাশীতে প্রথম এনেছেন সাইকেল-রিকশা যার সংখ্যা এখন কাশীতে মানুষের সংখ্যার চেয়ে অনেক বেশী। কাশীতে মধ্যবিত্ত মানুষদের আহার ও বাসস্থানের সুলভ ব্যবস্থার মূলেও বড়বাবু। কাশীর যেটিকে 'গ্র্যান্ড হোটেল' বলছি সেটির খাবারের ব্যাপার তদারক করতেন ব্যক্তিগতভাবে এই বড়বাবুই। এখন আর করেন না ; যেদিন করতেন সেদিনকার সুনাম-এর বেগ

কমে এলেও, গতি এখনও থামেনি। তারই জোরে যে হোটেলে উঠলাম তার চাকা আজও চলছে; কিন্তু যে চালালো এই চাকা সে আজ চাকার নীচে ভাগ্যচক্রের আবর্তনে। তার জন্যে কোন বাঙালীর কাশীতে এতটুকু মাথাব্যথা আছে মনে করলে বর্তমান বাঙালী চরিত্রের পরিচয় ভুলে যেতে হয়। বিশ্বপ্রেমে অধুনা উদ্দীপিত বঙ্গসন্তান মানুষ হতে গিয়ে আড়াই কোটিতে ঠেকেছে। অবিলম্বে মানুষ হবার বদলে আবার বাঙালী হবার দিকে মন না দিলে কেবল বেরুবাড়ি থেকে নয়, সব বাড়ি থেকেই তাকে বেরুতে হবে। যে উপায়ে পূর্ববঙ্গ পাকিস্তানে পরিণত সেই একই অপূর্ব উপায়ে পশ্চিমবঙ্গেরও আর কোনও অস্থান-কুস্থান হতে দেরি হবে না কিন্তু। উদ্বাস্তুদের যারা বাঙাল বলে ঘেন্না করছে বাঙালী জ্ঞান করতে পারছে না আজও তারা জানে না যে শরীর থেকে হাত বাদ গেলে বেহাত হলে কেবল হাতের নয় শরীরের ক্ষতি! পশ্চিমবঙ্গের তালপুকুরে এই হতভাগ্যের ঘটি ডুবতে দেরি নেই আর। আসামে যার বর্ণপরিচয় হয়নি, বেরুবাড়িতে তার বোধোদয় হবে এমন আশার মর্মান্তিক তামাশায় আর যেই উদ্যত হোক, আমি হইনে। হইনে তার কারণ আমি রবীন্দ্রনাথ নই। রবীন্দ্রনাথ হলে বলতে পারতাম: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। রবীন্দ্রনাথ নই বলে বলি; 'বন'-মানুষের প্রতি বিশ্বাস রাখা অনেক বড় পাপ।

এ-হেন বড়বাবুকে হোটেলে একদিন বলেছিলাম: ইনসাইড কাশীর রিয়াল চেহারা দেখতে চাই। বলেই মাথার চুল ছিঁড়েছিলাম; কেন বলতে গেলাম। তখন রাত দশটা; কিন্তু 'হোটেল কলকাতা'র বাঙালীতে যতটা সম্ভব তার চেয়েও বেশী গমগম করছে। বড়বাবু হাঁক পাড়লেন: রহমৎ? রহমৎ আসবার আগেই আমাকে জিজ্ঞেস করলেন; আপনার কত নম্বর ঘর? সাতাশ তো? আমাকে হাঁ, না, বলবার ফুরসত না দিয়েই সদ্য আগত রহমৎকে বলেন বড়বাবু আজ হোটেলকে শুনিয়ে; রহমৎ, সাতাশ নম্বরকা সাহাব একঠো মেয়েমানুষ মাঙতা। হোটেল-সুদ্ধ লোক দেখি বারান্দায় হাজির মুহূর্তে। এই এক মজা দেখছি; কাশী টু ক্যালকাটা—সর্বত্র। সব চেয়ে জনশূন্য, সব চেয়ে নির্জন পৃথিবীতে, একজন পুরুষের সঙ্গে যেই একজন মহিলার দেখা সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা দ্বিগুণিত। রাতের যে অন্ধকার গড়ের মাঠে একা বসতে ভয়ে কাঁপে সব চেয়ে দুঃসাহসী বুক—সেখানেও একজন 'খোঁপা' কি 'বিনুনী' গিয়ে বসুক একজন 'ধুতি' কি 'ট্রাউজার'-এর পাশে, আশে-পাশে দেখতে দেখতে গজিয়ে উঠবে ভুঁইফোঁড়ের দল। ছারপোকার মতো; মশার মতো; রাণীকে দেখতে কেরাণীর পঙ্গপালের মতো এরা কোথা থেকে বেরোয় এবং কোথায় প্রস্থান করে কে বলবে।

বারান্দার মঞ্চে উপস্থিত সেক্স-স্টার্ভডরা প্রস্থান করলে ; হেসে বিদায় নিলে রহমৎ,—বড়বাবুকে সবিনয়ে বলি ; মেয়েমানুষ নয় ; মানুষ দেখতে এসেছি কাশীতে। একজন সাচ্চা মানুষ মেয়েমানুষ, কলকাতা টু কাশী এক, যে মেয়েমানুষের বাসা আপনি বলছেন ; তার জন্যে কাশী আসার মতো বয়স বা পয়সা কোনটারই প্রাচুর্য নেই আমার। আমাকে কাশীতে এমন একজন মানুষ দেখাতে পারেন, যাঁর জন্যে কাশীতে মরা নয়—বাঁচার মানে হয়—

'পারি' ; নির্বিধান্বিত উত্তর আসে বড়বাবুর মুখ থেকে ; কাল সকাল দশটায় এসে আমার ঘরে টোকা দেবেন। নিয়ে যাবো। কাশীতে তেমন মানুষ একজনই আছেন। এখনও পর্যন্ত আছেন বটে ; তবে আর কতদিন আছেন কে জানে !

কার উদ্দেশে যুক্তকর উঠে যায় প্রণামের ভঙ্গীতে বড়বাবুর, জানিনে। তিনি যিনিই হন, তিনি যে 'সবা'-র 'রাম'-নাম উচ্চারণের উদ্দীপনা যোগাবার জাদু জানেন,—বড়বাবুর কণ্ঠস্বরের আর্দ্রতায় এবং নাম করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর উদ্দেশে প্রণাম করবার মধ্যেই তার প্রমাণ, সূর্যমুখীর মধ্যে সূর্য-যাচ্ঞার মতোই সুস্পষ্ট।

আমার হাতও আমার কপালে ঠেকল আমার অজ্ঞাতসারেই।

পরের দিন সকাল সাড়ে দশটায় বেরুনো গেলো গোধূলিয়া থেকে সাইকেল-রিকশায়। ভাড়া দু'আনা, যাত্রী দুজন ; আমি আর বড়বাবু। সোনারপুরা অঞ্চলে গিয়ে নামলাম বড় রাস্তায়। তারপরই গলির গোলকধাঁধা। যেখানে গিয়ে পেঁছলাম সেখান থেকে একা আবার হোটেলের ডেরায় ফিরে আসা অসম্ভব। দরজার কড়া নাড়তে খুলে গেল দড়িবাঁধা খিল দোতলা থেকে টান দিতেই। এই খিল খোলা এবং বন্ধের ব্যাপারটি কাশীর সব চেয়ে নিজস্ব জিনিস। ওপর থেকেই দড়ি টানতে তবে খিল খোলে। এই, আর একটুখানি জায়গা ওপেন সব বাড়িতেই ; সেখানটা জাল দিয়ে ঘেরা,—বাঁদরের উৎপাত থেকে বাঁচবে। খিল খুলতে অবারিত হলো যে পথ সে পথ পাতালের থেকে উঠেছে স্বর্গে। দোতলার স্বর্গে ওঠবার সিঁড়ি কলকাতার মধ্যবিত্ত জীবনের চেয়েও অন্ধকার। সিঁড়ির ছাদ এত নীচু যে প্রতি মুহূর্তে মনে করিয়ে দিলো আমাকে যে আমি বাঙালী ; আজকের মোসাহেবদের ভারতে মাথা উঁচু করবার উপায় নেই। করবার চেষ্টা করলেই অবাঙালী বাধা। কাশীর সিঁড়ির ছাদের মতোই মুহূর্তে হিট ব্যাক করবেই !

স্বর্গ এবং মর্ত্যের মাঝখানে সেই প্রেতলোকের অন্ধকার সিঁড়িতে যখন ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছি সেই সময়েই ওপর থেকে স্বর্গের ঘণ্টাধ্বনি হলো। ঘণ্টার মতোই গোল গোল নিটোল কণ্ঠস্বরে উচ্চারিত হলো প্রশ্ন ; কে রে ? বড়বাবুর উত্তর উঠে গেলো ওপরে আমরা ওপরে গিয়ে পেঁছবার আগেই : 'আমি দিদিমা !'

'কে,—বড় ?'—বোঝা গেল প্রশ্নকর্ত্রী কণ্ঠস্বরেই চিনেছেন আগন্তুককে। ততক্ষণে ওপরে উঠে দাঁড়িয়েছি দুজনেই। ঘরের ভেতরে দিনের প্রথমালোকেও অন্ধকার দূর হয়নি পুরো! তারই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন যিনি তাঁর গায়ের রং এই অতিবৃদ্ধ বয়সের সূর্যকে লজ্জা দেয়। প্রথম দর্শনে কাশীর দিদিমা সম্পর্কে আমার ধারণা পরে পরিবর্তিত হয়েছিলো; গায়ের রং নয়,—রং-এর গায়েই কে যেন রামধনুর রং ছিটিয়ে দিয়েছে। এ রং গায়ের নয়; এ রং সেই মনের,—সেখানকার রং বয়সের সঙ্গে সঙ্গে কারুর কারুর বেলায় মুছে না গিয়ে নতুন করে খোলে।

দিদিমাকে প্রণাম করে বড়বাবু বলেন: এই আমার দিদিমা—

দু'পায়ের ধুলো মাথায় নিয়ে বলি: আর আমার কাশীর দিদিমা!

কাশীর দিদিমা মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন: এ কে রে? বড়বাবু জবাব দেন: কাশীতে মানুষ দেখতে এয়েছেন; তাই নিয়ে এলাম তোমার কাছে; কাশীতে আমার মতে একটাই মানুষ আছে—

ভেবেছিলাম কাশীর দিদিমা নিশ্চয়ই বিনয় প্রকাশ করে বলবেন, 'কি যে বলিস!' কিন্তু সেদিক দিয়ে গেলেনই না কাশীর দিদিমা; বললেন: 'ও? লেখে বুঝি?' কাশীর দিদিমার কথায় চমকে উঠি; মুখ-পড়তে জানেন নাকি? আমি তো বটেই; কাশীর দিদিমা যার কাছে কাশীর একমাত্র মানুষ,—সেই বড়বাবু পর্যন্ত যে আজকের চেয়ে একটু বেশীই, হতবাক হয়েছেন, বোঝা যায় তাঁর পরের প্রশ্নে। বড়বাবুও যে এতটার জন্যে প্রস্তুত ছিলেন না তা প্রকাশ হয়ে পড়ে অতঃপর তাঁর কথাতেই: কি করে বুঝলে দিদিমা,—যে ইনি লেখেন?

কাশীর দিদিমা সঙ্গে সঙ্গে ফিরিয়ে দেন প্রশ্নের পিঠ-পিঠ উত্তর: লেখক না হলে এত বোকা আর কে আছে যে মানুষ দেখবার জন্যে কলকাতা থেকে কাশী আসবে?

কাশীর দিদিমা যে সত্যিই কাশীর দিদিমা সেই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই মনে হয়েছিলো আমার!

অনেক পরে অবশ্য মনে পড়েছিলো আরও অনেকের কথা। দেশে বিদেশে এমন শিক্ষিত মূর্খ অনেক, যাদের মুখে প্রায়ই শুনি, গল্প লেখার জন্যে দেশ-দেশান্তর না করলে লেখক হওয়া যায় না। পদব্রজে পৃথিবী ভ্রমণ করে যারা তারাই যে পৃথিবীর সাহিত্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক হতো, এ কথা কিন্তু তাদের মুখে শুনি না। বালজাক যে প্রায় ঘরে বসেই, বাড়ির বাইরে পা না বাড়িয়েই এমন গল্প লিখেছেন যা দ্বিতীয়বার আর কারুর কলম দিয়ে বেরুলো না আজও, একথাও অবশ্য শুনি না তাদের মুখে। গল্প লেখবার জন্য যার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে হয় সে বালজাক নয়; সে বড় জোর সমার্সেট মম্।

এবং আমার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই যাঁর কথা মনে না পড়ে পারে না, তিনি হচ্ছেন ইথেল মানিন। সমার্সেট মম্ সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে

কনফেশানস্ এণ্ড ইম্প্রেশানসে তিনি বলেছেন : 'One would have thought that anyone who knew as much about human nature as the author of *The Trembling of a Leaf*, *The Painted Veil*, and *The Sacred Flame*, would have seen through the fallacy that travel broadens the mind or is of any value in creative work…'

কিন্তু ইথেল মানিন ইথেল মানিন। বিপুল তাঁর পড়াশুনো, বিস্তর তাঁর বুদ্ধি। কিন্তু কাশীর দিদিমা? তিনি কেমন করে জানলেন যে জীবনের গল্প হচ্ছে ছাই-চাপা আগুন; প্রতি সংসারেই তার অস্তিত্ব আদ্যন্তকাল পর্যন্ত অব্যাহত। জীবনের গল্পের জন্যে দেশে দেশে, দেশে বিদেশে যেতে হয় না। বরং প্রতি সংসারে যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখ তাই। পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন! জীবনের গল্পের চেয়ে কোন্ রতন আর অধিক অমূল্য!

আমাদের দেশে কয়েক শ্রেণীর আরও শিক্ষিত আরও ইডিয়াট আছে যারা প্রায়ই বলে, শুনি, আমাদের জীবনে তেমন থ্রিল কই? থোড়বড়ি-খাড়া, খাড়াবড়ি-থোড় এর এই জীবনে গল্প কোথায়। গল্প আছে ওদের জীবনে। নায়িকাকে নিয়ে উড়োজাহাজে করে পালাচ্ছে অতিনায়ক; আর নায়ক সাবমেরীনে ফলো করছে তাকে। কি থ্রিল ভাবুন একবার? এডগার ওয়ালেশ অথবা না বলে এর বাঙলা অনুবাদে যে থ্রিল সে থ্রিল জীবনের থ্রিল নয়! জীবনের গল্পকার যে সে এর জন্যে দুঃখ করে না; তার দুঃখ তার নিজের, তার কাছের জীবনকেও যথেষ্ট না-দেখার দুঃখ; তাই তার মুখে শুনি—

'ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর একটি শিশির-বিন্দু!'

কাশীর দিদিমার সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিনের প্রথম কথাটা ভুলিনি; আর মনে আছে প্রথম দিনের শেষ কথাটা। চলে আসবার উদ্দেশে প্রথম দিন যখন আবার পায়ের ধুলো নিয়ে বলেছি: আবার দেখা হবে,—তখনও কাশীর দিদিমা বিনয় করেননি, বলেননি যে নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই, যা বলা এই সভ্যসমাজের, ফ্রম ক্যাল টু কাশী এক দস্তুর; বরং তার পরিবর্তে বলেছিলেন, দেখা হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো।'

পৃথিবী জুড়ে মনে রাখার মতো কথা এত বার এত লোক বলেছে যে তা দিয়ে সম্ভবত ত্রিভুবন মুড়ে দেওয়া যায়। 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ' থেকে আরম্ভ করে 'ইনকিলাব জিন্দাবাদ' পর্যন্ত কথামৃতের তো কথাই নেই; অনেক বাজে কথাও কেবল বার বার বলে বলে শেষ পর্যন্ত কাজের কথা বলে চলে গেলো। যেমন আমার অভিধানে অসম্ভব বলে কোনও কথা নেই। যার অসম্ভব বলে কিছু নেই, তার সম্ভব বলে কিছু আছে কি? নিজের উন্মাদনা চরিতার্থ করবার কারণে লক্ষ লক্ষ লোককে বাঁচার লক্ষ্য থেকে চ্যুত করে।

যুদ্ধের উপলক্ষে বলি দেওয়া অসম্ভবের পায়ে এ এক আমাদের মতো ক্লীব দৃষ্টিকোণ থেকেই কেবলমাত্র যিনি বীর সেই নেপোলিঁওর পক্ষেই সম্ভব,—আর কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়, সত্যিই অসম্ভব। এমনই আরেক নির্বোধ-উক্তি হচ্ছে, আরাম হারাম হ্যায়। যে আরাম করে না সে কাজও করে না। যার আরাম নেই, তার কাজ নেই, কাজের ব্যারাম আছে কেবল।

কিন্তু কাশীর দিদিমার এই, 'হলে ভালো, নাহলে আরও ভালো', একথার আর মার নেই। সংসারে থেকে একথা যে প্রতিপদক্ষেপে বলতে পারে সে-ই কেবল 'সব' ত্যাগ করে সার-কে পেয়েছে শেষ পর্যন্ত। এ কথা কাশীর দিদিমার স্বরচিত নয় নিশ্চয়ই; অন্যের মুখ থেকে এসেছে তাঁর সম্মুখে। তবুও। তবুও, কাশীর দিদিমার মুখেই একথা সাজে; অন্যলোকের মুখে লাঠি বাজে। তাঁর মুখে শুনলে মনে হয় অন্যের কথা। অনেক কথা ভুলিয়ে দেয় এই অনন্য কথাটি।

প্রথম সাক্ষাতের দিনে কাশীর দিদিমা আসবার এবং ঢোকবার মুহূর্তে দুটি অবিস্মরণীয় উক্তির মধ্যে আরেকটি স্মরণীয় কথা বলেন। সেটি একটি প্রশ্নের উত্তরে কাশীর দিদিমা ব্যক্ত করেন। প্রশ্ন করেন তিনি এক সময়ে: কাশীতে এসে বিশ্বনাথ দর্শন করেছ? জবাব দিই: না। কাশীর দিদিমার ব্যবহার আবার উল্টোপথ ধরে। লোকে কাশী এসে বিশ্বনাথ না দেখলে রাগ করে; কিন্তু একি আশ্চর্য স্ত্রীলোক, কাশীর দিদিমা! শুনে খুশী হন: ভালো করেছ; খুব ভলো করেছ। ৺বিশ্বনাথ দর্শন না করে। লোকে চোখ তৈরী হবার আগেই হড়বড় করে কাশীশ্বরসন্দর্শনে যায়; কাজেই তার দেখা হয় কিন্তু বিশ্বনাথ দর্শন হয় না। কাশীতে এসে প্রথম যাঁকে দেখবে তিনি হলেন সচল বিশ্বনাথ ত্রৈলঙ্গস্বামী।

আমি বলি: কিন্তু ও তো ত্রৈলঙ্গর মূর্তি, ত্রৈলঙ্গ নয়—

কাশীর দিদিমা উত্তর দেন: 'চোখ না থাকলে,—মূর্তি; চোখ থাকলে দেখবে,—স্বয়ং বিশ্বনাথ ওখানে মূর্ত!' 'তবে তাঁকেই দেখব, প্রথম!'—বলে চলে এলাম।

কাশীর দিদিমার কাছ থেকে প্রথম দিন হোটেলে ফেরার পথে আরেকটি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়,—যারও দ্বিতীয় নেই। আসাম এবং বেরুবাড়ির পর বিশেষ করে আমার কাছে এই অভিজ্ঞতা অমূল্য। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এই। হোটেলে ফেরার পথে রাস্তার ওপর রকে একজন মালাই ইত্যাদি নিয়ে বসে আছে দেখি। লোকটার স্বাস্থ্য চেয়ে দেখবার মতো। বাইসেপ এতো উঁচু যে হাতের আঙুল কাঁধে ঠেকে না। তার সামনে দণ্ডায়মান বাড়িওলা স্বয়ং; তুলে দেবার চেষ্টা করছে সে মালাইওলাকে বহুদিন। ওই রক সংলগ্ন আর সব

ঘরকে তুলে দিয়েছে ; পারেনি কেবল মালাইওলাকে। মালাইওলা অন্যদিন হয়তো কথাই বলে না ; আজ নেমে এলো নীচে। এসে মালিকের সব কথা শোনবার পর মালাইওলা হঠাৎ নরম গলায় বললো : হাম এক বাত বাৎলাই ?— অর্থাৎ আমি একটা কথা বলি এবার ? বললে এমন সুরে যেন রাধার মান ভাঙাতে কৃষ্ণের বাঁশি বাজছে ! ব'লে, সেই একই স্বরে মালইওলা তার বক্তব্য পেশ করে : আদালত তুমার হো ; ঘর তুমার হো ; আইন ভি তুমার হো, পুলিশ তুমার হো, লেকিন—অর্থাৎ আদালত, ঘর, আইন, পুলিশ সব তোমার, কিন্তু— ! লোকটা থামে ; আর কয়েক মুহূর্তের সে কি সাসপেন্স ! যেন হিচককের ছবির চরম মুহূর্তের বর্ষণের আগে কয়েক মোমেণ্টের লাল। তারপর সেই বাইসেপওলা হাত যার কারণে আঙুল কাঁধে ঠেকে না, মালাইওলা সেই হাত শূন্যে তুলে গর্জন করে ওঠে : লেকিন, আবি এইসা মার মারে—!

যখন স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতে আসামের মতো ঘটনা ঘটে তখনই আমার মালাইওলার কথা মনে পড়ে। কাশীর সেই মালাইওলা। হিংসা খারাপ জানি ; কিন্তু নির্বীর্যের অহিংসার চেয়ে বোধ হয় ভালো। তাছাড়া রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হবারই কেবল প্রয়োজন আছে যে তা নয় ; বাল্মীকি থেকে রত্নাকরও হতে হয় কখনও কখনও যে ; মরা মরা বলতে বলতে যেমন রাম ; রামরাজ্যে তমনই রাম-রাম বলতে বলতে কখনও কখনও প্রতিবাদের মার-মার আওয়াজ করা চাই।

॥ আট ॥

তলস্তয়ের গল্পের নায়ক সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই, সূর্যদেব বসবার আগেই পশ্চিমাকাশের পাটে, জমি জিতেছিলো দৌড়ে অঢেল। কিন্তু জীবনের সন্ধ্যা যে তার অনেক, অনেক আগেই অপরাহ্ন থেকে গড়িয়ে গিয়েছিলো সায়াহ্নে, জীবনসূর্যে নির্বাপিত হয়েছিলো প্রাণের অগ্নি ; সে হতভাগা যখন তা জানতে পেলে তখন সে আরও যা জানতে পারলো অথচ কাউকে জানাতে পারলো না, তলস্তয় তাঁর হয়েই তা সকলকে জানিয়ে দিয়েছেন। মানুষের দেহ কবরে দিতে যে সাড়ে তিন হাত জমির মাত্র দরকার হয়,—সব মানুষই সেই সাড়ে তিন হাতেরই জমিদার হতে পারে মাত্র। তার বেশী নয় এক ছিটেরও ; অথবা এক তিল নয় কমেও। মানুষের দেহটারই মাপ সাড়ে তিন হাত। এই দেহ ছাড়াও মানুষের মধ্যে নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে কোনও দেশে, কোনও কালে যার কোনও পরিমাপ নেই। দেহের মাপ আছে, মৃত্যু আছে ; প্রয়োজন আছে তার তাই সাড়ে তিন হাত জমির। আত্মার পরিমাপ নেই ; তার মৃত্যু নেই ; অতিরিক্ত এই সাড়ে তিন হাতের অতিরিক্ত সে তাই।

কিন্তু ত্রৈলঙ্গস্বামীকে যখন কাশীর গঙ্গায় তাঁর দেহাবসান হলে সমস্ত শহর পরিক্রমার পর গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দেবার আগে শেষ দেখার জন্যে খোলা হলো শবাধার,—তখন দেখা গেল ত্রৈলঙ্গের দেহও সেই আধারে নেই। অর্থাৎ দেখা গেল যে তাঁকে দেখা গেল না। মানুষ মাত্রেরই আত্মা মৃত্যুঞ্জয়। ত্রৈলঙ্গের দেহও মৃত্যুকে জয় করছিলো জীবনে। দেহেও তিনি ছিলেন দেহাতীত। তাঁর দেহ সাড়ে তিন হাতের চেয়ে বেশী ছিলো আর এক হাত। লম্বায় সাড়ে চার হাত এই মানুষ সেই অতিরিক্ত আর এক হাত দিয়েই অতিরিক্ত মৃত্যুকে দেখে নিয়েছিলেন এক হাত।

এই 'সাড়ে চার হাত' মানুষকেই দেখতে গেলাম কাশীর দিদিমার কথামতো সর্বাগ্রে।

কাশীর দিদিমা কেবল ওইটুকুই বলেননি; আরও বলেছিলেন। আরও বলেছিলেন যে: 'লৌকিক শরীরে তোমরা যাকে অলৌকিক বল, তার এমন আশ্চর্য প্রকাশ আশ্চর্যের চেয়েও একটু বেশী। শাস্ত্রে মানুষের যেসব অবস্থা হতে পারে বলে বলা হয়েছে ত্রৈলঙ্গকে না দেখলে বোধ হয় বলতাম মানুষের অমন অবস্থা হতেই পারে না।' ত্রৈলঙ্গের দীক্ষিত শিষ্যের কথা বলতে পারি না; তাঁর ভক্তের শেষ নেই, বলতে পারি। কাশীর দিদিমা ভক্ত নন; 'ভক্তি'। ত্রৈলঙ্গের 'ভক্তি'র প্রতিমূর্তি কাশীর দিদিমা।

কাশীর দিদিমা বাড়িয়ে বলেননি। আলোয়-আলোয়, রাগে-অনুরাগে, মেঘে-রৌদ্রে, সুখে-দুঃখে, বিপদে-সম্পদে, শীতে-গ্রীষ্মে, জলে-ডাঙায়, আভরণে-অনাবরণে, জীবনে-মরণে এমন সমদৃষ্টি, এমন বিষম অভিজ্ঞতার তুলনা নেই কাশী কাঞ্চী, কোথাও!

ভগবানের সব চেয়ে কাছে থাকে যে ভক্ত, ভগবান থেকে সে থাকে সব চেয়ে দূরে,—এর প্রমাণ পেতে দূরে যেতে হবে না; কলকাতা থেকে যেতে হবে কাশী। ত্রৈলঙ্গ বলতে 'কাশী'-র মুখ দিয়ে লাল পড়ে; চোখ দিয়ে ভক্তির মৃদু অশ্রু, জোড়কর ওঠে কপালে, লোম দাঁড়িয়ে ওঠে গায়ে, শরীর কাঁপতে থাকে কাশীর। কিন্তু কাশীতে যাঁদের দীর্ঘকাল ধরে বাস নয় কেবল, যে কোনও উপলক্ষ্যে নির্জলা উপবাস, তাঁদের অনেককে জিজ্ঞেস করুন; ত্রৈলিঙ্গর আসন কোথায় কাশীতে; দেখবেন তাঁদের অনেকের মুখই বড় করুণ; তাঁদের অনেকেই একাশিতে পড়েও শুধু শুধুই এ-কাশীতে পড়ে আছেন। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যেখানে বসে মাটির নয়, 'মা'-টির আরাধনা করে গেছেন, সেখানে আজও তাঁর অপূর্ব কৃষ্ণবর্ণ 'সাড়ে চার হাত' মূর্তি বিরাজমান তার খবর দিতে পারবেন না।

পারবেন কি করে? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো দেশ-বিদেশ জুড়ে

জন্মোৎসব পালিত হয় না কোথাও। হবে কেমন করে? জন্ম-মৃত্যুর দুয়েরই তিনি অতীত; যাঁর আদি নেই; নেই অন্ত—তিনি অনাদি এবং অনন্ত, কোন্ বিশেষ তিথি হবে তাঁকে স্মরণ করার যোগ্য,—তিথির অতীত, এ পৃথিবীতে সেই 'অ'-তিথির। পারবেন কি করে? যাঁর কথা বলছি তাঁর তো রচনাবলী নয়; তাঁর যে কেবল 'অহং'বলি!

একটা কথা একটু আগেই যে বলেছি, কাশীতে অনেকেই সচল কাশীশ্বর কোথায় বসে আছেন 'মূর্তি' হয়ে এখনও তা জানেন না,—মাফ করবেন, তার মধ্যে আপনাকে ধরিনি আমি। এই বসুমতীর হরেকরকমের রসের এবং রসদের আয়োজন সত্ত্বেও যদি আপনি নেহাতই এই প্রতিক্রিয়াশীল রচনার পাঠক হন, এবং আপনি দৈবাৎ যদি হন কাশীর লোক, তাহলে জানবেন আপনি আমার লক্ষ্য নন। আমার ঘাড়ে একটাই মাথা আছে কিনা। আপনি ছাড়া আরও যে লক্ষ লক্ষ লোক আছেন কাশীতে তাঁরাই আমার উপলক্ষ্য। আরও একটা কথা। আপনি যদি পাঠক না হয়ে পাঠিকা হন; লোক না হয়ে কাশীর স্ত্রীলোক, —তাহলে শুধু মাফ নয়,—বিশ্বাস করবেন,—আপনাকে আমি অমন কথা বলতেই পারি না। বরং তার বদলে যা বলতে পারি তা হচ্ছে ত্রৈলঙ্গর আসন কোথায় আপনি ছাড়া আর কে জানে? কলকাতা থেকে কাশী কোনও একজন লোক আরেকজন লোকের মতো নয়; কিন্তু স্ত্রীলোকের কলকাতা টু কাশী তো বটেই, ত্রিলোক জুড়ে স্ত্রীলোক সর্বত্র আদি ও অকৃত্রিম এক। কাজেই, আপনি যদি পাঠিকা হন তো, আপনি কাশীতে পদার্পণ না করলেও ত্রৈলঙ্গর তো বটেই, যাঁর আদি এবং অন্ত নেই বলেছি, তাঁরও আদ্যন্ত সব জানেন আপনি, এ কথা যে না জানে তার তুল্য হতভাগ্য আর কে? আমার স্ত্রী-পুত্র আছে; ঘরবাড়ি আছে। পাঠিকাকে কিছু বললে আমি, তখন আর বাড়ি নেই, তখন আছে বেরু শুধু বেরুবাড়ি!

বেণীমাধবের ধ্বজার কাছে নৃসিংহ-দাঁড়ার ঘাট: আর তার অনতিদূরেই ত্রৈলিঙ্গস্বামীর সমূর্তিক আসন আশ্রম। পঞ্চগঙ্গার ঘাটের ওপরেই একদিন দাঁড়িয়ে ছিলো স্মরণের অতীত এক কালের অবিস্মরণীয় সাক্ষী বিন্দুমাধবের মন্দির। কাশীখন্ড বলছেন, অগ্নিবিন্দু নামে এক সাধকের স্তবে কাশীধামে আবির্ভূত মাধব প্রীত হয়ে বলেন, যতদিন কাশীর নাম আছে, ততদিন তোমারও নাম রইবে আমার নামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে। বিন্দুমাধবকে তাই হিন্দুরা উত্তরবাহিনী গঙ্গায় অবগাহন করে উঠে প্রণাম করতেন। বিন্দু এবং মাধবের নাম করতেন, প্রণাম করতেন একসঙ্গে।

সেদিনকার কাশীতে বিন্দুমাধবের প্রস্তরনির্মিত জয়ধ্বজাই ছিলো সব মন্দিরের চূড়ো ছাড়িয়ে। তারপর এলো ঔরংজেব। হিন্দুমন্দিরের উন্নত শিরকে অবনত করবার ব্রতয় বিব্রত করে তুললো বিন্দুমাধবকে। ধূলোয় লুটিয়ে দিয়ে তাঁর ধ্বজা, বানালো মসজিদের মিনারেট। কিন্তু তবুও কাশীর

কাছে, কাশীবাসীর কাছে তাঁর পরিচয় আজও অপরিবর্তিত। বেণীমাধবের ধ্বজা বা মাধোজীকা ধরারা। বিন্দুমাধবের অস্তিত্ব এখনও এর কাছেই নবনির্মিত এক মন্দিরে অব্যাহত।

এরই অনতিদূরে কাশীর সচল বিশ্বনাথের অচলায়তন।

ত্রৈলিঙ্গর মূর্তি ছাড়াও এখানে তাঁর আরাধ্যা দক্ষিণা-কালিকার মূর্তি বিরাজমান। সেই মূর্তি যাঁকে ওপরতলায় রেখে নীচের তলায় বসতেন ত্রৈলিঙ্গ। ভক্ত প্রশ্ন করেছিলো: আপনার 'মা' ওপরতলায় তো আপনি সেখানে সাধনায় না বসে, নীচের তলায় এখানে বসে কেন। ত্রৈলিঙ্গ বললেন: যা, ওপরে গিয়ে দেখে আয় তো 'মা' কোথায়? ভক্ত ওপরে গিয়ে দেখে মাতৃমূর্তি সেখানে নেই।

'আমাকে'-ই পুজো করে যে তার 'মা-কে' পাওয়া যায় বাইরের মন্দিরেই শুধু; আর আমাকে নয়, 'আমাকে'র মধ্যে মাকে যে পুজো করে তার মা থাকে যে মনের মন্দিরে। তাকে খুঁজতে একতলা দু'তলা করতে হবে কেন?

অনেক সিঁড়ি বেয়ে তবে নেমে গিয়ে দাঁড়াতে হয় ত্রৈলিঙ্গের আশ্রমে তাঁর ভয়ংকর অভয়ংকর মূর্তির সামনে। নাম করতে হয় তাঁর। কোন্ নাম জানি না; ত্রৈলিঙ্গ, না ত্রৈলঙ্গ, না তৈলঙ্গ। শেক্সপীয়ারের মতো বলতে জানি না, নামে এসে যায় না। কারণ নামে এসে যায়। গাঁদাকে মেরিগোল্ড বললে যখন জগতে সর্বত্রই ছ'-পয়সা থেকে ছ'-আনায় ওঠে দাম, তখন নামে এসে যায় না বলি কেমন করে? কিন্তু সেজন্যে নয়, নামে সত্যি এসে যায়। আমি বলছি বলেই একথা সত্য নয়; সত্য বলেই আমি একথা বলছি। নাম দ্বারাই সব; নামহারা শুধু শব।

যাঁরা ত্রৈলঙ্গর আসল নাম কি ছিলো তাই নিয়ে উত্তেজিত হতে ভালোবাসেন, ত্রৈলিঙ্গর এই জীবনকাব্য তাঁদের জন্যে নয়। বিদ্যাসাগর অথবা রামমোহন, নাকি ডেভিড হেয়ারের গায়ে ক'টা তিল, ক'টা আঁচিল ছিলো, কটাক্ষ করে বলছি না এই নিয়েই যাদের মাথাব্যথা, এ জীবনকাব্য তাদের জন্যে নয়। কারণ, বাঙলা ভাষায় লেখা হলেও আমি যা লিখতে যাচ্ছি তা জীবনচরিত নয়; একটি জীবন্ত চরিত্র।

ত্রৈলিঙ্গ, রামকৃষ্ণ, রামপ্রসাদ, ব্যামাক্ষ্যাপা—এঁদের এক নাম ছিলো না, অনেক নাম ছিলো। কাজেই এক নাম করলে অনেক নাম করা হয়; অনেক নাম করা হলেও সেই 'এক'-এর নামই করা হয়। অনেককে প্রণামের মধ্যে সেই 'এক'-কে প্রণাম করা; এক-কে প্রণাম করার মধ্যেই হয় অনেককে প্রণাম করা।

তাই বলতে পারব না, ত্রৈলিঙ্গ না তৈলঙ্গ; তিনি দেড়শো বছর ছিলেন কাশীতে, কিংবা পঁচানব্বই বছর পর্যন্ত। আমি যে নামে প্রণাম করছি ত্রৈলিঙ্গকে, সে নাম, কাশীর দিদিমার কথা ধার করে বলি, সে নাম-ধাম ঠিক হলে ভালো; না হলে আরও ভালো।

বাঙলা এগারোশো আট সাল। নেপালের সেনাপতি গুলি মেরেছেন বাঘকে। বাঘের গায়ে গুলি লেগেছে ; জখম হয়েছে : কিন্তু মরেনি। বিকট আর্তনাদে বনভূমি কাঁপিয়ে সে গিয়ে লুটিয়ে পড়েছে এক সাধুর পায়ে। পায়ে পায়ে একটু বাদেই সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছেন নেপালের সেনাপতি। থেমে গেছেন নিঃশঙ্ক সাধুর সামনে গৃহপালিত পশুর মতো চোখ বুজে নিঃশঙ্কতর সেই শার্দূলকে বসে থাকতে দেখে। তাঁর হাতের উদ্যত বন্দুক নেমে এসেছে নিজের অজান্তে। চির উন্নত শির নত হয়েছে কখন, সাধুর পায়ে হয়েছে প্রণত, সে নিজেও জানে না। তাঁর বিস্ফারিত দৃষ্টির সামনে অবারিত হয় এক অদৃষ্ট-পূর্ব জগতের সিংহদ্বার সাধুর মেঘমুক্ত দিনের আকাশে সূর্যালোকের চেয়েও সহস্রগুণ দীপ্ত হাসিতে। সে হাসিকে দিয়ে সাধু একথাই বলতে চেয়েছিলেন সেদিন যে গহন অরণ্যের আদিম হিংস্রতম নরখাদকও নিরুপায় হলে লুটিয়ে পড়ে মানুষের দু'পায়ে-ই, যদি নর দেখতে পায় সকলের মধ্যেই নারায়ণ আছেন।

মানুষের মধ্যে চৈতন্য আবির্ভূত হলে বনপরিক্রমায় বাঘ এবং বলদ দুই হয় মানুষের বনসঙ্গী! কারণ তখন নারায়ণ যে নরের মনোসঙ্গী। এর চেয়ে লৌকিক আর কিছু হতে পারে না,—এই 'অলৌকিক' অঘটনের মতো!

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে লোক বলছে, হিংস্রকে হিংসা কোরো না ; সিংহও তার হিংসা ভুলে যাবে ;—সেই লোকই, আবার হাতিকে নারায়ণ জ্ঞান করে শুয়ে পড়লেও হাতি যখন বিশ্বাসীকে পায়ের তলার পিষ্ট করেছে, তখন বলছে : মাহুত-নারায়ণের বারণ না শোনার ফলেই এমন দুরবস্থা ভক্তের,—এ কেমন কথা? তার উত্তরে বলি, এ কেমন নয়, এই কেবল একমাত্র কথা। অর্থাৎ সকলের জন্যে নয় সব কথা। যার সাজে তার সাজে অন্যলোকের লাঠি বাজে। মুখে রামকৃষ্ণ মনে রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার দিকে লক্ষ্য নিবদ্ধ করলে রামও না ; কৃষ্ণও না ; রামকৃষ্ণ ডালমিয়ার তো বাঁচাবার ক্ষমতাই নেই।

লোকে বলে, স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই সবই যদি সেই বৃন্দাবনের একমাত্র পুরুষের ইচ্ছেয় হয়, তাহলে পুরুষকারে যদি কিছুই না হয়,—তাহলে তো পুরুষমানুষের ঘরে শুয়ে থাকলেই হয়, সেই একমাত্র 'পুরুষই' তাহলে খাওয়াবেন, পরাবেন। জিব দিয়েছেন যিনি আহার দেবেন তিনি,—এ মনে করে ঘরে যে সত্যিই শুয়ে থাকতে পারে তাকে নিশ্চয়ই দেবেন। কিন্তু যারা বলে তারা কেউ পারে কি সত্যিই ঘরে শুয়ে থাকতে? দ্রৌপদী যতক্ষণ বিবস্ত্র হবার লজ্জায় বস্ত্রের খুঁট চেপে ধরে ছিলেন ততক্ষণ দেখা দেননি শ্রীকৃষ্ণ। যেই দুই হাত তুলে দিয়েছেন মাধবের দিকে, দিকে দিকে অমনই দেখা দিয়েছে বস্ত্রের পর বস্ত্রের সম্ভার। দুর্যোধন মায়ের সামনেও হতে পারেননি নিঃসঙ্কোচ ; ঊরুর আবরণ করেননি উন্মুক্ত। ঊরুভঙ্গেই কুরুরাজ ভঙ্গ হয়েছেন তাই!

আগুনের মধ্যে গুণাতীতকে দেখে যে প্রহলাদ সে নরকে স্পর্শ করে এমন বৈশ্বানর কোথায়? জিব দিয়েছেন যিনি তিনি আহার দেবেন ; ঠিকই। কিন্তু

জিব দিয়েছেন তিনি চাইলেই জিবে গজা দেবেন, এমন বিশ্বাস করলে হাতির পায়ের তলায় পিষ্ট হতেই হবে। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ যখন শুদ্ধা ভক্তি ছাড়া আর কিছু চাইতে পারলেন না, একবার নয়, বার বার তিনবারই ব্যর্থ হলেন, তিনি যা চাইবেন তাই পাবেন জেনেও, বৈরাগ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে, তখন বিবেকানন্দকে বলেছিলেন : 'যা, আজ থেকে তোর মোটা ভাত-কাপড়ের ভাবনা হবে না।' ইচ্ছে করলেই তিনি পোলাও-কালিয়ার চিরস্থায়ী ব্যবস্থা করতে পারতেন, কিন্তু করেননি।

করেননি, তার কারণ রাজা জনকের যা সাজে অন্য লোকের পক্ষে তা যে বিপজ্জনক এ যিনি জানেন শুধু তিনিই হতে পারেন রাম এবং কৃষ্ণ; ইদানীং রামকৃষ্ণ!

লোকে আরও বলে; স্ত্রীলোকে তো বলে বটেই যে সবই যখন তাঁর ইচ্ছেয় হয় তখন আর পাপ-পুণ্য কি; স্বর্গ-নরক কেন। যতক্ষণ তোমার পাপ-পুণ্য বোধ আছে ততক্ষণ আছে স্বর্গ-নরক। পাপ-পুণ্য দুয়েই যখন শূন্য বোধ হবে তখনই কেবল স্বর্গ-নরক নেই; নেই জন্ম-জন্মান্তর। বিবেকানন্দ সম্পর্কেই কেবল রামকৃষ্ণ বলেছিলেন : ওর কোন কিছুতেই কিছু পাপ নেই! রামকৃষ্ণ-শিষ্য বিবেকানন্দ যা করলে সাজে তা যুগান্তর-সম্পাদক বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় করলেও যে ঠিক হবে, এমন কথা অন্যে বললেও, যতদূর জানি, রামকৃষ্ণ বলেননি। বলে যাননি বলেই তো জানি তাই!

তাই ব্যাঘ্রচর্মাসনে বসে, মুখে নারায়ণ মনে নগদনারায়ণ বললে বাঘ এসে আশ্রয় নেবে না মার্জারের মতো পায়ের কাছে। কিন্তু শার্দুলের মধ্যে দুলে উঠতে দেখবে সিংহবাহিনীকে, শুধু সে-ই যে ৺কালীর গায়ে প্রস্রাব ছিটিয়ে দিয়ে বলতে পারেন : গঙ্গোদকং! কালীর গায়ে তা ছিটানো কেন,—এ জিজ্ঞাসার জবাবে যিনি বলেন : 'পূজা'—এ এক তাঁর পক্ষেই সম্ভব।

নেপালের সেনাপতির গুলি-লাগা বাঘ যাঁর পায়ে লুটিয়ে পড়েছিলো বেড়ালের মতো, সেই সাধুই আরেক সময়ে বসে ছিলেন প্রয়াগে। সন্ধ্যার সময়ে 'গ্রামান্তের বেণুকুঞ্জে নীলাঞ্জন ছায়া' সঞ্চারে 'ঈষাণের পুঞ্জ মেঘ অন্ধ বেগে ধেয়ে' এল দেখে রামতারণ ভট্টাচার্য নামে এক ব্রাহ্মণ সেই সাধুকে নিরাপদ আশ্রয়ে নিয়ে যেতে এলেন। সাধু হাসলেন। সেই প্রসন্ন বন্ধুর মতো মেঘমুক্ত দিনে আকাশের হাসি। দূরে অঙ্গুলি সংকেত করলেন সাধু। প্রলয়মদির জলে যাত্রী-নৌকা তার শেষ নিশ্বাস গুনছে। রামতারণের পলক পড়বার আগেই অন্তর্হিত হলেন সাধু। ডুবন্ত নৌকা ভেসে উঠল জলের ওপর। তীরের দিকে ছুটলো তরী তীরের বেগে।

নৌকা থেকে নিরাপদে সবাই নামবার পর সবাই অবাক হয়ে দেখলো,—সুদীর্ঘ সাড়ে চার হাত এক কৃষ্ণ জ্যোতি নেমে যাচ্ছেন নৌকা থেকে। সবায়ের

মনে প্রশ্ন, নৌকায় তো ইনি ছিলেন না ; ইনি কে ? রামতারণেরই কেবল প্রশ্ন নেই। তিনি তাঁর উত্তর পেয়ে গেছেন ; সব প্রশ্নের যা শেষ উত্তর,—তিনি কে ?

এই সাধু মূর্তির মধ্যে মূর্ত বিশ্বনাথকেই প্রথম দর্শন করতে গিয়েছিলাম কাশীতে। কাশীতে পা দিয়ে অচল বিশ্বনাথের আগে গিয়েছিলাম সচল বিশ্বনাথের কাছে। কাশীতে যদি কোনও পাপ করে থাকি তা ওই একটিই ; কাশীতে যদি কোনও পুণ্য অর্জন করে থাকি তাও ওই একটি।

কাশীর বিশ্বনাথ কে, বিশ্বনাথের মন্দিরে যিনি তিনি, না, বিশ্বের যত অনাথের মনের মন্দিরে যাঁর বাস সেই ত্রৈলঙ্গ ?—এর উত্তর স্বয়ং বিশ্বনাথ ছাড়া আর কে জানে ?

মুক্ত পুরুষের আচরণ সম্পর্কে শাস্ত্রের সাক্ষ্য হচ্ছে—জড়বৎ, শিশুবৎ, উন্মাদবৎ আচরণ লীলা করবে যাঁর মধ্যে তিনিই কেবল যথার্থ মুক্তপুরুষ। ত্রৈলঙ্গ ছাড়া শাস্ত্রের এই ব্যাখ্যার জীবন্ত কোনও সাক্ষী নেই। রামকৃষ্ণ তাই এঁকে দেখে বলেছেন : দেখলাম, সাক্ষাৎ বিশ্বনাথ তাঁর শরীরটা আশ্রয় করে প্রকাশিত হয়ে রয়েছেন। রোদে বালি এমন তেতেছে যে পা দেয় কার সাধ্য ? সেই বালির উপরই শুয়ে আছেন।

কাশীর দিদিমা বলেছিলেন, শাস্ত্রে যা যা বলেছে, মানুষের যে-সব অবস্থা হতে পারে বলে, তা যদি ত্রৈলিঙ্গ এসে দেখিয়ে না দিতেন, তাহলে ছুঁড়ে ফেলে দিতাম সব শাস্তর ওই গঙ্গার জলে।

বলেছিলাম, মনে আছে, সে কি শাস্ত্রের চেয়ে মানুষে বিশ্বাস বেশী ? না। কাশীর দিদিমা ব্যাখ্যা করেছিলেন : যে শাস্তর শুধু বলে, অন্তরের মতো যা প্রমাণ করে না তার অভ্রান্তি, সে শাস্তর হিন্দুর শাস্ত্র নয়।

হিন্দুর সেই কালজয়ী শাস্ত্রের জীবন্ত ব্যাখ্যা ওই ত্রৈলিঙ্গ। এই ত্রৈলিঙ্গ-স্বামীর সাংসারিক নাম ছিলো শিবরাম। কাশীর অচল বিশ্বনাথ হচ্ছেন শিবলিঙ্গ। কাশীর সচল বিশ্বনাথ যিনি তিনি শিব থেকে হয়েছেন ত্রিলিঙ্গ।

॥ নয় ॥

'মরা মানুষ বাঁচাইবার উপায়'—গোদা গোদা অক্ষরে ছাপা বিজ্ঞাপনের এই শিরোনামা দেখে মুহূর্তের জন্যে চমকে ওঠে মানুষ আজও ; তারপর ক্ষুদি-ক্ষুদি টাইপে ওই বিজ্ঞাপনই যখন তার অব্যবহিত পরেই আবার জানায় যে, 'এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই !'—তখন সে শুয়ে পড়ে। ভুয়া বামপন্থী 'অভি'-

নেতৃত্বে ডাক-তার ধর্মঘটের কৃপায় অসাধ্য সাধনের প্রতিশ্রুতি যখন কয়েক দিনও না চলতে ধর্মঘট প্রত্যাহৃত হবার ফলে বসে পড়তে বাধ্য হয় সাধারণ কর্মী, [শুধু বসে পড়তে নয় ; উঠতে-বসতে বাধ্য হয় কেউ কেউ,—দু'হাতে দু'কান ধরে উঠ-বোস করতে !] তখনকার মনের অবস্থার সঙ্গেই কেবল তুলনা চলে উপরিউক্ত বিজ্ঞাপন-পাঠকের দুরবস্থার [এক্ষেত্রে অবশ্য, বিদ্যাসাগর মহাশয় মাফ করবেন, দুরবস্থা নয়, দুরাবস্থাই ব্যাকরণ-সঙ্গত না হলেও জীবনসঙ্গত এক্সপ্রেশান ; অবস্থা যখন এমন হয় যে ওই আকা:' না দেখলে অবস্থা কতদূর অর্থাৎ কি দুরাবস্থা যে হয়েছে ডাক-তার ধর্মঘটীদের বিদ্যাসাগরমশাই তা দেখে যেতে পারলেন না তাই ; নাহলে তিনি বলে যেতেন দুরবস্থা নয়। দুরাবস্থাই ঠিক। 'ব্যাকরণ-সম্মত না হলেও জীবনসঙ্গত সুনিশ্চিত !']

কিন্তু সেকথা নয়। আমার বক্তব্য, আজ যা নিছক বিজ্ঞাপন,—আধুনিক বিজ্ঞাপনের পণ-ই হচ্ছে, প্রাণপণ চেষ্টাই হচ্ছে আগামীকাল তা সত্য করে তোলে। এবং বিজ্ঞানের big gun যারা, যারা রথী মহারথী যারা আজ গ্রহ-গ্রহান্তরে গর্বিত সারথি, তারা যে একদিন সত্যি মরা মানুষকে আবার বাঁচাবে এ বিষয়ে সন্দেহ কি ? কিন্তু সেই দিন দূরে থাক, ভগবান করুন সে দুর্দিন মানুষের কখনও না আসে। তার কারণ মরা মানুষকে না পারলেও, মুমূর্ষু মানুষকে বিজ্ঞান এখনই প্রাণ দান করতে অব্যর্থ সক্ষম হয়েছে ! হচ্ছে : আরও হবে। তার ফলেই। বাঁচা মানুষের পায়ের চাপে পৃথিবীর প্রতি ইঞ্চি জমি এমনভাবে পিষ্ট হচ্ছে যে ফসল করলেও আর সোনা ফলানো সম্ভব হচ্ছে না। কাজে-কাজেই দেশে-দেশে যুদ্ধ বাধিয়ে বাঁচা মানুযকে মারা যায় কি করে, বসুমতীর ভার লাঘব করা যায় কিসে তারই দুর্দান্ত চেষ্টায় তৈরী হচ্ছে অতিকায় ফানুস। হিরোসিমায় মানুষ-মারা এই 'ফানুসের হিরো'-দের বীরত্বের শুরু মাত্র। সভ্যতাকে অবলুপ্ত করে অসভ্যতা জগৎ জুড়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে আজ ; মানুষের আজ দুঃখের সীমা পরিসীমা নেই। মহাশূন্যে মানুষের জয়যাত্রার মুহূর্তে আফ্রিকায়, আলজিরিয়ায়, আসামে, বেরুবাড়িতে ঘোষিত হচ্ছে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা। সবার উপরে মানুষ সত্য নয়, সবার উপরে আজ ফানুস সত্য ! আর তাই, এই নির্জন, নিস্তব্ধ, নিরুপম নীল ভেদ করে মানুষ যখন অন্য অনিলে মেলে দিচ্ছে তার পাখা তখনও আমি মানুযের জয়যাত্রাকে মনুষ্যত্বের পরাজয়বার্তা বলে জ্ঞান করতে বাধ্য হচ্ছি। আমার মনে অভূতপূর্ব আনন্দ নয়, পরমাশ্চর্য এক নিরানন্দ কেবলই মনে পড়াচ্ছে :

'নিদারুণ দুঃখরাতে
আত্মঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখনও দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা।'

কে জানে? মানববিধাতা মহাশূন্যচারী মানুষ না কি ফানুসকে দেখে মনে মনে হাসছেন কিনা: 'পিপিলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে।'

কিন্তু কেন? কেন এই মরা মানুষকে বাঁচাবার উপায় প্রায় বের করে ফেলার মুহূর্তেই আবার বাঁচা মানুষকে যুদ্ধে দাঙ্গায়, সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে না মেরে ফেলা পর্যন্ত বিজ্ঞান নিরুপায়? এর কারণ বিজ্ঞান মরা মানুষকে প্রাণ দেয়; কিন্তু জীবন দেয় না। প্রাণ পশুরও আছে; মানুষেরও আছে। কিন্তু 'জীবন' শুধু মানুষেরই আছে; পশুর নেই। প্রাচীন ভারতে মৃত্যুকে স্বীকারই করেনি। মানুষকে মৃত বলে মানেইনি তারা; মানুষকে তারা বলছে অমৃতের পুত্র। দেহের মৃত্যুকে সে বলেছে জীর্ণ-বসন পরিত্যাগ মাত্র। মৃত্যুকে বলেছে নবজীবনের সূচনা। বর্ষশেষকে নববর্ষারম্ভের। মৃত্যুতে মানুষের হাহাকারকে তুলনা করছে স্তন থেকে স্তনান্তরিত হবার মধ্যে অবুঝ শিশুর ক্রন্দনের মতো। শেষ বলে কিছু আছে এ কথা মনে করতে নারাজ এই এই ভারতবর্ষ! শেষ নেই সে শেষ কথা কে বলবে। জীবনে ফুল-ফোটা হলে মরণে ফল ফলবে! প্রকৃতির সঙ্গে মানবসংগ্রামের ইতিবৃত্ত পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে জীবন-মৃত্যুর রহস্য সমাধানের রাস্তায় জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান এখনও পর্যন্ত গোলকধাঁধায় কেবলই ঘুরে মরছে। একেকটি আবিষ্কার হয়েছে আর মানুষ মনে করেছে এবারে রহস্যর আবরণ বুঝি উন্মোচিত হলো। কিন্তু হতাশায় ভেঙে পড়েছে সে যখনই আবার রহস্যর জট পড়েছে নতুন করে জীবন-মৃত্যুর জটিলতার আর কোথাও। আলো বলে যাকে মনে করেছিলো সে দেখা দিয়েছে আলেয়া হয়ে। শিশু মৃত্যু রোধ করেছে সে নতুন নতুন বহুমূল্য ভেষজের জন্মদানে কিন্তু জন্মের হার বেড়ে গেছে মৃত্যুহারের তুলনায় তার ফলে এখন সেই বিজ্ঞানই আবার মনে ভাবছে জগৎ জুড়ে বেশ কিছু মানুষ মরলে বাঁচি। অর্থাৎ সিসিফাস ঠেলে ঠেলে পাথর তুলছে পাহাড়ের মাথায়; তোলা মাত্রই পাথর আবার পাহাড়ের অপর পিঠ বেয়ে গড়িয়ে গেছে সমান স্পীডে। আবার তাকে ঠেলে তুলেছে মানুষ অসীম ধৈর্যে; আবার সেই পাথর নামতে শুরু করেছে নীচে। এই পাথর তোলা আর গড়িয়ে পড়ার খেলা চলেছে যুগের পর যুগ। মহাকাশযাত্রার মুহূর্তে আজও আবার নতুন করে মনে হচ্ছে মানুষ বুঝি খুঁজে পেয়েছে সেই আলো যা দিয়ে সে দেখবে জীবন-মৃত্যুর রহস্যাবৃত আনন। কিন্তু আবার সে দেখবে যাকে সে আলো মনে করেছে আসলে তা আলেয়া। জীবন-মৃত্যুর সারমেয়-লাঙ্গুল সোজা করার চেষ্টা সফল হবে না কোনও দিন জ্ঞানের অথবা বিজ্ঞানের দুঃসাহায্যে।

প্রাগৈতিহাসিক কালে যে সব অতিকায় প্রাণী একদিন পৃথিবী অধিকার করেছিলো, আজ তারা অনেকেই নেই। নেই তার কারণ যে অস্ত্রকে তারা ধার দিয়ে যত বড় ও তীক্ষ্ন করে তুলেছে সেই অস্ত্রে সে নিজেই একদিন হয়েছে নিহত। মানুষের সব চেয়ে সহায় হয়েছে তার বুদ্ধি। এই ক্রমাগত শাণিত

বুদ্ধিই ডেকে এনেছে তার অন্তিমকাল। এটম স্প্লিট করা মানুষের জয় ঘোষণা করেছে যত না তার চেয়ে অনেক বেশী আসন্ন করছে মানব-সভ্যতার চরম বিপর্যয়। এ যুগের শেষ চিন্তাশিল্পী বার্টাণ্ড রাসেল নিঃসংশয়ে উচ্চারণ করেছেন সেই সতর্কবাণী। এটম গাদা করা আছে যে গোপন জায়গায়, সেখানকার কোনও পাহারাদার যদি ক্ষণকালের পাগলামিতে আগুন নিয়ে খেলা আরম্ভ করে দেয় তা হলে আমরা জানবার আগেই জগৎ জুড়ে নিঃশেষ হয়ে যাবো। পৃথিবী আবার পরিণত হবে দগ্ধ মাটির ঢেলায়।

তাই, জ্ঞানে অথবা বিজ্ঞানে নয়, ধ্যানেই কেউ কেউ কখনও কখনও জীবন-মৃত্যুর রহস্যের পেয়ে গেছে সন্ধান। পেয়েছে বলেই একদা এ ভারতের কোন্ বনতলে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়েছে: নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। শুধু সেই একবার নয়। বার বার ধ্যানীরা প্রেমীরা তার খবর পেয়েছে; কবিরা দিয়েছেন সেই খবর: তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।

জীবন-মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে মানুষের জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানীর দেবার সাধ হয়েছে; কিন্তু সাধ্য হয়নি। সাধ্য হয়েছে যাঁদের তাঁদেরই নাম কখনও ত্রৈলিঙ্গ কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ; কখনও শ্রীচৈতন্য কখনও কবীর। কখনও কবির কলমেও উচ্চারিত হয়ে গেছে তাঁর অজান্তে এর উত্তর:

'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে
সে পায় তোমার হাতে
শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

যুগে যুগান্তরে চিরজাগ্রত মানব-সমুদ্রের অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ হচ্ছেন চিরনিরুত্তর মানব-হিমালয়।

ত্রৈলঙ্গ যখন শিবরাম ছিলেন অথবা তাঁর বাবা নৃসিংহ ধরের নামে নাম মিলিয়েছিলেন ত্রৈলঙ্গধর। সেই সময়েই তাঁর মা তাঁকে বললেন: 'আমার পুত্র না হওয়ায় গৌরীশংকরের পূজা এবং বারোটি ব্রাহ্মণের সেবা করেছিলাম। গৌরীশংকর সন্তুষ্ট হলে তোমাকে পেয়েছি; কিন্তু দ্বাদশ ব্রাহ্মণ সেবার ফল কি তা আজও জানি না। শিবরাম তুমি সন্ন্যাসব্রত নেবেই যে একদিন তা আমি জানি কিন্তু আমার অনুরোধ, এই বারোটি ব্রাহ্মণ-সেবার ফল না জেনে তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ করো না।'

মায়ের মৃত্যুর দশ বছর পর, শিবরাম তখন এক পুত্র ও এক কন্যার জনক, মায়ের সেই একমাত্র জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে বেরুলেন। কাশীতে এক পণ্ডিত তাঁকে ত্রিধারায় নব্যস্মৃতি রচনায় প্রতিষ্ঠ স্মার্ত-পণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্যের কাছে যেতে বলেন। শিবরাম উপস্থিত হয়ে রঘুনন্দনের কাছে তাঁর মায়ের প্রশ্ন

উপস্থিত করেন; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল কি? রঘুনন্দন সে জিজ্ঞাসার এই জবাব দেন যে, একটি ব্রাহ্মণ-সেবার ফল বলা যায় না; দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল কে বলবে? এই রঘুনন্দন শিবরামকে নর্মদাতীরে সাত দিন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর আরাধনা করলে এক মহাপুরুষ এসে তাঁর প্রশ্নের মীমাংসা করে দিতে পারেন,—এমন আশা দেন।

শিবরাম নর্মদার নির্জনতম তীরপ্রান্তে বসে আরাধনা আরম্ভ করলেন মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর। তখনও সূর্যোদয় হয়নি নদীতীরে। গাছে বসে পাখি, মাটির নীচ থেকে বেরিয়ে এসে সাপ, এবং বনের অন্ধকার থেকে বহির্গত শেয়াল সব ভুলে শুনতে লাগলো সেই পাঠ। দেখা দিলেন জটাজূটসমন্বিত বাঘাম্বরে সজ্জিত ত্রিশূলাবলম্বিত এক পুরুষ। এবং তারও কিছু পরে সেই পুরুষের পাশে এসে বসলেন এক গৈরিক-বসনা গৌরী; উন্মুক্তবেশী মহাযোগিনী। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে প্রাজ্ঞপুরুষ সেই মহাযোগিনীকে আদেশ দিলেন শিবরামকে তিনটি বটিকা দিতে। এবং বলে দিলেন যে এক নিঃসন্তান পার্বত্য-রাজার পুত্রলাভ হবে এই বটিকা সেবনে; সেই নবজাত শিশুই কেবল সক্ষম হবে দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল কি, তার সঠিক উত্তর দিতে।

মায়ের প্রশ্ন মাথায় নিয়ে অজানা উত্তর-অভিযানে বহির্গত শিবরাম এক শহরে এসে শুনলেন সেটি অপুত্রক পার্বত্যরাজার রাজধানী। তিনি রাণীকে বটিকা খেতে দিলেন। এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ না হওয়া পর্যন্ত নজরবন্দী রইলেন সেখানে। নবজাতক ভূমিষ্ঠ হয়েই পদ্মাসনে প্রতিষ্ঠপূর্বক হাসতে লাগলেন। শিবরামের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে একটি ব্রাহ্মণ-সেবার ফলস্বরূপ তিনি আজ রাজকুমার. অতএব দ্বাদশ ব্রাহ্মণ-সেবার ফল অনুমেয়।

এই কাহিনী অলৌকিক কিন্তু অলীক নয় যে তার প্রমাণ যিনি এই উক্তির লিপিকার তিনি ত্রৈলিঙ্গর মুখ থেকে শুনে তবে লিপিবন্ধ করেছেন এই ঘটনা। তাঁর নাম, ওঁ স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী। তিনি তাঁর তৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিতে লিখেছেন, "আমি প্রায় একাদিক্রমে ৬২ বৎসর মানস সরোবরে স্বামীজীর চরণকমল সেবায় রত ছিলাম। ঐ সময়ে একদিন তাঁহার জীবনচরিত লিখিবার ইচ্ছা তাঁহাকে জ্ঞাপন করিয়াছিলাম। তাহাতে তিনি প্রসন্নচিত্তে আমাকে বাধা দিয়া উত্তর করিলেন, তুমি আমার সমাধি অন্তে আমি ব্রহ্মে লীন হইলে আমার জীবনচরিত প্রকাশ করিও।"

এই জীবনচরিতেই স্বামী কৃষ্ণানন্দ আরও জানাচ্ছেন। "মহাত্মা একদিন হঠাৎ কি ভাবিতে ভাবিতে আমাকে বলিতে লাগিলেন, আমার বিমাতার এক পুত্র হইলে পর আমার মাতাঠাকুরাণী বিদ্যাবতী পুত্র-কামনায় একনিষ্ঠভাবে গৌরীশংকরের আরাধনা আরম্ভ করিতে লাগিলেন এবং একদিন স্বপ্নে দেখিলেন একটি শুভ্রবর্ণ হস্তী তাঁহার অন্তরে প্রবেশ করিল। তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিদ্রাভঙ্গ হইল এবং তিনি ঐ বৃত্তান্ত স্বামী নৃসিংহধরকে ব্যক্ত করায় তিনি বলিলেন,

বিদ্যাবতী, তোমার এমন একটি পুত্রসন্তান লাভ হইবে, যে ত্রিলোক উদ্ধার করিবে এবং তুমি ধন্য হইবে। অনন্তর ১৫২৯ শতাব্দীর অর্থাৎ বঙ্গীয় ১০১৪ সালের পৌষ মাসের পঞ্চম দিবসে পুষানক্ষত্রে পূর্ণিমা তিথিতে শুক্রবাসরে দিবা সপ্তম ঘটিকায় আমি ভূমিষ্ঠ হই। পিতা পুত্রের কল্যাণ কামনায় যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণগণসহ পুজা হোমাদি আরম্ভ করিলেন। এই সকল বৃত্তান্ত আমি আমার মাতাঠাকুরাণীর কমলমুখাৎ শ্রবণ করিয়াছি। পঞ্চম বৎসরে চূড়াকরণ করিয়াছি এবং অষ্টম বৎসরে আমার উপনয়ন হয়। নামকরণ পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, পিতৃদত্ত নাম তৈলঙ্গধর; মাতৃদত্ত নাম শিবারাধনার জন্য 'শিবরাম'। জননীর স্নেহাধীন হইয়া পাণিগ্রহণ করিয়াছিলাম এবং পিতৃঋণও শোধ করিয়াছি। এক পুত্র ও এক কন্যা হইয়াছিল এবং এই সকল সাংসারিক ব্যবহার সমস্তই দাদা শ্রীধরকে সমর্পণ করিয়া পরমাত্মা পরমব্রহ্ম উদ্দেশ্যে এই সংসার হইতে বাহির হইয়াছিলাম। আমার জীবনচরিত সমস্তই তোমাকে ব্যক্ত করিলাম। আমার দেহান্তে প্রকাশ করিও।"

স্বামী কৃষ্ণানন্দ সরস্বতীর তৈলঙ্গ-জীবনী বলছে, মহাত্মা বিদ্যানন্দ সরস্বতী শিবরামকে দণ্ড-কমণ্ডলু দিয়ে সন্ন্যাসদীক্ষা দেন। তিনি যাবার সময় বলে যান: "বৎস! তুমি ভীমরথীতে কিছুদিন যোগাভ্যাস করিয়া তিব্বত ও মানস সরোবরে যাইও এবং সর্বদা আত্মধ্যানে মগ্ন থাকিও, সেই পরমাত্মাই তোমাকে ব্রহ্মধামে লইয়া যাইবেন।"

উদ্দেশ্যহীন জীবন আমাদের; আমাদের জীবনের বাণী তাই উদ্দেশ্যহীন ব্যর্থ। ত্রৈলিঙ্গর জীবন দিব্যজীবন; তাই তাঁর বাণী দৈববাণী!

লৌকিক জগৎ ত্রৈলিঙ্গর অলৌকিক পরিচয় প্রথম পায় সেতুবন্ধ রামেশ্বর মেলায় ১১08 সালে। মেলায় দ্বিতীয় দিনে একজন ব্রাহ্মণ সর্দিগর্মিতে প্রাণ হারান। হাহাকার পড়ে যায় মেলায় সেই ব্রাহ্মণের আত্মীয়-বান্ধবকুলে। মেলার আনন্দ মুছে গিয়ে আকাশ ভরে ওঠে বিচ্ছেদ-বেদনায়; বাতাস ভারি হয়ে ওঠে অশ্রুজলে। তারপর এক সময়ে তারা ব্রাহ্মণের সৎকার-উদ্যোগ শুরু করলে এক অতিকায় মানব এসে দাঁড়ান তাদের সামনে। আশ্চর্য চেহারা সেই সন্ন্যাসীর আবির্ভাব ওই দুঃসময়ে ঝড়ের যাত্রীদের চোখে যেন তীরের স্বপ্ন জাগিয়ে তুললো। যেমন ভয়ংকর আস্য, তেমনই অভয়ংকর হাস্য। মাথা যেন আকাশ পেরিয়ে অন্য কোনও আকাশ স্পর্শ করে। দৃষ্টি যেন সুদূর অস্ত-অচলে নিবদ্ধ; মাথায় জটাজাল,—তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখা দেয় সেখানে যেন 'ক্ষীণ শশাংক বাঁকা'; অমাবস্যার ভয়ংকর অন্ধকার আননে অভয়ংকর হাসির বিদ্যুচ্ছটায় আশংকা ও আশার লুকোচুরি খেলছে; সুবিপুল সেই মানুষের কণ্ঠস্বর যেন মধ্যরাত্রির বন্দর ছেড়ে যাওয়া জাহাজের

ঘর-ছাড়ার দিক-হারাবার জলদ গম্ভীর আহ্বান। মুখে আগুন দেবার মুহূর্তে উচ্চারিত হয় 'বহুদূরে সমুদ্রের বিষণ্ণ নাবিকের গানের' সুরে: একে পোড়াচ্ছ কেন বাবা? আত্মীয়দের মধ্যে একজন উত্তরে বলে: প্রাণ নেই যে দেহে। উত্তর শোনা মাত্র সন্ন্যাসীর বিকট অট্টহাস্যে আকাশ দু'ফাঁক হয়ে যায়, রামপ্রিয়ার আকুল আকূতিতে একদিন যেমন মাতা ধরিত্রীর বুক বেদনায় বিদীর্ণ হয়েছিলো সংখ্যা গণনার অতীত এক দিবসে। হাস্য সংবরণ করে সন্ন্যাসী প্রত্যুত্তর করেন; এর প্রাণ এখনও আছে কমণ্ডলুর এই বারিতে।

জলের ছিটেয় মুহূর্তের মধ্যে জেগে ওঠে সগরসন্তানের শরীরে জীবনের চিহ্ন!

কিন্তু মুহূর্তকাল পরে আর দেখা যায় না বৃষস্কন্ধ, আজানুলম্বিত-বাহু মানবহিমালয়কে। মৃতের চোখে আবার পলক পড়বার আগেই, অমৃতপুরুষ ত্রৈলিঙ্গ পলকের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন; উধাও হয়ে গেছেন কোথায় তা কে বলবে!

বার বার ত্রৈলিঙ্গ নিজেকে আড়াল করতে চেয়েছেন; অলৌকিক এই মায়ার জগতে স্থগিত রাখতে চেয়েছেন নিজের শক্তির বিকাশ। বার বার মর্ত্যলোকের আকুল আহ্বান অমর্ত্যলোকের ঘুম ভাঙিয়েছে তবু—ধরা দিতেই হয়েছে অধরাকে। ধরা দিয়ে এই ধরাকে বিপন্মুক্ত করার পরেই তিনি অদৃশ্য হয়েছেন। তবু ছড়িয়ে গেছে যেপথ দিয়ে হেঁটে গেছেন তিনি যে জল দিয়ে গেছেন ভেসে, তার রেণুতে রেণুতে, তার বিন্দুতে বিন্দুতে অমৃতনিস্যন্দ! ফুল ফুটলে তার গন্ধ জড়িয়ে যাবেই আকাশের কালো কেশে, চাঁদ উঠলে তার বাঁধভাঙা আলো হেসে গড়িয়ে যাবেই সমুদ্রদেহে; মহামানব এলে দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগবেই মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে!

এই মুক্তপুরুষকে বাঁধবার চেষ্টাও হয়েছে বার বার! বার বার ব্যর্থ হয়েছে তাও!

সমস্ত দিক যাঁর অম্বর তিনিই শুধু দিগম্বর হতে পারেন। ত্রৈলিঙ্গ তাই দিগম্বর। কাশীতে এই সত্যের মতো, সূর্যের মতো, মানবপুত্রের ভূমিষ্ঠ-বেশের মতো, পুণ্যের মতো, পবিত্রতার মতো, পূর্ণতার মতোই নিরাভরণ নিরাবরণ নির্মম উলঙ্গ ত্রৈলিঙ্গকে কয়েকজনের প্ররোচনায় এক পুলিশ হাজতে দেবার নির্দেশ দেন। পরের দিন সকালে সাহেব দেখলেন হাজত ভেসে গেছে সন্ন্যাসীর মূত্রে; আর সন্ন্যাসী হাসছেন হাজতের বাইরে দাঁড়িয়ে। সাহেবের বিস্ময়-বিস্ফারিত দৃষ্টির উত্তরে ত্রৈলিঙ্গ প্রত্যুত্তর করলেন: "আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন, চাবি বন্ধ করিয়া কেহ কাহারও জীবন আবদ্ধ রাখিতে পারে না। তাহা হইলে মৃত্যুকালে হাজতে দিলে ত আর কেহ মরিত না।" ['ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবনচরিত' — কৃষ্ণানন্দ সরস্বতী]

স্বামীজীর বন্ধনমুক্তির হাসিই তো রবীন্দ্রনাথের কবিতা !—

'আমারে বাঁধবি তোরা সে বাঁধন কি তোদের আছে ?
আমি যে বন্দী হতে সন্ধি করি সবার কাছে !'—

এই একবার নয়। আরেকবার,—নর্মদার তীরে দাঁড়িয়ে তৈলঙ্গধরের ইচ্ছা হলো দুগ্ধপানের। নর্মদার নীল জল হলো শুভ্রবরণ ; জলধারা পরিবর্তিত হলো দুগ্ধধারায়। তৈলঙ্গধর অঞ্জলি ভরে মেটাতে লাগলেন তিয়াস। আরেক-জনও ঐ সময়ে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন সেই দৃশ্য। তার নাম খাকি-বাবা। তিনিও দুগ্ধপানের ইচ্ছেয় যেই স্পর্শ করলেন, দুগ্ধধারা আবার প্রত্যাবর্তন করলো জলধারায়। লোকে একেই বলে অলৌকিক। কিন্তু এর চেয়ে লৌকিক আর কি ? মা-টির প্রতিমাকে যে মাটির পুতুল মনে করবে সে-ই পৌত্তলিক ; কিন্তু মাটিতে পুতুলে 'মা'-টির প্রতিমা যে দেখতে পাবে সে খেতে দিলে খাবে না কোন্ মা ? সে মায়ের পায়ে কুশাঙ্কুর বিঁধিয়ে দিলে কেন বেরুবে না রক্ত সেই রক্তপদ্মপদ থেকে ?

লোকে পুণ্যতিথিতে স্নান করে গঙ্গায় ; পাপমুক্ত হয় না তবু। কেন ? কারণ—নর্মদাকে যে প্রাণদা, 'সর্ব'-দা মনে করে নর্মদা তাকেই দেয় জলের বদলে দুধ। নর্মদাকে যে নদী মাত্র মনে করে তার কাছে নর্দমা আর নর্মদায় তফাত কোথায় ?

যে যা দিনে যত দিতো, যতক্ষণ দিতো ত্রৈলিঙ্গ তাই নিতেন, তত নিতেন ততক্ষণ নিতেন। তাই দেখে একদিন ভ্রান্ত কয়েকজন জলের সঙ্গে চুন আর আফিং গুলে খাইয়ে দেয় তাঁকে। ত্রৈলিঙ্গস্বামীর তা গলাধঃকরণ, নীলকণ্ঠ একদা বিষপান করেছিলেন যেমন অনায়াসে তেমনিই নির্দ্বিধায়। তারপর তাকে বার করেছেন প্রস্রাবের সঙ্গে ত্রিধারায় ; জল, চুন আর আফিং আলাদা আলাদা করে। বহু ভক্ত কখনও-কখনও তাঁর অঙ্গে পরিয়ে দিতো মহার্ঘ্য অলঙ্কার। বহুতর লোভী আবার তাঁর গা থেকে খুলে নিতো সেই গয়না। ত্রৈলিঙ্গ পরিয়ে দেবার সময়ও যেমন, খুলে নেবার সময়ও তেমনই নির্বিকার। অলঙ্কারই যাদের একমাত্র অহঙ্কার তারা গয়না দিলে আনন্দিত এবং খুলে নিলে আন্দোলিত হতে পারে ; কিন্তু ওঁকারই যাঁর একমাত্র রণহুঙ্কার তাঁকে নিরলঙ্কার করবে কে ?

২৮০ বৎসর মর্ত্যলোক এই অমর্ত্যলোকের লীলা প্রত্যক্ষ করে দেহত্যাগের পূর্বদিন ত্রৈলিঙ্গ বললেন : "আগামী কাল একখানা নৌকা ভাড়া করিবে, দেহ-ত্যাগের পর সিন্দুকে আমার দেহ বন্দী করিয়া, অসি থেকে বরুণা পরিভ্রমণের পর গঙ্গাগর্ভে নিক্ষেপ করিবে। অন্য সৎকারের প্রয়োজন নাই।" পরের দিন

সকাল আটটায় আবার বললেন : "সমস্ত দরজা বন্ধ করিয়া দাও ও যে পর্যন্ত আমি দরজায় আঘাত না করিব ততক্ষণ কেহ দরজা খুলিও না।" বেলা তিনটেয় দরজায় আঘাত পড়লো। সংসারের বন্ধ দরজায় সংসারমুক্ত পুরুষের সেই শেষ আঘাত!

গঙ্গাগর্ভে সিন্দুক ভাসিয়ে দেবার আগে লোকশ্রুতি আছে—সিন্দুক খোলা হয় একবার, শেষ দর্শনের জন্যে। কিন্তু খোলার পর দেখা যায় যে ত্রৈলিঙ্গর দেহও তাঁর আত্মার সঙ্গে মুক্ত হয়ে গেছে, ত্রৈলিঙ্গর দেহ নেই সিন্দুকে।

শ্রুতি নয়; সত্য। অসীম সিন্ধুকে কে বন্দী করতে পেরেছে কবে লোহার সিন্দুকে?

॥ দশ ॥

ত্রৈলিঙ্গস্বামী যেখানে মূর্তির মধ্যে মূর্ত হয়ে আছেন সেইখান থেকে হোটেলে ফিরে,—কাশীর গ্র্যান্ড হোটেল যাকে বলে, শুনি হৈ-হৈ কান্ড রৈ-রৈ ব্যাপার। একজন কাল রাতেও ফেরেনি; আজ সকালেও না। এবং হোটেলের অভিজ্ঞতায় বলা চলে আর ফিরবেও না। কিন্তু তার মালপত্তরের তাহলে কি হবে? হোটেলের অভিজ্ঞতায় তারও অবধারিত উত্তর হচ্ছে সে মালপত্তর পড়ে রইবে; তবুও মালিক ফিরবে না। ফিরবে না কারণ, মালপত্তর বলতে একটা ছাতাপড়া মরচে-ধরা টিনের বাক্স; বাকী উসুলের জন্যে মালিক পালালে যার মধ্যে থেকে বেরুবে কেবল কয়েকটা থান-ইঁটের ভাঙা টুকরো। আজকেও যে তার ব্যতিক্রম হবে না হোটেলের মালিকের ঘরে, মালিক অথবা ম্যানেজারের ঘরে মালিক অথবা ম্যানেজারের ফোড়েদের মধ্যে সে বিষয়ে দ্বিমত নেই। তাদের মধ্যে তখন উত্তপ্ত আলোচনা চলছে পলাতক সম্পর্কে; পলাতকের নামটি শুনেই আমি দাঁড়িয়ে গেলাম; হাবলু গাঙ্গুলী।

রবিন হুড শুনলে একদিন রাজার অনুচরেরা; মোহন দত্তের শশধরের নাম শুনলে যেমন পুলিশ সুপার; শার্লক হোমসের নাম শুনলে যেমন নিরপরাধ ব্যক্তির বুক ঢুকে যায়, শুকিয়ে যায় মুখ, হাত পা ঠান্ডা হয়ে আসে, হাবলু গাঙ্গুলীর নাম শুনলে তেমনই তার পরিচিতদের মাথা ঘুরে যায় মুহূর্তে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পূর্ববর্তী প্রেসিডেন্সী-স্কটিশের যাঁরা ছাত্র কিংবা শিক্ষক হাবলু গাঙ্গুলীকে আজও তাঁদের মনে গেঁথে আছে নিশ্চয়ই। হাবলু গাঙ্গুলীকে মনে রাখা নয়; ভোলাই শক্ত। তাঁদের আরও ভোলা যা শক্ত তা হচ্ছে হাবলু গাঙ্গুলীকে আমরা হাবলু 'জি' বলতাম; হাবলু বাঁড়ুজ্যে বলে আরেকজন ছিলো,—যার সঙ্গে না গুলোবার জন্যে। হাবলু গাঙ্গুলী ছিলো হাবলু 'জি'; হাবলু বাঁড়ুজ্যে, হাবলু 'বি'। হাবলু 'বি' এতদিনে বিয়েটিয়ে করে নিশ্চয়ই

বাপের দয়ায় এখন বড় চাকরি, বাড়ি গাড়ি সবই করেছে। পৃথিবীতে অসংখ্য সাকসেসের গড্ডালিকায় হারিয়ে গেছে হাবলু 'বি'। কিন্তু হাবলু 'জি' ঠিক আছে। জনি ওয়াকার কেবল স্টিল গোয়িং স্ট্রং ; হাবলু 'জি' স্ট্রং থেকে স্ট্রংগার হলো দিনে দিনে। সারা জীবন ধরেই তার শুক্লপক্ষ। প্রত্যেক দিনই সে বাড়ছে, এক কলা দু'কলা করে। ষোলো কলা পূর্ণ করা পঞ্চদশীর রাত তার জীবনমহাকাব্যে এখনও অনেক পরের অধ্যায়।

সেই হাবলু 'জি'। আমার সঙ্গে তার আলাপ, ইজের পরা বয়সেরও আগে থেকে। আমরা এক মা-মাসীর কোলে-পিঠে মানুষ ; এক টোলে পড়ুয়া এবং কলেজেও একই বছরের একই ক্লাসের মেট। কিন্তু হাবলু 'জি' আজ নয় সেই প্রথম দিন থেকেই আমার এবং পরবর্তী জীবনে আমাদের সকলেরই অবিসম্বাদী লীডার। আমরা সেদিন কে তার গোয়েবল্‌স্‌ গোয়েরিং ছিলাম, জানি না ; কিন্তু সে আমাদের সকলেরই যে একমাত্র 'ফুয়েরার' ছিলো জানি। তফাতের মধ্যে এই জার্মান ফুয়েরার তাঁর দলবল এবং নিজেকে একবার ডুবিয়েছেন ; আমাদেব ফুয়েরার আমাদেরকে কতবার ডুবিয়েছেন বলা শক্ত ; কিন্তু নিজে ডোবেননি একবারও সেকথা বলা শুধু সহজ যে তাই নয় ; বলা বোধ হয় বাহুল্য।

একটি চাল টিপলেই যেমন বোঝা যায় ভাত সিদ্ধ হয়েছে কিনা ; তেমনই হাবলু 'জি'-র কীর্তির এক কণা নমুনা দিলেই জ্ঞান হবে যে সে তার কীর্তির চেয়ে কত মহৎ। তখন আমরা দুজনেই মিত্র স্কুলের ভবানীপুর শাখার ছাত্র ; কোন্‌ ক্লাসে পড়ছি অথবা এখন বলতে বাধা নেই আর, পড়ছি না অথচ, মনে নেই। আমাদের অংক কষাতেন তখন বিখ্যাত কেশব নাগ মহাশয়, পরবর্তী কালে ওই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, বর্তমানে বোধ হয় অবসর উপভোগ করছেন অঙ্কের নূতন কোনও সমস্যা নিয়ে। সেই ক্ষীণ কলেবর কিন্তু বিপুল প্রতাপ কেশব নাগ মহাশয় গরমের্‌ ছুটিতে আঁক কষে আনতে দিয়েছেন—কম করে শো দুয়েক। কিন্তু ছুটি মানেই তো ছুটোছুটি। আজ করি, কাল করি করে করে, দার্জিলিং যাবার আগে করি, দার্জিলিং থেকে ফিরে এসে করি করি করে শেষ অব্দি প্রতিবছরই যা হয়, স্কুল খুলতে যখন আর দিন দুয়েকও নেই পুরো, তখন শরণাপন্ন হতেই হয় আমার আদি ও অকৃত্রিম বন্ধু শ্রীমান হাবলুর। হাবলু 'জি'-র।

হাবলু ঘাবড়াতে বারণ করে কেবল বলে : কেশববাবুকে আমি যা বলব, তুইও তা-ই বলবি ; ব্যস্‌,—দেখবি কেশববাবু বকবেন তো না-ই ; বরং—। হাবলু বাকীটা বলে না ; আমি আন্দাজ করে নিই। বোধ হয় আদর করবেন,—গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ;—ভাবি,—এই কথাই, এই আশাই হাবলু আমার ভীতু মনে জাগাতে চায় ; আমার ভয়ংকর ভীতু মনে। কিন্তু হাবলুর কথা শেষ পর্যন্ত সত্য হয়। কেশববাবু আদরই করেন শেষ পর্যন্ত। আমাকে

আদর করেন ; একলা আমাকেই ; হাবলুকে নয়। ওরকম আদর ছ'বছরের মধ্যে স্কুলে আর কেউ পেয়েছে বলে মনে পড়ে না। কিন্তু হাবলুকে কেন আদর করেন না,—হাবলু কি করে বঞ্চিত হয় কেশব নাগের স্নেহান্তসুখস্পর্শ থেকে,—সে কথা জানলেই হাবলুকে জানা হয়! এখন সে কথাই বলছি।

স্কুল যথারীতি খুললো এবং কেশববাবু ক্লাসে এসে যথারীতি হোম-টাস্‌ক্ দেখতে চাইলেন প্রত্যেকের। হাবলুর চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা, রুগ্ন চেহারা। হাবলুর টার্ন আসতেই হাবলু খুব মিহি গলায় বলে : 'হয়নি'। 'কেন?' কেশববাবুর গর্জনের উত্তরে আরও মিইয়ে গিয়ে আরও মিহি গলায় হাবলু প্রায়াশ্রুত কণ্ঠে বলে : ম্যালেরিয়া হয়েছিলো। 'বোসো',—কেশব নাগের গলা আশ্চর্য মোলায়েম। শুনে ভরসা হয়। কেশববাবুর আমাকেও ওই এক প্রশ্ন : হোম-টাস্‌ক্? 'হয়নি',—আমার উত্তর। 'কেন?' 'ম্যালেরিয়া হয়েছিলো।' আমার উত্তরের মধ্যে কি ছিলো কে জানে, সেই উত্তর শুনে,—ক্লাসের উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম থেকে কেশববাবুর দোর্দণ্ড ব্যক্তিত্ব বিস্মৃত হাসির হররায় ছাদ ফেটে যাবার যোগাড়! এমন হাসি কল্লোল যুগের উপন্যাস পড়েও কেউ কখনও হাসেনি। কিংবা জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় না পড়ে ; নবনাট্যান্দোলনের কবলিত অভিনয় কি নিওরিয়্যালিস্টিক ছবির সিয়েরিয়াস দৃশ্যেও এমন হাসি স্ত্রীলোকের হাসার বড় বেশি সুযোগ ঘটে না!

কেশববাবু আমাকে ডেকে কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করেন, 'কি হয়েছিল তোমার?' 'ম্যালেরিয়া',—আবার উত্তর করি। আবার হাসিতে কড়িবরগা কাঁপতে থাকে ক্লাসের। কেশববাবু ক্লাসের উদ্দেশে বলেন : 'দেখো, ম্যালেরিয়া হলে কেমন টম্যাটোর মতো লাল আর ফুলো ফুলো হয় গাল!' বলেন,—আর মারেন মাথায়। গাঁট্টা মারেন আর বলেন। গাঁট্টা নয়। গাঁট্টার চেয়ে একটু বেশিই বোধ হয় সেগুলি ; গাঁট্টাগোট্টা। আমার চোখে জল ; সকলের মুখে হাসি! সব চেয়ে বেশি হাসি,—অবশ্যই, বলা বাহুল্য,—হাবলুর মুখে নয়, দু'চোখে। আমাদের হাবলু 'জি'-র!

আরেকবার। কাশীর হোটেলে হাবলু 'জি'-র এই পালাবার কয়েক মাস আগে,—কাশ্মীর যাচ্ছে হাবলু। সঙ্গে তার স্ত্রী অনিতা, একটি কয়েক মাসের বাচ্চা, হাবলুর ভাই, এক শ্যালক এবং হাবলুর প্রধান শাগরেদ পিকলু চ্যাটার্জি। রাতে শুতে যাবার আগে, টিকিট-টাকা-সুদ্ধ পার্স বউ-এর হাতে দিয়ে শুতে গেলো হাবলু : আমাদের হাবলু 'জি'। বউ সেটিকে বালিশের তলায় রেখে,—ঘুমোতে গেলো লোয়ার বার্থে। ডোরিয়ানশোনএ চা দিতে এলো এবং তারপর আর পার্স পাওয়া গেলো না। হাবলুর বউ-এর কান্না, শালা ভাইদের যোগদান, পিকলু নার্ভাস। সকলের মত,—ফিরে চলো, ফিরে চলো আপনার ঘরে। হাবলুর মাথাও এক মুহূর্তের জন্যে ঘোরে ; তারপর আবার

যে হাবলু 'জি', সেই হাবলু 'জি', বলে : না ; বেরিয়েছি যখন তখন কাশ্মীর হয়ে তবে ফিরবো।

চেন টানা ; গাড়ি থামা ; গার্ড আসা ; যথারীতি যাত্রা নাটকের দৃশ্য পর পর অভিনীত হয়। হাবলুকে ট্রেন-কর্তৃপক্ষ বলেন যে হাবলুকে নেমে যেতে হবে এখনই ; এখনই ! কেন ? হাবলুর জিজ্ঞাসার জবাবে রেলওলা জনৈক উচ্চপদস্থ জানান ; কারণ আপনি ডবলিউ-টি অর্থাৎ উইদাউট টিকেট ট্র্যাভেল করতে পারেন না। ঠিক সেই মুহূর্তেই হাবলুর মুখ দিয়ে সেই মোক্ষম উত্তর বেরোয় ; আলবৎ পারি ; আমি বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার। বাল্মীকির মুখ দিয়ে যেমন একদিন শরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের বেদনায় উচ্চারিত হয়েছিলো প্রথম কাব্য ; গান্ধীজীর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিলো সেই বিখ্যাত ব্রিটিশ বিতাড়ন উক্তি : কুইট ইণ্ডিয়া ; হাবলুর মুখ দিয়ে ঠিক তেমনই উৎসারিত হলো বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার।

স্লোগান নয় ; মেশিনগান। আঁকড়ে ধরে আগাগোড়া রাস্তা যেখানেই নেমে যাবার কথা বলবার জন্যে আক্রমণের সম্ভাবনা সেখানেই ঘুরিয়ে গেল হাবলু ওই ঐক্য-বাক্য-মাণিক্য : বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার। ডোরিয়ানশোন,—যেখানে এই দুর্ঘটনার সূত্রপাত সেখানে ট্রেন বেশিক্ষণ দাঁড় করানো গেলো না। ঠিক হলো দিল্লিতে হাবলুকে নামিয়ে দেওয়া হবে সপরিবারে,—আর পাদমেকং দেওয়া হবে না এগুতে। হাবলু দিল্লিতে গাড়ি লাগতেই পাঠানকোট রাউণ্ড গাড়িতে বউ, শালা, ভাই এবং শাগরেদকে তুলে দেওয়ার পর,—রেলকর্তৃপক্ষের সঙ্গে একা লড়ে গেল সেই একমাত্তর অস্তর দিয়ে : বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার। অবশেষে কর্তৃপক্ষ একসময়ে মেনে নিল যে হাবুল, হাবলু-'জি' বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার ! কিন্তু তখন তারা নতুন প্রশ্ন তুললো হাবলুই হাবলু-'জি' তার প্রমাণ কি অর্থাৎ হাবলু 'জি'-ইয়ে সেই বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার তার প্রমাণ কি ? হাবলু প্রশ্ন করে এবার,—কি প্রমাণ চান ? রেলকর্তৃপক্ষ বলে : দিল্লিতে আপনাকে চেনে এমন কেউ আছে ? আছে। কে ? ডক্টর প্রসাদ ! হাবলুর উত্তর শুনে নিরুত্তর হয় রেলকর্তৃপক্ষ বটেই ; ইঞ্জিনের বাঁশি পর্যন্ত।

পাঠানকোট থেকে কাশ্মীর ডিলাক্স-বাস সার্ভিস। সেখানেও হাবলু 'জি'-র টিকিট ওই : বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার ! কাশ্মীরে গুলমার্গে জ্ঞান হয় হাবলুর, 'জি'-র যে সে তার অন্তত কাশ্মীর আসার মানে হয় না কোনও। 'কারণ' কলকাতাতেও তো সে গুলমার্গেই থাকে সারাদিন !

ফেরার পথে দিল্লিতে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় যথারীতি। অর্থাৎ যাবার সময় যারা আটকে ছেড়েছিলো, এবার তারা আটকায়। হাবলুকে তারা বলে : কি মশাই, খুব যে বলে গেলেন, ডক্টর প্রসাদ আপনাকে চেনেন ; কই তাঁর কোনও সেক্রেটারি তো কোনও জন্মে আপনার নাম শুনেছেন বলে স্বীকার করলেন না ! হাবলু 'জি' এতটুকু না দ্বিধা করে পাল্টা প্রশ্ন করে : ডক্টর প্রসাদের আবার

সেক্রেটারি কি ? তাঁর আবার সেক্রেটারি হলো কবে, এ্যাঁ ? উত্তর শুনে এবার কিন্তু নিরুত্তর হয় না রেলওলা ; আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে : রাজেন্দ্র-প্রসাদের সেক্রেটারি নেই ? জানেন একথা বললে সিডিসন হয় ? নিস্পৃহকণ্ঠ হাবলু 'জি' জবাব দেয় : জানি। রাজেন্দ্রপ্রসাদের সেক্রেটারি থাকবে না কেন ? তিনি দরিদ্র ভারতরাষ্ট্রের প্রথম পুরুষ,—ইণ্ডিয়া দ্যাট ইস্ ভারত এর যত পপুলেশান তার অর্ধেক হওয়া উচিত তাঁর সেক্রেটারি ! রেল-কর্তৃপক্ষ বোকার মতো হয়ে যায় ; তবে যে বলেছিলেন ডক্টর প্রসাদ , তাহলে তিনি কে ? হাবলু 'জি' উত্তর দেয় তৎক্ষণাৎ ! তিনি দিল্লির একজন দাঁতের ডাক্তার ; আমার কাছে এখনও কিছু টাকা পান ; তাই তাঁর নাম নির্ভয়ে বলেছিলাম,—কারণ তাঁর পক্ষেই আমাকে মনে রাখা সব চেয়ে সহজ। রাজেন্দ্রপ্রসাদকে ডক্টর প্রসাদ বলতে যাব কোন কারণে ? তিনি কি আমার এয়ারবন্ধু ? তাহলে বলতাম, প্রেসিডেণ্ট ; আর তিনি আমাকে জানলে,—আমার মতো একজন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জারকে আপনারা এমন অপদস্থ করতে সাহস করতেন ? বলুন, আপনারাই বলুন ?

এর পর হাবলু 'জি'-র কলকাতার ঠিকানা নিয়ে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় রেলকর্তৃপক্ষ ; ট্রেনে করেই ছেড়ে দিতে হয় অবশ্য ; সপরিবারেই ছেড়ে দিয়ে আসতে হয় ; –হাওড়া পর্যন্তই পৌঁছে দিতে হয় অবশেষে ! হাবলু, আমাদের হাবলু 'জি' বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার যে !

কলকাতায় ফিরে জামাকাপড় গুছিয়ে আলমারিতে তুলতে গিয়ে বাক্সর তলা থেকে বেরিয়ে আসে হাবলুর সেই হারানো পার্স ! হাবলুর বউ-এর আবার শুরু হয় নতুন করে কান্না। এরই জন্যে এত হেনস্তা, - অথচ সেই পার্স হারায়নি, কেউ চুরি করেনি, দিব্যি দিবানিদ্রা দিচ্ছে কাপড়ের গাদায় ? তারপর পার্স খুলতেই টাকা, কানের দুল সব পাওয়া যায় ; পাওয়া যায় না শুধু টিকিট। হাবলু বলে : তাইতো টিকিটটা শুধু কে নেবে ? এমন সময় হাবুল, হাবলু 'জি'-র চোখ আর তার বউ অনিতার চোখ মিট করে ; শুভদৃষ্টি হয় আবার নতুন করে। হাবলুর বউ যেন আলো পায় ; তার চোখে জলের বদলে এখন হাসির রামধনু ; সেই রামধনুতে সহাস্যপ্রশ্ন ঝিলিক দেয় : আচ্ছা, সত্যি করে বলো তো ; টিকিট কিনেছিলে তো আদৌ ?

প্রশ্ন শুনেই পিছু হঠতে থাকে, বাথরুমের দিকে হাঁটতে থাকে হাবলু ; আমাদের হাবলু 'জি'। কাঁধে তোয়ালে, হাতে দাঁতমাজা ব্রাশ, পিছন না ফিরেই জবাব দেয় : কি যে বলো ? টিকিট কিনিনি মানে ? আমি একজন বোনাফাইড প্যাসেঞ্জার !

সেই হাবলু, হাবলু 'জি'-র ট্রাংক ভাঙতে উদ্যত যখন হোটেলওলার ফোড়েরা —তখন আমি আর থাকতে পারলাম না ; গেলাম মালিকের কাছে। বললাম :

ট্রাঙ্ক ভাঙলে বিপদে পড়বেন ; এই হাবলু গাঙ্গুলীকে আমি চিনি ; কলকাতা-সুদ্ধ সবাই চেনে ; কলকাতার নামকরা ছেলে ! আরেকটু অপেক্ষা করুন না হয়। হোটেলের মালিক যদি বা ঘাবড়ালেন শুনে, ফোড়েরা অকুতোভয় [প্রভু যত বলে পারিষদ দলে বলে তার শত গুণ]। তার ওপর ফোড়েরা প্রায় সবাই কাশীর ছেলে। কলকাতার ছেলেকে তারা কেয়ার করতে চাইবে কেন। তাই তারা কোরাসে, আমার, হাবলুর ট্রাঙ্কভাঙার ব্যাপারটা আপাতত মুলতুবি রাখার প্রস্তাব নামঞ্জুর করবে। : আমরা ট্রাঙ্ক ভাঙবই। বিরোধীপক্ষকে বুঝিয়ে ঠাণ্ডা করবার চেষ্টায় মেজাজ ভালো থাকলে ডক্টর রায় যেমন কায়দায় কথা বলেন তার অনুকরণ করি অতঃপর : ট্রাঙ্ক ভেঙে কি পাবেন ? কিন্তু হা হতোস্মি ! চোরা না শুনে ধর্মের কাহিনী হোটেল-তলার ফোড়েরা চতুর্গুণ চীৎকার করে ওঠে : পাব কয়েকটা ঢিলপাটকেল জানি কিন্তু যদি কোনও এতটুকু হদিস পাই হাবলু গাঙ্গুলীর ঠিকানার, তাহলে থানাপুলিশ হয়ে যাবে এবার ! কলকাতার ছেলেদের শিক্ষা দেওয়া দরকার। ইঁট-পাটকেল বোঝাই ট্রাঙ্ক জামীন রেখে টাকা না দিয়ে পালিয়ে যাওয়া কাশীর হোটেল থেকে, —আর হতে দেব না !

তর্ক করা বৃথা বুঝে বললাম : তাহলে ভাঙুন ! বারান্দায় বেরিয়ে আসতে আসতে শুনলাম একজন ফোড়ে বলছে : না বললেও ভাঙতুম !

বারান্দায় এসে সিগারেট ধরালাম। অপেক্ষা করতে লাগলাম হাবলুর, হাবলু 'জি'-র। সিগারেটের নীল ধোঁয়া স্পাইর‍্যাল সিঁড়ির মতো ঘুরে ঘুরে উঠতে লাগলো স্বর্গলোকের দিকে। আর তারই সঙ্গে ঘুরতে লাগলো আমার মাথা। ঘুরে ঘুরে আসতে লাগলো কাশীর গ্র্যান্ড হোটেলে এই আড়াই দিনের অভিজ্ঞতা ! ছবির মতো রিলের পর রিল অবারিত হতে থাকে মনের পর্দায়। আশ্চর্য সব চিত্র আশ্চর্যতর কত চরিত্র !

মহাভারতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন মুখব্যাদান করে। স্বাধীন ভারতে বিশ্বরূপ দেখতে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিয়ে যেতেন যে কোনও হোটেলে। রবিঠাকুর লিখেছেন, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া ; হোটেলে বাস করলে রবীন্দ্রনাথ জানতেন, ঘর হতে দু'পা ফেলিবারও প্রয়োজন নেই ; ঘরে বসেই এমন সব দৃশ্য চোখে পড়তো যাতে বাইরে যাওয়া হতো বাহুল্য। পৃথিবীর কবিকুল দুনিয়াকে পান্থশালার সঙ্গে তুলনা করেছেন। পান্থশালা হোটেলেরই প্রথম সংস্করণ। যে পৃথিবী পান্থশালা ছিলো, সে পৃথিবী আজ আর নেই ; জটিল হয়েছে অনেক। তাই তার তুলনা আজ হোটেলের সঙ্গেই দিতে হয়। শেক্সপীয়ার যেমন আজ জন্মালে, ওয়ার্লড ইজ এ স্টেজ লিখতেন না, ওয়ার্লড ইজ এ ফিল্ম স্টুডিও, লিখতে বাধ্য হতেন ; ওমর খৈয়ামও

তেমনই আজকের পৃথিবীকে পান্থশালা বলতেন না। মডার্ন ওয়ার্ল্ড হচ্ছে আলট্রা-মডার্ন হোটেল।

এই যাকে কাশীর গ্র্যান্ড হোটেল বলেছি, আসল গ্র্যান্ড হোটেলের তুলনায় যা ন্যুয়ার্কের তুলনায় কলকাতাও নয় ;—সেই কাশীর গ্র্যান্ড হোটেলে আড়াই দিনের মধ্যেই যা দেখবার দেখলাম, একাশীবার পৃথিবী ঢুঁড়েও এর চেয়ে বেশী কি দেখতাম। পৃথিবীটা যদি জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের অভিধান হয়, কাশীর গ্র্যান্ড হোটেল তবে রাজশেখর বসুর চলন্তিকা ; তফাত মাত্র এই। চলন্তিকা থেকে জ্ঞানেন্দ্রাভিধানের সেই সব কথার মানে বাদ দেওয়া হয়েছে যা বাদ দিয়ে বরবাদ করেও কাজ চলে। কাশীর গ্র্যান্ড হোটেলেও পৃথিবীর সব দৃশ্যই দেখা যাবে ; কেবল সেই সব দৃশ্যই কেবল অদৃশ্য, যা না দেখতে পেলেও মানবচক্ষের দেখার ক্ষমতার সীমা নিয়ে দুঃখ করার সময় অত্যন্ত অল্প অথবা একেবারেই নেই।

কাশীর এই গ্র্যান্ড হোটেলেই শুধু নয়। পৃথিবীর সব হোটেলেই একখানা খাতা আছে। তাতে আপনার নাম-ঠিকানা, বাবার নাম, আসার উদ্দেশ্য এবং থাকার বাসনা কতদিন সব লেখাবার নিয়ম। খাতাখানা সই করে দিলেই আপনার ছুটি। আপনি ঠিক লিখলেন কি গুল দিলেন তার দায়িত্ব যারই হোক ; হোটেলওলার দায় নেই বিন্দুমাত্র। কলকাতার নাগরিক যেমন যে কোনও রেস্তোরাঁয় ঢুকে যে কোনও খাবারে মুখ দিতে পারে নিশ্চিন্তে, যদি শুধু ঢোকবার মুখে বড় বড় অক্ষরে দাগানো থাকে : No BEEF ! ব্যাস ! 'No BEEF' লিখে যে কোনও মাংস দাও,—খেতে আপত্তি নেই কারুর !

অথবা কলকাতায় যে কোনও বাড়িতে যে কোনও লোকের মাথার ওপর একটা তিন বা চার ব্লেডের পাখা থাকা চাই। সেটা হাওয়া না দিলেও চলবে ; —শুধু খটমট আওয়াজ একটা হলেই কলকাতার নাগরিকের মাথা ঠাণ্ডা,— পাখা আছে !

হোটেলেও তাই। খাতায় লেখা হলো,—লেখার সঙ্গে জীবনের খাতা মেলাবার দায় অথবা দায়িত্ব আর যারই হোক ! হোটেলওলার নয়।

ভারতবর্ষ জুড়ে যে অসংখ্য হোটেলে অসংখ্যতর লোকের আসা-যাওয়া, থাকা-খাওয়া. তাদের সঙ্গে যে সব স্ত্রীলোকের এক ঘরে থাকা তারা সব সময়েই যে তাদের স্ত্রী, তা নয়। কিন্তু তাদের ওঠা-বসা, চলা-ফেরা থেকে বোঝবার জো নেই যে কে কার স্ত্রী এবং কে কার স্ত্রী নয়। কেবল চোখ আছে যার সে বুঝবে—নিজের স্ত্রী হলে এই সব স্ত্রীলোকেরা সবাই তাদের এত স্ত্রী-স্ত্রী মনে হতো না সর্বক্ষণ। আসল চ্যাপলিনের চেয়ে নকল চ্যাপলিনকে সব সময়েই অনেক বেশি আসল হবার প্রাণপণ চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত হতে হয় যে ! শহরে আজকাল প্রায়ই সতীলক্ষ্মীদের মাথায় সতীলক্ষ্মী সিঁদুর নেই ; থাকলেও গ্রীষ্মকালে শুকিয়ে-আসা শীর্ণ নদীর প্রায় অদৃশ্য রেখার মতো আছে কি নেই

বোঝা যায় না। হোটেলে তা হবার উপায় নেই ; এখানে যার বিয়ে হয়নি তারও মাথায় কখনও কখনও সিঁদুর জ্বলজ্বল করতে দেখবেন অনেক দূর থেকে।

হ্যাঁ। ভালো কথা! সিঁদুর বলতে মনে পড়লো। সদ্যবিবাহিত এক শিশুট্যাক্সি-ড্রাইভার। ফুলশয্যার রাতে লাল-টিপ-পরা নববধূর সঙ্গে আলাপের আরম্ভেই ঘটে গেলো বিপর্যয়। কেস খারাপ হতে পারত ; সাইকোএন্যা-লিস্টের কাছে যেতে পারত ; আরও কত কি ঘটতে পারত এই বিবাহ-বিচ্ছেদের [হু]-যুগে! কিন্তু সেদিন সেই নববিবাহিতা সবুজশাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করতে সবুজ টিপ পরে এলো স্বামীর কাছে সেদিন আর আলাপ ব্যাঘাতের কমা, সেমিকোলন, ফুলস্টপের বাধা মানলে না মোটেই! গড়গড় করে এগিয়ে চললো আদরের তুফান মেল নির্দিষ্ট স্থানে আমার নিষেধ অবজ্ঞা করে নিরুদ্দেশ যাত্রায়! এগিয়ে চলবেই তো। প্রথম দিন ছিলো লাল গোল টিপ ; শিশুট্যাক্সি-চালকের চোখে যে তা STOP-এর ট্রাফিক সিগন্যাল! আর আজ সবুজ গোল টিপ,— শিশুট্যাক্সি-চালকের চোখে তার সংকেত হচ্ছে : Go!

হোটেলে লোক এবং স্ত্রীলোক চর্চা থেকে আরেকটি সংখ্যাতত্ত্ব অবগত হওয়া যায় অনায়াসেই। এখানে পরের রমণীঅঙ্গসুখকামনায় যারা বিপুল রিস্ক-এর বিনিময়ে বিপুলতর অর্থ ব্যয় করতে বাধ্য হয় কখনও কখনও তারা সবাই কিছু যে ব্যাচেলার নয় ; তাদের অনেকেরই ঘরের রমণী ঘরেই আছে। সেই যারা তারা কেউ কেউ ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণী ; তবুও তাদের স্বামিগণ যে হোটেলের কয়েক ঘণ্টার সুযোগ সৃষ্টি করতে গিয়ে সারা জীবন দুর্যোগ পোয়াতে বাধ্য হয় অথবা বধ্য হয়, দেখতে অতি সাধারণ, কখনও রীতিমতো কুৎসিত এমন কারুর সান্নিধ্যে যারা ঘরেরও নয়, পরেরও নয়, কেবল সন্ধ্যেবেলায় কে ডেকে নেয় তারই অপেক্ষায়, এর কারণ কি? এর কারণ এ নয় যে এরা সবাই স্ত্রীকে সাঙ্ঘাতিক কষ্ট দেওয়া নিদারুণ বজ্জাত লোক। না। যদিও এই একফোঁটা গরুতর দোষের চোনা তাদের একাধিক গুণের এক বালতি দুধকে দারুণ অপেয় করে তোলে ঠিকই ; তবুও তারা যে বাড়ির দিকে ফিরে তাকায় না ; স্ত্রী এবং সন্তানেরা মরলো কি বাঁচলো দেখে না, এমন নয় ; বরং এইজাতীয় অনেকেই অনেক চরিত্রবান লোকের চেয়েও ঘর, ঘরনী, এবং সন্তানদের প্রতি কর্তব্য বেশি করে। নিজের স্ত্রীকে তারা ভালোওবাসে কম নয় ; তবুও পরনারী থুস্বসিসে যে পুরুষ প্রায়ই কাতর হয়। কাৎরায় কেবলই, তার কারণ বোধ হয় ওই নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের অভিশাপের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছে ; আদমের ওপর সেই আদিম অভিশাপেরই অকারণ বোধ হয় এর একমাত্র কারণ হবে।

পুরুষ এবং প্রকৃতির প্রকৃতিই বোধ হয় এই ;—অনেকের মধ্যে দিয়ে একের উপাসনা!

নাহলে কেন এই গল্প চালু হবে, যে গল্প অনেকবার শোনা থাকলেও আরেকবার শুনতে বাধা নেই! বইপাগল এক অধ্যাপক তার স্ত্রীর দিকে যথেষ্ট মনোযোগ না দেওয়ায় তার প্রায় পাগল বউ স্বামীকে শুনিয়ে প্রার্থনা করছে মা কালীর কাছে : মা, যদি আসছে বারে আবার জন্ম দিয়ে পাঠাও এ পৃথিবীতে, তাহলে বউ করে পাঠিও না ; বই করে পাঠিও ; তাহলে অন্তত স্বামীর মন পাব। শুনে বইপাগল অধ্যাপক প্রায়-পাগল বউকে শুনিয়ে বলছে বাবা শংকরের কাছে আকুল আবেদনে : যদি মা কালী ওকে বই করেই পাঠায় শেষ পর্যন্ত বউ না করে তাহলে তুমি ওকে পাঁজি করে পাঠিও বাবা যাতে বছর বছর বদলাতে পারি।

কতক্ষণ এই সব স্বপ্নে বিভোর ছিলাম জানি না,—হোটেলের মালিকের ঘরে দারুণ হাল্লায় স্বপ্নভঙ্গ হলো। গিয়ে দেখি, হাবলুর, হাবলু 'জি'-র ট্রাঙ্ক ভেঙে ফেলেছে মালিকের ফোড়েরা। এবং ভেঙে ফেলতেই তার ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়েছে আলাদিনের আশ্চর্য-প্রদীপ! থরে থরে নোটের বাণ্ডিল সাজানো! গাদা গাদা একশো টাকার নোট গাদা করা! কয়েক হাজার টাকা সেই ট্রাঙ্কে,—যে ট্রাঙ্ক নাকি ভেঙে ফেলা হয়েছে তার মালিক হাবলু, আমাদের হাবলু 'জি'-কে এই সন্দেহ করে যে হোটেলের কয়েকটা টাকা মেরে দেবার জন্যে যে পালিয়েছে এই ট্রাঙ্ক ফেলে রেখে।

হোটেলের মালিকের মুখের অবস্থা অবর্ণনীয়। ফোড়েদের মধ্যে একজন প্রেস্টিজ পাংচার হয়ে যাওয়ায় শুধু বললো : এতো টাকা ট্রাঙ্কে,—তাহলে পালিয়ে বেড়াবার মানে বুঝলাম না তো! সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যুত্তর এলো : এখনি বুঝবেন! দেখি দুয়ার হতে অদূরে দাঁড়িয়ে স্বয়ং হাবলু গাঙ্গুলী ; আমাদের সেই আদি ও অকৃত্রিম হাবলু 'জি'! সঙ্গে নিয়ে আসা পুলিশকে জিজ্ঞেস করতে ব্যস্ত হোটেলের মালিক এবং ফোড়েদের শুনিয়ে : ঘরে ট্রেসপাস এবং টাকাভর্তি ট্রাঙ্ক ভাঙায় মিনিমাম কত বছর জেল হয় বলছিলেন ?

॥ এগারো ॥

'কাশী বস্তুত ভারতবর্ষের কোনও বিশেষ প্রদেশভুক্ত নয়, কাশী ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেরই।' —রবীন্দ্রনাথ

স্মরণের অতীত এক ভারতবর্ষের স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি এই কাশী। 'সব সাধকের সব সাধনার ধারা' এই কাশীতেই কেবল 'মিলিত হয়েছে তারা'। কাশী হিন্দুর। কিন্তু সেই হিন্দুর যে সিন্ধুর মতো অতল, পর্বতের মতো যে মাথা উঁচু করে আছে আকাশে, বসুমতীর মতো যে সর্বংসহা, গভীর অরণ্যের

চেয়েও যে গহন, জীবনে যে মৃত্যুর চেয়ে মহৎ এবং মৃত্যুতে যে জীবনের চেয়ে দীপ্ত,—কাশী সেই হিন্দুর। সেই হিন্দুর কাশী যে সম্রাট আকবরের জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরে সবাই যখন নীরব, তখনও নিরুত্তর থাকেনি। জগদীশ্বরের পরেই ছিলো একদা মোগল ভারতে যে একজনের স্থান সেই দিল্লীশ্বর জানতে চেয়েছিলেন দুটি জিজ্ঞাসার জবাব। চরম তৃষ্ণার উত্তরে প্রার্থনা করেছিলেন পরম পানীয়। তাঁর প্রশ্ন ছিলো দুটি ; এক,—ভগবান কি পারেন আর ভগবান কি পারেন না ? দুই,—আর, এই মুহূর্তে ভগবান কি করছেন ?

মুহূর্তের মধ্যে দিল্লীশ্বরের এই জগদীশ্বর সম্পর্কে কৌতূহলের কথা রটে গেল আসমুদ্র হিমাচলের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত। অনন্তর উদ্দেশে অনন্তর নিক্ষিপ্ত এই ঢিল পাণ্ডিত্যের মৌচাকে পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে বেরিয়ে পড়া নানা ধর্মের নানা মধুকরের উদ্যত হুলের অন্ত রইলো না আর। কিন্তু প্রশ্নের কুঁড়িতে ব্যাখ্যা আর টীকার, ইণ্টারপ্রিটেশান আর এলিউসিডেশানের হুল যতই আঘাত করুক : জিজ্ঞাসার ফুল ফোটাতে পারলো না কিছুতেই। সেই ফুল নয় ; বিউটিফুল তার উত্তর বহন করে আনেন যিনি অবশেষে তিনি এক হিন্দু সন্ন্যাসী।

দিল্লীশ্বরের সামনে এসে দাঁড়ালেন জগদীশ্বরের ভক্ত। বললেন : হে সম্রাট ভিখারী, তোমার প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, ভগবান সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন ; অসম্ভবকে সম্ভব। একটি জিনিস কেবল পারেন না তিনি ; জীবকে তিনি তাঁর বক্ষচ্যুত করতে পারেন না কিছুতেই। আর দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর হচ্ছে এই যে, তোমার চোখে গুরু এবং আমার চোখে শিষ্য রূপে স্বয়ং ভগবান এই মুহূর্তে গুরু-শিষ্য সম্বাদ করছেন।

প্রথম ও দ্বিতীয়,—দুই চরম জীবন-জিজ্ঞাসার উত্তরে আজও পর্যন্ত হিন্দু-ভারতের এই হচ্ছে অদ্বিতীয় পরম উত্তর।

এই হিন্দুভারতেই আবার অতিরিক্ত প্রাচুর্যের মধ্যে যাঁর অহোরাত্র বাস সেই রাজা জনকের কাছেই যেতে হয়েছিলো তত্ত্বজিজ্ঞাসু শুকদেবকে,—অতিরিক্ত অবস্থার মধ্যে যাঁর বছরের বেশির ভাগ সময়েই উপবাস। ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন যিনি বৈরাগ্যজ্ঞানে পরিপূর্ণ হয়ে, সেই শুকদেব প্রশ্ন করলেন : চরমজ্ঞানের জন্যে আমার আর কি করণীয় বাকী ? আদেশ হলো, রাজা জনকের কাছে যেতে। দ্বিরুক্তি না করে সেই মুহূর্তে যাত্রা করলেন বৈরাগী শুকদেব বৈভবী জনকের কাছে। যাচ্ঞা করলেন উপদেশ। প্রার্থনার উত্তরে রাজা জনক কেবল ভৃত্যকে বললেন, উন্মুক্ত করে দিতে অতিথিশালা। দিনের পর দিন যায়, রাতের পর রাত, উত্তর মেলে না শুকদেবের। অবশেষে সিদ্ধান্তে আসেন বৈরাগী যে এই বৈভবী সুখ দেবে, কিন্তু শুকদেবের প্রশ্নের উত্তর দেবে না। দেবে কেমন করে ? বিলাসের মধ্যে তিনি নেই, বৈরাগ্যের মধ্যেই কেবল যিনি আছেন।

বিদায় নেবেন বলে যখন শুকদেব সংকল্পে প্রায় স্থির তখন একদিন রাজ-

পুরীতে আগুন লাগায় অস্থির হয়ে পড়েন তিনি। অলিন্দে শুকোতে দেওয়া একটি মাত্র সম্বল, একটি কৌপীনকে অগ্নির জঠর থেকে বাঁচাতে দৌড়ে আসেন জন্মবৈরাগী শুকদেব ! কৌপীনে হাত পড়তে শুনতে পান হাসি। হাসি নয় ; রাজা জনকের অট্টহাসি। একটি মাত্র কৌপীনের মায়া ত্যাগ করতে পারেননি বৈরাগী ; আর রাজপুরী পুড়ে ছাই হতে দেখেও হাসতে পারছেন বৈভবী ! কেন জনকের কাছে আসার আদেশ হয়েছিলো তাঁর প্রতি, শুকদেব তা অবগত নয় কেবল, মর্মগত হন মুহূর্তে।

এই হাসি আজও কেবল কাশীর মাটিতেই কান পাতলে শোনা যায়। সেই কাশী আজও হাসে কখনও কখনও ! উত্তরবাহিনী যেখানে গঙ্গা তারই তীরে দাঁড়িয়ে কাশীর সেই অট্টহাসি আজও শুনি ; 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে' যেমন হেসেছে সে বার বার !'

সেই ভারতবর্ষের কথা বলছি না, যে ভারতবর্ষে সাহেব ছিলো একদা দারুণ এবং যে ভারতবর্ষে অধুনা মোসাহেবেরা নিদারুণ বিভীষিকা। সেই ভারতবর্ষের কথা বলছি, যে ভারতবর্ষ একদিকে গীতার ; আর একদিকে গীতাঞ্জলির। যে ভারতবর্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাব্যজীবনে এবং রামকৃষ্ণ ঠাকুরের জীবন-কাব্যেই আজও বিধৃত। সেই ভারতবর্ষের কথা এখন বলছি না, যে ভারতবর্ষে হিন্দী বললে যেমন সুবিধার অন্ত নেই তেমনই নিজেকে 'হিন্দু' বললে যে ভারতবর্ষে অসুবিধা অনন্ত। হিন্দুর ভারতের বদলে হিন্দীর এ-ভারত সেকুলার নয়, পেক্যুলার স্টেট। এ ভারতবর্ষ বিশ্বপ্রেমে মশগুল ; ভারতবাসী বলে আজ কেউ নেই ; আছে কেবল উপবাসী ভারত। কাশী এ ভারতের প্রাণকেন্দ্র নয় ; এ কাশীতে একাশিবার গেলেও তাই কোনও পুণ্য হয় না। সেই কাশীর কথা বলছি যে কাশী কোন প্রদেশের নয়, ছিলো সকল দেশের। যে কাশী ছিলো সেই হিন্দুর যে নিজেকে বাঙালী, মারাঠী, গুজরাটী, ওড়িয়া, আসামী, পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী ভাবেনি ! যে নিজেকে জানতো পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতার অনির্বাণ অগ্নিশিখার পরিচয়ে প্রদীপ্ত বলে। যার সমস্যার অভাব ছিলো না ; কিন্তু ভাষায় তা প্রকাশ করবার ছিলো না বাধা। ভাষা সমস্যা ছিলো না সেদিন ; কারণ হৃদয়ের ভাষায় তারা কথা বলতো সেদিন। প্রাণের ভাষায় নয়।

সেই হিন্দুর ছিলো কাশী। প্রাণধারণের ঊর্ধ্বে ধ্যানধারণার পৃথিবী তার যে সূর্যকে অযুতনিযুত বৎসর করেছে প্রদক্ষিণ, বৃন্দাবন তারই যৌবনের উপবন ; বারাণসী তারই বার্ধক্যের আনন্দকেতন। আমরা আজ যারা 'দশরথের চার ছেলে'-র হিন্দী করছি দশরথ কি চৌবাচ্চা বলে ; আমরা যারা মনে মনে প্রতি মুহূর্তে নিজেদের অহম অথবা আসামী, শিখ অথবা পাঞ্জাবী, গুজরাটী অথবা মারাঠী ছাড়া কিছু ভাবতে পারছি না, অথচ মুখে বলছি আমরা সবাই 'India that is Bharat' ; আমরা যারা ইংরেজের সঙ্গে লড়াই-না-

করে-জেতার দুঃখ ইংরেজী ভাষার সঙ্গে লড়াই করে পোষাবার চেষ্টা করছি আমরা নামে হিন্দু প্রণামে কার্ল মার্কস ; গ্রামে কংগ্রেস, শহরে কম্যুনিস্ট ; আমাদের দক্ষিণে ধর্মের নামে নরবলি, বামে ধর্মঘটের নামে বানরবলি অব্যাহত। আমরা মুখে রামকৃষ্ণ বলি, মনে বলি, রামকৃষ্ণ ডালমিয়া ! আমাদের একদিকে টানছে ডিভোর্স, আরেকদিকে ডিভাইন ফোর্স। আমাদের বক্তৃতায় কেবল গ্রাম ; আমাদের প্রত্যেকের বাসায় রেডিও এবং বাসনায় রেডিওগ্রাম। মুখে মা, মনে সিনেমা ! আমাদের এক চোখ চরম রুষেঃ দিকে ; আরেক চোখ পরম পুরুষের দিকে, একই সঙ্গে বিস্ময়ে পলকহীন !

হিন্দী বলতে আজ যে আমরা গর্ব করি, কিন্তু নিজেদের হিন্দু বলতে লজ্জা পাই তার কারণ, এই হিন্দুরা কি এবং কে আমরা আজ জানি না এবং জানতে চাই না তাই। হিন্দু বলতে আমরা কেবল বুঝি যারা মূর্তিপূজায় এবং ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়, বৈশ্য শূদ্র এই চারি বর্ণে বিশ্বাস করে। এবং যেহেতু মাটির পুতুলে তারা মায়ের প্রতিমাকে দেখতে পায় ; তাকে মাটি না করে, 'মা'-টিতে উত্তীর্ণ করে সেই হেতু তারা পৌত্তলিক। রাজনৈতিক [অভি]-নেতাদের ছবি অথবা মূর্তি ঘরে রাখুন, ঘরে-বাইরে আপনি সোস্যাল কনশাস বলে অভিনন্দিত হবেন ; বিরুদ্ধ পক্ষ কর্তৃক নিন্দিত হবেন অবশ্য ;—কিন্তু সে মূর্তিপূজার কারণে নয়, যার মূর্তির ধ্যান করছেন তার প্রতি বিরুদ্ধ পক্ষের বিদ্বেষের অকারণে। কিন্তু মাতৃমূর্তি ধ্যান করতে ধারণায় আনতে সুবিধের জন্যে, 'মা'-টি অনুধ্যানে নিবিষ্ট চিত্ত হবার জন্যে মাটির তৈরী প্রতীক ঘরে রাখুন ঘরে-বাইরে আপনি প্রতিক্রিয়াশীল বলে অবধারিত গ্রাহ্য হবেন যে এ বিষয়ে আর যারই সন্দেহ থাক, আপনি যে নিঃসন্দেহ তাতে আর সংশয় কার ?

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বেশ্য, শূদ্রে যাঁরা সমাজ ভাগ করেছিলেন, মানুষকে তাঁরা ক্ষুদ্র করবার জন্যে এই ভাগ করেননি। ভারত ভাগ করেছে যারা আজ তাদের চেয়ে তাঁরা নির্বোধ ছিলেন না। সবাই যদি যজ্ঞ নিয়ে থাকে তাহলে দেশকে বহিরাক্রমণ থেকে রক্ষা করবার যোগ্য লোক পাওয়া ভার হবে, তাই ক্ষত্রিয়। অন্নচিন্তার তুলনায় কোনও অন্য চিন্তাই অর্থহীন তাই ব্যবসা, বাণিজ্য চাষবাসের জন্যেও একদল লোকের বিশেষ কেবল সেই কাজেই নিযুক্ত থাকার প্রয়োজন দেখা দিলো ; তারাই বৈশ্য। এবং অপরিহার্য সেকাজগুলি না সম্পন্ন হলে সম্পন্ন-মহল থেকে বিত্তহীন পর্যন্ত সবাই অচল,—সকলের সেবায় যারা মহত্তম কর্মে নিরত নিযুক্ত, সেই শূদ্রকে ক্ষুদ্র বলে বিবেচনা করেনি সেই হিন্দুরা কাশী যাদের জীবন ও কর্মের কেন্দ্র ছিলো একদা !

শ্রেণী লোপের যারা আজ সাংঘাতিক সংগ্রামী তাদের সমাজ কি বলছে। বলছে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা নয় ; বসুন্ধরা তদ্বিরভোগ্যা। পৃথিবীটা কার ? না, পৃথিবী টাকার। সেই প্রাচীন হিন্দুভারতে অর্থহীন ব্রাহ্মণ বিদ্যা, চরিত্র, নির্লোভতার জোরে রাজার চেয়েও ছিলেন অনেক বেশি পূজার পাত্র। রাজার

আদর ছিলো স্বদেশে ; বিদ্বানের আদর ছিলো সর্বত্র। আজ যার পয়সা আছে, সমাজ কেবল সেই মুষ্টিমেয়র। একদল ব্রেডের লড়াই-এ ক্ষত-বিক্ষত যখন তখন আরেক দল রুটির দু'দিকে পুরু করে বাটার লাগিয়ে খেতে খেতে বাটারফ্লায়ের স্বপ্ন দেখছে শুধু। শূদ্র যে এ জন্মে, তার অধিকার ছিলো কর্মের মহত্ত্বে ব্রাহ্মণ হবার। এযুগের যারা 'হ্যাভ্‌নট্‌স্‌' জন্মে তারা ওই সবহারানোদের, সবহারাদেরই দলের। হিন্দুদের কাস্ট সিস্টেম যদি প্রগতির পরিপন্থী হয়, তবে আজকের দিনে এই নয়াবাদ যার যথার্থ নামকরণ হওয়া উচিত কার্সড সিস্টেম, এ তাহলে জগৎ জুড়ে বর্তমান দুর্গতির, এখনও অনেক অনেক দূর গতি যার বাকী, তার প্রচণ্ড অনুকূল ছাড়া আর কিছু নয়।

যদি কেউ বলেন শূদ্রের হাতে না খাবার কারণ কি ছিলো হিন্দু ব্রাহ্মণের ; তাহলে তার উত্তরে বলব, ছিলো ; এবং এখনও আছে। ব্রাহ্মণেরা সেদিন শূদ্রের হাতে খেত না তার কারণ এ নয় যে তারা শূদ্রকে অমানুষ জ্ঞান করতো। কারণ ব্রাহ্মণেতর কারুর হাতে খাওয়াই ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় ছিলো। স্বপাক আহারই ছিলো ব্রাহ্মণসম্মত ; জীবনসঙ্গত। কিন্তু কেন এই বিধিনিষেধ ? এর কারণ ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরের ভয়াবহ পরিণাম তাঁরা অবগত ছিলেন। যা-তা খেলে অসুখ করে, এইটুকু জেনেই আমরা যেমন বিজ্ঞানের [হু-] যুগে আজ আত্মসন্তুষ্ট, সেদিন জ্ঞানের যুগে তাঁরা ওর চেয়ে একটু বেশিই জানতেন। কেবল যা-তা খেলেই নয় ; যার-তার হাতে খেলেও সুখ হয় না,—এ জ্ঞান এ বিজ্ঞান তাঁদের কেবল করতলগত নয়, অস্থিমজ্জাগত ছিলো যে !

আজ থেকে অনেক দিন আগে এক সন্ন্যাসী অনেক রাত্রে একা ব্রাহ্মণের গৃহে রাতটুকুর জন্যে অতিথি হয়েছেন। সন্ন্যাসীর আগমনকে মহা সৌভাগ্যসুখজ্ঞানে বিত্তবান না হলেও চিত্তবান সেই ব্রাহ্মণ যথাসাধ্য সেবা এবং আতিথেয়তার পরিচয় দিয়েছেন। রাতে শুতে দিয়েছেন সেই ঘরে যে ঘরে নিজেরাও কখনও করেননি শয়ন, সেই সালংকার কৃষ্ণগোপাল আর রাধার পূজালয়ে। সূর্য ওঠবার মুহূর্তে ব্রাহ্মণ ঘরে এসে দেখন, সন্ন্যাসী নেই, আর নেই কৃষ্ণ-রাধার স্বর্ণাভরণ। সন্ন্যাসী তখন হন্‌হন্‌ করে হেঁটে চলেছেন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরের নিরাপদ দূরত্বে।

সূর্যদেব যখন দিনান্তে পরিশ্রমান্তে বসেছেন পাটে এবং ব্রাহ্মণের হতাশ মুখে যখন পর্যন্ত ওঠেনি একগ্রাস অন্নও, ঠিক সেই মুহূর্তে ফিরে এসেছেন সন্ন্যাসী। সমস্ত অপহৃত অলংকার সমেত। এসে রাধাকৃষ্ণের কাছে পড়ে কেঁদে উঠেছেন হাউহাউ করে। ব্রাহ্মণও তখন কাঁদছেন। ফিরে পাবার গভীর আনন্দে নয় ; নয়, ঠাকুরের অলংকার চলে যাবার সুগভীর বেদনায়। সন্ন্যাসীর দুই পা জড়িয়ে ব্রাহ্মণ কেবলই বলেন : সন্ন্যাসী ঠাকুর, সব অপরাধ আমার। হতবাক্‌ সন্ন্যাসীর জিজ্ঞাসা : চুরি করলাম আমি, অপরাধ তোমার কেন ঠাকুর ? কারণ,—ব্রাহ্মণ তখন ব্যক্ত করে : তোমাকে যে অন্ন দিয়েছিলাম, সে চাল আমি

পেয়েছিলাম শ্রাদ্ধবাড়িতে। শ্রাদ্ধের অন্ন দিতে নেই কাউকে ; দিতে হয় শ্রদ্ধার অন্ন। যার শ্রাদ্ধে পেয়েছিলাম এই চাল, অন্যায় পথে সে সঞ্চয় করেছিলো বিপুল সম্পদ। তার সেই মনের প্রভাব ক্ষণকালের জন্যে তোমাকে আচ্ছন্ন করে তোমাকে দিয়ে করিয়েছে অপহরণ। সেই চাল হজম হয়ে যেতেই উঠে এসেছ তুমি তমসাচ্ছন্ন লোক থেকে তোমার অন্তরের সরল, সাধু, স্বচ্ছ আলোকে। এ পাপ তোমার নয় সন্ন্যাসী ; এ পাপ আমার !—

খাদ্যে কেবল শরীর গঠিত হয় এ সেই হিন্দুরা বিশ্বাস করতেন না। খাদ্যের প্রভাব মনের ভাবের ওপরেও পড়ে, এ যুগের বিজ্ঞান যেদিন পুনরুদ্ধার করতে পারবে এই জ্ঞান, কেবল সেদিনই হিন্দুদের মতো করে বলতে পারবে সে, যা-তা খাওয়াই বারণ নয় শুধু ; যার-তার হাতে খাওয়াও নিবারণযোগ্য !

কাশী কেবল এই হিন্দুরই। এই হিন্দুরই কেবল কাশী !

হিন্দুরা কে এবং কি, একথা জানতে হলে যেতে হবে না অতীত ভারতের সংখ্যাগণনার অতীত প্রত্যুষে ! আজও তার পরিচয় প্রদীপ্ত হিন্দুদের শ্রাদ্ধের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্যেই ; যেখানে হিন্দু বলছে এই পৃথিবীর কোনও প্রান্তে এমন হতভাগ্য যদি কেউ থাকে, অপুত্রক, এমন কেউ যার আত্মার শান্তির জন্যে ইহলোকে নেই, এমন কেউ যে দেয় গণ্ডূষ জল,—আজ এই শ্রাদ্ধবাসরে তার উদ্দেশেও শ্রদ্ধামিশ্রিত শ্রাদ্ধবারিতে করছি তিলতর্পণ ! হিন্দু অথবা ভারতবাসীর কথা নয়। অকূল আর কোনও সিন্ধুতীরে, মরুদেশ থেকে মেরুদেশ পর্যন্ত সকল চর্মের সকল ধর্মের মানুষের প্রতি মানুষের এই চরম নিবেদন, এই পরম তর্পণ,—হিন্দু ছাড়া আর কার মুখে হয়েছে একবারও উচ্চারিত ?

কাশীতে এই হিন্দুই কেবল সংকল্প করতে পেরেছে 'এক বিশ্বের' ; আরেক বিস্ময়ের ! পৃথিবীর মানুষ যদি ফানুসের ভয়েও এক হয় কোনও দিন কোনও এক জায়গায়,—সে স্থান যদি কাশী না-ও হয় তবুও হিন্দুর এই সংকল্পের ফলেই কোনও এক কল্পে তা সম্ভব হবে। কারণ সবার উপরে মানুষ সত্য,—সবার উপরে ফানুস সত্য নয়, একথা মহামানবের সাগরতীরে ভারতবর্ষেরই জীবন ও বাণী !

ভারতবর্ষ কেবল কবির দেশ নয় ; পৃথিবীর প্রথম কবিরাজের জন্মও বোধহয় সেদিন সুনীল জলধিজাত ভারতই দিয়েছে। এই কবিরাজরাই যাবতীয় রোগের প্রস্তুত করেছে প্রতিষেধক। তারপর বলেছে, এছাড়াও আছে, এই তালিকার বাইরেও রয়েছে আর এক রোগ ; আরেক মহাব্যাধি,—তার নাম মৃত্যু। সে রোগের নিদান নেই ওই প্রতিষেধকের তালিকায়। মৃত্যুরোগের একমাত্র প্রতিষেধক হচ্ছে হরিনাম। হরণকালে হরির নাম করো ; প্রণাম করো তাঁকে। তিনি রাখলে মারে কে ? তিনি মারলে রাখে কে ! ভারতবর্ষের এই শেষ কথার মধ্যেই রয়ে গেছে সেই অশেষ কথা, ভারতীয় কবিরাজের সে উক্তির প্রায়

পুনরুক্তি করে বলেছিলেন জগৎকবিদের রাজা রবীন্দ্রনাথ। জীবনদীপ নির্বাপিত হবার আগে সূর্যদীপ্ত সেই প্রতিভা জ্বলে উঠেছিলো যখন শল্যাহত হতে অনিচ্ছুক কবিকে পার্ষদরা বোঝাবার ব্যর্থ চেষ্টায় বলেছিলো যে অপারেশন ছাড়াও কবি সুস্থ হবেন, তবুও অপারেশন কেন, না, সাবধানের মার নেই! শুনে, যাবার সময় হলো যে বিহঙ্গের, যে বিহঙ্গ কোনও দুঃসময়েই বন্ধ করেনি গানের পাখা, সে বিহঙ্গ হেসে বলেছিলো : কিন্তু মারেরও সাবধান নেই!

আজকে যে হিন্দু মারা গেলে মাঝরাতে পড়াপড়শীকে স্মরণ না করে পারে না বলহরি হরিবোল ডাকে, সে হিন্দুর কথা বলছি না। জীবনে যারা গোলে হরিবোল দিতে অভ্যস্ত হয়েছে, মরণে তারা সে বোল পরবর্তীদের কানে তুলে দিতে ভুলবে কেন?

এই ভারত কেবল কলার গুরুকে নয়; কামকলার গুরু বাৎসায়নকেও বলেছে ঋষি। বলেছে; বলতে পেরেছে যে তার কারণ, তারা জানত কলার নয় কেবল, কামেরও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের প্রয়োজন। কাম তাদের কাছে লজ্জার অথবা গোপন করবার ছিলো না বিষয়। কাম থেকেই যে সমস্ত কামনার জন্ম, —একথা ফ্রয়েডের জন্মের শতসহস্র শতাব্দী আগে ভারতের মুখে উচ্চারিত। স্বপ্নব্যাখ্যার সে আধুনিক প্রয়াসে আমরা মূর্ছা যাই, তার আবির্ভাবের স্মরণাতীত কাল পূর্বে ভারতবর্ষ স্বপ্নতত্ত্ব নিয়ে মাথা ঘামিয়ে যে তথ্য উদ্ধার করেছে তা আজও যদি কেউ পুনরুদ্ধার করে আবার তাহলে সে স্বপ্নাতীত ব্যাপার বলে স্বীকার করবেই; করতে বাধ্য হবে সে।

পুরীর মন্দিরগাত্রে উৎকীর্ণ কামকলার বিচিত্র চিত্র দর্শন অথবা বাৎসায়নের কামশাস্ত্র পাঠ করবে যারা বিকৃত অসুস্থ কামনা চরিতার্থ করবার কারণে কেবল তারা নয়; যারা ওর মধ্যে দেখবে যে সেদিনের প্রাণবন্ত বীর্যোচ্ছল বীরভোগ্যা বসুন্ধরার যারা অধীশ্বর তারা জীবনের এমন কোনও দিক ছিলো না যার সম্বন্ধে না ছিলো পূর্ণোৎসাহী পুরুষ। শুধু তারাই জানবে যে, বৈরাগ্যসাধনে মুক্তি ছিলো না তাদের মত; রূপগন্ধশব্দস্পর্শস্পন্দিত পৃথিবীর প্রতি কণায় তারা পেয়েছে ব্রহ্মাস্বাদ-সহোদরকে। ইন্দ্রিয়ের সাধনা করতে করতেই তারা খুঁজে পেয়েছে ইন্দ্রের সাধ্যাতীত, সেই ইন্দ্রিয়াতীতকে।

তাই ঋষি বলেছে তারা জীবনায়নের জন্মদাতা বাৎসায়নকে। আজকের দিনে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সে কিছু ভাবে না, কেবল ছাগলদাড়ি রাখে এবং পাগলবাণী দেয় এই কারণে সবাই যাকে ঋষি ভাবে, তেমন ঋষি নয়। সত্য অর্থাৎ ঋক্-এর তপস্যায় অহর্নিশি যিনি নিরত,—তিনিই শুধু ঋষি।

তেমন ঋষিই ছিলেন ভগবান ভৃগু। সংখ্যাগণনার অতীত সংখ্যায় মানুষের ভবিষ্যৎ গণনা করে গেছেন তিনি। যতরকম গ্রহসন্নিবেশে জন্মাতে পারে মানুষ, ভৃগুর আগে, তাঁর সময়ে এবং তাঁর পরে, আদিকাল থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত, গ্রহসন্নিবেশের সম্ভব-অসম্ভব পার্মুটেশান-কম্বিনেশান্ অগণিত গণিত কষে কষে

বার করে গেছেন ; যদি কেউ বলেন যে সেগুলি যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ কিসে? তাহলে বলব সে প্রমাণের প্রয়োজন কিসে? বর্তমান আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অন্য। আমি কেবল বলতে চাইছি যে সেদিনকার ভারতীয়রা জীবনের কত গভীরে অনুপ্রবেশ করেছিলো, বাৎসায়নের কামকলা, ভৃগুর ফলিত জ্যোতির্বিজ্ঞান তারই তুলনাহীন দৃষ্টান্ত কিনা,—শুধু তারই বিচার করুন!

আজকের জ্যোতিষ-জামদারের কথা নয়। পাঁচটার একটা প্রশ্নের উত্তর জানতে গেলে যিনি আপনাকেই প্রথম প্রশ্ন করেন ; বয়স কত ; আপনি বললেন : সাতাশ। ব্যস্! সঙ্গে সঙ্গে উত্তর জ্যোতিষ-জমিদারের ; যান, আপনার বয়স, আর পাঁচ বছর বাদে বত্রিশ হবে। যেতেই হয় আপনাকে ; চলে যেতেই হয় আপনাকে অগত্যা। আপনার সবেধন নীলমণি পাঁচটি টাকা ততক্ষণে চলে গেছে জ্যোতিষ-জমিদারের পকেটে রকেটের চেয়েও দ্রুতবেগে অনেক। আর তাছাড়া, আপনার বর্তমান বয়স সাতাশ হলে, পাঁচ বছর বাদে আপনার বয়স বত্রিশ হবে,—এমন অকাট্য গণনা মাত্র পাঁচ টাকায় করা আপনারও অসাধ্য ছিলো যে।

কালিদাসের কালে যারা জন্মায়নি তারাই আজকের জগৎকে আর আজকের জগজ্জনকে ভেবেছে নিদারুণ মডার্ন। কালিদাসের কালে জন্মালে লোকে জানতো, স্ত্রীলোকে জানতো অনেক বেশী যে, তাদের সময়েও ছিলো লিপস্টিক, কিউটেক্স, রুজ, পাওডার—পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিলো তার ব্যবহার। অন্য নামে মেয়েদের চুলে, ঠোঁটে, মুখে, বুকে বিরাজ করতো লোধ্ররেণু, অলক্তরাগ। চন্দন-কুমকুম,—আরও কত কি। এমন কি, আজকের যে লেটেস্ট মডেলের বুক-ঢাকা যাতে নাকি বুক ঢাকা যাবে না, তারও বিকল্প ছিলো সেদিন। পত্রলেখার বক্ষাবরণ সেই বিচিত্র বিকল্প। দেহকে তারা আদর করতে জানত ; কারণ তারা দেহকে জানত দেহাতীতের আলয় বলে। দেহাতীতের আলোয় তারা দেহালয়কে দেখেছে সেদিন। তারাই সত্য করে বলতে পারত সেদিন : আমার এই দেহখানি তুলে ধর,—তোমার এই দেবালয়ের প্রদীপ কর!

এই ভারতবর্ষই বলেছে বসুন্ধরা বীরভোগ্যা। কিন্তু বীর বলতে এই ভারত কেবলমাত্র দেশ জয় করেছে যারা বাহুবলে তাদের কথা বলেনি। সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ যে মানুষ দেশে-কালে বেরিয়েছে জয় করতে মানুষের হৃদয় চরিত্রবলে তাদেরকেই স্বীকার করেছে সত্যিকারের বীর বলে। শক্তির উপাসককে ভারত নিবেদন করেছে তার শ্রদ্ধা, কিন্তু সমস্ত শক্তির চেয়েও যার শক্তি বেশি সেই নিরাশক্তির যারা সাধক তাদেরই ভারত করেছে পূজা যুগে যুগান্তরে। এই জন্যে ভারত যাকে বীর বলেছে সে শুধু বীর নয় ; তাঁর পুণ্য-নাম রঘুবীর ['কে পেয়েছে সবচেয়ে কে দিয়েছে তাহার অধিক']।

এই রঘুবীর-এর জনক রাজা দশরথ, গুরুতর অন্যায় করে ফেলে, এসেছেন ঋষির কাছে জানতে প্রায়শ্চিত্তের বিধান। ঋষি সেই সময়ে কুটীরে না থাকায়

ঋষিপুত্র বলেছেন, তিনবার 'রাম'-নাম করতে। দশরথ চলে গেলে ঘরে ফিরে ঋষি সেই কথা শুনে শাপ দিয়েছেন পুত্রকে, যে-নাম একবার করলেই অসংখ্য জন্মের সমস্ত পাপ শূন্য হয়ে পরিবর্তিত হয় মুহূর্তকালের মধ্যে অক্ষয় পুণ্যে,—সে নাম তিনবার করতে বলেছেন কেন ঋষিপুত্র? এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত সহস্রবার 'রাম'-নামেও অপ্রাপণীয়।

কাশী কেবল এই ভারতেরই মর্মকেন্দ্র। এই হচ্ছে বার্ধক্যে বারাণসীর ভূমিকা; তার যথার্থ এবং একমাত্র পটভূমিকা। এই ভূমিকা মনে অনির্বাণ অগ্নিশিখার মতো নিত্য জাগ্রত না থাকলে লক্ষবার কাশী গেলেও লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে হবে, যেমন ঘুরছি আমরা; 'জন্ম-জন্মান্তরের গোলকধাঁধায় ঘুরে মরছি কেবলই!

কবি তাজমহলকে বলেছেন, কালের কপোলে মুক্তোর মতো মালিন্যমুক্ত একবিন্দু অশ্রুজল। কাশী হচ্ছে চিরকালের জন্যে চলিষ্ণু মুহূর্তের দল থেকে ছিটকে-পড়া একটি মুহূর্ত;—অন্তহীন একটি মুহূর্ত। এক অনন্ত মুহূর্ত!

যদি কেউ বলেন যে এসব কথা তো কাব্যকাহিনী অথবা পুরাণের গল্প মাত্র;—তাহলে বলি কোনও কাহিনী কখনও মরে না; সত্য যা শতশতাব্দীর আঘাতে সে টলে না, অপমানে হয় না অস্থির, সাময়িক বিস্মৃতির অতল থেকে উঠে আসে যখন তখন, দেখা যায় মানুষের স্মৃতির মণিকোঠায় সযত্নে রক্ষিত সেই হাসি-কান্নার হীরাপান্নায় গাঁথা সোনার কাহিনীগুলিই শুধু মানুষের চিরকালের ধন। সেই অমর কাহিনীরই তো আরেক নাম কাব্য। আর যে গল্প কখনও পুরানো হয় না, তারই নাম তো পুরাণ!

যে জায়গায় দাঁড়িয়ে অবিস্মরণীয় এই ভারতচিত্র চলচ্চিত্রের মতো স্মৃতির রজতপটে আলোছায়ার খেলা খেলছিলো, সে স্থান পুণ্যভূমি কাশীর সবচেয়ে পুণ্য, সবচেয়ে পূর্ণ, সবচেয়ে পবিত্র, আমার সবচেয়ে প্রিয় স্থান হরিশ্চন্দ্রের নামাঙ্কিত শ্মশানঘাট।

বাইরের আকাশে চন্দ্রের উদয় আছে; বিলয় আছে। মানুষের মনের আকাশে যার নেই অস্ত যাওয়া, সেই চির-উদিত চন্দ্রের নামই হরিশ্চন্দ্র!

রাজা হরিশ্চন্দ্রের দানতপস্যার পরীক্ষাকল্পে প্রার্থী চেয়ে বসেছেন সসাগরা পৃথিবী। মুহূর্তমাত্রও দেরি হয় না রাজার তা দিতে। কিন্তু পরের মুহূর্তেই তাঁর স্মরণ হয় দানের সঙ্গে দিতে হয় দানকর; দিতে হয় 'বেণীর সঙ্গে মাথা'! সময় নেন হরিশ্চন্দ্র। সময় যখন সমাপ্তির মুহূর্তে গড়িয়েছে প্রায়,—তখন মনে পড়ে তাঁর এই কাশীর কথাই সর্বপ্রথম। সসাগরা পৃথিবী দান করে দেবার পর যে পৃথিবীতে বাস করার, উপবাস করার অধিকারও যে তিনি হারিয়েছেন। হারান; ক্ষতি নেই। সসাগরা পৃথিবীর বাইরে রয়েছে এখনও আরেক পৃথিবী। সমস্ত বসুন্ধরার দু'বাহু দিয়েও যাকে ধরা যায়নি সেই কাশীর দ্বার মুক্ত রয়েছে এখনও রিক্ত রক্তাক্ত রাজা হরিশ্চন্দ্রের জন্যে।

সেইখানে চণ্ডালের কাছে নিজেকে বিক্রয় করেন রাজা; তবুও দানধর্মের প্রতিজ্ঞায় অবিচল হরিশ্চন্দ্র ; প্রতিজ্ঞাভঙ্গের যূপকাষ্ঠে আত্মবিক্রয় করেন না তিনি। দানকর দিতে গিয়ে দূরে সরিয়ে দিতে বাধ্য হন রাণী শৈব্যা আর পুত্র রোহিতাশ্বকে। কিন্তু তবুও কি পরীক্ষার শেষ হয় ? না। এ যে সত্যরক্ষার অগ্নিপরীক্ষা। সত্য যে কঠিন বড়ো ! সে কঠিনকে তবুও ভালোবাসতে হয়, 'সে কখনো করে না বঞ্চনা' !

হরিশ্চন্দ্রঘাটে দাঁড়িয়ে কল্পনায় ফিরে যাই কল্পনাতীত সেই 'কৃষ্ণারজনী'-তে। বিদ্যুৎ-বিচলিত ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ তারাহারা নিঃসীম অন্ধকার সেই রাত। প্রলয়াহ্বানে সাড়া দিয়েছে সারা জগৎ। শ্মশানঘাট থেকে সেদিনও ছুটি নেই চণ্ডালের ক্রীতদাস একদা রাজা হরিশ্চন্দ্রের। তখনও অপেক্ষায় আছেন সংসার থেকে ছুটি হয়ে গেছে এমন কেউ যদি আসে দৈবাৎ তার জন্যে। অপেক্ষা সার্থক [!] হয়।

সর্পনিহত বালককে নিয়ে এসে দাঁড়ায় এক নিঃস্ব রমণী সন্তানের দাহকার্যের কারণে। কর্তব্যনিষ্ঠ হরিশ্চন্দ্র চান তাঁর প্রতিপালক শ্মশানেশ্বরের প্রাপ্য। কণ্ঠস্বর শুনে কেঁদে ফেলে মৃতপুত্র ক্রোড়ে সেই কান্না। আর সেই মুহূর্তে বজ্রনির্ঘোষে কেঁপে ওঠে পায়ের তলায় মাটির পৃথিবী ; বেদনায় বিদীর্ণ হয় সর্বংসহা বসুন্ধরার বুক। দুলে ওঠে পৃথিবী। ফুলে ওঠে সাগরের উদ্গত অশ্রু আর জ্বলে ওঠে বিদ্যুতালোকে আকাশের বুক। রাজা হরিশ্চন্দ্র সেই আলোয় দেখেন তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, মৃতপুত্র-রোহিতাশ্ব-ক্রোড়ে রাণী শৈব্যা ; তাঁর চোখে টলমল করছে জল। আর সেই মুহূর্তেই মরলোকে বেজে ওঠে জয়ডঙ্ক ; অমরলোক থেকে হয় পুষ্পবৃষ্টি ! অযুত নিযুত বৎসরের সূর্য প্রদক্ষিণের পথে চলতে চলতে থেমে যায় চিরকালের চাকা ! প্রতি মুহূর্তে প্রস্ফুটিত কালের শতদল থেকে খসে পড়ে একটি পাপাড়। অন্তর্নিহিত মুহূর্তের দল থেকে জন্ম নেয় দল-ছাড়া একটি অনন্ত মুহূর্ত !

মর্ত্যলোকের সঙ্গে অমর্ত্যলোকের মাল্যবদলের সেই মিলনরাত্রে অসীমকালের আকাশপ্রদীপ জ্বলে ওঠে মৃত্যুহীন প্রাণের, জ্যোতির্ময়ী একটি গানের, অনির্বাণ আলোকশিখা !

পুরাণের বলেই হরিশ্চন্দ্র কি কখনও পুরানো হবার ?

॥ বারো ॥

'History, in the conventional European sense, has never possessed much interest for the Hindu Mind.' —হ্যাভেল

সময়ের চেয়ে বয়সে প্রাচীন এই কাশীর বয়স কত, কে বলবে? সহস্রলোচন জবাকুসুমসংকাশ, রক্তবর্ণ সূর্যদেব অস্ত যাচ্ছেন তখন। দিনের আলো রাত্রির মুখচুম্বন করে বিদায় নিচ্ছে; সন্ধ্যা নামছে সারনাথে। আর বহু যুগের ওপার থেকে ভেসে আসছে আমার কানে, বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। এই সেই সারনাথ,—যেখানে কোন এক জন্মে বুদ্ধদেব আর তাঁর ভাই দেবদত্ত আবির্ভূত হয়েছিলেন হরিণদের রাজারূপে। একদল হরিণের অধিপতি ছিলেন বুদ্ধদেব স্বয়ং; আরেক দলের—তাঁর ভাই দেবদত্ত। সারনাথ তখন কাশীর কাছে এক গহন অরণ্য ছিল। কাশীর রাজা মৃগয়ায় বেরিয়ে মারছিলেন এই হরিণের দলকে; নির্দয় হাতে সেই হৃদয়হীন নির্মম হত্যা করছিলেন বনের সব চেয়ে নিরীহ, সব চেয়ে নিরুপম মৃগদের! কিন্তু যে মৃগদের প্রাণ হরণে নিরত ছিলেন কাশীরাজ,—সে হরিণ সবই দেবদত্তের। তাই দেখে বোধিসত্ত্ব, যিনিই পরে বুদ্ধ, তিনি অনুরোধ করলেন রাজাকে যে শুধু দেবদত্তের মৃগদল হত্যা না করে তিনি বোধিসত্ত্বের মৃগ-প্রজাদেরও মারুন। তাতে, দুই দল হরিণই নিশ্চিহ্ন হবার আগে আরেকটু সময় পাবে।

রাজা সম্মত হলেন এ প্রস্তাবে। ঠিক হলো, একদিন বোধিসত্ত্বের আর আরেকদিন দেবদত্তের দল থেকে যাবে একটি হরিণ, পালা করে প্রত্যহ। সেই হরিণ স্বেচ্ছায় গিয়ে মাথা দেবে হত্যার হাড়িকাঠে, দিনের পর দিন, একবার দেবদত্তের, আরেকবার বোধিসত্ত্বের বাহিনী থেকে। এমনি করে চলতে চলতে একদিন এক মৃগীর পালা এল প্রাণ দেবার। কিন্তু তার পেটে রয়েছে তখন এক বাচ্চা। সে তার দলের রাজা দেবদত্তকে বললে এই অনাগত শাবকের জন্মরক্ষার কারণে, তার পরিবর্তে আর কাউকে পাঠাতে সেদিন, কাশীর রাজার লোভানলে। দেবদত্ত সেকথা কানেই তুলল না। ক্রুদ্ধ হয়ে তাড়না করলে সন্তান অভ্যন্তরে যার সেই মৃগজননীকে।

হতাশ হয়ে সন্তানের জন্যে প্রাণ-ভিক্ষা করতে গেল সে অন্য দলের রাজা, বোধিসত্ত্বের দরজায়। বোধিসত্ত্ব তাকে ফেরালেন কিন্তু দেবদত্তের মতো হতাশ করে তাকে ফেরালেন না। তাকে ফেরালেন মৃত্যুর মুখ থেকে। নিজে গেলেন ঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে। রাজদ্বারে গিয়ে দাঁড়াতে সাধারণ এবং অসাধারণ লোকের ভিড় জমল। স্বয়ং 'মৃগ'-রাজ এসেছেন কেন আজ? কাশীরাজ বিশ্বাস করতে চাইলেন না প্রথমে 'মৃগ'-রাজের আগমনবার্তা। কিন্তু লোকের মুখ থেকে মুখে সেকথা যখন সত্য হয়ে গিয়ে পৌঁছল নৃপকর্ণে তখন রাজা আর থাকতে পারলেন না। বেরিয়ে এলেন প্রাসাদের প্রাঙ্গণে যেখানে উন্মুক্ত নীলাকাশের নীচে মৃত্যুর মুহূর্তেও মৃত্যুঞ্জয় ধ্রুব এক বিশ্বাস মূর্ত দাঁড়িয়ে মৃগ-মূর্তিতে। পাখিরা কূজন-বিস্মৃত; জনতা রুদ্ধশ্বাস; সূর্যদেব গতিরুদ্ধ; বাতাস ভীষণ ভারী। মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বয়ং নির্মম কাশীনাথ এবং নির্ভীক সারঙ্গনাথ।

হরিণরাজের এই অপ্রত্যাশিত আগমনে বিস্মিত কাশীরাজ কারণ কি জানতে চাইলে, হরিণরূপী বোধিসত্ত্ব বললেন : 'আজ যার প্রাণ দেবার পালা সে মৃগ নয় ; মৃগী। শুধু মৃগী নয় ; সন্তানসম্ভবা এক হরিণ-জননী। তাই তাকে হাড়িকাঠে পাঠানো গুরুতম অপরাধ মার্জনার অতীত ; তার বদলে তাই আপনার প্রাপ্য চুকোতে এসেছি আমি। আপনি আমার প্রাণ নিয়ে আপনার রন্ধনশালার রসদ যোগান আজকের মতো।' সেই উত্তরে নিরুত্তর রইলেন রাজা অনেকক্ষণ। মুখ তুললেন যখন, তখন তাঁর বুক ভেসে যাচ্ছে চোখের জলে ; তিনি অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে কেবল বললেন : 'মানুষের বেশে আমিই আসলে পশু ; আর আপনি পশুরূপে এক মানব-সত্তা !' এই কথা বলে রাজা আদেশ দিলেন, হরিণ-হত্যা নিষেধ করে ; এবং যেখানে নিরীহপ্রাণ মৃগদের বিচরণক্ষেত্র, সেই অরণ্যে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন মৃগয়া। হরিণরাজ অর্থে সেই সারঙ্গনাথ থেকেই এসেছে আজকের বিশ্ববিখ্যাত এই 'সারনাথ'-নাম।

সেই সারনাথে দাঁড়িয়ে আমি কল্পনা করতে চেষ্টা করছিলাম কাশীর ইতিহাস। কল্পনাতীত এই কাশীর ইতিবৃত্ত কে দেবে ? যার আদি নেই এবং সেই কারণে নেই ইতিও, তার ইতিহাস লিখবে কে ?

কাশী অনেক লোকের ইতিহাস ; আবার মূলত দুটি লোকের ইতিহাস। তার একজন বুদ্ধদেব, অপর জন শংকরাচার্য। কিন্তু সে দুইজনের আগেও যেমন, পরেও তেমনই অশেষ হয়ে আছে কাশীর কথা। নিছক স্টোরী বলে যাকে উড়িয়ে দিতে চেয়েছে হিস্‌টরী চিরকাল, কাশীর জন্মবৃত্তান্তে তার ভাগও নেহাত কম নয়। কিংবদন্তীর এই কাশীতেই কবি বলেছেন, গিয়েছিলেন একদিন ভারত-ধুরন্ধর ভীষ্ম। বিশ্বামিত্র এখানেই তাঁর ত্রিবিদ্যাকে অপরূপ রূপ দেবার, অসম্ভবকে সম্ভব করবার 'ত্রিবিদ্যা'কে করেছিলেন লাভ। বুদ্ধদেব এখান থেকেই আরম্ভ করেছিলেন তাঁর দিগ্বিজয়। রামভক্ত তুলসীদাস, আর জোলার ছেলে কবীর দুজনেই কাশীর গঙ্গার তীরে বসে জীবনের করে গেছেন জয়গান। কাশী কেবল মাটি দিয়ে তৈরী নয় ; মন্ত্র দিয়ে রচিত এর দেহ।

ইতিবৃত্তকার-এর মুখর ভাষণ ক্ষান্ত হলে তবেই প্রবেশ করা যাবে কাশীর অন্তর্লোকে। সমস্ত মানুষ, যে এক পৃথিবী, এক পরিবারভুক্ত হবার কথা আজ চিন্তা করছে তার প্রথম স্বপ্ন আর সাধনা দিয়ে তৈরী সকল মানবের আত্মার গেহ, এই পূত, পবিত্র, পরমাশ্চর্য কাশীর দেহ !

সমস্ত মানুষই একদিন মুক্ত হবে ; নশ্বর হবে ঈশ্বর ; ব্যাসের এই সংকল্পের অস্থি দিয়ে নির্মিত কাশীকাণ্ড। রত্নাকর একদিন বাল্মীকি হবেই,—হিন্দু ভারতের এই হচ্ছে এক বিশ্বাস ; আর তার আরেক বিশ্বাস হচ্ছে—শুচি ও অশুচির কোনও ভেদ থাকা পর্যন্ত, ভালো ও মন্দের কোনও বিচার থাকা পর্যন্ত আসবে

না সে মুক্তি! কাশীই হচ্ছে বাঙালী কবির দৃষ্টিতে, কেবল আকৃতির নয়, বিপুল সেই মুক্তির পীঠস্থান। কাশীনাথ নাকি ঘোষণা করেছিলেন, কাশীতে কেউ রইবে না অভুক্ত! কবি বলেছেন, কেবল দেহের ক্ষুধা নয়, আত্মার সুধাও যোগাবে এই কাশী। এখানেই একদিন ব্যাস সংকল্পিত সেই এখনও অকল্পিত কাণ্ড ঘটবে! আজও মানুষ যে 'ওয়ান ওয়ার্লড'-এর স্বপ্ন দেখছে, সেই 'এক বিশ্ব', সেই পরম এক বিস্ময় ঘটবে এই কাশীতেই একদিন ; এবং এখানেই মানবাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার নতুন আত্মীয়তা গড়ে উঠবে যে আত্মীয়তা গড়ে উঠলে তবেই মানুষের চর্মগত নয় আর, এ জ্ঞান মর্মগত হয় যে গায়ের জোরে সাম্য হয় না ; সাম্যবাদ হয় মাত্র। সেই one-কে না জানলে, তাঁর কাছে নত না হলে, না হলে প্রণত one world-এর প্রতিষ্ঠা হয় অসম্ভব!

পুরীতে সেই 'এক'-এর নাম জগন্নাথ। কাশীতে 'এক'-এর নাম বিশ্বনাথ।

যিনি জগন্নাথ, তিনিই বিশ্বনাথ! যিনি কালী তিনিই দুর্গা। যিনি অনেক, তিনিই এক। হিন্দুর নিশ্বাসে এই হিন্দু বিশ্বাসেও এই! একে যাঁরা বুঝতে পারেননি সেই 'এক'-কেও তাঁরা পারেননি বুঝতে। তাঁরাই দূরে সরে গেছেন, হিন্দুরা পতুল পুজো করে,—এই হাস্যকর বিমূঢ়তায়! দূরে সরে গেছে বলেই তাই ; কাছে এলে তারা দেখতে পেত, পুতুল নয় প্রতিমা! নিজের স্ত্রী ছাড়া সকল স্ত্রীলোকের মধ্যে, কখনও কখনও নিজের স্ত্রীর মধ্যেও 'মা'-কে যারা দেখতে পেয়েছে তারাই প্রতি 'মা'-র মধ্যে পেরেছে 'মা'-কে প্রতিষ্ঠা করতে! প্রতি 'মা'-ই তাই হিন্দুর প্রতিমা!

এই কাশীতেই একদা এক অশ্ব-ব্যবসায়ী তক্ষশীলা থেকে আসছিল মেলায় যোগ দিতে। পথে একদল ডাকাত তার বিক্রির ঘোড়া সব চুরি করে এবং অশ্ববিক্রেতাকে সাঙ্ঘাতিক জখম করে চলে যায়। বুকে হেঁটে সে কোনও রকমে শহরতলিতে একটি পরিত্যক্ত গৃহে আশ্রয়ের জন্যে প্রবেশ করে। সেখানে রাজার অনুচর এই পরদেশী পথিককে ধরে নিয়ে যায় রাজদরবারে চোর বলে। নিজেকে নির্দোষ বললেও সে মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডিত হয়। কারাগারে যাবার পথে তার সাক্ষাৎ হয় কাশীর শ্রেষ্ঠ নর্তকীর সঙ্গে। সেই সহায়-সম্বলহীন তস্কর বলে ধৃত অশ্ব-ব্যবসায়ী না জেনে এবারে একটি অনির্বচনীয়, অপরূপ বস্তু হরণ করে ; কাশীর সেই 'উর্বশী'র মন। এমন পুরুষ সেই প্রকৃতির চোখে পড়েনি এর আগে। বিপুল বিত্তশালিনী আর এক অঙ্গে যার অনেক রূপ সেই অপরূপ বিলোল কটাক্ষী, যার পদ-ভরে কাশীর পৃথিবী নেশায় টলমল করে সেদিন সেই নৃত্যপটীয়সীর আজ্ঞায় তার পরিচারিকারা গেল রাজার অনুচরের কাছে পরিচয়হীন সেই অজ্ঞাতকুলশীলকে উদ্ধার করে আনতে। বিপুলতর উৎকোচের বিনিময়ে রাজার লোক রাজী হলো চোরকে ছেড়ে দিতে। শর্ত হলো আরেকটি লোককে পাঠিয়ে দিতে হবে মৃত্যুকক্ষে, যার প্রাণ বলির বদলে প্রাণ ফিরে পাবে দণ্ডিত প্রেমিক কাশীর নর্তকীর।

সেই উর্বশীর জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলো আরেক রূপমুগ্ধ ; ধনী মহাজনপুত্র সেই প্রায়-বালককে রাজী করাতে দেরী হলো না ছলনাময়ীর ; খাবার পাঠাবার অছিলায় তার আত্মীয়ের কাছে ; কিশোর প্রেরিত হলো বধ্যভূমিতে, অশ্বারোহীর জন্যে আহার নিয়ে। পৌঁছনো মাত্র উৎকোচবশ রাজপ্রহরীর অস্ত্র দ্বিখণ্ডিত করল তার দেহ এবং মুক্তি পেল অশ্ববিক্রেতা ! একটি মহৎ প্রাণের মৃত্যুতে জন্ম নিল একপক্ষে উত্তপ্ত এবং আরেকপক্ষে অনুতপ্ত প্রেম।

সদ্যমুক্ত প্রেমিককে যত জড়িয়ে ধরবার চেষ্টা করে কামনাবিবশ সেই কামিনী, ততই মুক্তি খোঁজে সেই অনুতাপের অনলে অঙ্গার প্রেমিক। মহাজনপুত্রের মৃত্যুর মূল্যে ফিরে পাওয়া প্রাণ পীড়া দেয় এই "মহা'জনকেও। গঙ্গায় নৌকাবিহারে বেরিয়ে একদা নর্তকীকে জলের মধ্যে দু'হাতে গলা চেপে ধরে তার প্রেমিক। সুর এবং সুরায় মাতাল নর্তকীর প্রাণহীন দেহ নদীর ঘাটে ফেলে দিয়ে পালায় প্রণয়ী। নর্তকীর মা দাঁড়িয়ে ছিল অদূরেই ; সে মৃতদেহে প্রাণসঞ্চার করে আবার। নর্তকী আবার পত্র দেয় তক্ষশীলার পলাতককে কাশীতে এবং তার জীবনে, তার যৌবনে প্রত্যাবর্তন করবার জন্যে ! তৃপ্তিহীন কামনায় কালো সে চিঠির কথা ! মৃত্যুহীন প্রেমে উজ্জ্বল তার অক্ষর !

এই নর্তকীর নাম শ্যামা ; এই অশ্ববিক্রেতার নাম বজ্রসেন। এই শ্যামাই আবার যশোধারা ; এই বজ্রসেনই সিদ্ধার্থ গৌতম হয়ে আবির্ভূত হন কপিলাবস্তুতে, শাক্যরাজের একমাত্র বংশধর। শ্যামা-জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেন যশোধারা যখন তাঁকে পরিত্যাগ করে যান, জীবনের মহত্তর অর্থে সিদ্ধ হবার কামনায় ব্যাকুল, সিদ্ধার্থ গৌতম।

বুদ্ধ গৌতম বুদ্ধত্বলাভের পর কাশীযাত্রা করেন। এই কাশীকে কেন্দ্র করেই আরম্ভ হয় বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা !

ভগবান বুদ্ধের মহিমায়, সম্রাট অশোকের ছত্রছায়ায়, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী অহিংসায় উদ্দীপ্ত হলো। আসমুদ্র হিমাচল ভারত চঞ্চল হয়ে উঠল : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি এই গানের জয়গানে। সে ডাকে সাড়া দিল চীন ; সে ডাকে নাড়া খেল জাপান। বুদ্ধের পর এলেন আরেক প্রবুদ্ধ ; তাঁর নাম শঙ্করাচার্য। বুদ্ধের মতন শঙ্করাচার্যের প্রথম কর্ম, প্রথম ধর্মকেন্দ্রও এই কাশী। হিন্দুরা যখন শাস্ত্রের অন্তরঙ্গতা ত্যাগ করে তার বহিরঙ্গ নিয়ে মেতে উঠল ; এবং সমাজের হিত-অহিত করার সর্বময় কর্তা হয়ে বসল পুরোহিত ; যখন পূজার নামে পশুবলির প্রমোদে সবাই ঢেলে দিয়েছে মন, তখন এলেন এমন একজন যিনি বললেন অহিংসা হিংসার চেয়ে বড়ো। অস্পৃশ্যকে তিনি স্পর্শ করলেন ; ভগবানের দূত তিনি বললেন : 'অন্তর হতে বিদ্বেষ বিষ নাশো'।

অন্তর থেকে উত্থিত মনুষ্যত্বের বাণী মন্তরের মতো কাজ করল পুরোহিতপিষ্ট ভারতে।

বুদ্ধের সঙ্গে হিন্দু ব্রাহ্মণদের বিরোধ বেঁধে উঠল প্রধানত দুই বিষয়ে। ব্রাহ্মণরা বলে আসছিলেন: পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্যে বলির প্রয়োজন এবং তাঁদের শিক্ষাই মুক্তির একমাত্র উপায়। বুদ্ধ অস্বীকার করলেন বেদের সর্বময় কর্তৃত্বকে 'বলি'র তত্ত্বকে নস্যাৎ করলেন; এবং বললেন: সর্বপাপ মুক্ত হতে হলে চাই অষ্টসিদ্ধি। সে সিদ্ধার্থের মতে: "· through right views, right resolve, right speech, right actions and living, right effort, right self-knowledge, and right meditation···" [*Benares, the Sacred City*—E. B. Havell]

বুদ্ধ জানতেন, 'বাধা দিলে বাধবে লড়াই'। তবু বাঁধা পড়েছে যে মানুষ হিংসার বাঁধনে তাকে মুক্ত করতেই তাঁর আসা মর্ত্যলোকে অমর্ত্যলোক থেকে।

আজ থেকে আড়াই হাজার বছর আগে ভগবানের দূত ভগবান বুদ্ধ এসেছিলেন এই পৃথিবীতে। হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদন এবং রাণী মহামায়ার কোলে মহামায়ার কৃপায় জন্ম নিলেন যিনি সেই নবজাতকের নাম হলো গৌতম। পৃথিবীকে যাঁরা পাপমুক্ত, পবিত্র করতে আসেন তাঁরা আসেন দরিদ্রের পর্ণকুটীরে; তাঁরা জন্ম নেন কখনও গোশালায়; আবার কখনও আস্তাবলে! সকলের অগোচরে, সকলের অবহেলায়, সমস্ত জগতের উপহাস আর অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় তাঁরা নিশ্বাস নেন। লেখাপড়ার থেকে, আমোদ-প্রমোদ থেকে দূরে নির্জনে আরম্ভ হয় তাঁদের নিঃসঙ্গ সাধনা। লোকে বলে ভণ্ড। রাজার অনুচর ভয় দেখায়; স্ত্রীলোক দেখায় লোভ। সব কিছুকে তুচ্ছ করে, শশিকলার মতো বাড়তে বাড়তে, বসুন্ধরা তাঁদের ধরে রাখতে পারে না আর। পূর্ণচন্দ্রের উদয় হয় আকাশে। আত্মার আলো ছড়াতে ছড়াতে চলেন শূন্যে, জলে স্থলে। 'জড়ায়ে আছে বাধা!'—ছাড়ায়ে যেতে চায় যারা তবু পারে না তাড়াতে ভয় আর ভর্ৎসনা, অলংকার আর অহংকার তাদের মধ্যে ছড়াতে থাকেন বীর্যের আর করুণার বিরামহীন ধারা! ভয়ংকরের সাধনায় অভয়ংকরের উদ্বোধন হয় এইভাবেই!

কিন্তু বুদ্ধদেব এসেছিলেন এই পৃথিবীতে রুপোর চামচে মুখে নিয়ে রাজার ঘরে; বৈশাখী পূর্ণিমার এক পবিত্র রাত্রে; যে রাত্রকে বৈশাখী পূর্ণিমার রাত্রি থেকে বুদ্ধপূর্ণিমার রাত্রে উত্তীর্ণ করে যান তিনি: কিন্তু রাজার ঘরে জন্মালেও যা প্রজার ঘরে জন্মালেও তাই। জগতের যিনি রাজা, তাঁর জয়টিকা যিনি ললাটে দিয়ে এসেছেন পার্থিব সুখে ওঁর অসুখ; পার্থিব অসুখে তাঁর সুখ। সেকথাই ভূত-ভবিষ্যতের যিনি অতীত আসলে, তাঁর ভবিষ্যৎ গণনা

করে বলেন রাজগণক। সংসারে থেকেও সং ত্যাগ করে 'সার' গ্রহণ করবার সাধনাই হবে এঁর সাধনা! সকলের যাতে সাধ তাতে 'না করাই হবে এঁর সাধনা! কারুর যা সাধ্য না, তাই হবে এঁর সাধনা! অসৎকে নাশ করার জন্যে ইনি গ্রহণ করবেন সন্ন্যাস!

বালক গৌতমের কোলে ভাই দেবদত্তের তীরবিদ্ধ হাঁস এসে পড়ে হঠাৎ। দেবদত্তর দাবীর উত্তরে গৌতম বললেন, তোমাকে এই হাঁস আমি মারতে দেবো, যদি এর প্রাণ তুমি ফিরিয়ে দিতে পার তবেই। '' চেৎ নয়। বালক বড় হলো। বিবাহ হলো তার কোলিকন্যা গোপার সঙ্গে যার আরেক নাম যশোধারা। রাজার ছেলে হয়ে জন্মে, রাজা হবার স্বপ্ন দেখেন না গৌতম। ইন্দ্রের ঈর্ষাযোগ্য রমণীলাভ করেও অন্য রাজার, অন্য রমণীয় সঙ্গের জন্যে লালায়িত গৌতম একদিন রাজরথে যেতে যেতে রাজপথে দেখেন হেঁটে যাচ্ছেন এক থুড়থুড়ে বুড়ো। মাথার চুল কাশফুলের মতো সাদা; গায়ের চামড়া কাঁথার মতো কুঁচকে গেছে: দাঁত নেই; চোখ দৃষ্টিশক্তিহীন। সারথি ছন্দক, বিস্মিত রাজপুত্রকে বললেন: এই অবস্থা, এই দুরবস্থা থেকে কারুর মুক্তি নেই। আবার একদিন, ওই রাজরথে যেতে যেতেই, রাজপথে দেখলেন মুমূর্ষুকে। রাজরথ-চালক বললেন: এই অবস্থা সকলেরই সামনে উপস্থিত হবে একদা! তারপরও আরেক দিন; এবারে এক মৃতদেহ। সারথি এবার জানায়: রাজা প্রজা. জ্ঞানী মূঢ়, কারুরই নিস্তার নেই, এই 'নিশ্চিতের' হাত থেকে।

কিন্তু মুক্তি যে সুনিশ্চিত আছে, এই নিশ্চিতের হাত থেকেও তাই দেখবার জন্যেই যেন সন্ন্যাসী এসে দেখা দেন রাজপুত্র গৌতমকে। 'মেঘমুক্ত আকাশের প্রসন্ন হাসি হাসছেন বন্ধুর মতো' সেই সন্ন্যাসী। তাঁকে দেখে মনে হয়, সারথি যে যে অবস্থা থেকে পরিত্রাণ নেই কারুর বলেছিল, সেই সব অবস্থার থেকেই ইনি মুক্ত, সর্ববিপন্মুক্ত ইনি কে? কি করে এঁর এ অবস্থা লাভ হলো জানতে গিয়ে গৌতমের এই জ্ঞান লাভ হলো যে: ভোগের ফল ওই দুর্ভোগ! ত্যাগের পথেই আসে মুক্তির রথ।

সেই পথেই একদিন বেরিয়ে পড়লেন গৌতম; সার লাভের যে পথ গিয়ে শেষ হয় আরেক দিন সারনাথে!

জরা, রোগ, মৃত্যু এ পৃথিবীতে প্রত্যক্ষ করেছে প্রায় সবাই। সন্ন্যাসীর মূর্তিও কারুর অগোচরে নয়। তবু তারা কেউ জানতে চায়নি কেন জরা, রোগ এবং মৃত্যুর ভয়? এবং সন্ন্যাসীর হাসিতে কি করে আসে অভয়। গৌতম জানতে চাইলেন। অনেকে মনে করে, গৌতম বুঝি ওই চার দৃশ্য দেখেছিলেন বলেই রাজ্য ছেড়ে যেতে পারলেন। তারা মনে করে 'বেলা যায়' ডাক শুনেছিলেন বলেই বুঝি লালাবাবু পথে বেরিয়ে পড়তে পেরেছিলেন। তুলসীদাসের স্ত্রী তুলসীদাসকে অপমান করেছিলেন বলেই নাকি তুলসীদাস আরাম ছেড়ে রামকে পেরেছিলেন চাইতে। না। গৌতমের মধ্যে, লালাবাবুর

মধ্যে তুলসীদাসের মধ্যেই ছিলো এমন কিছু, সংসার ছাড়ে যারা তাদের মধ্যেই থাকা দরকার এমন কিছুর যার জবরদস্তিতে 'সং' ত্যাগ করে 'সার' কামনার জীবন-জিজ্ঞাসা জাগে তাদের মনে। না এ জিজ্ঞাসা তেমনভাবে না জাগলে সংসার ছেড়ে গেলেও তারা সার পায় না ; ছাইমাখা সং সাজে। আবার কেউ সংসারের মধ্যে থেকেই অসার ত্যাগ করে পেয়ে যায় ঈশ্বরসঙ্গ। শুধু তাতেও হয় না। সময় হওয়া চাই। গৌতমের যেদিন সেই সময় এল তার আগের মুহূর্তেও তিনি তৈরী ছিলেন না। এই সাক্ষাৎ এবং তার থেকে সাক্ষাৎ-মুক্তির তীব্র পিপাসা জাগবার জন্য। লালাবাবুর জীবনে, অনন্ত সন্ধ্যা এসেছে এবং গেছে। কিন্তু যে সন্ধ্যায় সেই জীবনের প্রথম প্রভাত এল পায়ে হেঁটে, লালাবাবুর অন্তরে, সেদিন আর মন্তরের প্রয়োজন হলো না।

তুলসীদাস ছিলেন স্ত্রৈণ। স্ত্রীর দাস ছিলেন তুলসীদাস। বিবাহের পর একদিনের জন্যেও স্ত্রীকে তাঁর পিতৃগৃহে পাঠাতে পারেননি তিনি, রমণীহীন জীবন মণিহীন চোখের মতো তা অর্থহীন বলে। একদিন পিতার গুরুতর অসুখের খবর পেয়ে তুলসীদাসের অনুপস্থিতির সুযোগে তাঁর স্ত্রী বেরিয়ে পড়লেন বাপের বাড়ির দিকে। ঘরে ফিরে ঘরনীকে না পেয়ে, আকাশপথোত্তরণে ক্লান্তপাখা বিহঙ্গ সিন্ধুবক্ষের নিকটবর্তী কোথাও ডাঙা খুঁজে না পেলে যেমন কেঁদে মরে তেমনই অসহায় বোধ করলেন তুলসীদাস ; অন্ধকার দেখলেন জগৎ, স্ত্রীর ঘরের বন্ধ দ্বার দর্শনে। দুরন্ত জল-ঝড়ের রাত সেদিন। পশুরা পর্যন্ত যে রাতে বেরুতে ভয় পায়, সে রাতে শ্বশুরবাড়ি যাবার পথে বেরুলেন তুলসীদাস। দুস্তর পারাবার পার হয়ে পেঁছিলেন শ্বশুরালয়ে। দরজা বন্ধ প্রবেশদ্বারের। প্রাচীর অতিক্রম করতে গিয়ে ধরা পড়েন তুলসীদাস। ধরা পড়ে শ্বশুরবাড়ির লোকের হাতে জামাই প্রচন্ড মার খেয়ে অচৈতন্য হয় ; তবু চৈতন্য হয় না স্ত্রী-অন্ধ গোস্বামীর।

স্ত্রী তখন স্বামীকে তীব্র ভর্ৎসনা করে বলে : আমার দেহের জন্যে তোমার এই ঘৃণ্য কামনা, এর একটুখানি যদি তোমার ঈশ্বরের জন্যে হতো তাহলে বিশ্রী কাম দূরে যেত, দেখা দিত স্বয়ং শ্রীরাম।

তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে পড়েন তুলসীদাস ; প্রভাতের জন্যে করেন না অপেক্ষা (প্রভাত কি সূর্যোদয়ে ?) !

আমরা কত সময় বলি, এর অর্ধেক ডাক ভগবানকে ডাকলে তিনি সাড়া দিতেন। কত সময় আমাদেরকেও লোকে বলে। কিন্তু আমাদেরও কিছু কাজ হয় না ; যাদের বলি তাদেরও হয় না। হয় না যে তার কারণ তখনও সময় হয় না। তুলসীদাসকেও তাঁর স্ত্রী নিশ্চয়ই একথা আগেও বলেছিলেন। হয়তো অনেকবারই বলেছিলেন। কিন্তু কাজ হয়নি ; কারণ সময় হয়নি ; সময় যখন হলো তখনই তুলসীদাসের কানে গেল না সেকথা শুধু, প্রাণে গিয়ে বাজল।

সময় হলে তবেই 'রত্নাকর' বাল্মীকি ! 'ক্ষুদে' হয় ক্ষুদিরাম ! 'বিলে,'—বিবেকানন্দ !

সময় হলো গৌতমের বুদ্ধ হবার ; প্রবুদ্ধ হবার। বেরিয়ে পড়লেন তিনি পথে। এসে পৌঁছলেন বৈশালীতে ; অরাড় মুনির আশ্রমে। মুনি উত্তর দিতে পারলেন না গৌতম-জিজ্ঞাসার : দুঃখ থেকে মুক্তি কিসে ? মুনি তাঁকে স্বর্গের পথ বলতে পারলেন ; কিন্তু মুক্তির ঠিকানা দিতে পারলেন না। গৌতম স্বর্গ অথবা নরকের রাস্তা জানতে চান না। তিনি চান মুক্তির পথ। তাঁর জন্যে নয় ; জগতের জন্যে। সেখান থেকে গৌতম এলেন উরুবিল্বের পাঁচ ব্রাহ্মণের কাছে। অনাহার-তপস্যাই মুক্তির পথ তাঁরা বললেন। গৌতম সে-পথ পরীক্ষা করে বুঝলেন এ পথ তাঁর পথ নয়।

গৌতম বুঝলেন তাঁর পথ তাঁকেই আবিষ্কার করতে হবে। নিরঞ্জনা নদীর তীরে বোধিবৃক্ষের তলায় আসন পাতলেন তিনি। আরাধনার আসন। দুঃখ থেকে মানুষের মুক্তির মৃত্যুঞ্জয় সাধনায় রত গৌতমকে দুঃখের রাজা 'মার' ভয় দেখান ; অপ্সরীরা লোভ। কিন্তু গৌতম তাদের অতিক্রম করে পেলেন সেই জ্ঞান। তিনি বুদ্ধ হলেন ; প্রবুদ্ধ।

বুদ্ধের নবধর্মের যাত্রা আরম্ভ হয় বোধিলাভের ঊনপঞ্চাশ দিন পরে মৃগদাব সারনাথে ; বৌদ্ধধর্মের জয়যাত্রা !

এই বৌদ্ধধর্ম যখন আসমুদ্রহিমাচল ভারতবর্ষ এবং ভারতের বাইরে একের পর এক, দেশ নয়, দেশের হৃদয় জয় করার পর অবিচল প্রতিষ্ঠায় প্রদীপ্ত,—তখন এসেছিলেন এই ভারতে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দু, শংকরাচার্য।

শংকরস্থান কাশীতেই শংকরাচার্যও অবস্থান করেছিলেন। তাঁর জয়যাত্রাও আরম্ভ হয় এই কাশীতেই। কাশী যে শংকরের আর কাশীতে যে শংকর এসেছিলেন এঁদের দুজন আসলে এক। প্রথম শংকর আর দ্বিতীয় শংকর, এঁরা দুজনেই অদ্বিতীয় শংকর যে এ না বুঝলে অদ্বৈতবাদকে বোঝা যাবে না। এবং অদ্বৈতবাদকে না বুঝলে হিন্দু কি এবং কে, কাশী সেই হিন্দুর কাছে কি এবং কে অসম্ভব হবে উপলব্ধি করা ; কারণ : 'Nevertheless it was Sankaracharya's teaching and philosophy which established Sivaism, ..' [E. B. Havell]

অদ্বৈতবাদের জন্ম শংকরাচার্যের জন্মের অনেক আগে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে হিন্দুধর্মের যে ভিৎ টলে উঠেছিল শংকরাচার্য তাকে চিরকালের মতো আবার অটল প্রতিষ্ঠা দিয়ে যান অদ্বৈতবাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠায়। তার প্রমাণ :

'It is not to be supposed that Sankaracharya was the first to teach the pantheistic doctrines of Hinduism. The idea of the One Supreme being manifested in the many had been clearly indicated centuries before in the Upanishads, and

developed in tne Vedanta school of philosophy, but Sankaracharya's preaching marks the final absorption of Buddhism into the Brahmenical system, and the development of the worship of Shiva into one of the most popular cults.' [*Benores, the Sacred City*]

হিন্দুরা জীবনের গভীরে প্রবেশ করেছিল। একদা তারই প্রথম পরিচয়ে প্রদীপ্ত উপনিষদ; তার দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় প্রমাণ, বেদান্তের অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সিদ্ধ শংকরাচার্য।

বিশ্বের ইতিহাসে সত্যিই যদি কখনও কোনও 'বিস্ময়' জন্মগ্রহণ করে থাকেন তবে তিনি শংকরাচার্য। অতি অল্পায়ু এই 'বিস্ময়' ত্রিশ বৎসরের কম-বেশি জগতে অবস্থান করে গেছেন। কেরলের এই বালক-বিস্ময়ের বয়স যখন ষোলো, তখন গুরুকৃপায় বেদান্তভাষ্য রচনা সমাপ্ত। হেগেল অথবা কান্ত্ বলতে আমরা মূর্ছা যাই, তাই; চৈতন্য যদি কখনও ফিরে আসে হিন্দুভারতের, সেদিনই সে জানবে শংকরাচর্য কি এবং কে? এবং মানবে, কাশী কেন ভারতবর্ষের কোনও একটা 'স্থান' মাত্র নয়। শংকরাচার্য যেখানে অদ্বৈতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন সেই কাশীতেই কেবল 'শংকরের' নিত্য অবস্থান!

মাত্র সেইদিনই, ভারতের হিন্দুরা জানবে, কাশী কেবল হিন্দুর নয়; নয় বৌদ্ধের, কাশী সেই সকলের, যাদের চর্মভেদ নয় কেবল, মর্মভেদ করছে শংকরবাণী; কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ! সেই ভাগ্যবান ছাড়া আর সকলেরই বেনারস যাত্রা সম্ভব হলেও কাশীদর্শন হবে অসম্ভব। কাশী সত্যিই বিনারস ছাড়া আর কি? শংকরের রস বিনা!

॥ তেরো ॥

'যাহা জ্ঞানেন্দ্রিয় মন ও কর্মেন্দ্রিয় চক্ষুকর্ণাদির কারণ, যাহা আকাশের ন্যায় সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত, যে বস্তু দিবাকরের ন্যায় নিখিল পদার্থের প্রকাশক, আমিই সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা।'

['সাধক-জীবনী'— শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]

রৌদ্ররুক্ষ রাজপথ দিয়ে হেঁটে চলেছেন অদ্বৈতবাদী অদ্বিতীয় শংকর। মাথার ওপর মধ্যাদিনের সূর্য আগুন ঢালছে আপন মনে। পায়ের তলায় পথ যেন পুড়ে যাচ্ছে জ্বরে; মুন্ডিত-মস্তকে সূর্যের অগ্নি, নগ্নপদে পথের উত্তাপ দুই অগ্রাহ্য করে এগিয়ে চলেছেন হনহন করে স্বয়ং শংকর; তাঁর ভারত-দিগ্বিজয়ের পথে শেষ কণ্টক, মণ্ডন মিশ্রের গৃহ অভিমুখে। তপ্ত দিবাকর,

আর উত্তপ্ত পথ এ-দুয়ের চেয়েই, উৎপাটিত না করতে পারা পর্যন্ত সেই কণ্টকের জ্বালা শংকরে পক্ষে অনেক বেশি দুঃখকর। মণ্ডন মিশ্রের বাসভূমি মাহিষ্মতীতে, আজ শংকর সেই কারণেই উপস্থিত; শংকর প্রশ্ন করলেন রাজপথে দেখা-হয়ে-যাওয়া কয়েকজনকে: মণ্ডন মিশ্রের বাড়ি চিনব কি করে? জিজ্ঞাসিতদের একজন জবাব দিল: যে-বাড়ির দরজায় শুকপাখি তর্ক করছে জগৎ স্বতঃপ্রমাণ না পর্বত-প্রমাণ; জগৎ নিত্য না অনিত্য,—সেই বাড়িই জানবে, মণ্ডন মিশ্র ছাড়া আর কারুর নয়।

পিতৃশ্রাদ্ধে নিরত মণ্ডন মিশ্র দুই ব্রাহ্মণের পা ধুইয়ে দিচ্ছিলেন যখন ঠিক তখনই শংকর সেখানে উপস্থিত হলেন, উপবীতহীন ও মুণ্ডিত মস্তকে শিখা-বিহীন অবস্থায়। কুপিত মণ্ডন কটাক্ষ করলেন শংকরের গুরুভার কন্থার প্রতি। গাধা যে ভার বইতে সহজে প্রস্তুত নয়, তুমি সেই বস্তুর ভার সানন্দে বহন করছ; অথচ শিখা ও উপবীতের ভার তোমার কাছে এতই বেশী যে, তোমার পক্ষে তা দুর্ভার বলে ত্যাগ করেছ?

শংকর প্রত্যুত্তর করেন তদ্দণ্ডেই:

ন কর্মণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ।

শ্রুতি ব্যাখ্যা করে বললেন শংকর: কাজ, পরিবার অথবা অর্থ মোক্ষের সামর্থ্য যোগায় না। মুক্তির পথই হচ্ছে ত্যাগের পথ। তিনিই যথার্থ সন্ন্যাসী যিনি বর্ণভেদে, বস্ত্রে, কেশে, দারপরিগ্রহে বিশ্বাসী নন। শিখা ও যজ্ঞোপবীতে মুমুক্ষুর প্রয়োজন কি?

মণ্ডন মানলেন তবু মানলেন না: পত্নীপালনে অসমর্থ, এ-সত্য স্বীকারে দেখছি তুমি সমর্থ নও—

হার মানলেন-না শংকরও: মণ্ডনকে তিরস্কার করলেন মণ্ডন স্ত্রীলোক পরিবৃত বলে। মণ্ডন পুনর্বার শংকরকে আক্রমণ করেন এই বলে যে, যে স্ত্রী জন্মদাত্রী, যে স্ত্রীলোক পালয়িত্রী, যে স্ত্রীলোকের দুগ্ধে সন্তানের বৃদ্ধি, সেই স্ত্রী-জাতির নিন্দা পুরুষের জিহ্বাকে পাপ দেয়! শংকর প্রতি-আক্রমণে কখনও অপ্রস্তুত নন: যে স্ত্রী-জাতির দুগ্ধ পান করে মণ্ডন আজ মণ্ডন হতে পেরেছেন, সেই স্ত্রী-জাতির সঙ্গে স্বয়ং মণ্ডন ইন্দ্রিয় চর্চা দ্বারা কি পরিমাণ পাশবিকতার প্রমাণ দিচ্ছেন তা মণ্ডনের না হলেও অন্যান্যদের চিন্তার বিষয়।

মণ্ডনকে নিরস্ত করলেন মণ্ডনের শিষ্যমণ্ডল। শংকর অতিথি; অতএব কলহের পরিবর্তে তাঁর যথাযোগ্য আপ্যায়নই কর্তব্য। ক্রোধ সংবরণ করলেন মণ্ডন। শংকর বললেন: আমি ভিক্ষাপ্রার্থী; কিন্তু অন্নভিক্ষার্থী নই। তর্ক ভিক্ষা করি আপনাকে। যে যাকে তর্কে হারাতে পারবে তার কাছে পরাজিতকে গ্রহণ করতে হবে শিষ্যত্ব। মণ্ডন মিশ্র সম্মত হলেন। মণ্ডনের স্ত্রী উভয়ভারতী হলেন বিচারক।

['সাধক-জীবনী: শ্রীশ্রীশংকরাচার্য"—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সংকলিত]।

তর্কযুদ্ধের অন্তে মণ্ডনের গলায় যিনি স্ত্রী-হিসাবে একদিন মালা দিয়েছিলেন আজ বিচারকের পদে আসীন হয়ে সেই মণ্ডনমহিলা উভয়ভারতী, শংকরের কণ্ঠে স্বয়ং পরিয়ে দিলেন বিজয়মাল্য। তারপর নিজের পরিচয় দিলেন ভারতীর বরকন্যা উভয়ভারতী। শাপভ্রষ্টা স্বর্গচ্যুতা তিনি ; মহর্ষি দুর্বাসার ক্রোধই তাঁর মর্ত্যাগমনের কারণ ছিল। এখন শংকরের এই বিজয়মুহূর্তে হবে তাঁর শাপমোচন ও প্রত্যাবর্তনের কারণ !

আত্মপরিচয়-প্রদানের পর অবশ্য উভয়ভারতী তাঁর স্বামীকে শংকরের শিষ্য হতে দিলেন না ; বাধা দিলেন এই বলে যে, উভয়ভারতী মণ্ডনের অর্ধাঙ্গিনী, তাই তাঁকে তর্কযুদ্ধে পরাস্ত না করতে পারা পর্যন্ত শংকরের পরমবিজয় স্বীকৃত হয় না এবং মণ্ডন মিশ্রের চরম পরাজয় অস্বীকৃত হয়। শংকর এবং স্বয়ং মণ্ডন মিশ্র উভয়েই বিস্মিত হন উভয়ভারতীর প্রস্তাবে, কিন্তু বিস্ময়ের তখনও বাকী ছিল বোধ হয় কিছু।

উভয়ভারতীকে প্রশ্ন করলেন শংকর, কোন্ শাস্ত্রের ব্যাপারে তর্ক করতে চান উভয়ভারতী। উভয়ভারতী বললেন, কামশাস্ত্র হবে তাঁদের তর্কের বিষয়।

তরুণকিশোর বিচলিত বোধ করলেন। আজন্ম ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সবচেয়ে অপ্রস্তুত বিষয়ে তর্ক করতে প্রস্তুত উভয়ভারতী। উপায়ান্তর না দেখে শংকর সময় নিলেন। এমন বিষয়ে তর্ক যেখানে শুষ্কপাঠ সম্বল করে বসা যায় না দ্বন্দ্বের আসরে।

শংকর বেরিয়ে পড়লেন উদ্দেশ্য-সাধনের উদ্দেশে। কিছুদূর না যেতেই সেই সুযোগ পায়ে হেঁটে এসে দাঁড়ায় শংকরের দরজায়। এক সদ্যোমৃত নৃপতির দেহপ্রদক্ষিণরত রমণীদের কান্না দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর। প্রিয়শিষ্য সনন্দনকে অতঃপর শংকর তাঁর অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করে বলেন যে, তিনি শংকর ওই রাজার মৃতদেহে প্রবেশ এবং রাজাকে পুনর্জীবিত করে কামিনীকুলের কাছে কামরমণীয়াভিজ্ঞতার পাঠ নেবেন। প্রিয়শিষ্যর সূর্যোজ্জ্বল মুখে বেদনার মেঘের নীলাঞ্জন ছায়া পড়ে। শংকর বোঝেন সনন্দনের প্রাণের বার্তা। বলেন, সনন্দন তবে শোন মহাভারতের গল্প। দ্রৌপদীর অতিথি হতে আসছেন সশিষ্য দুর্বাসা। নদীপথ পার হতে পারছেন না তাঁরা। পারাবারের কোথাও পারাপারের খেয়া নেই।

দ্রৌপদী কৃষ্ণকে স্মরণ করলেন : মহামান্য অতিথিকে নদী পার করে দাও, হে শ্রীকৃষ্ণ সখা, হে ভবনদীর কাণ্ডারী ! স্মিতহাস্যে সম্মতি দিলেন গোপিনীপরিবৃত রাখালরাজ : নদীর কানে বলো, ব্রহ্মচারী কৃষ্ণ বলছেন অতিথিকে আসতে দাও ; দ্বিধাবিভক্ত হও এই মুহূর্তে। তদ্দণ্ডেই নদী নত হয় পার্থসারথির কথায় ; প্রণত হয় নদী ভবনদীর কাণ্ডারীর পায়ে। কৃষ্ণের পায় দুভাগে ভাগ হয়ে যাওয়া নদীর মধ্যবর্তী শুকনো পথ দিয়ে আসার উপায় হয় দুর্বাসার ! চর্বচুষ্যলেহ্যপেয়-র পর রাগী দুর্বাসা অনুরাগী শিষ্য সমেত আবার সমস্যার

সম্মুখীন হন। নদী পার করে কে এবার? দুর্বাসা এবারে নিজেই হাল ধরেন; শিষ্যদের বলেন, যাও, নদীর কানে তুলে দাও আমার আদেশ: বলো, অনাহারী দুর্বাসা বলছে দু'ভাগ হতে নদীকে। শিষ্যদের মুখে দুর্বাসা-বাণী উচ্চারিত হওয়া মাত্র নদী পথ করে দেয় আবার যেমন দিয়েছিলো সে একবার ভবনদীর যিনি কান্ডারী তাঁর কথায়।

হাসিতে খুশিতে উচ্ছ্বসিত গোপবালারা কিন্তু তাদের প্রশ্নের জবাব পায় না। এ কেমন কথা! একজন দিবারাত্র রমণীর সঙ্গে মজে, অবিরত রমণী-মনোহরণে নিরত, সে কেমন করে নিজেকে বলে ব্রহ্মচারী? আর নদী কেমন করেই বা তার কথায় কোথায় সরে যাবে ভেবে পায় না। আবার দুর্বাসা ভোজনের মাত্রাধিক্যে যে দাঁড়াতে পারছে না, শুয়ে শুয়ে পড়ছে, সে-ই কোন্ সাহসে নিজেকে ঘোষণা করে অনাহারী বলে? শুধু তা-ই বা কেন? নদীই বা কেন তার কথায় পথ করে দিতে পথ পায় না।

অন্তর্যামী উত্তর দেন গোপীজিজ্ঞাসার, সেই গোপন প্রশ্নের। বলেন: আমি রমণীরঙ্গে মজলেও আমার মধ্যে একজন আছেন যাঁর চেয়ে নরম, যাঁর চেয়ে শান্ত, আবার যাঁর চেয়ে শক্ত নেই কেউ আর। তিনি নিরাসক্ত। সেই নিরাসক্ত পুরুষ, এই দেহটার কোনও খেলায় আসক্ত হয় না; শুধু দেখে। সে আদেশ দিলে স্বয়ং শ্রীভগবানকেও বইতে হয় ভাগ্যবানের গুরুভার। শুধু আমার অথবা দুর্বাসার মধ্যে নয়, সকলের মধ্যেই তাঁর থাকা; এবং না থাকা একই সঙ্গে। যে জানে তাঁকে সে জানে সে কে, যে জানে না কে সে, সেই বিস্মিত হয় কৃষ্ণ নিজেকে ব্রহ্মচারী বললে, অথবা আকণ্ঠ আহারের পর দুর্বাসা বললে নিজেকে অনাহারী।

সক্রেটিস সেই একই কথা আরেক ভাষায় বলেন Know thy Self! Know অথবা No? 'Know' মানে Self-ই তখন সব! আর 'No' হলে এই Self তখন শব! জানলে যিনি সব, না জানলে সে শব ছাড়া আর কি!

গল্প শেষ করে হাসেন শংকর। সেই নিরাসক্ত হাসির রক্তিম ছটা ছড়িয়ে পড়ে সনন্দনের মুখের চিন্তার বাদল মেঘের ওপরে। রামধনুর বিচিত্র রং খেলা করে মুখের আকাশে। সংশয়ের মেঘ কেটে গিয়ে নির্ভয়, নীল, নিঃসীম নিরুপম বিশ্বাসের আকাশে উজ্জ্বল হয় নিঃশংকতার রৌদ্ররাগ।

রাজশরীরে প্রবেশ করবার আগে প্রিয় শিষ্যকে সতর্ক করেন শংকর: 'কাম-কলাভিজ্ঞ হয়ে আমি ফিরে না আসা পর্যন্ত আমার এই দেহ গোপনে রক্ষা করো। কারণ, রাজার লোকেরা এক সময়ে আমার এই পরিত্যক্ত দেহ খুঁজে বেড়াবে!'

আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার মুহূর্তে ওদিকে অলৌকিক কাণ্ড ঘটে যায়।

সদ্যোমৃত তরুণ রাজচক্ষে পলক পড়ে ; আর রাজার অনুচরবর্গের চোখে বিস্ময়ে পলক পড়ে না আর। সচন্দনপুষ্পমাল্যভূষিত নরদেহ, নরপালের মৃতদেহ যেন কার অমৃতস্পর্শে আবার জেগে ওঠে। কিংকর্তব্যবিমূঢ় অমাত্যদের ঘোর কাটতে সময় নেয়। তারপর এক সময়ে ক্রন্দনরোল থেমে গিয়ে আকাশে বাতাসে বেজে ওঠে বাদ্য, জেগে ওঠে আনন্দ কলরোল !

রাজা ফিরে আসেন রাজধানীতে ; রাজতক্তে। অভূতপূর্ব উপায়ে বেঁচে-ওঠা রাজার মধ্যে ভূতপূর্ব রাজাকে কিন্তু খুঁজে পান না দুজন। একজন রাণী ; আরেকজন,—মন্ত্রী। যে রাজা শ্মশানে গেছিলেন, আর যে রাজা সিংহাসনে ফিরে গেছিলেন শ্মশান থেকে,—এঁরা দুজন যেন এক নয়। রাজার জগৎ-ও যেন পালটে গেছে ; জগতের রাজা যেন এখন হাল ধরেছেন রাজার জগতের। এবং সে পরিবর্তনের পরামশচর্য প্রকাশ পত্রেপুষ্পেপল্লবে ; কিশলয়ে কিশলয়ে। রাজার জগৎ তিরোহিত হয়ে আবির্ভূত না হলে জগতের রাজা, নদীতে এল কি করে এত নতুন জল ? আকাশের নীলে এমন নীলোৎপল শোভা জগতের অনিলে এমন পারিজাতবাস ?

রাণী ও প্রধানমন্ত্রী অতএব নিশ্চিত সিদ্ধান্তে এলেন, সুনিশ্চিত প্রত্যয়ে উপনীত হলেন, যে কোনও যোগী কোনও বিশেষ কারণে বর্তমানে অবস্থান করছেন এই রাজশরীরে। রাজভৃত্যদের ওপর তাই আদেশ হল: 'যেখানেই কোনও সন্ন্যাসী বা যোগী অথবা যে কারুর মৃতদেহ অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াহীনাবস্থায় দেখবে সেখানেই সে দেহ পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।'

শিষ্যরা শঙ্কিত হন। শংকর ফিরছেন না কেন? রাজানুচরেরা ক্ষ্যাপা কুকুরের মতো খুঁজে বেড়াচ্ছে পরিত্যক্ত প্রাণহীন যোগিদেহ। শিষ্যরা শংকরকে খুঁজতে খুঁজতে এক রাজ্যে এসে শুনলেন যে সেখানকার রাজা মরে গিয়ে আবার বেঁচেছেন। শুনে শিষ্যরা বুঝলেন, শংকর ছাড়া আর কেউ নন। তাঁরা শুনলেন রাজা সঙ্গীতপ্রিয়। শিষ্যরা গানের মধ্যে দিয়ে তাঁদের বিপদের কথা রাজরূপী গুরুর কানে তুলে দিলেন। শংকর বললেন : কামশাস্ত্র দেখা শেষ হয়েছে আমার ; এবারে যাবো। তোমরা তৈরী থেক।

রাজসৈন্য তখন দুর্ভেদ্য অরণ্যের অন্ধকারে খুঁজে পেয়েছে শংকরের পরিত্যক্ত প্রাণহীন দেহ। তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া হয়নি তখনও। সৈন্যরা সেই দেহ কেড়ে নেবেই আর শংকর-শিষ্যরা দেহে প্রাণ থাকতে গুরুকলেবর স্পর্শ করতে দেবে না কিছুতেই। দু'পক্ষই দ্বন্দ্বমুখর। এবং সেই মুহূর্তেই মূর্ত হলেন শংকর মৃতদেহে। এবং রাজার অমৃতদেহ পুনরায় প্রত্যাবর্তন করল মৃতদেহে। উভয়ভারতীর কাছে গেলেন শংকর। উভয়ভারতী তর্ক নিরর্থক বুঝে উভয়কর জোড় করে পরাজয় স্বীকার করলেন। মণ্ডন স্বীকার করলেন তাঁর শিষ্যত্ব। তখন শংকর আবার উভয়ভারতীকে উভয়কর যুক্তাবস্থায় নিবেদন করলেন তাঁর প্রার্থনা ; উভয়ভারতী মর্ত্যলোক থেকে অমর্তলোকে ফিরে

যাবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলে শংকর বললেন, তাঁর প্রতিষ্ঠিত শারদা মঠে অবস্থান করবার জন্যে। উভয়ভারতী বললেন : তথাস্তু।

['সাধক-জীবনী'—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী সংকলিত]

অন্যের মৃতদেহে প্রবেশ করার এই কাহিনীকে বলা হবে আজকের দিনে, হয় অলীক, নয় অলৌকিক। বলা হবে তার কারণ আচার্য শংকরের আবির্ভাব বিংশ শতাব্দী নয়। বলা হবে তার কারণ শংকর য়ুরোপীয় কোনও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বিজ্ঞানে 'চিকিৎসক' অভিধায় ভূষিত নন। বলা হবে, তার কারণ শংকর 'আত্মকথা' প্রচারের পরিবর্তে আত্মার বাণী প্রচারে বেরিয়েছিলেন। আজকের দিনে যখন পশুর অঙ্গ, মানুষের অবশ, অক্ষম অথবা দুষ্টক্ষতে খসে যাবার মতো অঙ্গকে পেনসন দেয়; যখন অন্ধ দৃষ্টি লাভ করে ধার-করা রেটিনায় তখন কিন্তু তা আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রা! বিজ্ঞান যে কেবল এ-যুগের পলিটিক্যাল 'Big Gun'-দের যারা হাতের পুতুল তাদেরই একচেটে। এ যুগের আগে যেন জ্ঞান অথবা বিজ্ঞান বলে কোনও 'অধিকার' মানুষের জানাই ছিল না। ভারত-ধুরন্ধর ভীষ্মের ইচ্ছামৃত্যু যে হেতু মহাভরতের সেই হেতু তা ব্যাসের কল্পনা মাত্র; উইশফুলফিলমেন্ট ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু এ যুগে মৃত কুকুরে প্রাণ-সঞ্চারের প্রচেষ্টার সাফল্য থেকে মরা মানুষকে নবজীবনদানের পরীক্ষা যেদিন জয়যুক্ত এবং মানুষ যেদিন স্বেচ্ছায় মরতে পারবে, সেদিন কিন্তু তা আধুনিক কালের বলেই, স্বচক্ষে দেখা যাবে বলেই তা আর কল্পনা নয়, তখন তা, কোনও পাঁচসালা পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ মাত্র।

রামায়ণে মেঘনাদ যখন মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী বলে বিবৃত হন তখন আমরা তাকে কিংবদন্তীর মূল্যও দিই না; কারণ তা স্মরণাতীত এক কালের অবিস্মরণীয় আরেক ঘটনা। কিন্তু আজকে গাগারিন-এর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। অথচ বিজ্ঞানের এই জয়যাত্রা আসলে মানুষের পরাজয়-বার্তা ছাড়া আর কি! পৃথিবীতে যখন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় এটমবম্ব ঝাড়া যাচ্ছে না, তখনই তো শুরু হয়েছে এই অদৃশ্য নভোলোক অন্বেষণ; যাতে শত্রুপক্ষ জানবার আগেই তাকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করা যায়। সেকথা থাক। এই যে নভোলোক অতিক্রম,—এ যদি বিশ্বাস হয় তো মেঘলোকের আড়াল থেকে লক্ষ্মণ-নিহত মেঘনাদের পক্ষে সে যুদ্ধ করা অবিশ্বাসযোগ্য কেন? যেহেতু তা রামায়ণে আছে, আজকের কারুর লেখা কোনও মোরাভিয়া বা নবোকভের লেখা কোনও 'রামায়ণে' তা নেই,—এই কারণে কি?

সেযুগেই বা শুধু কেন, এযুগেই তো বৈজ্ঞানিক যখন বলেন, নদীর এক জলে দু'বার ডুব দেওয়াটা ইলুশান মাত্র কারণ নদীর জল চলিষ্ণু তখন তা বেদবাক্য, কিন্তু কবি যখন বলেন,—

'যদি তুমি মুহূর্তের তরে
ক্লান্তিভরে
দাঁড়াও থমকি
তখনি চমকি
উচ্ছিয়া উঠিবে বিশ্ব পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তুর পর্বতে ;'

তখন যেহেতু 'কবি'-র উক্তি অতএব তা শুধুই কবিতা ! অথবা রবীন্দ্রনাথের তৃতীয় দৃষ্টিতে যখন ধরা পড়ে,—

'নৃত্যের বশে সুন্দর হল বিদ্রোহী পরমাণু,
পদযুগ ঘিরে জ্যোতিমঞ্জীরে বাজিল চন্দ্রভানু '

তখন তা কেবল রবীন্দ্রনাথের অবর্তমানে ভুল সুরে গাইবার মাত্র ; কিন্তু ওই একই কথা যখন বৈজ্ঞানিকরা বলেন যে প্রত্যেক অণুতে অনন্ত বিশ্বের, অন্তহীন বিস্ময়ের সম্ভাবনা, তখন তা ট্রু ; কারণ তখন তা সায়ান্স। তখন তা 'কন্‌সায়ান্সের' মোহমুক্ত।

॥ চোদ্দ ॥

অষ্টকুলাচল-সপ্তসমুদ্রাঃ
ব্রহ্মা-পুরন্দর-দিনকর-রুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোক-
স্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১॥

[শঙ্করাচার্য বলেছেন 'মোহমুদ্গরঃ'-তে : এই জগৎ, তুমি, আমি, দীপ্ত দিনকর, প্রচণ্ড রুদ্র, বিপুল ব্রহ্মা, বিচিত্র সেই পুরন্দর, সপ্তসমুদ্রের শেষ বারিবিন্দুটুকু অথবা আট কুলাচল, কিছুই থাকবে না ; তবে কার জন্যে এই শোক ?]

গহনকুসুমকুঞ্জ ঘেরা কুটিরে নিশীথ রাত্রে। আজ থেকে সহস্রাধিক বছর আগে, আকাশ-বাণী উচ্চারিত হয়েছিলো দক্ষিণাপথের কেরল জনপদের কাছে 'কালাতি' বলে এক ব্রাহ্মণ-প্রধান গ্রামে : শোনো শিবগুরু, তুমি যা ইচ্ছা করবে তাই হবে। একটি পুত্র হবে তোমার। সর্বগুণাভরণভূষিত অতি অল্প আয়ু এক দিগ্বিজয়ী সন্তান ; অথবা জ্ঞানকর্মকীর্তিহীন বহুদীর্ঘবাস যাদের সম্ভব হবে বসুমতীতে, এমন একাধিক পুত্র হওয়াও তোমার অসম্ভব হবে না,—কি চাও তুমি ?

শিবগুরু বললেন : বহুগুণসম্পন্ন এক পুত্র চাই আমার ; একমাত্র পুত্রর হওয়া চাই কীর্তি সুর্যোজ্জ্বল ; কৃতবিদ্য। শিবগুরুকে গুরু শিব বর দিলেন : তথাস্তু।

শিবের বরে সরস্বতীর 'বরপুত্র' শংকরাচার্যের আবির্ভাব আচার্যের ভূমিকায় ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষকে আর একবার শোনাবার জন্যে :

'যাবজ্জননং তাবন্মরণং
তাবজ্জননী-জঠরে শয়নম্ ।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ
কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৬ ॥

নিরবধিকাল ধরে এই বিপুলা পৃথিবীতে 'জ্ঞান' এই একবারই অবতীর্ণ হয়েছিল শংকরাচার্যরূপে। মানবকণ্ঠে স্বয়ং সরস্বতীর কণ্ঠস্বর শ্রুত হয়েছিল একবার। নগাধিরাজ হিমালয়ই যেমন একমাত্র পর্বত। আর সব পাহাড়ই নামে পর্বত ; আসলে ঢিপিবঢ্য ; গঙ্গাই একমাত্র মুক্তিদা, আর সব নদী অথবা নদই জলপূর্ণ কলসী মাত্র ; হিন্দুধর্মই যেমন একমাত্র মানব-তরণ, আর সব ধর্মেই শুধু উপদেশ বিতরণ ; তেমনই শংকরাচার্যই এ পৃথিবীর আদি থেকে অনাদিকাল পর্যন্ত হয়তো একমাত্র, বিদ্যার যিনি দ্বার খুঁজে পেয়েছিলেন :

"ব্যবহারিক জগৎ যাদের নিয়ে সেই জীবের জ্ঞান এবং জ্ঞানের বিষয় দুয়ের কোনটাই সৎ নয় ; কারণ এ-কে 'বিদ্যা' বলব না ; বলব 'অবিদ্যা'-র কল্পনা মাত্র।"

'বেদে'র জ্ঞানকাণ্ডের ব্যাখ্যাকার ছাড়া এ জ্ঞান ত্রিভুবনে আর কে দেবে ?

এই শংকরকে মণ্ডন মিশ্র প্রশ্নের ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে বলেছিলেন : পরমাত্মা চিৎস্বরূপ, এ বিষয়ে বেদান্তবাক্য প্রমাণ নয় ; কারণ কার্যের অতীত চিৎবস্তুর পরমাত্মায় সংশ্লিষ্ট হওয়া সম্ভব নয়। তাই চিৎস্বরূপ পরমাত্মা অসম্ভব।

শংকর তার উত্তরে নিরুত্তর করেন মণ্ডন মিশ্রকে মুহূর্তে : একমেবাদ্বিতীয়ং সত্যং জ্ঞানমনন্তং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম [ব্রহ্ম অদ্বিতীয় ; সত্যও জ্ঞানস্বরূপ। অনন্তময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময়]। সর্বখল্বিদং ব্রহ্ম [অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সবই ব্রহ্মময়]। তরতি শোকমাত্মবিৎ [নিজেকে যে জেনেছে সে উত্তীর্ণ হয়েছে সব দুঃখ]। তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ [ব্রহ্মদ্রষ্টার কাছে শোক বা মোহ সম্পূর্ণ অর্থহীন]। ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি [ব্রহ্মকে জানলেই স্বয়ং ব্রহ্ম]। ন সা পুনরাবর্ততে ন স পুনরাবর্ততে [তিনি যিনিই হন তিনি আবর্তনমুক্ত]।

এই শংকরাচার্যও একদিন বিভ্রান্ত হয়েছিলেন। এবং এই কাশীতেই একদিন গঙ্গাস্নান করে তীরে উঠে আসছেন এমন সময় এক চণ্ডাল কয়েকটা কুকুর নিয়ে পথ আগলে আছে। গঙ্গাস্নানের পবিত্রতা কুকুর-স্পর্শে মালিন্যযুক্ত না হয় যাতে তাই শংকর চণ্ডালকে পথ ছেড়ে দিতে বললেন। চণ্ডাল মুহূর্তে রুখে দাঁড়ায় : সে কি ? বেদ বলছেন, আত্মা এক, অনাদি, অদ্বিতীয় ; তাহলে কুকুরের আত্মায় আর আপনার আত্মায় পার্থক্য-বোধ কেন। দাঁড়িয়ে গেলেন সশিষ্য শংকর। নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের মুহূর্তে চণ্ডালের মুখ মুখর হলো

বেদব্যাখ্যায় : আর যদি কুকুরের দেহকে দেখে এই সংকোচ, তবে বলি দেহ তো মায়া।

চণ্ডাল নয়। স্বয়ং শংকর শংকরের সামনে উপস্থিত। মাতৃগর্ভ থেকে জাত হয়েছিলেন শংকর ; আজ দ্বিতীয়বার জন্ম হলো তাঁর চণ্ডাল-কৃপায়। মহাদ্বিজর অহৈতুকী করুণায় দ্বিজ হলেন অদ্বিতীয় শংকর আজ।

এবং ওই একবার নয় ; আরেকবার। সেবারও এই কাশীতেই, মণিকর্ণিকার ঘাটে স্নান করতে যাচ্ছেন সশিষ্য শংকর। এবং সেবারেও পথ আগলে পড়ে আছে এক শব। শবধারক এক রমণী। তাকে বললেন শংকর এবারেও পথ ছেড়ে দিতে। শবকে রাস্তা জুড়ে না শুইয়ে রেখে আড়াআড়ি একটু পাশ দিতে। রমণীর উত্তরে এবারেও দাঁড়িয়ে যেতে হয়। সেই রমণী বলেন শংকরকে : শব-কে বলো ; আমাকে বলছ কেন ? শংকর রমণীর কথায় অবাক হন : শব কখনও কারুর কথায় নিজেকে নড়াতে পারে ? রমণীর প্রত্যুত্তর আসে তৎক্ষণাৎ : পারা উচিত ! কি রকম ?—শংকর-জিজ্ঞাসা। রমণীর জবাব হলো তার এবারে : যিনি জগৎকর্তা তিনি শক্তিবিমুক্ত ব্রহ্ম। এইতো আপনার দর্শন ; তাই না ? শংকর বললেন : হাঁ। 'তাহলে শক্তিহীন শব কেন নিজেকে নড়াতে অক্ষম হবে ?'

শংকরের চোখে পলক পড়বার আগেই সেই নারী সশব উধাও হন। আর শংকর মুহূর্তে উপলব্ধি করেন যে শক্তিযুক্ত ব্রহ্মকল্পনাই সাধারণের সাধ্য ; নির্বিশেষ ব্রহ্মতত্ত্ব কয়েকজন বিশেষের জন্যেই কেবল। ['ভারতের সাধক' —শ্রীশংকরনাথ রায়]।

শংকরাচার্যের বাঁচবার কথা মাত্র ষোলো বছর। সশিষ্য মণিকর্ণিকায় একদিন শংকর জপে বসেছেন, এমন সময় এক বৃদ্ধ এসে প্রশ্ন করেন : ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তুমি সব চেয়ে বেগ পেয়েছ কোথায় ? শংকর বললেন : আপনি কোথায় বুঝতে পারেননি শুধু সেইটুকু জেনে নিন না ; আমি কোথায় অসুবিধেয় পড়েছি তা জেনে লাভ কি ? বৃদ্ধ তখন জানতে চাইলেন : তদনন্তর প্রতিপত্তৌ, বংহতি ইত্যাদি সূত্রটির অর্থ। বৃদ্ধের সঙ্গে শংকরের এই সূত্রের অর্থ নিয়ে মহা অনর্থ বেধে গেল। এক সময়ে ক্রোধে শংকর আদেশ দিলেন বৃদ্ধকে বার করে দিতে। শিষ্য পদ্মপাদ গুরুর পাদপদ্মে প্রণতি জানিয়ে বললেন : একদিকে গুরু শিব ; অন্যদিকে এ বৃদ্ধ স্বয়ং ব্যাসদেব। কি করব !

শংকর তখন ব্যাসদেবকে প্রণতি জানালেন। ব্যাস বললেন : ব্রহ্মসূত্রের এই ব্যাখ্যা ব্রহ্মাণ্ডে প্রচার কর তুমি। শংকর বললেন : আমার আয়ু ষোলো বৎসর মাত্র ! ব্যাসদেব বললেন : আমি বাড়িয়ে দেবো তোমার বয়স আরও ষোলো বৎসর। ['সাধক-জীবনী'—শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]

আমরা সময়ের অভাবে কখনও, অভাবের সময় বলে অজুহাত দেখাই কখনও, কাজ না করতে পারার কারণে। আজকের চিন্তাশীল বার্নার্ড শ

বলেন : তিনশো বৎসর পরমায়ু চাই অন্তত আংশিক জ্ঞানের জন্যেই শুধু ! শয়ের মতো শয়ে শয়ে আরও অনেক জ্ঞানী-গুণী সময়ের অভাবের কথা সব সময়ই জানিয়েছেন। কিন্তু অভাব সময়ের নয়। অভাবের সময়টাও সব সময় কেন, প্রায় সময়েই নয় আসল কারণ পূর্ণ বিদ্যা অর্জন করতে না পারার। অভাব 'ভাব'-এর। 'শংকর'র সঙ্গে শংকরাচার্যের ভাব না হলে, শক্তির সঙ্গে ব্রহ্মের ভাব না হলে জ্ঞানস্পৃহার সঙ্গে উদ্যমের ভাব না হলে, সাধ-এর সঙ্গে সাধ্যের অভাব ঘটে।

ষোলো বছরে ষোলো কলা ; বত্রিশ বছরে চৌষট্টি কলা আয়ত্ত করেছিলেন শংকর। কি করে করেছিলেন ? করেছিলেন সেই তাঁর কৃপায়, যাঁর কৃপায় খঞ্জ পাহাড় ডিঙোবার দুর্বার শক্তি পায় দু'পায় !

শংকরকে তাঁর মা সন্ন্যাস গ্রহণ করতে দিতে চাননি প্রথমে। শংকর তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর সানন্দানুমতি ব্যতিরেকে সন্ন্যাস নেবেন না শংকর। শংকরজননীর শংকার এবং শংকাহরণের—দুয়েরই উৎস শংকর। স্নানের জন্যে এক সময়ে অনেক দূর যেতে হতো শংকরজননীকে। একদিন সেই পথ পরিক্রমায় রৌদ্রাক্রান্তা হন শংকরজননী এবং সংজ্ঞা হারান। শংকরের প্রার্থনায়, শংকরের আজ্ঞায় নদী বইতে থাকে তার পরের দিন থেকে শংকরজননীর গৃহের দু'হাত দূর দিয়ে। ভগীরথ নামিয়েছিলেন নদীকে মহাদেবের জটা থেকে ; শংকর তাকে পৌঁছে দিয়েছিলেন মহাদেবজননীর পায়ের তলা পর্যন্ত। এই নদীতেই একদিন কুমীর চেপে ধরে শংকরের দু'পা ; শংকরের চীৎকারে এসে পড়েন শংকরজননী। শংকর বলেন : সন্ন্যাসগ্রহণে অনুমতি দিলে কুমীর আমাকে ছেড়ে দেবে : না দিলে কুমীর আমাকে নেবে ! শংকরজননী অনুমতি দিলেন পুত্রের সন্ন্যাস-গ্রহণে।

মায়ের দেহাবসানের পূর্বে মায়ের কাছে আর একবার আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন শংকরাচার্য। এবং সে-কথা রেখেছিলেন। মায়ের মৃত্যুশয্যায় শংকরবাণী উচ্চারিত হয় : ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। মায়াময় সংসারের কোনও কিছুতে তিনি লিপ্ত নন, যিনি না স্থূল, না সূক্ষ্ম এবং কোনও দেশে-কালে যাঁর নেই কোনও পরিমাপ।

শংকর বাণী নয় ; শংকর-বাণী শুনতে শুনতে তাঁর মায়ের আত্মা দেহত্যাগ করে।

আচার্যের শিষ্যরাও আচার্যের যোগ্য ছিলেন। তাঁরাও শংকর অধীন ছিলেন না ; ছিলেন শংকর-অধীন। যেমন একবার শংকর তাঁর প্রিয় শিষ্য সনন্দনকে আহ্বান করেন যখন, তখন সনন্দ দেখেন সামনে বিরাট নদী। কি করে এই বিপুল পারাবার পার হবেন, এ চিন্তা তাঁর মনে এলে না একবারও। মনে এল শুধু যে, গুরুর ডাক এলো এতদিনে জীবনে ; সত্যকারের আহ্বান ! সে ডাকে সাড়া দেবার মুহূর্তে, সামনে অগ্নিকুণ্ড অথবা অসীম পারাবার সে-কথা

মনে রাখে কে ? সনন্দন ঝাঁপ দিলেন গঙ্গায়। আর প্রতি পদক্ষেপে প্রস্ফুটিত হতে থাকল একটি করে পদ্ম। পদ্মের পরে পদ্মের ওপরে পদস্থাপনা করে উত্তীর্ণ হলেন গুরু-আহ্বানের অগ্নিপরীক্ষায়। তীরে উঠতে শঙ্কর আলিঙ্গনে আবন্ধ করে শিষ্যের নব নামকরণ করলেন : পদ্মপাদ'।

শঙ্করের আরেক শিষ্যর আবিষ্কারও আশ্চর্য করে। শঙ্কর তখন 'শ্রীবল্লী' নামে এক ব্রাহ্মণ-পল্লীতে। জড় পুত্রকে নিয়ে এক পিতা শঙ্করের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন : আমার এই ছেলে তেরো বছর বয়সেও কথা বলে না একটা ; ব্যবহারে জড়বৎ ! শঙ্কর তখন জিজ্ঞেস করলেন সেই বালককে : তুমি এরকম ব্যবহার করছ কেন ? বালক উত্তর দিল : যা, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন ও কর্মেন্দ্রিয় চক্ষু-কর্ণাদির প্রবৃত্তির কারণ, যা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্ত, সূর্যের মতো পদার্থ-প্রকাশ, আমি সেই জ্ঞানস্বরূপ আত্মা। বালকের শঙ্কার-বাণী নয়, শঙ্কর-বাণী উচ্চারিত হয় আবার : জড় নন। এই বালক সংসারজ্ঞানশূন্য ; আমার শিষ্য হবার যোগ্য এই বালক।

এই বালক-বিস্ময়ের নাম রাখেন শঙ্কর, 'হস্তামলক'।

হস্তামলক, পদ্মপাদ (সনন্দন), সুরেশ্বর (মণ্ডন মিশ্র) ও তোটকাচার্য এই চারজন প্রিয় শিষ্য শঙ্করের সর্বশাস্ত্র-পারদর্শী। অনেকের মতে এঁরাই ব্রহ্মার চতুর্মুখ ; ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্বও কেউ কেউ বলেন এই চারজনকে। কারুর মতে আবার এঁরা চারজনই হচ্ছেন ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ, এই চার পুরুষার্থ '

॥ পনেরো ॥

সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই বলে যাঁরা হা-হুতাশ করেন তাঁদের কাছে দূরের মাঠ চিরকালই সবুজ দেখায়। রাম এবং অযোধ্যা দুই-ই আমাদের কল্পনার ; কাউকেই আমরা দেখিনি। সম্ভবত কেউই দেখেননি। আদর্শ-মানুষের পরিকল্পনা করতে গিয়েই রামের কল্পনা এবং রামায়ণের পরিকল্পনা। আমি জানি। আমি জানি যে, ধর্মপ্রাণ হিন্দু আমার এই মন্তব্যে বিচলিত হবেন। কিন্তু ধীরে ; রজনী ধীরে। আমি মোটেই বলতে চাইছি না যে, রাম এবং রামায়ণ আগাগোড়া বানানো বা কল্পিত চরিত্র ; আদর্শ-মানুষ চিত্রণের জন্যেই পরিকল্পিত অবাস্তব চরিত্র। না ; তা আমার বক্তব্য না। আমার বলবার এই যে, রামের মতো কেউ সেদিনও ছিলো ; এবং আজও আছে। সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী, দ্রৌপদী, কুন্তী, অহল্যারা ছিলেন না কোনদিন বললে যেমন সত্যের অপলাপ হয়, তেমনই আজ আর তাঁদের মতো একজনও নেই একথা বললেও অসৎ এবং অসত্য উক্তি ছাড়া আর কিছুই করা হয় না।

এই কাশীতেই সেই রকম একজনকে আমি দেখেছি ; জেনেছি।

তার নাম তারা। তারা কি, আমি বলতে পারব না। 'জানি কিন্তু বলব না',—নয় ; সত্যিই জানি না। আমি বলে নয় ; কেউই জানে না তারার পদবী কি। কারণ, এমন এক সমাজ আজ আমরা অনেক দিন ধরে অনেকতর অবিদ্যায় গড়ে তুলেছি, যে সমাজে চরম উত্থিত এবং চরম পতিতদেরই কেবল পদবীর প্রয়োজন হয় না। তারা শুধু যে পতিত তাই নয় ; তারা পতিতাও। ভারতের যাঁরা শাশ্বত কালের বরণীয়া নারী, তাঁদের প্রসঙ্গে এক বারনারীর অবতারণায় যাঁদের নাসিকা কুঞ্চিত হবে, তাদের জানাই—শেষ বিচারের ভার যাঁর হাতে, তিনি যেমন বরনারীতে আছেন তেমনিই আছেন বারনারীতে। তিনি যেমন উত্থিত, প্রাপ্য বরান্নিবোধতের, তিনি তেমনই অধঃপতিতের তিনি 'পতিত' পাবন !

কোনও এক সময়ে তারার পদবীও ছিলো। তারার নাম তখন তারা ছিলো না নিশ্চয়ই ; তারার তখন মা-বাবা ভাই-বোন ছিলো। তারা ছিলো সকলের মধ্যে সব চেয়ে ফুটফুটে। তারা নয়, শুকতারা। বয়সের তুলনায় অনেক বাড়ন্ত সেই শরীরে বসন্ত আসবার সময় হবার অনেক, অনেক আগেই ডেকে উঠেছিল বসন্তের কোকিল। দুটি দুরন্ত চোখে দপদপ করতো দুরন্ত বুদ্ধি। মেধা নিয়ে এসেছিলো মাদাম কুরির। ব্যতিক্রম ঘটেছিলো রূপের সঙ্গে যোগে অপরূপের। সুন্দর কান্তি আর দীপ্ত মনীষায় প্রদীপ্ত তারা জ্বলে উঠেছিলো যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন আকাশে সন্ধ্যা হবার অনেক, অনেকক্ষণ আগেই। লেখাপড়ায় প্রতিভা বলে গণ্য হয়েছিলো শহরের মোটামুটি প্রখ্যাত স্কুলে অচিরকালের মধ্যেই। তার সঙ্গে গান আর নাচ। এক অঙ্গে এত রূপ নিয়ে এসেছিলো সে দরিদ্র নিম্নবিত্ত ঘরে যে, তার মায়ের প্রতিমুহূর্তে ভয় হতো এ কি থাকবার জন্যে এসেছে !

মায়ের মন মিথ্যা বলে কদাচ। থাকলো না ; থাকতে দিলো না তারাকে তার বিরূপ ভাগ্য বাপ-মা ভাই-বোনের সংসারে। না। মারা গেলো না তারা কোনও অসুখে ; মারা গেলেই বোধ হয় বেঁচে যেত সে। তার বদলে 'সুখের মধ্যে' বেঁচে মরে রইলো তারা। একটু একটু করে মরলো ! তুষের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে যখন তারার সব আলো, তখনই তার সঙ্গে আমার দেখা কাশীর দশাশ্বমেধ-ঘাটে। এ কাহিনী তার মুখেই শোনা। একটি কথাও আমার নিজের নয়। সে যেমন বলেছিলো তার মৃত্যুর জীবন্ত ইতিহাস, আমার এ লেখা তার অবিকল নকল মাত্র। অবান্তর বলে একটি অক্ষরও বাদ দিইনি ; যোগ করিনি প্রয়োজন মনে করে দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন পর্যন্ত।

তারার বয়স যখন তেরো এবং দেখায় ষোলো কারুর চোখে, কারুর আঠারো, ঠিক তখনই তারার বাবার প্রথম স্ট্রোকে এলো পঙ্গুত্ব। সাময়িক পক্ষাঘাতে শয্যাশায়ী তারার বাবা মণিবাবু তিন মাস পুরো মাইনে পেলেন ; তিন মাস অর্ধেক ; তারপর বিনা মাইনের ছুটি শুরু হলো যথারীতি। কলকাতার সব

চেয়ে চালু থিয়েটারের ম্যানেজার ছিলেন তিনি। পৌনে দু'শো টাকার মতো মাইনে ছিলো তাঁর। তখনকার দিনের হিসেবে খুব খারাপ টাকার অঙ্ক নয়। কিন্তু হলে কি হবে, থিয়েটারের ম্যানেজার। সঙ্গদোষে থিয়েটারের সব গুণই বর্তেছিলো মণিবাবুতে। ঢুকঢুক; স্ত্রীলোক; এবং রেস। থিয়েটারের ম্যানেজারের স্ত্রীলোক এমনই জোটার কথা: কিন্তু মণিবাবু সেরা মেয়ের দিকে হাত বাড়িয়েছিলেন। তার তরুণতর প্রণয়ীর সঙ্গে নীলামের দর হাঁকাহাঁকিতে মেয়েটার পায়ে ঢালতে হয়েছিল সুরা ছাড়াও বেশ কিছু নগদ। প্রতি মাসে সেই টাকা জোটাবার আশায় রেসের মাঠে ঘোড়ার তামাশায় আরও ঋণ বাড়তো বই কমতো না। তবুও টাকা যুগিয়ে যেতে বিরত হতে দেখেনি কেউ ম্যানেজার মণিকে।

কোথা থেকে আসতো সেই টাকা, তার হিসেব পাওয়া গেলো মণিবাবু স্ট্রোকের ধাক্কায় বিছানা নিতে। মণিবাবুর এবং থিয়েটারের মালিক এলেন অসুস্থ ম্যানেজারকে দেখতে নয়; ক্যাশের কয়েক হাজার টাকার গরমিলের কৈফিয়ৎ চাইতেও নয়। ম্যানেজারের মেয়েকে থিয়েটারের হিরোইন করে নিয়ে যেতে। তিনশো টাকা মাইনে শুরুতেই! প্লাস, ম্যানেজারের আধা-মাইনে অসুস্থ থাকা-কালীন আরও ছ'মাস; এবং তারও পরে ক্যাশের গরমিল-মামলায় বেকসুর খালাসের লিখিত স্বীকৃতি।

মেয়ের মৃত্যু এবং নিজের বাঁচার মধ্যে টাগ-অফ-ওয়ার লাগিয়ে দিয়ে ম্যানেজারের মনে মালিক বিদায় নিলেন এক সময়ে। মালিক বড়লোক হলেও সহৃদয় ব্যক্তি। সময় দিলেন তিনদিন। যাবার সময় মনে পড়লো আপেল এনেছিলেন ম্যানেজারের জন্যে। গাড়িতে উঠে ড্রাইভারকে দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন ফল।

ফল ফলতে দেরি হলো না। মেয়ের মৃত্যুতে অনেকগুলো প্রাণ বাঁচবে।

তারা গেলো স্টেজে প্লে করতে। ম্যানেজারের জায়গায় বসলেন মালিক। তাঁর প্লে-ও শুরু হতে দেরি হলো না। ম্যানেজারের বয়স ছাপ্পান্ন। তারার বয়স ষোলোও নয়। কিন্তু তাতে এসে গেলো কার? স্টেজের ওপর ষাট বছরের বুড়ীর ষোড়শীর অভিনয় এবং স্টেজের পেছনে ষোড়শীর, ষাট বছরের বুড়োর সঙ্গে অভিনয়,—রঙ্গমঞ্চের চিরকালের মঞ্চরঙ্গ তো এই-ই।

ম্যানেজার মণি বাড়িতে চোখ বুজে রইলেন। সংসার যেমন চলছিলো তার চেয়ে অনেক সচ্ছল চলতে লাগলো। ছ'মাস বাদে ঘরের মধ্যে; তারপর ঘরের বাইরেও বেরুতে সক্ষম হলেন তিনি। কিন্তু থিয়েটারে ঢুকতে পারলেন না আর। চাইলেনও না অবশ্যই। বিকল্প ব্যবস্থা করে দিলেন থিয়েটারের মালিক নিজে থেকেই। মিল ছিলো তাঁর একটা; সেইখানে মোটামুটি মাইনেয় বসিয়ে দিলেন ম্যানেজার মণিকে। সংসারের চাকা ঘুরতে লাগলো আগেকার চেয়ে অনেক সহজে। তারার পরের দু'ভাই লায়েক হয়ে উঠলো। তাদেরও

জুটে গেলো কাজ। এবং ঠিক তখনই তারার পরের বোন সন্ধ্যার বিয়ের বয়স আসবার আগেই এসে উপস্থিত হলো পাত্র স্বয়ং। বাধা হয়ে দাঁড়ালো তারার থিয়েটারের চাকরি। যার দিদি থিয়েটারে প্লে করে ও এক বাড়িতে থাকে, সে বাড়ির মেয়েকে ঘরে তুলতে পাত্রপক্ষের ইজ্জতে লাগলো। লাগবারই কথা! ইজ্জত যে আমাদের সমাজে কখনও কখনও কাচের চুড়ির চেয়েও ঠুনকো!

একদিন রাতে। তারা তখনও থিয়েটার থেকে ফেরেনি। তারার বাবার ঘরে তারস্বরে সেই কথাই আলোচিত হচ্ছিলো সকলেই একমত হয় শেষ পর্যন্ত। যাকে বলে য়ুন্যানিমাস ভার্ডিক্ট তা পাওয়া গেলো সহজে বটে, কিন্তু তা জানানো শক্ত মনে হলো স্বয়ং ম্যানেজার মণির পক্ষেও। সকলের মতেই ঠিক হলো মুহূর্তে যে, তারা এ বাড়িতে থাকলে সন্ধ্যার বিয়ে হওয়া সম্ভব হবে না। কিন্তু তারাকে সে-কথা স্পষ্ট করে বলতে তারার বাবারও সেদিন আটকালো। ঘরের মধ্যে যারা মাথা ঘামাচ্ছিলো কি করে পাড়া যায় কথাটা, তারা কেউ জানতোই না যে তারা ততক্ষণে থিয়েটার থেকে ফিরে দরজার ওদিকে দাঁড়িয়েছে নিঃশব্দে। আসর ভাঙবার আগেই অবশ্য তারা যেমন নিঃশব্দে এসেছিলো সরে গেলো নিঃশব্দে। শুধু দরজার ওপার থেকে নয়: পরের দিন আকাশের আলো, কাকপক্ষী জাগবার আগেই তারা সরে গেলো তার বাপ-মা-ভাই বোনেদের ভিটে থেকে,—যে ভিটে টিকিয়ে রেখেছিলো এতকাল তারা নিজেকে বিক্রয় করে। যাবার আগে বাবার নামে রেখে গেলো ছোট্ট একটা চিঠি:

"—আমি চলে যাচ্ছি এ বাড়ি থেকে চিরকালের মতো। সন্ধ্যার বিয়ে আর আটকাবে না। সন্ধ্যার জন্যে আমার সব গয়না আর তার বিয়ের পণের টাকা রেখে গেলাম। এ টাকা আর গয়না নিতে শুধু 'না' কোরো না। সন্ধ্যার বিয়েতে যেন ত্রুটি না হয়। এ ছাড়া তার জন্যে রইলো তার দিদির অযাচিত আশীর্বাদ। ইতি—তারা"

এর পরের ঘটনাটুকু অনুমান করি সহজেই।

চিঠি পড়ে শুকনো চোখ মুছতে মুছতে তারার বাবা তারার মা-কে গয়না আর টাকা সাবধানে রাখতে নির্দেশ দিয়ে ছেলেদের দিকে ফিরে বললেন: এ টাকা আর গয়না না নিলে তারা মা আমার মনে দুঃখ পাবে।

ছেলেরা দেখা গেলো এবারেও একমত!

এই তারার আলোয় আমি দেখেছি কাশীকে। এই তারার মধ্যেই আমার সীতা-সাবিত্রী তাঁরা সবাই মিলিয়ে আছেন।

তারার আলোয় দেখেছি কাশীকে, আর দেখেছি কাশীর দিদিমার ক্লান্ত চোখের অক্লান্ত দৃষ্টিতে।

কাশীর দিদিমা সেবারে তাঁর বড় নাতনীর বিয়েতে এসেছেন মেয়ের বাড়িতে কয়েকদিন বাদে। কাশীর দিদিমার জামাইয়ের মা দোর্দণ্ডপ্রতাপ মহিলা। জামাই তাঁর ইঙ্গিতে তখনও ওঠেন-বসেন। নাতনীর ঠাকুমা এই মহিলা কাশীর দিদিমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। তার প্রথম কারণ, বিবাহের পরেই জামাই ব্যবসায় বিপর্যস্ত হন। দ্বিতীয় কারণ, কাশীর দিদিমার কাছে থাকাকালীন তাঁর দুই নাতি কলেরায় মারা যায়। সব দোষ পড়ে কাশীর দিদিমা আর তাঁর মেয়ের ওপর। এবং ওই দুর্ঘটনার পর কাশীর দিদিমার সঙ্গে এঁদের সাক্ষাৎ যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। দীর্ঘকাল বাদে বড় নাতনীর বিবাহ উপলক্ষে কাশীর দিদিমাকে সেবারে আনানো হয়েছে কলকাতায়।

ঠাকুমা কিন্তু ভোলেননি পুরানো দিনের ঝাল। মনের সুখে ঝাল মিটিয়েও যখন যথেষ্ট সুখ হলো না, তখন ইচ্ছে করে কাশীর দিদিমার ভাত রাঁধতে গিয়ে পুড়িয়ে ফেললেন ভাত। এবং পোড়া ভাত খেতে দিলেন কাশীর দিদিমাকে। দিদিমার মেয়ে অর্থাৎ ঠাকুমার পুত্রবধূ, যে এ সংসারে এত বচ্ছরের মধ্যে মুখ ফুটে কোনও কথা বলেনি আজ সে প্রথম প্রতিবাদ জানালো। কাশীর দিদিমাকে ভাতের পাত থেকে তুলে এনে বললো: তোমার কি অপমানজ্ঞান হয় না কিছুতেই?

ঠিক হলো পরের দিনের গাড়িতে কাশীর দিদিমা ফিরে যাবেন কাশীতে। পরের দিন ভোরবেলা ঠাকুমার গোঙানি শুনে উঠে দেখলো সবাই বহুদিনের পোষা কলিক ব্যথা চাড়া দিয়েছে ঠাকুমার পেটে। তিনি চেঁচাচ্ছেন আর নীরবে তাঁর পেটে হোমের পবিত্র ছাই মাখাচ্ছেন কাশীর দিদিমা। যন্ত্রণা কমতে ঠাকুমার সামনে বসে পোড়া ভাত সেই আগের দিনের খাচ্ছেন কাশীর দিদিমা।

হোমের ভস্মের গুণে অথবা কাশীর দিদিমাকে পোড়া ভাত খাওয়াতে পারার আনন্দে কে বলবে,—যন্ত্রণা-উপশমিত ঠাকুমার ততক্ষণ নাক ডাকছে।

কাশীর দিদিমাকে কেবল তাঁর মেয়ে বলে: যথেষ্টই তো হলো; এবার কাশী ফিরে গেলে হয় না? ফোকলা বুড়ী একগাল হেসে জবাব দেয়: গেলে ভালো। তারপর পোড়া ভাঁতের শেষ দানাটা মুখে দিতে দিতে কাশীর দিদিমা এবার তাঁর নিজের কথা শেষ করেন: না গেলে আরও ভালো।

গোটা রামায়ণের চেয়ে একা রাম যেমন, নবদ্বীপের চেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য যেমন, তেমনই কাশীর চেয়েও আমার কাছে আমার কাশীর দিদিমা অনেক বড়!

শুধু লৌকিক নয়। অলৌকিক ঘটনা আজও সমানই ঘটে। কেবল তারা কাছের বলে মনে হয় অলীক; আচার্য শঙ্কর অতীতের বলে মনে হয় অলৌকিক। কাশী নয়, কলকাতাতেই অলৌকিক ঘটনা ঘটতে দেখেছি আমরা অনেকেই। বুদ্ধির অতীত সেই ঘটনার পরে বুদ্ধিমান আমরা বলেছি হ্যালুসিনেশান।

যেমন সেই চাকরে ভদ্রলোক, যিনি আজ জীবিত নেই, তবু যাঁর আত্মীয়-স্বজন জীবিত থাকার কারণে এখানে যাঁকে উপস্থিত করছি বানানো নামে: হরি দত্ত। হরি দত্তকে আমার সামনে একজন একদিন এসে বললো—'কি তন্তর ফন্তর করেন মশাই; একটা বাচ্চা মারা যাচ্ছে। বিধবার একমাত্র সন্তান; বাঁচাতে পারে আপনার মন্তর?'

'পারে।' সংক্ষিপ্ত উত্তর আসে হরিমুখ থেকে।

আমাকে নিয়ে হরি দত্ত বেরোন সেই বাড়ি দেখতে, যেখানে বাচ্চা মেয়েটি শেষ প্রহর গুনছে। বাড়িটা পেরিয়ে যায় আমার গাড়ি। তারপর আবার ফেরবার মুখে বাড়িটার উল্টো মুখে গাড়ি থামাতে বলেন হরি দত্ত। গাড়ি থামলে নেমে যান। মনুষ্যেতর প্রাণীর মতো কি শুঁকতে শুঁকতে উঠে আসেন তিনি। গাড়ি চলতে শুরু করলে বলেন, 'এই উল্টো দিকের ফুট পেভমেণ্টে যদি রক্তপাত হয়ে কালকের মধ্যে মারা যায় কেউ, তাহলে বেঁচে যায় মেয়েটা।' শুনে রাগ হয়ে যায় আমার; বলি: খুব সুবিধে হয় রক্তপাত না ঘটলে কিন্তু! অবাক হন হরি দত্ত: কেন? আমার প্রত্যুত্তর তৎক্ষণাৎ। 'মেয়েটা না বাঁচার একটা অজুহাত তাহলে তৈরী থাকে; আপনি বলতে পারেন স্বচ্ছন্দেই। কি বলেছিলাম কি না যে রক্তপাত ঘটলে তবে বাঁচবে; রক্তপাত ঘটলোও না, মেয়েটা বাঁচলোও না—।'

হরি দত্ত অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে বলেন: না হে; রক্তপাতও ঘটবে, মারাও যাবে কেউ, এবং মেয়েটাও বাঁচবে।

পরের দিনের ঘটনা। ঘটনা নয়; দুর্ঘটনা—আমার মতো আপনাদেরও জানা। ভবানীপুরে বড় রাস্তার ওপর কন্স্টেবলের বন্দুক থেকে গুলি বেরিয়ে মারা যায় একজন নাপিত। এই দুর্ঘটনার নেপথ্যের ঘটনাই শুধু আপনাদের অজানা। নাপিতটা মারা যায় একজনের দাড়ি কামানোর সময়ে এবং প্রচুর রক্তপাত। আর? আর ভালো হয়ে উঠতে থাকে মেয়েটা সেই মুহূর্ত থেকে।

কাশীর সেই গুনতে জানা উকিলবাবুর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতাই কি কম অলৌকিক? কিন্তু তাকে অলীক বলে উড়িয়ে দিই কি করে? আমার চোখের সামনেই ঘটেছে যে সে ঘটনাও। কাশীতেই একজনের যথাসর্বস্ব চুরি যাওয়ায় উকিল ভদ্রলোকের কাছে গোনাতে গিয়েছিলাম, যদি জানা যায় চোর কে। চোরের নাম, ধাম, এবং লুক্কায়িত অলংকার ও টাকার অকুস্থল পর্যন্ত গুনে বলে দিলেন উকিল। থানার ও.সি.-কে বললাম সব। তিনি আপত্তি করলেন। গণনাকে গণনার মধ্যে আনতে চাইলেন না প্রথমে। আমি তাকে বোঝালাম যে, গণনানুযায়ী চোরকে ধমকালেই হয়তো কাজ হয়ে যেতে পারে; সার্চের প্রয়োজন নাও হতে পারে। রাজী হলেন ও. সি এবং আমার অনুমান মিথ্যে হলো না। চোরাই মালের পাত্তা সুড়সুড় করে বেরিয়ে এল।

কিন্তু বিপদে পড়লেন উকিল, যখন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে এই চুরির মামলা উঠলো। ম্যাজিস্ট্রেট প্রশ্ন করলেন ও.সি-কে, লোকটার সন্ধান কোন্ ক্লু-এর ওপরে নির্ভর করে পেলেন তিনি। ও. সি বললেন কৃতিত্ব তার নয়; কৃতিত্ব উকিলবাবুর গণনার। সাহেব বললেন, গণনা নয়; এই উকিলও এই চুরির মধ্যে আছে। আদালত সুদ্ধ সবাই হাহাকার করে উঠলো। প্রবীণ উকিল চোর হলো পরের উপকার করতে গিয়ে। উকিলকে বললেন ম্যাজিস্ট্রেট তুমি গুনে বলতে পার ভবিষ্যৎ? পারি,—জবাব দেন ব্যবহারজীবী। 'গুনে বলো আমার ইমিজিয়েট ভবিষ্যৎ।' উকিল একটু নীরব থেকে বললেন, 'তোমার স্ত্রী বিলাতে সাংঘাতিক অসুস্থ।' হোহো করে হেসে উঠলো গৌরবর্ণ আনন: 'কালকের মেলে জেনেছি, শী ইস হেল এণ্ড হার্টি।' 'তিনদিনের মধ্যে কেব্‌ল্ পাবে, শী ইস সিয়েরাসলি ইল'—উকিলের গণনা। 'বেশ; তিনদিনের মধ্যে খবর না পেলে তোমাকে আবার আসতে হবে আমার কোর্টে।' 'হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না'-র মেজাজে ম্যাজিস্ট্রেট কথা শেষ করেন।

তিনদিন পর উকিলকে নয়,—ম্যাজিস্ট্রেটকেই পায়ের ধুলো দিতে হলো উকিলের বাড়িতে।

আমরা চিঠি এবং মুখে আশীর্বাদ করি এবং চাই আজও; যদিও কেউ বিশ্বাস করি না। না আশীর্বাদে, না অভিশাপে। কিন্তু অভিশাপ যে আজও ফলে, তার প্রমাণ আমার এক প্রতিবেশী। এই ভদ্রলোকের বাবা যৌবনে ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। তার ফলে তাঁর ঠাকুর্দা সেই যে শয্যাগ্রহণ করেন, আর ওঠেন না। তিনি তাঁর ছেলেকে এত ভালবাসতেন যে, ছেলের প্রথম হস্তাক্ষর থেকে পরবর্তী রচনা পর্যন্ত যত্ন করে রক্ষা করে এসেছেন। মৃত্যু-শয্যায় সেই বাপ অভিশাপ দেন ছেলেকে এই বলে যে, তিনি যেমন মরবার সময় ছেলের হাতে শেষ জলটুকুর আশা ত্যাগ করতে বাধ্য হলেন, তেমনই তাঁর ছেলেও মরবার সময় তাঁর নাতির হাতে জল পাবে না। এই অভিশাপের কথা জানতেন আমার প্রতিবেশী। জানতেন বলেই দেশের বাড়িতে বাপের খবরাখবর করতেন রোজই কলকাতা থেকে।

কলকাতায় ভদ্রলোক অর্ডার-সাপ্লাইয়ের কাজ করে দু'পয়সা করছিলেন। এই সময়ে একটা বড় অর্ডারের টাকা জোগাড় করতে স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে অপেক্ষা করছিলেন বিল পাস হবার। তখনই খবর এলো বাবার অসুখের। একটা পয়সা নেই ভদ্রলোকের পকেটে। তিরিশ-চল্লিশটা টাকার জন্যে হন্যে হয়ে ঘুরছেন, এমন সময়ে একজনের কথা শুনলেন, সে দূর থেকে বলে দিতে পারে অনেক দূরে কি ঘটছে। তাকে ডেকে আনলেন বাড়িতে। সে খানিকক্ষণ চোখ বুজে কি দেখে যেন বলতে লাগলো—'আপনার বাবা যে ঘরে আছেন, সে ঘরের উত্তর দেওয়ালে ৺কালীর ছবি; পশ্চিমে মাছের আঁশের কাজ ফ্রেমে বাঁধানো। আপনার মাকে দেখছি; আরও কয়েকজন মহিলা এবং একজন ডাক্তারকে দেখছি। এখনই ভয়ের নেই কিছু।'

পর পর তিনদিন এরকম চললো। চতুর্থ দিনে বললো : 'আজ ভয় আছে। চারজন ডাক্তার ঘরে। আপনি আর দেরি করবেন না।' সেইদিনই ভদ্রলোকের বিল পাস হলো ; কিন্তু চেকে। চেকের বিনিময়ে টাকা পেলেন না কোথাও ; ত্রিশটা টাকাও নয়।

চেক ভাঙিয়ে যখন দেশের বাড়িতে উপস্থিত হলেন, চেকের মূল্য নেই তখন আর। তাঁর বাবা তার কয়েক ঘণ্টা আগে ছেলের হাতে শেষ জলের ব্যর্থ প্রতীক্ষায় থেকে মুক্তি নিয়ে চলে গেছেন।

এ ঘটনা কাশীখণ্ডে নেই বলেই কি অলীক ? না কি এ অতীত ভারতের কোনও ঘটনার চেয়ে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে কম অলৌকিক ?

কাগজে ছাপার অক্ষরে কোনও ঘটনা না উঠলে আজকের যুগে স্ত্রীলোকেও কিছু বিশ্বাস করে না। এখন যে ঘটনাটি বলতে যাচ্ছি, সেটি পুলিশের মুখ থেকে শোনা। মুসলমান সেই পুলিশ-অফিসার এখনও পুলিশেই কাজ করেন। যখনকার কথা—তখন তিনি শ্যামপুকুর থানায় ; তাঁর কাছে এক অসাধারণ রূপ ও অনন্যব্যক্তিত্ব এক বর্ষীয়সী মহিলা সন্ধ্যাবেলায় গরদ এবং রক্তিম সিন্দুর-টিপে থানার অন্ধকার ঘর আলো করে সে দাঁড়ান। সে রূপ দেহের আলো নয় শুধু ; আত্মার অপরূপ এক সৌরভ-সমাচ্ছন্ন সেই আবির্ভাব থানার সন্দেহের পাঁকে মুহূর্তে জন্ম দিলো নিঃশঙ্ক অরবিন্দের। তাঁর ঠাকুরের মাথার মুকুট, হাতের বালা চুরি গেছে। পূজার ঘর থেকে বেরিয়ে তিনি ঘুরে এসেছেন পূজার ঘরে,—দশ মিনিটও হয়নি অন্তর্বর্তী সময় ; এর মধ্যেই ঘরের বাইরে টর্চ ছিলো, যেটা জ্বালিয়ে তিনি ঘরে ঢুকতেন সেটা, একটা গামছা এবং ঠাকুরের সব গয়না, দাম দিয়ে যার মূল্য নয়—ঠাকুরের বলেই যা অমূল্য, তা অন্তর্হিত হয়েছে। এক বিশ্বাসী নেপালী চাকর, যাকে বাল্যকাল থেকে বিশ্বস্ত বলেই পালন করে আসছেন, উধাও হয়েছে সেও !

মুসলমান সেই পুলিশ-অফিসার বললেন : 'মা, আপনার গয়নার কোনও বিশেষ চিহ্নের কথা আপনি বলতে পারছেন না ; নেপালী চাকরের নাম বলছেন বাহাদুর। সব নেপালীরই কলকাতায় ওই এক নাম ; কি করে তদন্ত শুরু করি বলুন তো ?'

ভুবনমনমোহিনী পবিত্র পূত দিব্যচ্ছটায় দিগন্ত উদ্ভাস সেই মা বললেন : 'না বাবা, তদন্ত করতে হবে না ; যাঁর অলঙ্কার, তিনিই তা উদ্ধার করবেন। তার জন্যে ভাবনা বা কোনও চেষ্টা কোরো না তুমি। শুধু দিয়ে গেলে গয়নাগুলো কেউ, আমাকে খবর দিও।'

রাত সাড়ে এগারোটার সময় থানায় খবর এলো হাওড়া থেকে চোর ধরা পড়েছে গয়না, গামছা, টর্চ সমেত। মুসলমান অফিসার তাকে নিয়ে এলেন থানায়। কেস লেখালেন না তিনি ; কেস হলে ঠাকুরের গয়না প্রত্যর্পণে বিলম্বের হেতু হবেন তিনি।

মাকে ফিরিয়ে দিলেন সব। মা বললেন: 'বাহাদুরকে মেরো না, বাবা; মায়ের এই কথাটা রেখো।'

চোরকে হাতেনাতে ধরে না-মারার ইতিহাস রচিত হয় থানায়। মা-র এই সত্য ঘটনার কাহিনী কোন্ 'সিনেমা'র গল্পের চেয়ে কম রোমাঞ্চকর বলতে পারেন ?

॥ ষোলো ॥

আকাশে সেদিন এক ফোঁটা আলো নেই; কেবল অন্তহীন অমা। বর্ষণ-মুখরিত শ্রাবণ রাত্রির নিশ্চিহ্ন অন্ধকারে এক চোর এসেছে সাধুর আশ্রমে; চোর এবং সাধু এক জায়গায় যে এক সে-কথা বোধ হয় এই বেচারা চোর জানতো না। চোর এবং সাধু নিশাচর দুজনেই। চোর ঘুরে বেড়ায় ধনসিদ্ধ হবার আশায়; সাধু জেগে থাকে যোগের আসনে ধ্যান সিদ্ধ হবার দুরাশায়। বেচারা চোর যখন সেই সাধুর সামান্য যা কিছু অপহরণ করে পোঁটলা বেঁধে যাত্রার উদ্যোগ করছে, ঠিক তখনই গুপ্তস্থান থেকে কি কারণে কে জানে, বোধ হয় তস্করের কুষ্ঠি সেদিন বেজুত বলেই এমন হয়ে থাকবে, সাধু এসে পড়েছেন সপোঁটলা প্রস্থানোদ্যত চোরের একেবারে সামনাসামনি। চোর ও সাধু দুজনেই কিংকর্তব্যবিমূঢ়। একটুখানি সংবিৎ ফিরে পেতে না পেতেই পোঁটলাপুঁটলি সব ফেলে দিয়ে চোর মুহূর্তে ভোঁ দৌড় দেয়। একটু পরে, খুব বেঁচে গেছে আজ মনে করে অন্ধকারে হাঁফ ছাড়বার জন্যে যেই দাঁড়িয়েছে সেই বিদ্যুতের আলোয় চোর দেখে সর্বনাশ, সাধু দৌড়ে আসছেন তার পেছন-পেছন চোরের ফেরত দিয়ে আসা সেই পোঁটলা বগলে করে। আবার দৌড় শুরু হয়ে যায় চোরের। গন্তব্য-অনির্দিষ্ট এই দৌড়পাল্লায় কে জেতে কে হারে শেষ পর্যন্ত বলা শক্ত হতো যদি না হঠাৎ বিদ্যুতের মতোই চোরের পক্ষে আশ্চর্য এক চিন্তা না খেলে যেত সেই তস্করের মাথায়।

হঠাৎ দৌড়তে দৌড়তেই সেই চোরটার মনে হলো—সাধু যদি তাকে ধরবে বলেই তার পিছু নিয়েছেন তাহলে তাঁর বগলে চুরি করতে না পারা পোঁটলা কেন ? মনে করার জন্যে মুহূর্তের শ্লথগতির ফলেই হবে, ততক্ষণে সাধু এসে পড়েছেন চোরের নাগালের মধ্যে। আর একটু তফাত থেকেই ছুঁড়ে দিলেন সাধু চোরের ফেলে রেখে যাওয়া সাধুর অমূল্যবান তবু অমূল্য সম্পত্তি। এবং জোড়হাত করে অসাধুকে বলতে লাগলেন সেই সাধু: এগুলি আমার নয়; তোমার। দয়া করে তুমি তোমার জিনিস নিয়ে আমাকে করো পাপমুক্ত। এগুলি নেবার সময় আমি অজান্তে তোমায় বাধা পাবার এবং শূন্যহাতে যাবার কারণ হয়েছিলাম,—এজন্যে আমার অপরাধের শাস্তি দাও তুমি এগুলিকে গ্রহণ করে।

শ্রাবণাকাশের চেয়েও মানুষের চোখ থেকে যে উদ্গত হতে পারে অনেক বেশি জল,—এ কথা সাধুর সামনে দণ্ডায়মান সেই অসাধুকে কেউ দেখতে পেলে কেবল সেই সৌভাগ্যবানই তা দেখতে পেত হয়তো।

সে সাধু মুহূর্তের মধ্যে এক অসাধুকে রূপান্তরিত করেন সাধুতে, তিনি গাজীপুরের সিদ্ধযোগী পওহারী বাবা। তাঁর কথা বলবার আগে সেই চোরের কথা বলেনি' আরেকটু।

নরেন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ হননি তখনও। নিজের দেশটাকে নিজের চোখে চেখে চেখে বেড়াচ্ছেন তখন চিরভ্রাম্যমাণ সেই অদ্বিতীয় ভারতীয় সন্ন্যাসী, মেরামত করবার আগে ইঞ্জিনীয়ার যেমন করে দেখে নেয় উল্টেপাল্টে ক্ষয়ে আসা যন্ত্র-দানবকে। স্বদেশের বেদনায় তাঁর বুক বিদীর্ণ হয় বারবার। বইয়ে পড়া ভারত নয়; চোখে দেখা ভারতের দুঃখ, দৈন্য, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য চোখে দেখা যায় না বুঝি! দামাল ছেলে যেমন দাপাদাপি করে বেড়ায় ঘরময়; উল্টে-পাল্টে নেড়েচেড়ে তছনছ করে জানতে চায়—কি, কেন, কবে, কখন, কোথায়; রামকৃষ্ণের দুর্নিবার শক্তি মূর্তিমান ভারত নরেন্দ্রনাথ ভাবমূর্তিকে প্রত্যক্ষ করে বেড়াচ্ছেন নরেন্দ্র-থেকে অনাথের দ্বারে দ্বারে দুরন্ত বেগে অফুরন্ত আবেগে মুহুর্মুহু মথিত হতে হতে।

সেই সময় হৃষীকেশে এক সাধু তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই সাধুই সেই চোর, যাকে একজন্মে পওহারী বাবা চোর থেকে সাধুতে উত্তীর্ণ করে দিয়ে যান। নরেন্দ্রনাথের কাছে সাধু তাঁর চোর-জীবনের অপরূপান্তরের কাহিনী অকপটে বিবৃত করবার পর বলেন: "তিনি (পওহারী বাবা) যখন আমায় নারায়ণ জ্ঞানে অকুণ্ঠিত চিত্তে সর্বস্ব দান করিলেন, তখন আমি নিজের ভ্রম ও হীনতা বুঝিতে পারিলাম এবং তদবধি ঐহিক অর্থ ত্যাগ করিয়া পরমার্থের সন্ধানে ঘুরিতে লাগিলাম।" ['স্বামী বিবেকানন্দ', প্রথম খণ্ড — প্রমথনাথ বসু]

স্বামীজী এই সাধুর কথা স্মরণ রেখেই ম্যারিকায় একবার বলেছিলেন — 'পাপীর মধ্যেও সাধুর অঙ্কুর দেখা যায়। রত্নাকরের বাল্মীকি হবার ইতিহাস রামায়ণের যুগের সঙ্গে সঙ্গেই শেষ হয়ে যায়নি।' বিবেকানন্দের মতো ভারত-পথিক সেই ইতিহাসের দেখা রামায়ণের দেশ ভারতবর্ষে বার-বার পেয়েও বিস্মিত হননি কখনও!

আমি এর আগে ব'লেছি যে ভারতবর্ষের যতেক ধ্যানী ঈশ্বরান্বেষক আজও পর্যন্ত এসেছেন, তাদের প্রায় প্রত্যেককেই কখনও না কখনও কাশীতে আসতেই হয়েছে। কেউ কেউ আবার শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন চিরকালেরমতো। মর্ত্যলীলা প্রকট এবং সংবরণও তাঁরা কাশীতেই করেছেন। এখন আমি যাঁর

কথা বলতে যাচ্ছি তিনি কাশীতেই আবিভূ'ত হন। বারাণসীর অন্তর্গত গ্নজীর কাছাকাছি এক গ্রামে ব্রাহ্মণবংশে এই সাধকের আবির্ভাব। দীর্ঘকাল ধরে দিনের পর দিন, রাতের পর রাত গ্নহার মধ্যে অনাহারে অকাতর এই যোগীকে কিছ্ন খেতে না দেখে লোকে তাঁকে পও (ন)-আহারী অর্থাৎ বায়্নভুক্ বলে জানতো। তার থেকেই সাধকের নাম দাঁড়িয়ে যায় পওহারী বাবা।

পওহারী বাবা কাশীতে জন্মান ; কিন্তু তাঁর শিক্ষা ও সাধনার ক্ষেত্র ছিলো গাজীপ্নর। ১৮৯০-এর জান্নয়ারী মাসে নরেন্দ্রনাথ গাজীপ্নরে আসেন। পওহারী বাবাকে দর্শন করবার জন্যে আশ্রমের খ্নব কাছে এক লেব্নবাগানে তিনি আশ্রয় নিলেন। পওহারী বাবার দেখা পাওয়া তখন ভগবানের দেখা পাওয়ার পরেই সব চেয়ে দ্নসাধ্য ব্যাপার ছিলো। রোজ ধরনা দিয়ে নরেন্দ্রনাথ পড়ে থাকতেন বাবাজীর দরজায়। একদিন এরই মধ্যে দর্শন হলো না বটে, তবে আলাপ হলো। দরজার এপারে নরেন্দ্রনাথের প্রশ্ন জাগে ; দরজার ওপার থেকে উত্তর আসে পওহারী বাবার। নরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞেস করেন—তিতিক্ষা জাগে কি করে ? পওহারী বাবার জবাব তৎক্ষণাৎ : গ্নর্নর কাছে নৌকার মতো পড়ে থাকো। পওহারী বাবা নরেন্দ্রনাথ না জিজ্ঞেস করলেও যে কথাটা বার-বার নিজে থেকে বলতেন সেটি তাঁর জীবনের পরীক্ষিত সত্য : 'যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি'।

পরবর্তীকালে বিবেকানন্দ স্বয়ং পওহারী বাবার একটি ছোট জীবনচরিত রচনা করেন। সেই প্নস্তিকার উপক্রমণিকায় স্বামীজী পওহারী বাবা এবং ওইরকম যোগীদের জীবনের এবং জীবনীর কি প্রয়োজন সেকথাই বোঝাতে গিয়েই বোধ হয় বলেছেন : যাঁহাদের বাক্যত্নলিকা আদর্শকে অতি স্নন্দর বর্ণে অঙ্কিত করিতে পারে অথবা যাহারা স্নক্ষ্মতম তত্ত্বসম্নহ উদ্ভাবন করিতে পারে, এর্নপ লক্ষ লক্ষ ব্যক্তি অপেক্ষা এক ব্যক্তি, সে নিজ জীবনে উহাকে প্রতি-ফলিত করিয়াছে—সেই অধিক শক্তিশালী।

প্নথিবীতে আজ পর্যন্ত যত যোগী জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশ্য এবং সাধনাই এক। সে উদ্দেশ্য এবং সাধনার মর্মবাণী হচ্ছে : দর্শন ছাড়া দর্শনের কোনও অর্থ নেই জীবনে।

পওহারী বাবার পিতৃব্য আজন্ম ব্রহ্মচারী পওহারী বাবাকে গাজীপ্নরের উত্তরে নিজের জায়গায় নিজের কাছে এনে রাখেন। তাঁর এই সময়ের এবং কিছ্ন পরের সঙ্গীরা যে সাক্ষ্য দেন তাঁর কিশোরকালের তা থেকে জানা যায়, তিনি যেমন অধ্যয়ন, তেমনই রঙ্গপ্রিয় ছিলেন। কখনও কখনও তাঁর রঙ্গপ্রিয়তার মাত্রাতিরিক্ততার কারণে সঙ্গীরা সাঙ্ঘাতিক নাজেহাল হতেন। এর অল্পকালের মধ্যেই পিতৃব্যের পরলোকগমনে শোকাহত, অধ্যয়ন ও রঙ্গরত য্নবক যিনি শেষ জীবনে পওহারী বাবা নামে খ্যাত হন তিনি বিবেকানন্দর ভাষায় সেই সময় এই-ভাবে উপস্থিত হয়েছেন : 'তখন সেই উদ্দাম য্নবক, হৃদয়ের অন্তস্তল শোকাহত

হওয়ায়, ঐ শূন্যস্থান পূরণ করিবার জন্য এমন বস্তুর অন্বেষণে দৃঢ়সংকল্প হইলেন, যাহার কখন পরিণাম নাই।'

ভারতীয় দর্শন পাঠের পর অতঃপর এই সময়েই পওহারী বাবা ভারত দর্শন করতে বেরুলেন।

ভারত পরিক্রমার পথে গিরনার পর্বতের শীর্ষে তাঁর অন্বেষণের প্রথম পর্ব শেষ হয় বলে তাঁর বাল্যবন্ধুদের ধারণা। গিরনারে তাঁর বন্ধুদের মতে যোগসাধনার রহস্যে দীক্ষিত এই যুবক এর পর বারাণসীর গঙ্গাতীরে এক যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর ভ্রমণপর্বের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত আজ আর কোথাও পাবার উপায় নেই; তবে বিবেকানন্দের অনুমান: 'তাঁহার সম্প্রদায়ের অধিকাংশ গ্রন্থ যে ভাষায় লিখিত সেই দ্রাবিড় ভাষাসমূহে তাঁহার জ্ঞান দেখিয়া এবং শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণের প্রাচীন বাঙলাভাষার সম্পূর্ণ পরিচয় দেখিয়া আমরা অনুমান করি, দাক্ষিণাত্যে ও বাঙ্গালাদেশে তাঁহার স্থিতি বড় অল্পদিন হয় নাই'। এই সময়েই তিনি আবার বারাণসীতে আরেক সন্ন্যাসীর কাছে অদ্বৈতবাদের পাঠ নিচ্ছিলেন বলেও জানা যায়।

ভ্রমণ, অধ্যয়ন, সাধনার পর ব্রহ্মচারী সেই অন্বেষক ফিরে এলেন তাঁর প্রতিপালক পিতৃব্য-ভূমিতে। তাঁর বাল্যবন্ধুর দল ফিরে আসা বন্ধুর মধ্যে আর সেই পুরানো দিনের ভাব ফিরে পেলেন না। সেই মুখে তখন যে সংকেত, সে ভাষা যিনি পড়তে পারতেন সেই পিতৃব্য তখন ইহলোকে নেই। বিবেকানন্দ বলছেন, পওহারী বাবার প্রতিপালক বেঁচে থাকলে সন্তানতুল্য ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখে তিনি নিশ্চয়ই সেই আলো দেখতে পেতেন যার জ্যোতিচ্ছটা দেখে স্মরণের অতীত এক কালে ঋষি তাঁর শিষ্যের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন: 'ব্রহ্মবিদিব বৈ সৌম্যভাসি'। [ব্রহ্মজ্যোতিতে তোমার মুখ আজ জ্যোতিদীপ্ত দেখছি, সৌম্য!]

পিতৃব্য-ভূমিতে প্রত্যাবর্তনের পর সাধনোন্মত্ত ব্রহ্মচারী বারাণসীবাসী তাঁর যোগগুরুর মতো মাটির নীচে গর্ত খুঁড়ে গুহাবাসী হলেন। নির্মম নিভৃত তপস্যার জন্যে তৈরী হলেন তিনি। প্রথমে কয়েক ঘণ্টা বাস করতে এবং উপবাস করতে আরম্ভ করলেন সেখানে। কয়েক ঘণ্টা সেখানে কাটানোর পর উঠে আসতেন ভূমির উপরে আশ্রমে। রামচন্দ্রের পূজারী রন্ধনবিদ্যায় অসাধারণ পটু এই জীবনযোগী ঠাকুরকে ভোগ দিয়ে বন্ধু এবং দরিদ্রনারায়ণকে বিলিয়ে দিতেন ভোগরাগ। আশ্রমে আর যারা ছিলো তারা নিদ্রিত হলে চলে যেতেন সাঁতরে গঙ্গার ওপারে। সেখানে অরণ্য-সাধনা শেষ করে যখন ফিরে আসতেন ফের আশ্রমে, তখনও আশ্রমবাসী বন্ধুদের নিদ্রাভঙ্গ হয়নি।

খাওয়া এবং গঙ্গার ওপারে যাওয়া যত কমতে থাকে, ততই বাড়তে থাকে মাটির নীচে থাকার সময়। এক মুঠো তেতো নিমপাতা বা কয়েকটা লংকা হলো সারাদিনের আহার। তারপর সু-পবন বইলো অনুকূল পরিবেশে।

গুহার মধ্যে কেটে যেতে লাগলো দুশ্চর তপস্যায় রত বিনিদ্র রাত। এই সময়ই তিনি কি খেয়ে থাকেন এই জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রশ্নকর্তারা নিজেরাই নির্ধারণ করলেন: পও (ন) অর্থাৎ শুধু বায়ু বলে। তাই থেকেই তার নতুন নাম হলো পওহারী বাবা। জীবনে কখনও যোগ এবং এই গুহা-সংযোগ ত্যাগ করেননি তিনি; এবং অন্তত একবার, বিবেকানন্দর কথায়: 'তিনি এত অধিক দিন ধরিয়া ঐ গুহার মধ্যে ছিলেন যে, লোকে তাঁহাকে মৃত বলিয়া স্থির করিয়াছিল। কিন্তু অনেকদিন পরে আবার বাবা বাহির হইয়া বহুসংখ্যক সাধুকে ভাণ্ডারা দিলেন।'

বিবেকানন্দ যখন নরেন্দ্রনাথ তখন পওহারী বাবাকে তিনি প্রশ্ন করেন যে বাবা কেন গুহার বাহিরে এসে জগতের উপকারের জন্য কিছু কাজ করেন না? জীবনরসিক নিত্যযোগী হাসতে হাসতে এক গল্প বলেন। গল্পটি এক নাক-কাটা সাধুর। কোনও এক সময়ে কোনও এক অপকর্মের কারণে এক দুষ্ট প্রকৃতির লোকের নাক কেটে দেয় অন্য লোকে। কাটা নাক নিয়ে সমাজে বেরুতে লজ্জা হওয়ায় সে বনে গেলো। সেখানে বাঘের ছাল পেতে, গায়ে ছাই মেখে বসলো। কারুর পায়ের সাড়া পেলেই চোখ বুজে ধ্যানের ভানরত নাক-কাটাকে মস্ত সাধু মনে করে প্রথমে দু-একটি, পরে দলে দলে সেই অরণ্য-সন্নিকট গ্রামের লোকেরা আসতে আরম্ভ করলো। এবং অনেকেই সাধুদর্শনে শূন্যহস্তে যেতে নেই বলে বেশ কিছু দক্ষিণহস্তের উপযুক্ত উপকরণ উপঢৌকন হিসাবে দিয়ে যেতে থাকলো। জীবিকানির্বাহের ভয় রইলো না আর নাক-কাটার।

'তাবচ্চ শোভতে মূর্খঃ যাবৎ ন ভাষতে'—এই অনুজ্ঞানুযায়ী নাক-কাটা মৌনী থাকার ফলে সিংহচর্মাবৃত গর্দভের ধরা পড়বার সময় সুদূরপরাহত ছিলো। কিন্তু কালে দুঃসময় ঘনিয়ে এলো নাক কাটা নির্বাক সেই অসাধুর। নিত্য আগন্তুক ভক্তদের মধ্যে একজন দীক্ষার জন্য এমন পীড়াপীড়ি করতে লাগলো যে তখন আর কিছু একটা না বললে অথবা না করলে এতদিনের নীরব প্রতিষ্ঠা সব যায়। নিরুপায় হয়ে নাছোড়বান্দা সেই দীক্ষাকাতর ভক্তকে নাক-কাটা একদিন দীক্ষা দিতে রাজী হলো। অথবা বলা উচিত হবে যে রাজী হতে বাধ্য হলো। শুধু বললো: আগামী কল্য একখানি ধারালো ক্ষুর নিয়ে এসো দীক্ষার সময়ে। দীক্ষোন্মত্ত যুবক পরের দিন প্রাক্-প্রত্যুষেই তীক্ষ্ণধার ক্ষুর হাতে এসে দাঁড়াল; নাক-কাটা [অ]-সাধু তাকে অরণ্যের আরও অন্তঃস্থলে নিয়ে গেলো এবং সেই ক্ষুর নিজের হাতে নিয়ে তার তীক্ষ্ণধার পরীক্ষা করবার পর এক কোপে যুবক দীক্ষেচ্ছুর নাক কেটে দিলো যুবক জানবার আগেই। তারপরে ইষ্টমন্ত্র দিলো এই বলে যে: হে যুবক, আমি এইভাবেই এই আশ্রমে দীক্ষিত হয়েছি। সেই দীক্ষাই আমি তোমাকে দিলাম। এখন তুমিও সুবিধে পেলেই অনলস হয়ে এই নাক-কাটা দীক্ষাই দিতে থাকবে; কারণ তোমার না দিয়ে উপায় থাকবে না আর।

গল্প শেষ করে পওহারী বাবা বলেন নরেন্দ্রনাথকে : এইভাবে এক নাক-কাটা সাধু সম্প্রদায় দেশকে ছেয়ে ফেললো। তুমি কি আমাকেও এরূপ আরেকটি সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা দেখতে চাও ?

একই সঙ্গে জীবনরসিক এবং জীবনধ্যানী পওহারী বাবার মুখে রঙ্গের রামধনু মিলিয়ে যেতে না যেতে দেখা দিলো চিন্তার তরঙ্গ। এবারে তিনি বললেন : তুমি কি মনে কর, স্থূলদেহ দ্বারাই কেবল অপরের উপকার সম্ভব ? একটি মন শরীরের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়া অপর মনসমূহকে সাহায্য করিতে পারে, ইহা কি সম্ভব বিবেচনা কর না ?

পওহারী বাবাকে আরেকবার জিজ্ঞেস করা হয় যে তিনি এত বড় যোগী হয়েও প্রথম-শিক্ষার্থীর করণীয় মূর্তিপূজা হোম ইত্যাদি এখনও কেন করেন। এর জবাবে জীবনযোগী বলেন : সকলেই নিজের কল্যাণের জন্যে কর্ম করে, এ কথা তুমি ধরে নিচ্ছ কেন ? একজনের কি অপরের জন্যেও এসব করতে বারণ ?

বিবেকানন্দ অতঃপর তাঁর পওহারী বাবা-চরিতে পওহারী-চরিত্রের আরেকটি দিক সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি শ্রীরামচন্দ্রের পূজা যে মন নিয়ে করতেন ঠিক সেই মন নিয়েই, সেই শ্রদ্ধা নিয়েই পূজার তাম্রকুণ্ডও মাজতেন। তার কারণ তাঁর জীবন ও বাণী এক ও অভিন্ন : যন্ সাধন তন্ সিদ্ধি। অর্থাৎ সিদ্ধির উপায়কেও এমনভাবে আদর-যত্ন করিতে হইবে, যেন উহাই সিদ্ধিস্বরূপ। ['পওহারী বাবা,' তৃতীয় অধ্যায়]

গোখরো সাপের কামড়ে মৃতবৎ পওহারী বাবা বেঁচে উঠে বলেন একবার : পাহন দেবতা আয়া। শুধু সাপের নয় রোগের আক্রমণকেও তিনি তাঁর প্রিয় পাহন দেবতার দূত জ্ঞান করে গেছেন বার-বার। এ কথা ঠিক নয় যে পওহারী বাবার সাপের কামড়ে বা রোগের জ্বালায় দেহে কোনও যন্ত্রণা হতো না। না। বরং এর উল্টোটাই সত্য। অর্থাৎ তাঁরও নিদারুণ যন্ত্রণা হতো ; তবুও। তাঁর ধ্যানের দেবতার দেওয়া এই দুঃখের আশীর্বাদকে কেউ অসুখ বলবে এ তাঁর অসহ্য ছিলো। তাই দুঃখের বরষায় চক্ষের জলকে কবি যেমন বন্ধুর রথ জীবনের দরজায় থামা বলে মনে করেছেন, এই মহাত্মাও বিষধরের কামড়কে মনে করেছেন ধনুর্ধর জীবনদেবতার মঙ্গল দূত !

দীর্ঘ, মাংসল একচক্ষু মানুষ পওহারী বাবার অসাধারণ বিনয়ের উৎস যে ভাব, পওহারী বাবা তার যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন স্বামী বিবেকানন্দর রাজসিক ভাষায় তা : 'হে রাজন্, সেই প্রভু, ভগবান অকিঞ্চনের ধন—হাঁ, তিনি তাহাদেরই যাহারা কোন বস্তুকে, এমন কি, নিজের আত্মাকে পর্যন্ত 'আমার' বলিয়া অধিকার করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়াছে।'

শেষ দশ বছর পওহারী বাবা লোকচক্ষুর সম্পূর্ণ অন্তরালে চলে যান। তাঁর গুহার উপরে স্থিত আশ্রম থেকে হোমের পবিত্র পাবকের ভাষা ধোঁয়ার

আগুন উঠলেই বোঝা যেত তিনি সমাধি থেকে উঠে এসেছেন। একদিন সেই ধোঁয়ার সঙ্গে ভেসে এলো পোড়া মাংসের গন্ধ। দরজা ভেঙে কৌতূহলীরা দেখলো সব শেষ, পওহারী বাবার শব পর্যন্ত তাঁরই জ্বালা আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

বিবেকানন্দের অনুমান তাঁর প্রিয় এই আচার্যের আগুনে পুড়ে শেষ হবার সম্পর্কে তাঁর ভাষাতেই এখানে উদ্ধার করে দিই: 'আমাদের বোধ হয়, মহাত্মা বুঝিয়াছিলেন তাঁহার শেষ সময় আসিয়াছে। তখন তিনি, এমনকি মৃত্যুর পরেও যাহাতে কাহাকেও কষ্ট দিতে না হয়, তজ্জন্য সম্পূর্ণ সুস্থ মনে আর্যোচিত এই শেষ আহুতি দিয়াছিলেন।'

আত্মার বাণী এক মহৎ জীবনের আহুতিতে তার আলোর ভাষা পেয়েছে আর একবার, —আমরা এই মাত্র বলতে পারি।

পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথ দীক্ষাপ্রার্থী হয়েছিলেন একবার, - পওহারী বাবার জীবনে এটি যেমন, রামকৃষ্ণের কাছে দীক্ষা পাবার পরেও পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা পাবার প্রচেষ্টাও তেমনই নরেন্দ্রনাথের জীবনেও অদ্বিতীয় ঘটনা। যোগমার্গে বিচরণশীল বিচারশীল সাধু পওহারী বাবার কাছে নরেন্দ্রনাথের দীক্ষা প্রার্থনার কারণ পওহারী বাবার মতো ওই পথের পথিক হবার ও দীর্ঘকাল এক জায়গায় বসে সমাধিস্থ থাকবার রহস্যাবগতির দুর্বার বাসনা ছাড়া আর কিছু নয়। স্বামীজীর জীবনচরিতকারেরা আরও জানাচ্ছেন যে স্বামীজী রাজযোগ-প্রার্থী মাত্র হয়েছিলেন পওহারী বাবার কাছে। একটি চিঠিতে অখণ্ডানন্দের কাছে তিনি লিখছেন: 'Our Bengal is the land of Bhakti and Jnana, Yoga is scarcely mentioned there. What little there is but the queer breathing exercises of the Hatha Yoga —which is nothing but gymnastics. Therefore I am staying with this Raja-Yogin—and he has given me some hope.' [*Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples*, Vol. I]. পওহারী বাবার কাছে যোগপ্রার্থনা রামকৃষ্ণের প্রতি অভক্তির সূচনা মনে করতে পারতেন যে হতভাগ্যেরা, তাঁদের উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ ওই চিঠিতেই লিখেছেন: 'My motto is to learn to recognise good, no matter where I may come across it. This leads my friends to think that I may lose my devotion to the Guru. These are ideas of lunatics and bigots. For all Gurus are one, fragments and radiations of God, the Universal Guru.'

কিন্তু পওহারী বাবার কাছে শেষ পর্যন্ত কিছু পাওয়ার নেই যে বিবেকানন্দর, তা বোঝাতে নরেন্দ্রনাথের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের

শ্রীরামকৃষ্ণ। দীক্ষার দিন নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তখন ; চিঠিতে তিরস্কার করা সত্ত্বেও প্রেমানন্দ নরেন্দ্রনাথকে প্রতিনিবৃত্ত করতে এসে ব্যর্থ হয়ে প্রত্যাবর্তন করেছেন তখন ; নরেন দৃঢ়সঙ্কল্প,—পওহারী বাবার কাছে দীক্ষা নেবেই সে। লেবুবাগানের নির্জন অন্ধকারে বিনিদ্র নরেন্দ্রনাথ প্রতীক্ষা করছেন দীক্ষাদিবসের। আর তখনই বিজন ঘরের নিশীথ রাতের দরজায় নিঃশব্দচরণে এসে দাঁড়িয়েছেন তিনি, যিনি নরলোকে একদিন নরেনকে টেনে নিয়েছিলেন অন্ধকার থেকে আলোকে ; মরলোকের কানে উচ্চারণ করেছিলেন অমরলোকের ভাষা,—সেই রামকৃষ্ণ। তাকিয়ে আছেন একদৃষ্টে শিষ্যের দিকে, সন্তানের দিকে সেই চোখে যে চোখ-এর জন্যে অন্ধ পৃথিবীর আকুল প্রার্থনা উচ্চারিত কবিকণ্ঠে : জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো।

অর্জুন যখন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরপ্রান্তে ক্ষণকালের চিত্তবৈকল্যে ফেলে দিয়েছিলো গাণ্ডীব, তখন তাঁকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ। নরেন্দ্র যখন নরের মতো ব্যবহার করতে উদ্যত হলো, তখন দেখা দিলেন অপরূপ শ্রীরামকৃষ্ণ। রাম এবং কৃষ্ণ বার বার এসেছেন নরের জন্যে মরলোকে অমরলোক থেকে। জন্মমুহূর্তেই মায়ের কাছে বলিপ্রদত্ত নরেন্দ্রনাথের জন্যে এসেছেন শুধু রামকৃষ্ণ। চিরশিষ্যের সঙ্গে চিরন্তন গুরুর চারি চক্ষের শুভদৃষ্টিমাত্র অশুভযোগ কেটে যায় নরেন্দ্রর। তাঁর মুখ থেকে হৃদয় বিদীর্ণ করে বিস্ফোরিত হয় জয়ধ্বনি : জয় রামকৃষ্ণ, জয় রামকৃষ্ণ !

পৃথিবীতে মধুগন্ধবহ যত পুষ্প তাদের প্রত্যেকের বাতাসে হেলেদুলে অধিকার আছে এ-মুখো সে-মুখো হবার। নেই শুধু সূর্যমুখীর ; কি সূর্যোদয়ে, কি সূর্যাস্তে,—কারণ সূর্যমুখী কেবল সে-ই যে সদাই সূর্যোন্মুখ !

ঈশ্বর কোথায় নেই ? তিনি ঊর্ধ্বে আছেন, অধে আছেন ; সর্বভূমিতে আছেন ভূমা। ঈশ্বর বামে আছেন ; দক্ষিণেও আছেন প্রতি নরের জন্যে ; কিন্তু নরেন্দ্রনাথের জন্যে জেগে আছেন দক্ষিণেশ্বরে।

॥ সতেরো ॥

বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কবল থেকে রক্ষা পেলে তবেই আসল কাশীর সাক্ষাৎ পাবেন আপনি, এমন কথা কেবল কাশীতে যাদের বাস, নানা বিধিনিষেধের কারণ তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তিনশো দিনের ওপর যাদের কখনও দুবেলা, কখনও একবেলা উপবাস, তাদের মুখেই না, যারা কাশীমুখো হয়নি কখনও এ জীবনে তাদের সুমুখেও কাশীর কথা তুলে দেখবেন, ওই এক জবাব বাঁধা। কিন্তু তারপরেও যদি জিজ্ঞেস করেন আসল কাশী বলতে বক্তা কি বোঝেন তাহলে তার আর উত্তর নেই। লোকসভায় বেকায়দা প্রশ্নের সম্মুখে

গত্যন্তরবিহীন মন্ত্রী মহোদয়কে বাঁচাবার জন্যে 'নোটিশ চাই'-এর কবচ অথবা স্পিকারের নাকচ করে দেবার ক্ষমতা প্রয়োগের রক্ষাকবচহীন আসল কাশীর টীকাকারকে কাজ আছে, পরে হবে-র ছুতোয় আশু প্রস্থানের উদ্যোগ করতে দেখবেন অতঃপর। কাশী অথবা পৃথিবীর কোনও জায়গা বললেই যাঁরা কেবল ধর্ম, ব্রহ্মচর্য, মালা-জপা বোঝেন তাঁরা আসল থেকে ততদূরে থাকেন যতদূরে রামকৃষ্ণ মিশান নয় রামকৃষ্ণ থেকে। কাশী বলো, হরিদ্বার বলো, বলো নির্জনাত্মা হিমালয়, যে কেবল কৈবল্যের আশায় এসব জায়গায় জীবনভোর যাওয়া-আসায় কাটিয়ে দিলো তার মন বৈকল্য ছাড়া আর কি পেলো।

গাইড দেখে দেখে যে কেবল কাশীর ঘাটে ইতিহাস আর কাশীর মন্দিরে কিংবদন্তীর মরীচিকায় মুখ থুবড়ে মোলো সেই মিসগাইডেড হতভাগ্য মিস করলো জীবন্ত কাশীকে; পাপে-পুণ্যে গলাগলির অসংখ্য গলি আর তার চেয়েও সংখ্যায় বেশি বিধবা, ষাঁড়, সিঁড়ি এবং সন্ন্যাসীর কাশীকে। বিশ্বনাথের আবাস সেখানে বিশ্বের যত পিতৃপরিচয়হীন অনাথের আবাসে সেই আসল কাশী গাইডে নেই; নেই এক টাকায় বারো কি ষোলোখানা ছবির পোষ্টকার্ডে। ট্যুরিস্ট-ক্যামেরার লেন্স আছে; তার চোখ নেই। কাশীখণ্ডে কিংবদন্তীর রোমাঞ্চ আছে; নেই কেবল সেই মুহূর্তের মধ্যে মূর্ত রক্তমাংসের কাশীর এই মুহূর্তের বিচিত্র বিস্ময়। যার ভগবান কেবল আকাশে বিরাজ করেন তাঁর সম্বন্ধে সাবধান হতে বলেছেন 'শ'। যার বিশ্বনাথ কেবল কাশীর বিশ্বনাথের গলিতে বাস করেন তার সম্বন্ধে সাবধান হতে বলি শতবার। বিশ্বের যত অনাথের গলি যে দেখেনি তার বিশ্বনাথের গলি দেখা হয়েছে হয়তো, কিন্তু বিশ্বনাথদর্শন আজও অসমাপ্ত সেই ভাগ্যনিহতের; সেই দুর্ভাগ্যপীড়িতের।

এই বিশ্বের যিনি নাথ তিনি নিঃস্বেরও নাথ; ঈশ্বর তিনিই যিনি বিশ্বের, যিনি নিঃস্বের; নিঃস্বেশ্বর যিনি তিনিই বিশ্বেশ্বর!

কোনও জায়গায় নবাগত কেউ যেমন স্টেশানে পা দিয়েই প্রশ্ন করে, এখানে কোনও ভালো হোটেল-টোটেল আছে? তেমনই কাশীতে তার চেয়েও ক্যাসুয়ালি জিজ্ঞেস করে: কাশীতে এখন ভালো সাধু টাধু আছে? যেন— গাড়ি, বাড়ি, গয়না, শাড়ি, ভালো খাবার, কি ফ্রিজ, না কি রেডিওগ্রাম, অথবা ট্রানসিস্টারের মতো সাধু-ও কোনও কোমোডিটি, হাত বাড়ালেই পাওয়া যাবে। এরাই, এইসব অন্তঃসারশূন্য, দম্ভে পরিপূর্ণ অর্বাচীন-প্রবীণরাই কেউ যে-কোনও সাধু গায়ে ছাই মেখে গেরুয়া পরে বসে থাকলেই তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে ধরে নেয় ভণ্ড বলে। ডাক্তার হবার আগেই মেডিক্যাল স্টুডেণ্ট স্টেথিসকোপ ঝোলায়; কোর্টে যায় দাবা খেলতে যে ব্রিফলেস ব্যবহারজীবী, সে-ও যায় কালো কোট চাপিয়ে। লোকে কখনও অবাক হয় না; কারণ এটাই ওই দুই পেশার রিডিক্যুলাস' জীবন-সঙ্গত; সাংঘাতিক রকমে স্বাভাবিক। কিন্তু ছাইমাখা

সন্ন্যাসী দেখলে, ছাই উড়িয়ে দিয়ে দেখবার সময় নেই কারুর, অমূল্য রতন মেলে কিনা ; কিন্তু বলবার পণ্ডিত-মূঢ়তা আছে 'দূর ছাই' !

ডাক্তারের কাছে যেতে হলে টেলিফোন করে, রেকমেণ্ডেশান যোগাড় করে, ধরনা দিয়ে, কিউ-তে অপেক্ষা করে দেখা পায় কখনও ; কখনও পায় না। উকিলের কাছেও তাই। কিন্তু সাধুর বেলায় উল্টো ; কাশীর বেলায় আলাদা। কাশীতে পা দিয়েই তাই আশা, সাধু-সন্ন্যাসী সব সার দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে আগন্তুকের জন্যে ; প্রত্যেকের গায়ে সাঁটা থাকবে তার দাম কত এবং সেইটে ফেলে দিলেই সাধুকে সঙ্গে সঙ্গে সুড়সুড় করে যেতে হবে ক্রেতার পেছন-পেছন। না গেলেই ক্রেতার অনিবার্য সিদ্ধান্ত, কাশীতে আর 'সাধু-টাধু' নেই ; সব ভণ্ড ; সবাই সেই পাগলা মেহের আলীর মতো সমবেত সোচ্চার মুহূর্তে : 'সব ঝুট হায় !'

এই 'সাধু টাধু' খোঁজার দল জানে না আজও যে পৃথিবীতে রাজা, পণ্ডিত, ব্যবসাদার, দরিদ্র, সবাই আজ অথবা কাল বিক্রীত হবার অপেক্ষায়। পৃথিবীতে এখনও পর্যন্ত যা অবিকৃত তা হচ্ছে মা এবং মাতৃসাধক !

কে চিনবে, সাধুকে ? সাধু কে, কে অসাধু এ-কথা বলবে কে ? ভক্ত ছাড়া ভগবান আর কার ? ভক্ত ছাড়া ভাগ্যবান কে আর ? এবং ভক্তকে, ভক্ত কে এ-কথা ভগবান ছাড়া বলবে আর কে ?

একজন গেছে হরিসভায় ;—আরেকজন, বাঈজী-আলয়। হরিসভায় যে গেছে তার কান হরিনামে সাড়া দিলেও প্রাণ পড়ে আছে বাঈজী-আলয়ে। বন্ধু কেমন মজা লুটছে সেখানে, আর, আমি পড়ে আছি শুষ্ক ধর্মতত্ত্বের মরুভূমিতে ; মরাভূমে। আর সুরসভায় সুরাশোভায় বিচ্ছুরিত রক্তিমবদন বাঈজীর গানে কান আছে আরেকজনের ; কিন্তু তার প্রাণ পড়ে আছে হরিসভায়। তার অনুতাপ হচ্ছে কেন সে মরতে এল এই মরুভূমের প্রেতনৃত্যের আসরে অমরভূমের নিত্যবাসর ত্যাগ করে। তার বন্ধুর মতো সেও কেন গেল না ক্ষুরের ধারের চেয়েও দুর্গম সেই বন্ধুর পথে,—যে পথ চলে গেছে নশ্বর থেকে ঈশ্বরের দিকে ; যে পথ নরলোককে মরলোক পার করে পৌছে দিয়েছে অমরলোকে ; যে পথ রাগে নয়, নয় বিরাগে রাঙানো ; অনুরাগে রাঙা মাটির যে পথ অনিত্যের মরুপর্বত, কান্তার-পারাবার পার হয়ে নিত্যকালের উৎসবলোকে নিয়ে গেছে ; যেখানে নব নব আলোকে আলোকে অবিনশ্বরের আরতির জ্বলছে অনির্বাণ জ্যোতিশিখা !

এই দুজনের মধ্যে কে পাবে হরিকে ? হরিদ্বারে যে আছে জপের মালা হাতে লোভের থালার দিকে তাকিয়ে সে নয় ; হরিদ্বার থেকে দূরে আছে যে, কিন্তু খুলে গেছে যার অন্তর্দ্বার সে পাবে তাঁকে, যাঁকে জ্ঞান পায়নি, বিজ্ঞান চায়নি ; ধর্ম যাঁকে খুঁজছে ; তত্ত্ব ঢুঁড়ছে যাঁকে আদিকাল থেকে ; অনাদিকাল থেকে যিনি তাকিয়ে আছেন তার দিকে যে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ কিছুই চায়নি, চেয়েছে কেবল তাঁকে ! অক্ষৌহিণীর বদলে চেয়েছে অক্ষয়কে ; অসংখ্যের

বিনিময়ে সেই শঙ্খকে যাঁর মুখে শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী শ্রীহরি স্বয়ং বলেছেন; ত্যাগ করো অধর্মকে; তারপরে পরিত্যাগ করো ধর্মকেও। স্মরণ করো আমাকে; বিস্মরণ করো সব অকর্ম, সব কর্মকে। জীবন মরণ সব আমি; শরণ নাও আমার!

তাই শ্বাস নয়; বিশ্বাস! তাই রণ নয়; চরণ! মরণ নয়, শ্রীহরির সমরণ! তাঁর দু'পায় পড়া ছাড়া তাঁকে পাবার আর উপায় কি? বোধি কেমন করে পাবে তাঁকে যাঁর অবধি নেই, নদী কেমন করে পায় সমুদ্রকে, তেমন করে ছাড়া?

কে বলবে তাই বিশ্বনাথ বন্দী হয়ে আছেন কেবল বিশ্বনাথের গলিতে? কে বলবে, তিনি নেই মধুলোভী অলিতে; তিনি আছেন কেবল প্রসাদলোভী অঞ্জলিতে? কে বলবে, 'মরা'-র মুখে যিনি অমরার বাণী, মারের সুমুখে রামের মূর্তি ফোটান, কলসীর কানায় যখন রক্তধারা গা বেয়ে পড়ছে তখনও ভালোবাসায় অন্ধ যিনি রাগে অচৈতন্য-কে চৈতন্য দিচ্ছেন, কে বলবে তিনি কোথায় আছেন আর কোথায় নেই?

নারদ এসে প্রশ্ন করলো শ্রীভগবানকে: মুমুক্ষ জিজ্ঞেস করছে তার মুক্তির দেরি কত আর? শ্রীভগবান উত্তর দিয়েছেন তার প্রশ্ন করে: আর আমার ভক্ত তার কথা তুমিও ভুলে গেলে? নারদের মনে পড়ে; রাগত স্বরে সৃষ্টি-স্থিতি-বিনাশের কর্তা অবিনাশী সত্তাকে তিনি বলেন: হ্যাঁ, আরেকজনও আমাকে প্রশ্ন করেছিল বটে, জিজ্ঞেস করেছিল কতদিনে সে পাবে তোমার দেখা? কিন্তু সে তোমার নাম করেনি; গাল দিয়েছিলে তোমায়! সে হলো তোমার ভক্ত? শ্রীভগবান হরি বললেন: 'দুজনকেই গিয়ে বলো, আমার হাতে অনেক কাজ উত্তর দেবার সময় নেই এখন; তারপর তারা কি বলে তা শুনেও যদি বুঝতে না পারো আমি কার ভক্ত, তবে এসো আবার আমার কাছে।'

নারদ গিয়ে মুমুক্ষুকে বললেন, আর বললেন শ্রীহরিনিন্দুককে, দুজনকেই জানালেন ভাগবৎ-বার্তা। প্রথমজন নিরাশ হলো; দ্বিতীয়জন গালাগালের রাশ আলগা করল আবার, একগাল, একরাশ গালাগালের পর অতঃপর বলল: 'তুমিও যেমন বিটলে, সে-ও তেমনই! যাঁর দৃষ্টিপাতে কোটি কোটি ভুবনের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় ঘটার ব্যাঘাত নেই, তাঁর কাজের ঘটা দেখ একবার! যাও যাও নিজের কাজে যাও এখন। বুঝেছি, আমার সময় হয়নি এখনও—!'

বুঝলেন নারদও। বুঝলেন, কার দুঃসময়ের ধারা ফুরোতে দেরি আছে আর কার 'সময়' হয়েছে সন্নিকট। আর, বুঝলেন, আরও বুঝলেন মুনিশ্রেষ্ঠ যে, কেন অসময়ে ডাকলে সাড়া দেন না শ্রীহরি, আর সময় হলে কেন তিনি এসে দাঁড়ান নিজে থেকেই, সময়ের অতীত যিনি সব সময়েই।

রাগের স্বর নয়, বৈরাগ্যের সুর নয়, অনুরাগের শর যাঁকে স্পর্শ করে তিনিই ঈশ্বর। ঊর্ধ্বে বা অধে নয়; নয় উত্তরে কিংবা দক্ষিণে; জ্ঞানে-বিজ্ঞানে

ধর্মতত্ত্বে নয় ; কিছুতেই নয় উপবাসে ; আর সমাজের বিধিনিষেধ নয় বিধির নিষেধ ; ভক্তের ভালোবাসা যাঁর সব চেয়ে ভালো বাসা, তিনিই ভগবান।

হরণ করতে করতে কোন সময়ে তাই রত্নাকর মনোহরণ করেছিলেন শ্রীহরির ; মরা মরা বলতে বলতে রাম রাম বলে উঠেছিলেন তিনি, রত্নাকর থেকে যিনি বাল্মীকি হয়ে উঠেছিলেন একদা। রমণীকে ভালোবেসে ভালোবেসে ছিলেন আরেকজন রমণীমোহনকে। এই কাশীতেই তিনি সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন সেই 'সংকটমোচনের'। সেই 'আরেকজনের' নাম সাধু তুলসীদাস ; যাঁর সম্বন্ধে মধুসূদন সরস্বতীর মুখে স্বয়ং সরস্বতীই যেন বলছেন :

আনন্দকাননেহ্যস্মিন্ জঙ্গমঃ তুলসী তরুঃ।
কবিতা মঞ্জরী যস্য রাম-ভ্রমর-ভূষিতাঃ ॥

কথাটা তাই সত্য। কাশী হচ্ছে সেই নিত্যানন্দের কানন যেখানে জেগে আছে জীবন্ত-তুলসী যাঁর কাব্যমঞ্জরী সেই ভ্রমর-ভূষিত যে ভ্রমরের নাম রাম। প্রথম যৌবনে রামনাম নয়, যে নাম তাঁর ধ্যানজ্ঞান ছিলো সে তাঁর স্ত্রীর নাম রত্না। বাল্মীকির মতো তিনিও ছিলেন রত্নাকর সেদিন। পথিকের ধনরত্ন অপহরণ করত যে একদা সেই আরেকদিন মানবচরিত্ররত্নের শ্রেষ্ঠ আকর যে রাম তাঁরই জীবনকাব্য রচনায় ভাষাকে দিলেন ছন্দ। মরা মরা বলতে উচ্চারণ করলেন, রাম, রাম। আর রমণীরত্ন থেকে আরেকজন রমণীয়তর রত্নের অন্বেষণে নিষ্ক্রান্ত হয়ে রচনা করলেন রামচরিত। রত্না রত্না করতে তিনি শরণ নিলেন রত্নাকর রামের। স্ত্রীনাম নয় ; শ্রীরাম হলো তাঁর ধ্যানজ্ঞান।

হিমাদ্রিশৃঙ্গে আসন্ন হয়ে এলে আষাঢ়, মহানন্দ ব্রহ্মপুত্র ক্ষিপ্ত ধূর্জটির মতো আপনার তীর উপকূল খুঁজতে উন্মত্ত হলে তমসাচ্ছন্নতম অরণ্যে শরাহত ক্রৌঞ্চমিথুনের বিচ্ছেদে বাল্মীকির বক্ষ বিদীর্ণ হয়ে জন্ম নিল ছন্দ। ভূচর ভাষার অঙ্গে যুক্ত হলো খেচর পক্ষ। সেই ছন্দে কার বন্দনা গাইবেন প্রশ্ন করলেন গুরুকবি ; নারদ যাঁর নাম করলেন তিনি শুধু বীর নন, তিনি রঘুবীর। এমনই অন্ধকারাচ্ছন্ন এক রাতে বাড়ি ফিরে স্ত্রীকে খুঁজে পেলেন না স্ত্রৈণ তুলসীদাস। ঝড়, জল অন্ধকার উপেক্ষা করে শ্বশুরালয়ে গিয়ে পেলেন স্ত্রী, রত্নাকরকে। ক্ষণিক অদর্শনে অস্থির স্বামীকে শান্ত করতে ভর্ৎসনার সুর ধ্বনিত হলো সে ধনী মানিনীর মুখে :

'লাজ না লাগত আপুকো,
ধীরে আয়েছ সাথ।
ধিক ধিক আয় সে প্রেমকো,
কহা কহোঁ যে নাথ ॥
অস্থিচর্মময় দেহ মম—
তামো জৈসী প্রীতি।

তৈসী জৌ শ্রীরামমহ—
হোত ন তত্ত্ব ভবভীতি ॥'
['সাধক-জীবনী' —শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী]

যৌবনস্বপ্নে আচ্ছন্ন তুলসীদাসের আকাশে মদিরাক্ষীর তীব্র তিরস্কারের অগ্নি-আখরে ফুটে উঠল স্ত্রীনাম নয়; শ্রীরাম। লালাবাবুর কানে এসে বেজেছিল মেছুনীর মুখে না জেনে উচ্চারিত সতর্কবাণী: 'বেলা যায়'। জীবনের অপরাহ্ণ বেলায় সেই বাণী বুকে এসে বিঁধেছিল। বাণী নয়; মোহপাশ ছিন্ন করবার সেই বাণই যেন বলেছিল আরেক কবির, জগতের সকল কালের সকল দেশের শ্রেষ্ঠ কবির কথায়:

'আরও বড় হবে না কি যবে অবহেলে
ধরার ধুলার হাট হেসে যাবে ফেলে।'

সংসারে যে ছিল সং সেজে, বেরিয়ে গেল সে 'সার' খুঁজতে। প্রস্তুতি ছিলো লালাবাবুর, বহু জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিলো পাথর চাপা। খুলে গেল মুহূর্তে তার মুখ। মেছুনীর ডাক তার নিমিত্ত মাত্র; তার বেশি কিছু নয়। মন প্রস্তুত ছিল তুলসীদাসেরও। তাই স্ত্রী রত্না যখন তাকে বলল যে, স্ত্রীনামে তোমার যে আগ্রহ তার কণামাত্র যদি হতো শ্রীরামে, তাহলে চলে যেত কাম, সেখানে জেগে উঠত নবদূর্বাদল শ্যাম। স্ত্রীর সেই ক'টি কথায়, কোটি কথায় যা ঘটে না, ঘটে গেল সেই অঘটন। স্বধর্ম-বিস্মৃত নদী দাঁড়িয়ে ছিল দু'দণ্ডের জন্যে ডোবা-র ছদ্মবেশে; তার কানে এসে পেঁছিল সমুদ্রের ডাক। রাধার কানে এল কৃষ্ণের বাঁশী। অন্তহীন দূরের। অনন্তের অভিসারে জীবন-নদী যখন বেরোয় সিন্ধুর উদ্দেশে, তখন তার দুর্বার দুর্নিবার গতি রোধ করে এমন সাধ্য কার; স্ত্রীনামও আর পথ আটকে দাঁড়াতে পারল না শ্রীরামভক্তের। স্ত্রীনামের দেয়াল দিয়ে ঘেরা সং পিছনে পড়ে রইল; শুরু হলো শ্রীরাম সার নবজীবনের। স্ত্রীনামের অসার অভিমান থেকে জাত হলো শ্রীরাম-অভিসার; শ্রীরাম-অভিযান।

বরুণা থেকে অসি; খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর। পাথরে নিষ্ফল মাথা কোটে। শ্রীনাম ধ্যান করে, শ্রীনাম জ্ঞান। কিন্তু শ্রীরাম কোথায়? শাস্ত্রজ্ঞ সনাতন দাসের কাছে গিয়ে পড়েন শাস্ত্র অজ্ঞ তুলসীদাস। কিন্তু শাস্ত্রে সে সান্ত্বনা পাবে কোথায় শাস্ত্রের অতীত অবাঙ্ মানসগোচরকে যে চাইছে জানতে; বিদ্যা তাকে কি দেবে যে খুঁজে বেড়াচ্ছে বিদ্যা যে দেয় তাকেই। দর্শন না হলে দর্শন পড়ে কি হবে লাভ। টোল থেকে দূরে অনন্ত নিভৃতে. মধুকরগুঞ্জরণে যেখানে কাঁপছে ছায়াতল সেখানে চলে শ্রীনাম জপ; শ্রীরামধ্যান। জ্যোতির্ময় সূর্যের আলো এসে পড়ে পায়ের কাছে তৃণাসনের ওপর তির্যক্‌রেখায় রাত্রির তিমির অন্তে। ভঙ্গ হয় না তখনও নবদূর্বাদলশ্যাম সেই ধ্যান। কত সূর্যোদয়ে, কত সূর্যাস্তে অধীর অপেক্ষা ব্যর্থ হয় বুঝি . .

অসীম অপেক্ষায়। নয়নের সম্মুখে কেন সে এসে দাঁড়ায় না নয়নের মাঝখানে যে নিয়েছে ঠাঁই। শ্যামল যে শ্যামল সেই নবদূর্বাদলশ্যাম কেন এসে দাঁড়ায় না একবার, ধনুর্বাণ হাতে সেই ধনুর্ধর?

তুলসীমঞ্চে সন্ধ্যাপ্রদীপে জ্বলে সেই জিজ্ঞাসা: পূর্ণচন্দ্র তুমি কি জানো শ্রীরামচন্দ্র কোথায়? সকালবেলায় রোজ জল ঢালেন এক বৃক্ষমূলে তুলসীদাস। সেই বৃক্ষে এক অতৃপ্ত আত্মার বাস। বুক জ্বলে যায় তার তৃষ্ণায়; তুলসীর দেওয়া জলে গলে যায় তৃষ্ণার পাষাণ রেজ। অসীম কৃতজ্ঞতায় সে একদিন শ্রীরামদর্শনলাভের নিশানা দেয় শ্রীরামাভিলাষীকে। তার নির্দেশমতো, দশাশ্বমেধ ঘাটের ধারে রামায়ণকথার আসর শেষ হয়ে গেলে অনুসরণ করে তুলসীদাস বৃদ্ধের বেশে আবির্ভূত মহাবীর রঘুবীরভক্ত স্বয়ং হনুমানকে।

নিভৃততম এক স্থানে তাঁর পায়ে পড়ে জানতে চান তুলসী শ্রীরামদর্শনের উপায়। বৃদ্ধের বেশ পরিত্যাগ করে বীরের বেশে আত্মপ্রকাশ করেন রঘুবীরভক্ত ভক্তরাজ মারুতি। শ্রীরামভক্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় 'শ্রীরামভক্তি'র।

॥ আঠারো ॥

মহাবীর রঘুবীরভক্ত পবননন্দন বললেন, তুলসীদাসকে চিত্রকূট পাহাড়ে যেতে। শ্রীরামপদস্পর্শে পবিত্র চিত্রকূট; সাধনার বিচিত্র কূট রহস্য অবগত হবার উপযুক্ত পরিবেশধন্য স্থান। সেইখানে সাধনাসনে অবস্থান করতে করতেই স্থূলদৃষ্টির সামনে আবির্ভূত হবেন পরমসাধ্য পদ্মলোচন সীতাপতি; রঘুপতি রাঘব রাজারাম। চিত্রকূট পর্বতের দিকে চললেন সাধক-কবি গোস্বামী তুলসীদাস। পথ চলেন রাম নাম করতে করতে; শ্রীরাম প্রণাম করতে করতে চলেন কবিকুলচূড়ামণি। শ্রীরাম নামে, শ্রীরাম প্রণামে মধু ক্ষরিত হতে থাকে আকাশে বাতাসে। মধুময় হয় দ্যুলোক, ভূলোক। কত সূর্যোদয়, কত সূর্যাস্ত রাম নামে রাঙা হয় সেই ভক্ত কবির করুণ রঙীন পথ।

চিত্রকূট পর্বতে পৌঁছন সাধক; শ্রীরামসিন্ধুর সন্নিকট হয় শ্রীতুলসী নদ।

চিত্রকূট পর্বতের এক কোণে তপস্যায় আসীন হলেন তুলসীদাস। একদিন চন্দন ঘষছেন ভক্ত, এমন সময় এক দুর্নিবার আকর্ষণযুক্ত দুরন্ত বালক এসে দাঁড়ায় দ্বারপ্রান্তে। প্রভাতের প্রথম আলো এসে পড়েছে পায়ের কাছে। সেই আলোয় যেন এসে দাঁড়িয়েছে আলোর চেয়েও আলোকময় এক শতদল। কি আশ্চর্য বরতনু সেই বালকের। দিব্য বিভায় জ্যোতির্দীপ্ত সেই আনন। কমলফুল বলে ভুল করে যে মুখে এসে বসছে মধুলোভাতুর অসংখ্য অলি। কি চায় এই নবদূর্বাদলশ্যামাঙ্গ? তুলসী তাকান: 'কি চাও তুমি, বাচ্চা?'

হাসিতে ভুবন আলো করে বালক হাত বাড়ায় চন্দনের থালার দিকে। তড়িৎ-গতিতে থালা সরান তুলসী। শ্রীরামথাল্য থেকে চন্দন তুলে নিতে চায়, এ কে? তড়িতালোকে স্মৃতির আকাশ থেকে অপসারিত হয় বিস্মৃতির যবনিকা। মনে পড়ে যায় এমনই একবার তার আরাধ্য দেবতা রঘুপতি রাঘব রাজারাম তাঁকে দেখা দিয়েও দেখা দেননি। ভক্ত হনুমান সেবারে বলেছিলেন যে, রামনবমীর পুণ্যতিথিতে শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং দেখা দেবেন শ্রীরামভক্তকে।

সেই পুণ্য রামনবমীতে যখন শ্রীরামচন্দ্রের দেখা না পেয়ে নিভৃত কান্নায় ভেঙে পড়েছেন তুলসীদাস তখন তাঁর দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল একদল যাযাবর। বাঁদর নাচ দেখাবে তারা সাধককে। ক্রুদ্ধ, কুপিত কবি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন বেদের দলকে। তার পর পবননন্দন ভুল ভেঙে দিয়েছিলেন তুলসীর। তাঁরাই গিয়েছিলেন বেদের বেশ ধরে,—শ্রীরাম, সীতা, লক্ষ্মণ এবং হনুমান সেদিন ভক্তের কুটীরপ্রান্তে। সেই ছলনার কথা আজ আবার মনে পড়ে তুলসীর। তুলসীতলায় জ্বলে ওঠে জীবনদেবতার দীপ। সেই দীপালোকে চিনতে পারেন যেন বালককে; এই সেই নবদূর্বাদলশ্যাম রাম। সেই চেনার আলোকে অচেনার আরতি করেন কবি :

বালক শুনহু বিনয় মম এহুঁ।
তুম্ শ্রীরামচন্দ্র কি দুসর কেহুঁ?

কমল আঁখির কোণে অমরাবতীর হাসি ছড়িয়ে পড়ে; বাঁধ ভেঙে উছলে পড়ে আলো : সকল শ্রীরাম অবতার! বালক বিদায় নিলে ধ্যানাবিষ্ট তুলসী লিখলেন চোখের জলে :

চিত্রকূট কে ঘাট পর ভাই সন্তন কী ভীড়।
তুলসী দাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর ॥

['ভারতের সাধক,' তৃতীয় খণ্ড]

সাধক তুলসীদাসের রামায়ণ, রামচরিতমানস,—সেই শ্রীরামদর্শন!

চিত্রকূট থেকে বৃন্দাবনের পথে পা বাড়ালেন কবি। বৃন্দাবনে মদনগোপালের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে রামদর্শনাভিলাষী তুলসীদাস যুক্তকরে নিবেদন করেন :

কহা কহোঁ ছবি আজকী তালের নেহো নাথ।
তুলসী মস্তক তব নোয়ে ধনুষ বাণ লেও হাত ॥

হে মুরলী-মুকুটরাজ মদনগোপাল, তুমি একবার ধনুর্বাণ হাতে দাঁড়াও আর নমস্কারে তুলসীদাসের মরদেহ লুটিয়ে পড়ুক অমরদেহর পায়ে!

বাঁশী ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিলেন মদনগোপাল; হাতে তুলে নিয়েছিলেন তীরধনুক! শ্রীরামপাদপদ্মে চোখের জলে ভেসে গিয়েছিল 'তুলসী'-পত্র!

বৃন্দাবন থেকে অযোধ্যায়। স্বনাম ধ্যান থেকে তখন জন্ম নিয়েছে শ্রীরাম-গান : শ্রীরামচরিত-মানস।

দয়া ধরমকি মূল হে'য়
নরক মূল অভিমান।
তুলসী মৎ ছোড়িয়ে দয়া
যও কণ্ঠাগত জান ॥

তুলসীর দোঁহা তখন উত্তর ভারতের পথে প্রান্তে বিকিরণ করছে আশ্চর্য আলো। সে আলোয় নিদ্রিত হৃদয়ের কলুষ মোচন হচ্ছে; জেগে উঠছে ভক্তির দলের পর দল মেলে ভক্ত শতদল। সেই ভক্তদের দেওয়া মূল্যবান দান অপহরণ করতে এসেছে একদিন একজন তস্কর। গোপ্যানির্মিত পত্রের দিকে হাত বাড়াবার আগেই, নবদূর্বাদলশ্যাম একজন ধনুর্বাণ হস্তে দণ্ডায়মান; নিত্য-প্রহরায় নিরত। তুলসীদাসকে প্রভাতে সেই তস্কর সাধু সেজে এসে জিজ্ঞেস করে ধনুর্ধারীর পরিচয়। সেই চোরের মুখে ধনুর্ধারীর রূপের কথা শুনে তুলসী বলেন: আমি যাঁর দর্শন পাইনি আজও, তুমি পেয়েছ তাঁর রূপের সাক্ষাৎ; সেই অপরূপের দর্শনধন্য কে তুমি ভাগ্যবান জানি না ভাই; তোমার আলিঙ্গনে আজ আমাকে পূত কর, পবিত্র কর, যোগ্য কর, তাঁকে দর্শনের যোগ্য; যোগে অথবা যজ্ঞে যিনি নেই।

তুলসীদাসের আলিঙ্গন বাক্যে দস্যু রত্নাকর মুহূর্তে স্বীকার করে নিজের অপরাধ; আর করে মার্জনা। তুলসীর মন তখন চলেছে অনেক দূরে। তাঁর সামান্য বিত্তের রক্ষণাবেক্ষণ করতে স্বয়ং প্রভু রামচন্দ্রকে পাহারা দিতে হয় সারা রাত জেগে.—এ দুঃখ তুলসী রাখবেন কোথায়। 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায়ে যেতে চাই; ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে'। যতক্ষণ রাম ছাড়া আরও কোনও উপকরণের আছে প্রয়োজন. ততক্ষণ দেখা দেবে কেন সেই ধনুর্ধারী? যতক্ষণ সামান্য বাঁকাচোরাও ঘরেতে আছে পোরা ততক্ষণ পোরাবে কেন মনোবাঞ্ছা সেই ধনুর্ধর? দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে, ততক্ষণ কৃষ্ণের দেখা নেই। যখন সম্পূর্ণ নিঃসহায় দ্রৌপদী হাত তুলে দিলেন শূন্যে, হা কৃষ্ণ তুমি কোথায় বলে, তখনই শূন্যকে পূর্ণ করে দেখা দিলেন শংখ-চক্র-গদা-পদ্মভূষণ। যে সব ত্যাগ করেছে, সর্বত্যাগী যে সেই পায় গীতার পুরুষোত্তমকে। কুন্তীকে বর দিতে স্বীকৃত শ্রীকৃষ্ণ যখন জানতে চাইলেন কুন্তী কি চায়, তখন কুন্তী বললেন: আমার জীবনাকাশ থেকে কখনও দুঃখের কৃষ্ণবর্ণ মেঘ দূর কোরো না তুমি। কারণ দুঃখ দূর হলেই দুঃখহরণও বহু দূর হবেন। আরামে হারাম হায়। আরাম ত্যাগ করে, হারাম জ্ঞানে পরিত্যাগ করে আরামের উপকরণ। 'হা রাম' বলে শ্রীরাম সর্বস্ব হলে তবেই দর্শন দেন, রঘুপতি রাঘব রাজা রাম।

তুলসী বিলিয়ে দিলেন সব সঞ্চয়। শুধু হাতে-লেখা রামচরিত-মানসের পাণ্ডুলিপি রক্ষিত হলো তুলসীর বন্ধু-গৃহে। তুলসীতলায় শ্রীরামশঙ্খে ফুঁ পড়ল এতদিনে জীবনতুলসী মঞ্জরিত হবার শুভ মুহূর্ত হলো সমাগতপ্রায়।

সিন্ধবাক্ শ্রীরামসাধক তুলসীর কাছে এলো এক অমোচনীয় পাপদাহের অন্তর্জ্বালায় অহরহ দগ্ধ একজন। ব্রাহ্মণবধের পাপ তার কোন্ প্রায়শ্চিত্তে হবে নির্মূল? তুলসী বললেন: শ্রীরাম নাম নাও! সব পাপ হবে পুণ্য; পূর্ণ হবে শূন্য। সমাজ আর শাস্ত্র পুঁথি আর পণ্ডিত বললে: রামনামের যদি এত জোর, এত জাদু যদি রামপ্রণামে ভবে মন্দিরের মধ্যে রয়েছে এই যে পাথরের ষাঁড়—এ গ্রহণ করুক নাম উচ্চারণে পাপমুক্ত এই পাতকের হাত থেকে তৃণগুল্ম। তুলসী বললেন: তবে তাই হোক। রাম নামে প্রকম্পিত মন্দির-প্রাঙ্গণে চৈতন্য লাভ করলে স্থূলচক্ষে জড়, সেই বৃষ। প্রকম্পিত হলো তার প্রস্তর-কলেবর। পাথরের বুক বিদীর্ণ করে বইল ক্ষুধা জাগ্রত নদী; বসুধার বুক বিদীর্ণ করে যেমন উচ্ছ্বসিত হয় সুধার ঝরনাধারা! অহল্যার পাষাণে যদি প্রাণসঞ্চার হয় শ্রীরামচন্দ্রের পদস্পর্শে, তবে কেন শিলায় শিলায়, বৃষস্কন্ধে তার শিরায় শিরায় বইবে না রাম নামে, রামপ্রণামে প্রবল প্রাণবন্যা? রৌদ্ররুক্ষ শাস্ত্রের অকৃপায় রুদ্ররুক্ষ শাস্তির অকরুণায় 'জীবন যখন শুকায়ে যায়' তখনই যদি না তুমি 'করুণাধারায় এস' তবে তুমি কেমন ভক্তের ভগবান?

রঘুবীরজনক এমনই কোনও পাপের দুঃসহ জ্বালা জুড়োতে গিয়েছিলেন, জানতে গিয়েছিলেন ত্রিকালজ্ঞ ঋষির কাছে প্রায়শ্চিত্তের উপায়। শ্রীরাম নাম করতে বলেছিলেন ঋষির অবর্তমানে ঋষিপুত্র সেদিন। তিনবার রাম নাম করলেই, শ্রীরামচন্দ্রের পিতার সব কলুষ মুক্ত হবে,—এই অমৃতবাণী দশরথের মৃত উৎসাহে আশার সঞ্চার করল। ফিরে গেলেন হৃষ্টচিত্তে ঋষির আলয় থেকে রাজালয়ে। ঋষি আশ্রমে ফিরে শুনলেন ওঁর পুত্রের তিনবার রাম নামে কলুষ-মুক্তির সিদ্ধান্ত জ্ঞাপনের কথা। প্রসন্নচিত্ত, সৌম্যদর্শন ঋষিচিত্ত জ্বলে উঠল দাবানলের মতো; ঋষির আনন আদিত্যবর্ণ ধারণ করল ক্রোধে। তিনি বললেন, যে নাম একবার করলে একাধিক জন্মের সমস্ত পাপ অবসান হয় চক্ষে পলক পড়বার পূর্বেই, সেই পুণ্য পবিত্র, পূর্ণতার প্রতীক রাম নাম তিনবার করতে বলে যে অন্যায় করেছেন তাঁর আত্মজ তার জন্যে পিতা হয়ে তিনি দিচ্ছেন পুত্রকে অভিশাপ।

রাম নামে যদি মুক্তি না আনে, ভগীরথ প্রণামে যদি না নামে শিবের জটামুক্ত হয়ে জাহ্নবীর মুক্তধারা, ভগবানের পায় যদি না বাজে অমৃতের উপায় তবে ভক্ত নিরুপায়!

দিল্লীশ্বর সাজাহান যোগী তুলসীর সম্বন্ধে প্রচলিত বহু উপাখ্যানে আকৃষ্ট হয়ে ডেকে পাঠান তুলসীকে: বলেন, অলৌকিক শক্তি দেখাতে। জগদীশ্বরের সেবক দিল্লীশ্বরের কথায় অলৌকিক ক্ষমতার অপব্যবহার করতে অসম্মত হন। সম্রাট তাঁকে কারাগারে বন্দী করেন। শ্রীরামভক্ত বন্দী হলে, দিল্লী জুড়ে শুরু হয়ে যায় হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড। জগতের যিনি সম্রাট তিনি যাঁকে পাঠিয়েছেন মুক্তপুরুষ করে সে পুরুষকে দিল্লীর সম্রাট বন্দী করবে কেমন করে। অবিলম্বে

সভাসদদের সুপরামর্শে, হনুমানের আবির্ভাবে ভীত প্রজাদের আর্তনাদে অশুভের আশংকায় সাজাহান মুক্ত করে দেন শ্রীরামভক্তকে।

এই তুলসীদাসই আবার সামান্য লোকের, অতি সাধারণ স্ত্রীলোকের দুঃখে তাদের শত অনুরোধ উপরোধ এড়াতে না পেরে অলৌকিক শক্তিপ্রয়োগ করতে বাধ্য হতেন: যেমন সেবার মণিকর্ণিকার ঘাটে সদ্যবিধবার প্রণামের উত্তরে আশীর্বাদ করেন: পতিপুত্রবতী হয়ে সৌভাগ্যসুখ ভোগ কর। স্বামীর শবের দিকে সাধকের দৃষ্টি পড়া মাত্র, শবের ওপর আরম্ভ হয় আবার জীবনের উজ্জ্বল উৎসব।

এমনই হয়; এমনই হবার কথা: শ্রীরামকৃষ্ণ যদি বলেন তবে একই গাছের একই ডালে সাদা এবং লাল দুই রঙের, দুই রূপের, দুই অপরূপ ফুল ফুটবে। প্রকৃতির নিয়ম পালটে যাবে পরমা প্রকৃতির নির্দেশে।

তুলসীর কাব্য-জীবনের বাণী: দয়া ধরমকী মূল হেয়, তুলসীর জীবন-কাব্যের বাণীও নিঃসংশয়ে!

কাশীর অতি দীন ব্রাহ্মণ এসে কেঁদে পড়ে তুলসীর দু'-পায়; উদ্দেশ্য— দাঁড়াবার, মাথা গোঁজবার জন্যে তার একটুকরো জমির উপায়। রাম নামে রত তুলসীদাস গঙ্গাকে বলেন নিরুপায়ের উপায় হতে। গঙ্গা সরে যান তীর থেকে। মুক্ত জমি পায় দরিদ্র ব্রাহ্মণ সাধকেরই সাহায্যে। এই একবার নয়; বার-বার। চিত্রকূটেও তাঁর দেওয়া দারিদ্র্য-হর কবচে এক চিরদারিদ্র্যের দুঃখ-মোচন হয় অচিরেই। ['ভারতের সাধক,' তৃতীয় খণ্ড]

জীবনকাব্য এবং কাব্যজীবনের সাধনায় অভিন্ন অপরাজিত তুলসীদাসের রামায়ণকে না জানলে কাশীকে জানা যাবে না। রামায়ণ আর মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ, তার আত্মার স্থূলমূর্তি এই কাশী। ট্রেন থেকে নেমেই কানে আসবে পূজাধ্বনির; শঙ্খ-ঘণ্টা-কাঁসরের। তার অলিতে-গলিতে, গঙ্গার ঘাটে-ঘাটে চলেছে রামায়ণ-পাঠ; রামায়ণ-কথা। সেই রামায়ণ-পাঠের উচ্চারণ শাস্ত্রসম্মত কিনা জানি না; তার ব্যাখ্যা পণ্ডিতসংগত কিনা, তা-ও না। শুধু জানি, এর উৎস অনাদিকালের ভারত-জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর জ্ঞানে নেই; নেই বিজ্ঞানে আছে রাম-গানে। এই গানের সুর অবিশ্বাসের অসুরকে বলে বার-বার: সর্বধর্মান্, পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ! বিদেশী পর্যটকও বিস্মৃত হননি সে বার্তা:

'You may spend hours on the *ghats* and in the streets and temples watching the old-world customs and the simple faith of the common people, who, however misguided, show an earnestness and deep religious feeling which many conventional Christians might study with advantage.'

[*Benares, the Sacred City*—E. B. Havell]

পার কেউ পায়নি।

এই কাশী সেই কাশী যেখানে 'অন্বেষণের' পালা আজও শেষ হয়নি ; 'অশেষ'কে অন্বেষণের !

॥ উনিশ ॥

রামায়ণ আর মহাভারতের দেশ এই ভারতবর্ষ ; কাশী সেই অনাদিকালের ভারতাত্মার প্রাণময় প্রতীক। ট্রেন যত কাশীর কাছাকাছি হয়, তত খসে পড়তে থাকে দাঁড়কাকের ময়ূরপুচ্ছ। মোসাহেবরা তত হ্যাট-কোট-প্যাণ্ট ছেড়ে শুরু করে দেশী পোশাক পরতে। হ্যাভেল সাহেব তারই ছবি তুলে ধরেছেন তাঁর *Benares, the Sacred City* গ্রন্থে :

'Europeans, and the great majority of Hindus, now come to Benares by the railway. It is amusing to see sometimes at Mogul Sarai, the Junction for the East Indian line, how the up-to-date Indian arriving from Calcutta, Bombay or some other large Anglo-Indian City, will in an incredibly short time divert himself of his European Environment and transform himself into the orthodox Hindu.'

ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের এইসব সাহেবী পোশাক পরা মোসাহেবের, ময়ূরপুচ্ছধারী দাঁড়কাকের দল ভারতাত্মা কাশীর পরিচয় পায়নি কোনও দিন। এরা কাশী বলতে কেউ বোঝে বেনারাস ক্যাণ্টনমেণ্ট ; কেউ রাবড়ি ; মালাই ; কেউ জর্দা-বেনারসী ; কেউ বাঈজী-বাজনদার ; কেউ স্থাপত্যবিদ্য, সূক্ষ্ম কারুকার্য পিতলের ওপর। এরা বিশ্বনাথের মন্দিরে যায়, যেখানেই দেখে দেবদেবীর মূর্তি সেখানেই মাথা ঠোকে, পয়সা ছুঁড়ে দেয় বিধবা, প্রত্যাশী বা পাণ্ডার উদ্দেশে, শিবের মাথায় বেলপাতা চাপায়, নিজের কপালে তিলক আঁকে, উন্মুক্ত বক্ষদেশে চন্দন লেপে। কলকতায় ফিরে এসে ছ'মাস ধরে এক কথা বলে বেনারস ঘুরে এলাম ; গ্যাঞ্জেসে ইভনিং-এ বোটে করে ঘোরা, হাউ লাভলি !

আর আসে বিদেশী পর্যটকের দল ; জেস্টিং পাইলট। এক মাসে পৃথিবী ভ্রমণের পথে ভারতবর্ষে নামাতেই হয় একবার উড়ো পা-কে। কারণ ভারতবর্ষ তাদের ছেলেবেলা থেকে কল্পনার চোখে দেখা। সে দৃষ্টিতে এদেশ হচ্ছে সাপুড়ে আর ভোজবাজির দেশ, দরিদ্র, অশিক্ষিত আর বিপুল বিত্তবান বোকা রাজরাজড়ার খামখেয়ালের তুঙ্গস্থান ; এখানে শহরের রাস্তায় দিনের বেলায় বাঘ বেরোয় ; এরা গোরুকে ভগবতী বলে এবং পুতুলপুজো করে প্রায় সবাই। এই ভারতবর্ষ দেখতে আসে এই মন নিয়ে, কাজেই দেখবার সময় চোখ খোলে না এদের ; দেখবার পর বইতে যা লেখে, তা ভারতবর্ষ দেখবার আগেই, অনেক

আগে থেকেই কল্পনার রং-লাগা চোখে যা দেখে আসছে ছেলেবেলা থেকে, তারই পুনরাবৃত্তি হয় ছাপার অক্ষরে :

"Time passed. The serpent went on nibbling imperceptibly at the Sun. The Hindus counted their beads and prayed, made ritual gestures ducked under the sacred slime, drank, and were moved on by police to make room for another instalment of the patient million. We rowed up and down, taking snapshots. West is West.

'Inspite of the serpent, the sun was uncommonly hot on our backs. After a couple of hours on the river, we decided that we had enough, and landed. The narrow lanes that lead from the *ghats* to the open streets in the center of the town were lined with beggars, more or less holy. They sat on the ground with their begging bowls. By the end of the day the beggars might, with luck, have accumulated a square meal. We pushed our way slowly through the thronged alleys. From an archway in front of us emerged a sacred bull. The nearest beggar was dozing at his post—those who eat little, sleep much. The buill lowered its muzzle to the sleeping man's bowl, made a scouring movement with its black tongue and a morninng charity had gone. The beggar still dozed. Thoughtfully chewing, the Hindu totem turned back the way it had come and disappeared.'

—Aldous Huxley.

ওয়েস্ট ইস্ ওয়েস্ট নেই আর। ওয়েস্ট এখন Waste-এর হাত থেকে বাঁচবার জন্যে East-এর দিকে, ইস্টের প্রতি লক্ষ ঘোরাচ্ছে। ইস্ট ইস্ নট ইস্ট আর। EAST এখন নিজের ইষ্টবিস্মৃত ; Waste অভিমুখী চিন্তা গ্রাস করছে EAST-কে, তার ইষ্টকে ক্রমশই।

এই দৃষ্টি নয়। এ দৃষ্টি দিয়ে অনাদিকালের এই ভারতবর্ষকে দেখা যায় না ; এ দৃষ্টিতে অদৃশ্য থেকে যায় ভারতাত্মা কাশীর দুঃখ-দারিদ্র্য, মৃত্যু-মহামারী, অশিক্ষা, কুসংস্কার-এর অন্ধকার আড়ালে সে ভারত প্রথম এই পৃথিবীর কানে উদাত্ত আশ্চর্যকণ্ঠে বলেছিল : শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, —সে ভারতকে দেখেছেন বিবেকানন্দ। রুদ্র, দীপ্ত, প্রভঞ্জনের মতো বয়ে গেছেন ভারতবর্ষের বুকের ওপর দিয়ে। খাপ খোলা এই বাঁকা তলোয়ার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য,—প্রত্যক্ষ করেছেন সেই দৃষ্টিতে, যে দৃষ্টির সামনে দারিদ্র্যের আর

ঐশ্বর্যের আবরণ হয়েছে উন্মুক্ত। পাশ্চাত্য দেশে নিয়ে গেছেন অমৃতের বাণী। প্রাচ্যের কানে শুনিয়েছেন আলস্য ত্যাগের আহ্বান। পাশ্চাত্যকে দিয়েছেন ধর্মের প্রাচ্যকে কর্মের মন্ত্র। দেশকে জেনেছেন, বইয়ের পাতায় নয়, মানচিত্রের বিচিত্র রঙের হিজিবিজিতে নয়। পায়ে হেঁটে, এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তর পর্যন্ত মহামানবের সাগরতীরে ঘুরে বেড়িয়েছেন এক মহত্তম মানব। রাজার প্রাসাদ থেকে পর্ণকুটীর পর্যন্ত; শিক্ষিত শ্রেষ্ঠ থেকে অশিক্ষিত ইতরদের মধ্যে; দ্বিজোত্তম থেকে বর্ণাধম,—সকলের কাছে গেছেন ভারতবর্ষকে জানতে। জ্ঞানে জেনেছেন, ধ্যানে জেনেছেন; ধনে জেনেছেন, নির্ধনে জেনেছেন, বিজ্ঞানে জেনেছেন, গানে জেনেছেন; প্রাণে জেনেছেন সুখদা মোক্ষদা মাতৃভূমি; মোক্ষভূমি, কবির আর প্রেমীর, ধ্যানী ও কর্মীর, জ্ঞানী ও বিজ্ঞানীর এই ভূমিকে,—কিন্তু সবার উপরে, সবার 'পরে ভূমির নয়।

যে ভারত, ভূমার যে ভারতভূমি তাঁকেই জেনেছেন বিবেকানন্দ। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য দুই ভূমিকেই জেনেছেন বলেই, ভারতকে ডেকে বলতে পেরেছেন, হে ভারত ভুলিও না ··! ভারতবর্ষকে, অনাদিকালের ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষকে তিনি তার আদর্শ বিস্মৃত হতে বারণ করেছেন। সীতা-সাবিত্রী-দময়ন্তীকে না ভুলতে বলেছেন; কারণ তাঁরাই ভারতীয়াদের আদর্শ। পাশ্চাত্য দেশকে নেড়েচেড়ে ঘেঁটেঘুঁটে ওলটপালট করে দেখে এসে বলেছেন বিবেকানন্দ যে পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে বর্তমান ভারতের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শক্তর চেয়ে অনেক কঠিন এই নিরাসক্ত সন্ন্যাসীর মধ্যেই শেষবারের মতো, অশেষবারের মতো জ্বলে উঠেছে ভারতাত্মার জ্যোতির্দীপ্ত জয়বাণী। ভারতবর্ষের পথ আর পাশ্চাত্যের পাথেয় সম্বল করে হওয়া যায় না পার। কারণ ক্ষুরের চেয়ে দুর্গম এই পথ চলেছে মানুষকে নিয়ে ভূমি থেকে ভূমায়; অন্ধকার থেকে আলোয়। দুঃখের বন্ধুর যে পথে গেছে মৃত্যুহীন আত্মার সারথ্যে মরদেহের রথ যে পথ ধরে গিয়ে পৌঁছেছে মোক্ষের দ্বারপ্রান্তে। এই পথেই বার-বার দেখা দিয়েছেন তাঁরা যাঁদের শক্তি সাধনার মধ্যে দিয়ে নিরাসক্তির আরাধনা। বুদ্ধির ক্ষেত্র থেকে বোধির ক্ষেত্রে নিত্য বিরাজ সেই ভগবানের দূতেরা বার-বার বলেছেন: ভূমিতে সুখ নেই; সুখ ভূমায়!

বুদ্ধির বিচারে রাম তাই ভিখারী রাঘব; বোধির আলোকে শ্রীরাম হচ্ছেন, 'কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক'। স্ত্রী-স্বাধীনতার ঝাণ্ডাধারী-দের দৃষ্টিতে সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী নয় আদর্শ। কারণ তারা স্বামীকে পরিত্যাগ করেনি; আদালতে মামলা রুজু করেনি; বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা! অনায়াসে এ মামলা করা যেত, কারণ নববিবাহিতাকে বনে যেতে বাধ্য করা পিতার কথা রাখতে এর চেয়ে ক্রুয়েলটি আর কি হতে পারে 'উওম্যান ইম্যান-সিপেসানের মানদণ্ডে'! কিন্তু স্ত্রী যে কেবল স্ত্রীলোক মাত্র নয়; সহধর্মিণীও সে,—এ বার্তা ভুলবে কি করে জন্মমুহূর্তে বলি প্রদত্ত যে 'ভারত'-এর কানে

এই বিবেক ও আনন্দযুক্ত অবিনশ্বর বাণী স্মরণের অতীত কাল থেকে বারম্বার উচ্চারিত যে, সুখের জন্যে বিবাহ নয়।

বিবেকানন্দ এই চিরন্তন ভারতের বাণী মূর্তি ; আর কাশী সেই জন্মমৃত্যুর অতীত ভারতাত্মার স্থূল প্রকাশ।

এক হিসেবে এই কাশীর চেয়ে দুর্গম, কাশীর চেয়ে রহস্যাচ্ছন্ন আর কিছু নেই ভারতভূমিতে। কাশীর বহিরঙ্গে পেঁছিতে, ট্রেনে করে একটা রাত ; উড়োজাহাজে গেলে কয়েক ঘণ্টা। কিন্তু কাশীঃ অন্তরের অন্তঃপুরে পেঁছিতে কোটি বছরও কিছুই না! কোটিকে গোটিক, ভাগ্যবান কেউ কাশীতে সেই ভারতাত্মাকে প্রত্যক্ষ করে। কাশীর ইতিহাস,—তার ঘাটে, তার আরতির আলোয়, শংখ-ঘণ্টা-ধ্বনিতে, ধর্মের ষণ্ডের সঙ্গে অধর্মের পাষণ্ডের গলাগলি করা অসংখ্য অন্ধকার গলিতে শুধু লেখা নেই ; কাশীর ইতিহাস সেই কোটিকে গোটিক যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন অপ্রত্যক্ষকে, যাঁরা স্পর্শ করেছেন স্পর্শের অতীতকে, অজরা, অমরা অবাঙ্‌মানসগোচরের দিব্যানুভূতিতে যাঁরা চিরদীপ্ত তাঁদের ইতিহাসই ভারতাত্মা কাশীর ইতিবৃত্ত।

'কোটিকে গোটিক' এমন একজনের কথাই আজ বলতে বসেছি যাঁর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে কাশীর জীবনে তাঁর জীবন এবং তাঁর জীবনে কাশীর জীবন অবিচ্ছেদ্য যুক্ত। তিনি প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বিজয়কৃষ্ণের প্রথম জীবন, রবীন্দ্রনাথের সেই গান: দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে—।

শুধু বিজয়কৃষ্ণ কেন ; সব সাধকেরই প্রথম জীবন কেঁদে ওঠে রবীন্দ্রনাথের কথায়: আমার সুরগুলি পায় চরণ আমি পাইনে তোমারে। ঠাকুর কেঁদেছিলেন, রামপ্রসাদকে দেখা দিলি, আমাকে দেখা দিবি না মা?—বলে ; বালকের বেশে নবদূর্বাদলশ্যাম শ্রীরাম যখন 'সকল শ্রীরাম অবতারা' বলে, প্রভুর জন্যে চন্দন-ঘর্ষণরত তুলসীদাসকে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যান তখন তুলসীও কেঁদে ওঠেন ; সেই কান্না গাঁথা আছে কাব্যের অক্ষরে ; শ্লোকের হীরা-পান্নায় তুলসীদাস চন্দন ঘসৈ তিলক দেই রঘুবীর !

অনন্তের জন্যে অন্তের, অসীমের জন্যে সীমার, মুক্তের জন্যে বদ্ধের কান্নাই বিজয়কৃষ্ণের জীবন ও বাণী।

সেই আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন এই এক মুক্তিপাগল ভক্তিসিন্ধ,—যে আলো অমরার ; যে আলো অধরার। লৌকিক জগতে অলৌকিক শক্তিরা আসেন দিব্য কর্তব্যের কারণে। বিজ্ঞান বলে বিরাট পুরুষেরা পৃথিবীর নানা প্রান্তে আসেন তখনই যখন তাঁদের ঐতিহাসিক প্রয়োজন থাকে। বিজয়কৃষ্ণ যখন বঙ্গদেশে আবির্ভূত হন তখন একটি নতুন আন্দোলনের জন্ম ও জয়যাত্রারম্ভ হয়েছে যার নাম ব্রাহ্মধর্ম। উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের ঢেউ যখন ভাসিয়ে নিয়ে যাবার মতো করেছে ভারতীয় সাধনাকে

তখন শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছেন দক্ষিণেশ্বরে হিন্দুধর্মের কেতন শূন্যে ওড়াতে নতুন করে। আর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন রামমোহন প্রদর্শিত পথে চালনা করছেন ভারতীয় সত্য দর্শনের আর একটি বিজয়রথ যার বাণী হচ্ছে: 'বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্যধর্ম'।

প্রতীচ্যের সঙ্গে প্রাচ্যের সাক্ষাৎ সংঘর্ষে ধর্মজগতে উন্মাদনা এসেছিল। এসেছিল উন্মত্ততাও! একদল উচ্চ মধ্যবিত্ত মানুষ বিদেশী শিক্ষাগুরুর প্রভাবে মদ্য ও গোমাংস আর ইংরেজীতে স্বপ্ন দেখার পথ ধরে উঠল গীর্জায়। তারা হলো খৃষ্টান। যা কিছু সাহেবের তাই উত্তম বলে গ্রহণ করল কিছু মোসাহেবের দল। ঠিক সেই মুহূর্তে প্রয়োজন ছিলো এমন একজনের যিনি কেবল ৺কালীর কথা শোনাতে পারেন যে তাই নয়, যিনি দর্শন করাবার ক্ষমতা রাখেন ৺কালীকে। সেই এক জনই, দিব্যানুভূতির প্রত্যক্ষ পরিচয় প্রদীপ্ত পুণ্যবান শ্রীরামকৃষ্ণ। এরই মাঝে তরঙ্গ-সংঘাতে দুলে উঠলো আর একটি দ্যুতি যার নাম রামমোহন। যাঁর সত্যানুসন্ধান বৃত্তি প্রতিমার মধ্যে খুঁজে পেল না ঈশ্বরকে, কিন্তু বেদান্তের মধ্যে খুঁজে পেল তাঁকে জ্যোতির্ময় নিরাকার যিনিই একমাত্র সৎ যিনি সত্য।

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী এই আন্দোলনের সব চেয়ে বিচিত্র প্রতিক্রিয়া।

বিদেশী পর্যটকমাত্রই যে ভারতকে বিকৃত দৃষ্টিতে দেখেছেন, তা নয়। ম্যারিকার সব চেয়ে ম্যারিকান লেখক মার্ক টোয়েন বিদেশী বিকৃতদৃষ্টি পর্যটকদের মধ্যে উজ্জ্বল ব্যতিক্রম। ভারতবর্ষে এসেছিলেন এই অশ্রুসিক্ত হাস্যরসের অফুরন্ত নির্ঝর; গভীর বেদনার রঙে রাঙা যাঁর সুগভীর আনন্দের রামধনু সাহিত্যের আকাশে চিরন্তন মহিমায় বারে বারে দেখা দিয়েছে সাহিত্যের সেই ট্রাজিক কমিডিকার মার্ক টোয়েন এসেছিলেন মহামানবের সাগরতীরে, পৃথিবী পর্যটনের পথে! তখনকার ইংরেজী কাগজ এই তরবারির চেয়ে তীক্ষ্ণ কলমের অধিকারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন; ভারতবর্ষ দেখবার পর ভারতবর্ষের কে বা কি তাঁকে আশ্চর্য করেছে অভিভূত করেছে সব চেয়ে বেশী তারই খবর করতে। বন্ধুকৃত্য করতে বদ্ধপরিকর, ঋণগ্রস্ত মার্ক টোয়েন জীবনের অপরাহ্ণে বেরিয়েছেন তখন দেশে দেশে বক্তৃতা দিয়ে উপার্জন করতে; ঋণমুক্ত হতে। ব্যঙ্গের ছদ্মবেশে মানুষের প্রতি সীমাহীন সমবেদনার উৎস এই মানুষটির কাছে নতুন কিছু শোনা যাবে ভারতবর্ষ সম্পর্কে এই আশাতেই দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি গিয়েছিল যাঁর কাছে তিনি রাজার বিদূষক নন; বিদূষকের রাজা। কৌতুকোচ্ছল বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া মাখানো দুটি চোখে সেদিন যা পরমাশ্চর্য বলে মনে হয়েছিল তা ভূস্বর্গ কাশ্মীরের হ্রদে নৌকা-বিহার নয়; নয় পাথরের বুকে প্রেমের কবিতা তাজমহল। একটি উলঙ্গ মানুষ,—এই নগ্ন সত্যের উদ্ঘাটনকারী প্রতিভার কাছে প্রতিভাত হয়েছিল ভারতবর্ষের পরমাশ্চর্য। পরম পবিত্র। পূত এক অভিজ্ঞতা বলে।

সেই আকাশ-গঙ্গার মতো নির্মম নগ্ন পরমাশ্চর্য ভারতীয় অভিজ্ঞতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় কাশীতেই ; যাঁর সন্ন্যাস-নাম : ভাস্করানন্দ সরস্বতী।

আমি আগে বলেছি যে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর কথা না বললে কাশীকাণ্ড অসম্পূর্ণ থাকে ; এখন বলছি আরেক জনের কথা যাঁর কথা না বললেও কাশীকাণ্ড সম্পূর্ণ হয় না। তিনিই বিদেশী পর্যটকের বিস্ময়। ভাস্করানন্দ স্বামী। কাশীর কথা অনেকের কথাই ; আবার তার মধ্যে বিশেষ যাঁদের কথা এঁরা দুজনই তাঁদের অন্যতম।

এবং কাশীতে এই দুই সিন্ধুগামী নদের সাক্ষাৎ হয়েছে ; জন্ম নিয়েছে সেই মুহূর্তে জীবন গঙ্গা-যমুনার প্রয়াগ। যাঁরা সেদিন এই সাক্ষাতের সময়ে উপস্থিত ছিলেন, সেই সৌভাগ্যবানদের প্রয়াগের পুণ্যবারিতে অবগাহন সার্থক হয়েছে তন্দণ্ডেই।

এই দুজনের কথাই এখন বলব।

॥ কুড়ি ॥

দূরের বন থেকে দুরন্ত হাওয়ায় ভেসে আসে মাতাল করা সুবাস। মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগ জানে না যে দূরের নয় ; নিকটের। নিজের সঙ্গেই সে বহন করছে সেই অনঙ্গকে। সুরাভমাখা নাভিদেশ তার ; সবাই জানে। জানে না শুধু যে তার ধারক, সে। মানুষ এই মৃগনাভির গন্ধে মাতাল মৃগের মতোই 'খ্যাপা ; খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর'। সেই পাথর যার স্পর্শে তামা হয়ে যায় সোনা, রত্নাকর হয় বাল্মীকি, জগাই-মাধাই হয় উদ্ধার ; তার উৎস যে মানুষের মধ্যে থেকেই হয় উৎসারিত, নির্বোধ মানুষ তার খবর রাখে না। তাই সে বনে যায়, একমনে বসে যায় গাছের তলায়, পথের ধুলায় মধ্যদিনে যখন গান বন্ধ করে পাখি তখন যে রাখালের বেণু বাজে তার দেখা পাবে বলে। সাধনায় গলে যায় পাষাণ ; দেখা দেন কখনও শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি ; কখনও হিরণ্যকশিপুবধের কারণে নৃসিংহ মূর্তি। কখনও নৃমুণ্ডমালিনী নগ্না ; ভয়ংকর বেশে অভয়ংকরের ধ্যানমগ্না। দেখবার পর ধ্যানভঙ্গ হয় সাধকের। সে বলে একি, একে তো অনন্ত কাল ধরে বুকের মধ্যে দেখে আসছি। তবে কি মানুষের মনই সেই অবাঙ্মানসগোচরের মন্দির !

তা-ই। সত্যই তা-ই। এই একমাত্র সত্য।

যিনি অসীম তিনিই সসীম। যিনি অনন্ত তিনিই অন্ত। যিনি নশ্বর তিনিই অবিনশ্বর। যিনি মর তিনি অমর। যিনি পরমাত্মা তিনিই জীবাত্মা। উপনিষদ তাঁকে প্রত্যক্ষ করে বলছে, পরমাত্মা আর জীবাত্মা, দুটি পাখির

মতো। ডানায়-ডানায় যুক্ত তাদের একজন পিপ্পল আস্বাদ করছে ; অনাহারী আরেকজন অনাসক্ত, শুধু তার সাক্ষী। মানুষের মধ্যেও একজন চাকরি করছে মামলা করছে, বাড়ি করছে, গাড়ি করছে ; ছেলে চাকরি পেলে ডিনার দিচ্ছে ; ছেলের কিছু হলে মাথা খারাপ করছে ভেবে ভেবে। আরেক জন সে কিছুই করছে না। সহস্র লোকের ভীড়ের মধ্যে দেবালয়ে অনালোকিত অন্ধকারে অনন্ত কাল ধরে যিনি অপেক্ষা করছেন মূর্তির মধ্যে মূর্ত সেই দেবাদিদেবের মতো মানুষের মধ্যে সেই আর একজন ওই একজনের মতোই অনিত্যের মধ্যে নিত্য। যিনি নূতন নন ? নন পুরাতন। যিনি অপরিবর্তনীয় সেই অসীমের কৌতুক এই সসীম।

সকল কালের সকল মানুষের মধ্যে নয় কেবল ; জড়ে এবং চেতনে, পদার্থে এবং অপদার্থে জীবাত্মার বাস এবং পরমাত্মার উপবাস কেবল প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁরাই যাঁরা বলতে পেরেছেন সময়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টির ঊষাকালে : নান্যঃ পন্হা বিদ্যতে অয়নায় !

লোকে বলে, স্ত্রীলোকেও বলে : প্রমাণ চাই ; প্রমাণ দাও !

কি প্রমাণ চাও তুমি ? আর কি প্রমাণ দেবো অন্ধকে যে আশ্বিনের নিঃসীম নিরুপম নীলে, মৃগনাভির গন্ধে মাতাল অনিলে প্রমাণ মেলে না তাঁর ? কি প্রমাণ পেলে না তাঁর ? কি প্রমাণ দেবো তাকে, যে হতভাগ্য মহামারী, দুর্ভিক্ষ, রাষ্ট্রবিপ্লবে তাকিয়ে দেখল না সেই অভয়ংকরকে ভয়ংকরবেশে ? প্রতি অণুতে সে পরমকে দেখল না, পরমাণু তার বিপজ্জনক বোমা আর কি !

এই লোকেই, এই স্ত্রী-লোকেই ডাক্তারের কাছে প্রমাণ চায় না। ডিগ্রি আর স্টেথিসকোপ দেখেই তুলে দেয় ছেলের জীবনমরণ তার হাতে। অসুখ সারলে বলে ধন্বন্তরী ; অসুখ না সারলে বলে, ভগবান কি নিষ্ঠুর। এরাই ভক্তের কপালে চন্দনের তিলক দেখলে বলে ভণ্ড। ডাক্তার সারাতে না পারলেও তার ফি দেয় ; কিন্তু দেবার পরেও যদি পুত্র না বাঁচে তাহলেই কালাপাহাড়ের মতোই করতে চায় সব লণ্ডভণ্ড !

এইসব ভাগ্যনিহতেরা জানে না যে, যে বাঁচাতেও পারে না, মারতেও পারে না, সে-ই হচ্ছে ধন্বন্তরী, যে বাঁচায় এবং মারে সে-ই হচ্ছে শ্রীহরি

চারশো ভোল্ট মাত্র বিদ্যুৎ-বিচ্ছুরণ যেখানে, সেখানে মড়ার মাথা-আঁকা সতর্কবাণী : সাবধান ! ছুঁইলেই মৃত্যু ! ইলেকট্রিক মিস্ত্রী হাতে নন-কণ্ডাক্টর বর্ম পরে ; কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে কাজ করে ভয়ে ভয়ে। অথচ মানবদেহ যা সেই দেবালয়ের প্রদীপ, সেই দুর্লভ দেহকে মানব গঠিত করছে না অনির্বচনীয়ের আবির্ভাবের জন্যে। বরং বলছে পণ্ডিত মূর্খের দল, যে যিনি দেহাতীত, দেহের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কি ? না। যিনি দেহাতীত, তিনি দেহেই স্থিত আবার। এবং এই দেহ কেবল রতি-র জন্যে নয় ; মানবদেহ অনির্বচনীয়ের আরতির দেহকে না বাঁধলে দেহাতীতের সে তার যে বাজে না ! রমণের..

আস্বাদের চেয়ে পরার্ধগুণ শিহরন যাতে সেই রমণীয়ের আস্বাদ অযোগ্য দেহে বহন করবে কে ?

বিবেকানন্দ যখন নরেন, তখন রামকৃষ্ণ-স্পর্শে কেঁদে উঠেছিলেন তিনি : আমার মা আছে ; ভাই আছে। সংসার আছে। এ কি করলে তুমি ? রামকৃষ্ণ সংবরণ করেন শক্তি মুহূর্তে ; সেই শক্তি যা নরদেহ সহ্য করতে পারে না। পারে কেবল নরেন্দ্রর বীর্য-অক্ষয় দেহ বরণ করতে ; বরণ করতে পারে যে মনোহরণকে !

এবং তখনই পারে কেবল, যখন সে দেহ হয় নিঃসন্দেহ-নিষ্পাপ !

সেই লৌকিক জগতে অলৌকিক বলি আমরা যাকে, আমরা যারা কেউ নানা মত, নানা পথভ্রান্ত, জ্ঞান-বিজ্ঞান অনুমান প্রমাণ-মান-অভিমান-তর্ক-বিচার বিশ্বাস-অবিশ্বাসের গোলকধাঁধার উদ্‌ভ্রান্ত তাদের প্রয়োজনে তিনি আসেন না। তিনি আসেন তাঁর নিজের প্রয়োজনে। কংসের যখন সময় হয়, আমাদের নির্বোধ বিচারে যা দুঃসময় তখন মেলে কৃষ্ণের দর্শন! নৃসিংহমূর্তিতে ভয়ংকরের বেশে হয় অভয়ংকরের আগমন। পার্থ যখন গাণ্ডীব ফেলে দেন মিথ্যা অহংকারে, তখন হুংকার দেন পার্থসারথি! মামেকং শরণং ব্রজ! দুঃখের বরষায় চক্ষের জল নামলে আসেন তিনি ; বক্ষের দরজায় থামে বন্ধুর রথ। দ্রোপদী যতক্ষণ কাপড়ের প্রান্ত চেপে ধরে আছে ততক্ষণ নয় ; যতক্ষণ না ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বলছে কৃষ্ণসখা হা কৃষ্ণ! ততক্ষণ দেখা নেই শঙ্খচক্রগদা-পদ্মপাণির !

আবার 'পরধর্মো ভয়াবহ স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়'। বলবার জন্যে এই পৃথিবীর পূর্বপ্রান্তে তাঁর উদয় দেখেছি আবার কতবার ! রামের বেশে আসেন যিনি রাবণ-উদ্ধারে ; নৃসিংহের বেশে হিরণ্যকশিপু-মুক্তির কারণে ; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য হয়ে আসেন যিনি চৈতন্য দিতে অচৈতন্যকে, তিনিই আসেন আবার রামকৃষ্ণ হয়ে, কৃষ্ণের কথা রাখতে, 'সম্ভবামি যুগে যুগে' ! যুগে যুগে তাই সম্ভব হয় অসম্ভব, অসম্ভব হয় সম্ভব ! যখন মনে হয় বৌদ্ধধর্ম ভাসিয়ে দিয়ে যাবে ভারতবর্ষকে ; আসমুদ্র-হিমাচল যখন কেঁপে ওঠে, কেঁদে উঠে : বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। তখন আসেন মুণ্ডিতমস্তক মহাযোগী দাক্ষিণাত্যের দক্ষিণপাণিতে নিয়ে অদ্বৈত ঐশ্বর্য, আসেন শংকর ! চির পুরাতন মন্ত্র চির নূতন কণ্ঠে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষের পথে প্রান্তে ; কিং করোমি ক্ব গচ্ছামি, কিং গৃহ্ণামি ত্যজামি কিম্‌।

ঠিক এমনই আবার আরেক দিন যখন মনে হয়েছিলো খৃষ্টধর্ম ভাসিয়ে নিয়ে যাবে ভারতভূমি, যখন মনে হয়েছিলো, হিতবাদের অহিত, জড়বাদের অবিশ্বাস নড়িয়ে দেবে ভারতের বিশ্বাসের ভিতকে তখন এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে রাম এবং

কৃষ্ণ একাধারে যিনি রামকৃষ্ণ শুধু এই বিবেকানন্দময় বাণী গুঞ্জরন করতে কুম্ভ-কর্ণে যে ভারতবর্ষ কেবল ভূমির নয় ; ভূমার।

বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ড হয়ে দেখা দিলে রাত্রি প্রভাত হবার আগেই ভারতের বিশ্বাসের প্রভাত আবার অবিশ্বাসের অমারাত্র হয়ে দিলো দেখা! শ্বেতদ্বীপ থেকে যারা এলো শাসনের নামে শোষণ করতে তারা আমাদের শিক্ষা, সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং ধর্মকে আঘাত করলো। অল্প ব্যয়ে, সামান্য জঙ্গীশক্তি সম্বল করে রাজত্ব করবে বলে এত বিরাট দেশের ওপর, তারা দেখলো সব চেয়ে সহজ রাস্তা হচ্ছে ভারতীয়দের মনে নিজের দেশ সম্পর্ক বিদ্বেষ জাগানো। ইংরেজী চাল—সাহেবদের মোসাহেব পরিণত করে তুলল দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষাকে। আশার ছলনে ভুলে ভারত হলো 'ক্যাপটিভ লেডি'—সে প্রকাশ্যে বললো : ইংরেজীতে বলো, ইংরেজীতে লেখো, স্বপ্ন দেখো যদি, তাও দেখো ইংরেজীতে।

স্বপ্নের নয় ; ঊনবিংশ শতাব্দী স্বপ্নের যত তার চেয়ে অনেক বেশী দুঃস্বপ্নের কাল!

সেই সময়ে, সেই দুঃসময়েই এলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। একা নয় ; একের পর এক এলেন তাঁরা। রামকৃষ্ণ থেকে বিজয়কৃষ্ণ সেই, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'র প্রতিশ্রুতি রাখতেই, পরিশ্রুত রাখতে স্মরণের অতীত কাল থেকে অবিস্মরণীয় অবিনাশী বিশ্বাস : নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়!

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে ঢেউ এসেছিলো ; নবজাগরণের ঢেউ ; পুরাতনের সঙ্গে নবীনের, প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের, ভক্তির সঙ্গে যুক্তির ভাববিরোধের যুগসন্ধিক্ষণে এসেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী। সন্ধি করতে আসেননি ; এসেছিলেন যুদ্ধ করতে! মিথ্যার সঙ্গে যুদ্ধ ; যুদ্ধ কুসংস্কারের সঙ্গে! কুরুক্ষেত্রযুদ্ধ-বিজয়ী কৃষ্ণের মতোই এ যুদ্ধেও জয়লাভ করেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ!

কি পরিমাণ যুদ্ধ তাঁকে সেদিনকার সমাজের সঙ্গে করতে হয়েছিলো ; শুধু সমাজের সঙ্গে কেন, আত্মীয়ের সঙ্গে, 'আত্ম'-র সঙ্গেও। তারই পরিচয়ে এই দিব্যজীবন, এই দীপ্ত, উদ্দীপ্ত জীবন আদ্যন্ত প্রদীপ্ত।

ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত বিজয়কৃষ্ণ উপবীত ত্যাগ করেন এক সময়ে। আত্মীয়-পরিজনরাও তাঁকে ত্যাগ করেন প্রায়। কিন্তু তাতে বিচলিত হবার পাত্র নন বিজয়কৃষ্ণ। কিন্তু মাঝে মাঝে মূর্তিতে অবিশ্বাসীর মনে নতুন করে বিশ্বাসের জন্ম দিতে যখন স্বয়ং গৃহদেবতা শ্যামসুন্দর আবির্ভূত হন সম্মুখে তখনও কোন্ ধর্ম, কোন্ শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে অস্বীকার করেন তাঁকে। এবং শ্যামসুন্দরও আশ্চর্য সুন্দর! তিনি বেছে বেছে তাকেই কি দেখা দেবেন যে তাঁর দেখা পেলেও বলবে, এ দেখা ঠিক দেখা নয়, তার সঙ্গেই কি যত কথা তাঁর, যে তাঁর কথা শুনেও বলবে, এ শোনা খাঁটি সোনা নয়!

সারাদিন তৃষ্ণায় জল দেয়নি শ্যামসুন্দরকে। সেই তৃষ্ণার বার্তা স্বয়ং

শ্যামসুন্দর তোলেন বিজয়কৃষ্ণের কানে। বিজয়কৃষ্ণ যখন সে কথা বাড়ির কর্ত্রীর কানে তুললেন, তখন তিনিও প্রথমে অবিশ্বাস করেন ; পরে আবিষ্কার করেন বিজয়কৃষ্ণের কানে শ্যামসুন্দরের অভিযোগ সত্য !

তাই পরবর্তী জীবনে একদিন কাশীতে ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণকে তাঁর গুরুদেব পরমহংসজী বলেছিলেন : এসব খোলস সময় হলেই খসে যাবে !

খসে গিয়েছিলো বিজয়কৃষ্ণের অলৌকিকে অবিশ্বাস ! ধসে গিয়েছিলো যুক্তির অচল পাহাড় ; ভক্তির যুক্তধারা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিলো অহং-এর অচলায়তনকে। ঈশ্বর-নির্দিষ্ট পুরুষ বহু মত, বহু পথের শেষে যেখানে এসে পৌঁছলেন, সেখানে ব্রাহ্ম বা হিন্দু নেই ; আছে কেবল ব্রহ্ম। নদী যত পথেই ঘুরে আসুক তার মৃত্যু, তার মুক্তি ওই সিন্ধুতেই। বিজয়কৃষ্ণ হিন্দু না ব্রাহ্ম কি ছিলেন, কোন্‌টা কত দিন ছিলেন তার চুলচেরা হিসাব জানি না ; জানি কেবল, তিনিও সেই নদী যার জীবনসিন্ধু হচ্ছে ব্রহ্ম !

ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ ; বিশ্বাস করেন না প্রতিমায়। মূর্তি ধরে তবু এসে দাঁড়ান শ্যামসুন্দর ; বলেন : আমায় অলংকার গড়িয়ে দিতে বল তোর কাকীকে। তার কাছে টাকা আছে। অলংকার উপলক্ষ্য মাত্র ; লক্ষ্য— বিজয়ের অহংকার চূর্ণ করা ! অবিশ্বাসের অহংকার। বিজয় বলেন : আমাকে কেন ? কাকীকেই বলো না কেন ? শ্যামসুন্দর হাসেন : সেই ক্ষমাসুন্দর হাসি : তাকেও বলেছি কাল ; জিজ্ঞেস কর কাকীকে। ক'টা টাকা লুকানো ছিলো কাকীমার কাছে। লুকোনো রইলো না সেই অর্থ ; তাই দিয়ে তৈরী হলো শ্যামসুন্দরের সোনার চুড়ো ; কাকীমার লুকোনো সামান্য টাকা নয় ; বিজয়কৃষ্ণের মধ্যে লুকোনো অসামান্য ঐশ্বর্য,—তাকেই বাইরে টানছেন শ্যামসুন্দর। সোনার চুড় পরতে চাইছেন না শুধু ; বিজয়-কৃষ্ণকে সেই বিশ্বাসের স্বর্ণচূড়ায় নিয়ে যেতে চাইছেন তুলে ; দেখাতে চাইছেন চোখ খুলে দিয়ে যে নিখিল বিশ্ব এক বিশ্বনাথের প্রতিমা !

বিজয়ের দিক্-বিজয়ের সেই শুরু ; সেই দিগ্বিজয় যার শুরু আছে ! সারা নেই !

নবদ্বীপে জ্বলে ওঠে নতুন দীপ। উপবীত-ত্যাগী বিজয়কৃষ্ণকে দেখেন চৈতন্যদাস। বলেন : তোমার ললাটে তিলক আর গলায় কণ্ঠি দেখছি অদূর ভবিষ্যতে !

ঠিকই দেখা যায় ; ঠিকই দেখেছেন চৈতন্যসিদ্ধ মহামানব। স্থূল দুই চোখে দেখলে, শিব তো শ্মশানচারী, নেশাসক্ত, ভিখারী মাত্র। কিন্তু তৃতীয় দৃষ্টি খুলে গেছে যার সে তো দেখবেই সেই জটা, সৃষ্টির প্রাণগঙ্গাকে যেখানে ধরে রেখেছেন গঙ্গাধর ! তার দৃষ্টি এড়াবে কি করে উমানাথ, সূক্ষ্ম দৃষ্টির সামনে যার আবির্ভূত সেই ত্রিশূল—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের পরমাশ্চর্য প্রতীক !

প্রতিমার বিশ্বাস আর অবিশ্বাসে এসে যায় কি, অপরূপের আলো লেগেছে যাঁর চোখের কালোয় তাঁর কলমে তো উচ্চারিত হবেই : 'হে ভয়ঙ্কর ! ওহে শঙ্কর হে প্রলয়ঙ্কর !'

উপবীত নেই বিজয়গাত্রে ; বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, শুনে, কালনার ভগবানদাসজী হাসেন : শ্রীঅদ্বৈতেরও বালাই ছিলো না উপবীতের ; শ্রীঅদ্বৈতের সন্তানের নেতৃত্ব যায়নি তাতে ; ব্রাহ্ম সমাজেই গোঁসাই আমার সেই আচার্যপদেই অসীন !

তবু বিদ্রূপ করে কেউ ; জুতো জামা-পরা আধুনিক আচার্য ! চরমের করুণা-প্রাপ্ত, পরমভাগবত, ভগবানের দাস ভগবানদাসের চোখে এবার অশ্রুর মুক্তো টলমল করে : নিজের লজ্জা নিজেকে করতে হয়েছে যে গোঁসাইপ্রভুর,— এর লজ্জা তো আমাদের ভাই – ['ভারতের সাধক', তৃতীয় খণ্ড] ।

চৈতন্যদাস প্রথমে ; তারপর এই ভগবানদাস। এঁদের ক'টি কথায় ঘটে যায় সেই অন্তর্বিপ্লব ; কোটি কথায় যা ঘটেনি এতকাল। চাতক শুনতে পায়, মেঘের গুরু-গুরু !

'বৈশাখের উদাসী আকাশে অকস্মাৎ আসে ভৈরবের হাঁক' ।

শান-বাঁধানো কলকাতার পাষাণ-হৃদয়ও গলে যায় বিজয়কৃষ্ণের পায়ের তলায়। ছেঁড়া চটি সারাতে দিয়েছিলেন একদিন এক মুচীকে ; মেছোবাজার স্ট্রীটে ; জুতো সেলাই হয়ে গেলে বিজয়কৃষ্ণ পয়সা বার করে দিলেন। তার থেকে দুটি পয়সা নিয়ে মুচী গুটিয়ে ফেললো তার ব্যবসার সাজ-সরঞ্জাম ; তারপর গুটি গুটি চললো গঙ্গার দিকে। বিজয়কৃষ্ণ অনুসরণ করতে করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন সেই মুচী জাতিতে ব্রাহ্মণ ; মস্ত মহান্ত ! রহস্য অবগত হলেন সেই চর্মকর্মেরত অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে। মহান্ত বললেন : অতিথিসেবার আগে একদিন খেয়ে ফেলেছিলাম বলে, গুরু বলেছিলেন তুই কিসের সাধু ! তুই চামার— ! গুরুবাক্য যাতে মিথ্যা না হয় তাই আজও আমি চামারবৃত্তি ত্যাগ করিনি !

সাধু নাগ মশায়কে ঠিক এমনই একদিন বলেছিলেন : কাজকর্ম ছেড়ে দিলি ; এখন ন্যাংটো হয়ে মরা ব্যাং ধরে খা ! পিতৃসত্য পালনের জন্যে শ্রীরামচন্দ্র গিয়েছিলেন বনে ; পিতৃবাক্য পালন করতে সাধু নাগ মশাই মুহূর্তের মধ্যে বস্ত্রত্যাগ করেন ; উঠোনের ওপর পড়ে থাকা মরা ব্যাং মুখে দেন নিজের !

গুরু-তিরস্কারের মান রাখতে অভিমান ত্যাগ করেন যে চামার তার চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ আর কে ?

তবু গুরুতে বিশ্বাস হয় না জগদ্‌গুরুর দর্শনাভিলাষী বিজয়কৃষ্ণর। জগদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে হলে গুরু চাই,—এ কথা তাঁকে বলেন কলকাতার রাস্তায় আরেক সাধু ; গুরু হচ্ছে সেই ভিৎ যার ওপর বিশ্বাসের ভিত্তি গড়ে না উঠলে কেউ জগদ্‌গুরুর হতে পারে না প্রত্যক্ষকার।

সেই গুরুর অপেক্ষায় ঘুরে বেড়ান বিজয়কৃষ্ণ! শ্রীরামপদ স্পর্শের জন্যে প্রতীক্ষা করেন অহল্যা!

ঘুরতে ঘুরতে এক সময়ে যেতেই হয় কাশীতে। বিশ্বপরিক্রমার পরে যেতে হয় বিশ্বনাথ-এর পরিক্রমায়। বিশ্বনাথের ভূমি বারাণসী; বিশ্বাসের জ্বলন্ত পটভূমিকা! কাশীতে তখন দুই বিশ্বনাথ; মন্দিরে অচল আর গঙ্গার ঘাটে সচল বিশ্বনাথ তৈলঙ্গস্বামী!

সেই অচল বিশ্বনাথের ভূমিতে সচল বিশ্বনাথ কালীর মন্দিরে মূত্রত্যাগ করে বলেন: গঙ্গোদকং; মা কালীর গায়ে তা ছিটিয়ে বলেন, পূজো!

মূত্রধারায় আর মুক্তধারায় ভেদ জ্ঞান লুপ্ত যেখানে সেই কাশীতে শেষ পর্যন্ত আসতেই হলো বিজয়কৃষ্ণকে; আসতে হবেই! বিশ্বের সবাইকেই আসতে হবে আজ অথবা কাল, যৌবনে কিংবা বার্ধক্যে; এ-জন্ম বা পরজন্মে জন্মমৃত্যুর এই ভূমিতে। বিশ্বের মধ্যে থেকেও যা বিশ্বের ভূমি নয়; বিশ্বাসের ভূমি, বিশ্বনাথের ভূমি।

॥ একুশ ॥

নিজের দেহখানি তুলে ধরেছেন বিজয়কৃষ্ণ বার-বার, দেবালয়ের প্রদীপ করতে হয়েছেন উন্মুখ। সেই দেহ-প্রদীপে ভক্তির তেল হয়েছে ঢালা; জ্ঞানের সলতে রয়েছে পাকানো। তবুও অন্ধকারে জ্বলেনি আলো সেই জ্যোতির্ময়ের। দুরন্ত তৃষ্ণায়, মাতালের মতো জল ভেবে মুখ থুবড়ে পড়েছেন মরীচিকায়। চোখ যায় যতদূর ধু-ধু করছে বালি আর রোদ্দুর। বালির অথৈ সমুদ্র! যাকে মনে করেছেন আলো অনেক দূর থেকে, কাছে গিয়ে দেখেছেন সে আলেয়া। ব্রহ্মোপাসনার মন্দিরে ধরে নিয়ে গেছেন সাধুকে। ব্রহ্মোপাসনা কেমন লাগলো শুধিয়েছেন তাঁকে। সাধু বলেছে: সবই সুন্দর! বেদবাণীও সেই চরমের পরম সুন্দর উক্তি! তবু বিজয়কৃষ্ণের প্রশ্ন নিরুত্তর থেকে যায়: প্রাণের অশান্তি যাবে কি সে! এই অশান্তির বিষের যন্ত্রণা কিসে যাবে বলো? সন্ন্যাসীর ব্রাহ্মপ্রশান্ত হাসি। অনন্ত গগন উদ্ভাসে সেই হাসিতে সীমাহীন বেদনার নীলাঞ্জন ছায়া আর অসীম অনন্তের রৌদ্রাভা মেলেছে—ছিটিয়ে দিচ্ছে করুণ-মধুর রামধনুর রং! হাসতে হাসতে বলে সন্ন্যাসী: গুরু ছাড়া কে করবে আর এই গুরুতর সমস্যার সমাধান? আপন গুরুকো পুছো—

গুরুকে মানেন না ব্রাহ্ম বিজয়কৃষ্ণ। জগদ্গুরু ছাড়া আর করেন না স্বীকার। সন্ন্যাসীকেও বলেন সে-কথা। বলা মাত্র আগ্নেয়গিরির সম্মুখে আবির্ভূত হয় পাবকবাণী: ইস্ ওয়াস্তে সব বিগড় গিয়া! আসমানসে ইমারৎ বনানে কোই নহি সক্তা! গুরু করনেই হোগা!

গুরু করতেই হবে তোমাকে! জগদ্‌গুরুর কাছে পৌঁছতে হবে! সুরে সুরে তালে তালে যত বাঁধো সেতার, সে তার যাবে ছিঁড়ে! গুরু-ই সেতু তোমার আর তাঁর মধ্যে বিরহের পারাপারে দেখতে না পাওয়া দুস্তর পারাবারে। ঘুড়ি উড়বে কি করে আকাশে, কেউ যদি না ধরে লাটাই?

খুলে যায় বন্ধদ্বার। অন্ধচোখে এসে পড়ে আলো; পথ আর কতদূর!

সেবারে আলেয়াকে মনে করেছিলো আলো; এবারে আবার আলো-কে সন্দেহ হয় আলেয়া বলে। সুদূর মানস-সরোবরে পেয়েছেন তাঁর ধ্যানের ধন, গুরুকে স্মরণ করলেই, শরণ নিলেই তিনি এসে পড়েন। কারণ 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্'—কেবল জগদ্‌গুরুর কথাই নয়; জগতের সমস্ত সৎ গুরুর কথাও তাই। গুরু-র উদয়েও সন্দেহের উদয় যায় না অস্ত! জিজ্ঞেস করেন বিজয়কৃষ্ণ! অণিমা, লঘিমা, শাস্ত্রোক্তি সত্য?

শিষ্যের হাত ধরে গুরু নিয়ে যান সন্দেহের অতীত লোকে। বিজয়কৃষ্ণের সদ্যলব্ধ গুরু মানস-সরোবরের পরমহংসজী তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন পাহাড়-পার দুর্গম অরণ্যে পড়ে থাকা, একটি মৃতদেহ। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলো অনড়; মৃতদেহ হলো 'অমৃত'-দেহ আবার। বিজয়কৃষ্ণ কেন সন্দেহ করেছিলেন নিঃসন্দেহকে কে জানে! কারণ বিজয়কৃষ্ণের নিজের ক্ষেত্রেই এর চেয়ে অনেক, অনেক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে গেছে; আবার অনেক ঘটনা-অঘটনের নায়ক স্বয়ং বিজয়কৃষ্ণেরই হবার পরম সৌভাগ্য হয়েছে।

বিজয়কৃষ্ণ সেদিন ঢাকায়: শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে। ঈশ্বরধ্যান-নিমগ্ন বিজয়কৃষ্ণের সামনে হঠাৎ আবির্ভূত হলেন দক্ষিণেশ্বরের সাধক। বিজয়কৃষ্ণ তখনও সন্দেহ করছেন। স্বপ্ন দেখছেন না তো? সন্দেহ নিরসনের জন্যে রামকৃষ্ণ-মূর্তিকে স্পর্শ করলেন বিজয়কৃষ্ণ; টিপে টিপে দেখলেন। না, সন্দেহ নেই; রামকৃষ্ণ-দেহেরই উপস্থিতি ঘটেছে সেখানে।

কিন্তু এই একবার কি জীবনে কত বার? বার-বার অঘটন-ঘটন- পটীয়সীর লীলা প্রত্যক্ষ করেছেন; মরদেহে অমরদেহীর লীলা। নিজেও ঘটিয়েছেন কতবার অঘটন; বাঁচিয়েছেন শিষ্যকে কত দুর্ঘটনের দুরন্ত বিপদ থেকে। যখন সাধনা করতে করতে সিদ্ধ হয়ে গেছেন প্রভুপাদ। যিনি নাকি গুরুতে বিশ্বাস করতেন না একদা সেই তিনি যখন নিজেই দীক্ষা দিচ্ছেন গুরু-চালিত হয়ে, তখন একদিন বিজয়কৃষ্ণের এক শিষ্য—মহেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁর নাম, বিজয়-নির্দেশেই কলকাতায় যান। সারাদিন রৌদ্ররুক্ষ রাজপথে ভ্রমণরত ক্লান্ত ক্ষুধিত শিষ্যের সম্বল চারিটি পয়সা। দুধ কিনে খাবেন পয়সা দিয়ে,—এমন সময় প্রার্থী এসে হাত পাতে। চারটি পয়সা, শেষ সম্বল তুলে দেন তাঁর হাতে।

ঢাকায় ফেরা মাত্র বিজয়-গুরু বলেন মহেন্দ্রনাথকে: দুধ খাবার পয়সা-চারটি প্রার্থী সাধুকে দিয়েছেন বলেই মহেন্দ্রনাথ বেঁচে গেলেন; কারণ যে দুধ তিনি খেতে যাচ্ছিলেন, সে দুধ তাঁর মৃত্যু-পীড়ার বীজ বহন করছিলো!

মহেন্দ্রনাথ বুঝলেন এ-সাধু কোন্ সাধুর নির্দেশে সেদিন হাত পেতেছিলো তাঁর কাছে ! হাত পাতেনি সেই সাধু। স্বয়ং শ্রীগুরু বিজয়কৃষ্ণ বুক পেতে দিয়েছিলেন বহুদূরে থেকেও মৃত্যুদূতের পথরোধ করতে। মৃত্যুদূত ফিরে গিয়েছিলো ভগবানের দূতকে দেখে।

এহ বাহ্য। আরও কতবার ! সতীশ কাঁপছেন কামভাবে ! যৌবনের নানা রঙের দিনে কামনার রঙীন পাখা তাঁর পুড়েছে কতবার রূপের আগুনে ; তারপর অপরূপের অনলে শোধন করছেন তাঁকে সদ্গুরু বিজয়কৃষ্ণ কেমন করে সে ঘটনা লেখা যায়। কিন্তু উপলব্ধি করা যায় না। সাধনায় অনেকদূর অগ্রসর হয়েও দেহ-বাসনায় অস্থির হন সতীশ। রমণীয়ের ধ্যানচিন্তার আসনে আসে রমণের কালচিন্তা ; উত্তেজনায় উঠে পড়েন সতীশ। অভিমানে প্রতিজ্ঞা করেন : 'আর সাধন করিব না, গোঁসাইয়ের কাছেও আর যাইব না।' সঙ্গে সঙ্গে নদীর অভিমানের উত্তরে উড্ডীন হয় সমুদ্রের সুনীল উত্তরীয়। হতাশার চরম মুহূর্তেই তো আশার আশ্চর্য আলো আকাশে জাগে। দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে ততক্ষণ নয় ; যখনই কাপড় ছেড়ে হাত তুলে দিয়েছে ওপরে, 'হা কৃষ্ণ' বলে, তখনই তো লজ্জা নিবারণ করতে বস্ত্রহরণ করেছিলো যে গোপীদের করেছিলো লজ্জাহরণ, সে আসে এবার বস্ত্রবিতরণ করতে ! রামকৃষ্ণ যখন রামপ্রসাদ যাঁর দেখা পেয়েছিলেন, দেখা না পেয়ে তুলে নেন খড়্গ,—মরবেন বলে, তখনই তো জগদম্বা ধরবেন সেই আত্মহত্যার উদ্যত হাতকে। 'আত্ম'-হত্যা থেকে 'আত্ম'-জ্ঞানে। যাঁকে খুঁজছো তুমি, 'তুমি'-ই 'সে'-ই, সাধনের রাস্তায় এসেই কেউ এ-কথা বলতে পারে না। পুঁথিতে নয়, শাস্ত্রে নয়, প্রণামে নয়, প্রাণায়ামে নয় ; রাগের উত্তর আসে অনুরাগে ! মাকে সে কাঁদায়,– বলে, হয় তোমাকে পাব, নয় তো মাকে-ই দেবো প্রাণ। চলতে চলতে, নদীর নৃত্য যখন থেমে আসে, পাথরের বুক চিরে রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুক ধনধান্যে ভরে দিয়ে, তলিয়ে দিয়ে বসুন্ধরা, অতল থেকে তুলে এনে নতুন জনপদ, তারওপরে যখন ক্লান্ত নদী বলে না আর, চলে না আর অনঙ্গ চরণ তার, তখনই সিন্ধুর ডাক আসে দুয়ার হতে অদূরে !

সতীশ যেই প্রতিজ্ঞা করেন, গোঁসায়ের কাছেও আর যাবেন না তিনি, তখনই গোঁসাই-এর ভঙ্গ হয় কঠোরতর প্রতিজ্ঞা। সতীশ কাছে আসতেই বলেন : সতীশ, আমার মাথায় একটু তেল ঘষে দাও ; সতীশের অন্তর বাহির পুড়ে যাচ্ছে আগুনে, আর গোঁসাই চাইছেন স্নিগ্ধ হতে। সন্দিগ্ধ সতীশ নিঃসন্দিগ্ধ স্বরে বললেন : না ; পারব না। হাসেন বিজয়কৃষ্ণ। সেই হাসি,—বার-বার সে হাসি হাসেন ভগবানের দূতেরা ; 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে' : সে হাসি বলে : পারব না বললে, আমি পারব কেন ?

তেল দেয় মাথায় গোঁসায়ের অনুরোধে, একান্ত অনিচ্ছায় সতীশ। আর সঙ্গে সঙ্গে সামনে আবির্ভূত হয়, যাদের পাবার ইচ্ছায় কামোন্মত্ত হয়েছিলেন

সতীশ সেই রূপসীর দল। তারা উলঙ্গ কামের স্থূল মূর্তি ধরে এসে দাঁড়ায় সতীশের সামনে। না। দাঁড়াল না। চলে যায় পাশ কাটিয়ে একের পর এক। সব তেল শুষে নিলে বিজয়কৃষ্ণের মস্তক, তিনি বলেন: তাহলে যাও।

তেল নয় খেল। সতীশের কাম শুষে নিলেন বিজয়কৃষ্ণ। গণ্ডূষে শুষে নিলেন কামনার সিন্ধু। এই খেল রাম এবং কৃষ্ণ থেকে শুরু করে রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণ এসেও সারা হয়নি। কাশী, কাঞ্চী, কোথায় এই খেলা আজও নয় অব্যাহত। ['শ্রীশ্রীসদ্‌গুরুসঙ্গ', খণ্ড ১, পৃঃ ১১৯-১২০]

রামকৃষ্ণও বলেছিলেন, কামের মুখ ঘুরিয়ে দে; কামে দেখ্ 'মা'-কে:

বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী কেবল মানুষের মধ্যে অলৌকিক লীলা দেখেননি। স্থানের মধ্যেও দেখেছিলেন; দেখিয়েছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীন বটগাছ। বৃন্দাবনের নিত্য-লীলার সাক্ষী সেই বৃক্ষ; লীলাসঙ্গী সে। সেই বৃক্ষমাহাত্ম্য বর্ণনা করতে গিয়ে মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ বলছেন: বাধাবাগে একটি গাছের নিচে একদিন বসে আছি; এমন সময় অদ্ভুত শব্দে আকৃষ্ট হয়ে দেখি, গাছ নয়, ভক্ত বৈষ্ণব দাঁড়িয়ে আছেন। বললেন, তিনি বৃক্ষরূপে আছেন এখানে অনেককাল।

কেবল বৃক্ষের মধ্যে বোধিকে নয়। কৃষ্ণের জীবের মধ্যে কৃষ্ণকে দেখেছিলেন শ্রীবিজয়কৃষ্ণ।

শান্তিপুরের সন্নিকট বাকলা। সেইখানে সংকীর্তনে বেরিয়েছেন বিজয়কৃষ্ণ; সঙ্গে চলেছে গৃহপালিত কুকুর, কেলে। ধর্ম স্বয়ং চলেছেন ধর্মসংকীর্তনে। ধর্মরাজ ছিলেন ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের শেষ যাত্রার সঙ্গী। গোঁসাইজীর ধর্ম-সংকীর্তন-যাত্রায় সঙ্গী হলেন ভক্তরাজ কেলে। এক জায়গায় এসে কেলে মাটি আঁচড়ায় কেবলি। গোস্বামী-প্রভু সে জায়গায় তৎক্ষণাৎ খোঁড়ালেন। এবং মাটির অন্ধকার গর্ভ থেকে উঠে এলো শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নামযুক্ত খড়ম। খড়ম মাথায় করে বিজয়কৃষ্ণ আবার সংকীর্তনমত্ত হলেন। সংকীর্তন-শেষে দেখা গেল ঠাকুর বিজয়কৃষ্ণ জ্ঞানহারা; কুকুর কেলেও নিস্পন্দ। ভক্তের কানে ভগবানের নাম উচ্চারণ করতে করতে প্রভুপাদ বললেন: তোমার কাজ শেষ! এবার অশেষকে লাভ কর; গঙ্গা লাভ কর তুমি।

পরের দিন সকালে দেখা গেল—ভক্তরাজ কেলে গঙ্গার কোলে ভাসছেন; ঠিক যখন সংশয়ের তিমির অন্ধকার সাঁতরে, পূর্বদিগন্তে অপূর্ব আলোয় উদ্ভাসিত করে উঠে আসছেন জবাকুসুমসঙ্কাশ মহাদ্যুতি দিবাকর।

বিজয়কৃষ্ণ ব্রাহ্ম না হিন্দু, বিজয়কৃষ্ণ রামকৃষ্ণের কাছে নত হয়ে ছিলেন, না, রামকৃষ্ণের চেয়ে তিনি বড়,—এই অসার অন্তঃসারশূন্য বাক্-বিতণ্ডায় যারা বাদ-প্রতিবাদের কুরুক্ষেত্রে কুরু-পাণ্ডবের ভূমিকায় অবতীর্ণ তাদের ধিক্। এর চেয়ে অধিক অসম্মান রামকৃষ্ণ-বিজয়কৃষ্ণের করা অসম্ভব! আলো এবং বাতাস কে বলবে এর মধ্যে কে বড়? আকাশ আর মাটি, কে বলবে এর মধ্যে কাকে না

হলে অচল, বসুন্ধরা-জননী সিন্ধু আর বসুন্ধরার প্রহরী আকাশস্পর্শী পর্বত, কে বলবে কার কাছে আছে অনন্ত জিজ্ঞাসার উত্তর। ব্রাহ্ম আর হিন্দু মুসলমান আর খৃশ্চান তো নদীর নাম মাত্র! গঙ্গা আর যমুনা, সিন্ধু আর টেম্‌স! উত্তরণ তো সকলেরই সেই মহাসাগরে,—সেখানে যাবার পাথেয় হোক যত আলাদা! সিন্ধু থেকে উৎসারিত সিন্ধুগামী কেউ গেছে সোজা, কেউ বেঁকা, কেউ মরুভূমি বুজিয়ে, কেউ চড়াই উজিয়ে। সিন্ধুতে গিয়ে শেষ হয়েছে যাত্রা। শুরুতে আর সারাতে বিজয়কৃষ্ণ আর রামকৃষ্ণে কোনও তফাত নেই। মাঝখানে কেউ দক্ষিণেশ্বরে বিলিয়েছেন নিজেকে, কেউ শান্তিপুরে টেনেছেন অন্যকে। যেখানে শেষ সেখানেই রাম নেই; বিজয় নেই; আছেন কেবল কৃষ্ণ!

বিজয় আর রাম নয়, বলো, জয় কৃষ্ণ! জয় কৃষ্ণ।

মাটি আর পাথর। চুন আর সুরকি। বালি আর সিমেন্ট। লোহা আর ইঁট দিয়ে গড়া,—এই যদি দেখো কাশীকে, তবে কাশীতে, একাশিতে মারা গেলেও শিবলোকে যাবে না; যাবে 'শিবা' লোকে। জন্মাবে আবার; আবার শেয়ালকুকুর কাঁদবে তোমার দুঃখে। ইঁট আর কাঠ; কাজ-করা কবাট,—কাশীর মাহাত্ম্য সেজন্যে নয়। কাশী যে কেবল আরেকটি প্রদেশ মাত্র নয়, বিপ্রদেশ, সে ঐ শংকর আর তৈলঙ্গের জন্যে; হরিশ্চন্দ্রের কারণে! ভারতাত্মা কাশী। ভারতবর্ষের এমন কোনও মহাত্মা নেই যাঁকে না যেতে হয়েছে কাশীতে! কারণ কাশী কেবল তীর্থক্ষেত্র নয়; জীবনযোগী তৈলঙ্গ থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত, তাঁদের আগে এবং তাঁদের পরে, সকল মুক্তপুরুষের সতীর্থক্ষেত্র কাশী।

জহুরী না হলে যদি জহর থেকে যায় অচেনা, কবে তীর্থের মহিমা বুঝবে কে, তীর্থংকর ছাড়া!

বৃন্দাবনের মাটিতে মাহাত্ম্যের সন্ধান না পেয়ে দুঃখিত একজন, ম্রিয়মাণ। গোস্বামী বললেন: কৃষ্ণ নাম করে গড়াগড়ি করুন ভূমিতে, একবার; তারপর দেখুন আপনার উপলব্ধি হয় কিনা, যে এ মাটি, মাটি নয়; স্বয়ং 'মা'-টিই এ মাটি! প্রভুপাদের কথায় লুটিয়ে পড়েন বিশ্বাসী ব্রজভূমে; চোখে আসে জল; বুকে থামে বন্ধুর রথ! ভূমি যে ভূমা,—এ বিশ্বাস সনাতন, সৃষ্টির ঊষাকালে উদ্ভূত ভারতের; আর ভারতীয় সাধকের।

প্রাচীন ভারত বলেছে, মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ—মধু ক্ষরিত হচ্ছে আকাশে, বাতাসে, আলোয়, অন্ধকারে। শুধু পৃথিবীতে ধূলি, তৃণ, বৃক্ষ, সমুদ্র নয় মধুময়, নবীন ভারতের সাধকের দিব্যতনু দিয়েও সেই মধুক্ষরণ, সেই মধুর ক্ষরণ ঘটেছে ভাগ্যবানদের চোখের সামনে। বিজয়কৃষ্ণ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য দিচ্ছেন কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী। বলেছেন, মধুলোভী মৌমাছির দল ঠাকুরের দিব্যদেহকানন জুড়ে গুনগুন করছে, অলস অপরাহ্ণ বেলায়। পিঠ মুছিয়ে

দিতে দিতে বিস্মিত বিস্ফারিতদৃষ্টি কুলদানন্দের স্বীকৃতি : 'মানুষের শরীরে ঘর্মাকারে মধু বাহির হয়—কোথাও শুনি নাই, কোনও পুস্তকে পড়ি নাই।'

'জীবন যখন শুকায়ে যায় করুণাধারায় এসো'! বিষয়চিন্তায় লোভ, লালসা, স্বার্থে কুটিল, তর্কে জটিল ধরণী যখন মরুভূমির মতো ধূ-ধূ-ময়, তখন এসো, রাম আর কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ!,—তোমরা যারা মধুময়!

কিন্তু অন্তরের সুধায় যাঁরা বসুধায় দেন ভরে, তাঁরা নিজেরা পান করেন গরল। হিন্দুর যিনি দেবাদিদেব,—তিনি অমৃত বিলোন; পান করেন বিষ। যাঁর ঘরনী অন্নপূর্ণা; অন্নভিক্ষা করেন তিনি। মুহূর্তে যিনি ইন্দ্র, বরুণ, চন্দ্র, সূর্য চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে পারেন, তিনি বাস করেন শ্মশানে। যাঁর কণ্ঠে মাল্য দিয়েছেন উমা, তাঁর গলায় জড়িয়ে আছে সাপ; আর সাপের বিষে কণ্ঠ হয়েছে নীল। জীবন্ত শংকর-ভাষ্য হচ্ছে এই ভারতবর্ষ। এই ভাষ্য, যে বুঝতে পারেনি, শংকরের ভাষার গ্রহণ করতে পারেনি মর্ম সে বোঝেনি শংকর ক্ষেত্র কাশীকে। যিনি বুঝেছেন, তিনি, কেবল তিনিই বলতে পেরেছেন, যে ভোলা-নাথ প্রতিদিনের তুচ্ছ সুখের কাঙাল নন; প্রত্যহের অতীত আনন্দের অধিকারী ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য সবাই ব্যস্ত সিংহাসন রক্ষায়। স্বর্গ, মর্ত্যলোকে কেউ সাধনায় বসলেই তাই কাঁপতে থাকে ইন্দ্রের বুক: যদি টলে যায় ইন্দ্রের আসন! তাই অপ্সরী আসে লোভের বেশে; ভয়ের ছদ্মবেশে দেখা দেয় মার: যাতে,—সাধনার বিঘ্ন ঘটে; নিরাপদে থাকে ইন্দ্রের আসন। কিন্তু সব দেবের মধ্যে যিনি আদি দেব, তাঁকে দেখো একবার। তাঁকে ডাকো একবার বেলপাতা মাথায় দিয়ে বলো: যার মাথায় হাত দেবো, তার মাথা তখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ হবে,—আশীর্বাদ দাও এই!

সঙ্গে সঙ্গে মঞ্জুর করেছেন তোমার প্রার্থনা আশুতোষ। খেয়াল নেই যে এই অসুরহস্তস্পর্শে জটাজালজড়িত ধূর্জটিমস্তকও ধূলিসাৎ হবে মুহূর্তে; কারণ এ-হাত তাঁর বরে বরীয়ান!

ইনিই সেই কাল যাঁর মন্দিরা দু'হাতে বাজে। ফুলে বাজে কাঁটায় বাজে, সুখে বাজে, দুখে বাজে। আলোছায়ার জোয়ার-ভাঁটায় সকাল-সাঁঝে ভালোয়-মন্দে আশায় শংকায় বাজে তাঁর ডমরু। কাশী সেই মহাকালের আবাসস্থল যেখানে ষণ্ড, পাষণ্ড, ভণ্ডের সঙ্গে আছেন এমন সাধু যিনি চোখের পলক পড়বার আগে লণ্ডভণ্ড করতে পারেন সৃষ্টি। সতীর সঙ্গে পতিতা, জন্ম হবে না যার তার সঙ্গে জন্মের ঠিক নেই যার, সে, এই কাশীর গলিতে আছে গলাগলি করে কোন্ অনাদিকাল থেকে তা জানেন ওই দেবাদিদেব কাল! কাশী কেবল শংকরভূমি নয়; সংকর ভূমিও বটে।

কেবল শংকর নন, শংকরভূমি এই ভারতে এসেছেন যাঁরা ভগবানের দূত, তাঁরাও গ্রহণ করেছেন গরল; বিলিয়েছেন অমৃত। কেবল এদেশে নয়! কোন্ দেশে নয়? যীশু রক্তাক্ত হয়েছেন তাদের হতেই যাদের উদ্দেশে বলেছেন:

Forgive tham! সক্রেতিশ বিষপাত্র গলাধঃকরণ করতে করতে বলেছেন: যাদের বিরুদ্ধে আমার প্রতিবাদ, আমাকে হত্যা করাই তাদের যুক্তিযুক্ত! অতএব এ আমার পুরস্কার। রামকৃষ্ণের গলায় যদি ক্যান্সার না হয় তাহলে আমাদের ক্ষত নিরাময় হবে কেন? সার-বস্তু বিলোতে পারেন তিনিই, ক্যান্সার যাঁর দেহকে মৃত করে; বসুন্ধরাকে করে অমৃত!

রাম আর কৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ আর বিজয়কৃষ্ণ সকলেই হাস্যমুখে অদৃষ্টের পরিহাস করেন বার-বার! জগন্নাথক্ষেত্রে নিয়ে আসে জীবনের সন্ধ্যা বিজয়-কৃষ্ণের। সেই বিজয়কৃষ্ণ যাঁকে হনুমানের মতো বুক চিরে দেখাতে হয়নি ইষ্টদেবতাকে। ইষ্টদেবতা যাঁর বুকের ওপরেই হয়েছেন আবির্ভূত। পুরীর সমুদ্রতীরে যেতে অসমর্থ বিজয়কৃষ্ণ বসে থাকেন ঘরে; বাইরে থেকে লোকে ঘরে এসে দেখে,—বিজয়কৃষ্ণের জটা দিয়ে জল ঝরছে সমুদ্রের।

[বিজয়]-কৃষ্ণের ডাকে যদি সিন্ধু ঘরে না আসে তাহলে কৃষ্ণের নাম হবে কেন কৃপাসিন্ধু?

এই পুরীতেই, জগন্নাথক্ষেত্রেই, জগতের যত অনাথের উদ্ধার-কল্পে, কৃষ্ণের কথা: 'সম্ভবামি যুগে যুগে';—রাখতে এসেছিলেন যে বিজয়কৃষ্ণ, তাঁকে ঈর্ষাতুর সত্য-ভীত কাপুরুষরা তুলে দেয়, বিষ-মিশ্রিত প্রসাদী নাড়ু। অন্তর্যামী বিজয়কৃষ্ণ, হেসে, ভালোবেসে মুখে তুলে দেন সেই গরল! গরল নয়; প্রসাদ! মুখ তুলে নেন সেই প্রসাদ সকলের সম্মুখে বিজয়কৃষ্ণ; ইষ্ট যার সহায় তাঁর দেহের অনিষ্ট করতে পারে বিষ; কিন্তু তাঁর অমৃত বিনষ্ট করে কে?

সকালবেলার ভৈরবী যেমন, সন্ধ্যাবেলার এই পুরবীও তেমনি সুরভিতে ভরে দেয় জীবনের অশেষ সন্ধ্যাকে।

রাম যান! আসেন কৃষ্ণ! রাম-কৃষ্ণ দুই যান; আসেন রামকৃষ্ণ! রামকৃষ্ণ যান; আসেন বিজয়কৃষ্ণ। বিজয়কৃষ্ণ যান; কিন্তু কৃষ্ণ-বিজয় আজও অব্যাহত এই ভারতভূমিতে! কারণ বিজয়কৃষ্ণের মুখে কৃষ্ণের কথারই পুনরুক্তি: সম্ভবামি যুগে যুগে!

দ্বিতীয় খণ্ড

॥ এক ॥

কোনও পূজা সিদ্ধ হয় না, সিদ্ধিদাতা গণেশের নাম না নিলে, তাঁকে প্রণাম না করলে সর্বাগ্রে। কাশীর দ্বিতীয় পর্বের সূচনাও কাশীর দিদিমার অদ্বিতীয় কথা দিয়ে না করলে, বোধন না করে দুর্গাপূজায় বসার ব্যর্থতা হয় অব্যর্থ। তা ছাড়াও কারণ ঘটে গেছে ভাস্করানন্দ সরস্বতীর কথা দিয়ে দ্বিতীয়বার কাশীকাণ্ড আরম্ভ করবার মুহূর্তে কাশীর দিদিমাকে স্মরণ করার। ভাস্করানন্দের কথা লিখবার প্রতিশ্রুতিকালে প্রার্থনা করেছিলাম, অয়মারম্ভ শুভায় ভবতু। দিব্যদ্যুতিময় সেই দিবাকরের কাছে জানিয়েছিলাম মর্ত্যের আকুলতা, যেন তিনি প্রকট হন এই রচনায়। গঙ্গাজলেই যেমন গঙ্গা পূজা, তেমনই সূর্য হেসে শিশিরের বুকে এসে ধরা না দিলে, ধরায় কে আছে যে হতে পারে প্রভাত-মধ্যাহ্ন সন্ধ্যার দিবাকর-দর্পণ? তাই বলেছিলাম তিরোভাব-আবির্ভাবের ঘণ্ট-নির্ঘণ্টের শুকনা গাঙ্গে নামুক তোমার দিব্য জীবনের, তোমার দীপ্ত জীবনের দুঃসহ বেদনার, দুর্বহ আনন্দের অফুরাণ কৌতুক-এর উদ্দাম বন্যা। কাঁদাও, হাসাও, ভালোবাসাও সে তুমি! যে তুমি আনন্দভাস্বর সেই তুমি ভাস্করানন্দ এসে দাঁড়াও আমার গানের এপারে! কলমের মুখে নয় কেবল আমার সম্মুখে হও আবির্ভূত তুমি! ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান মুছে দিয়ে দাঁড়াও আরেক বার, হে অপূর্ব যে অভূতপূর্ব! পুঁথির পাতায় নয় চোখের পাতায় পাতায় পড়ুক তোমার প্রেমাঞ্জন! দুচোখে পড়ুক তোমার তৃতীয় নয়নের আলো! অমর আনন্দের ভাস্কর তুমি! তুমি ভাস্করানন্দ! সরস্বতী কৃপা করুন, ভাস্করানন্দ সরস্বতীকে আবাহনের মুহূর্তে! সেই কৃপা যা পঙ্গুকে দেয় পা; পাহাড় ডিঙ্গোবার প্রেরণা। সেই করুণা যা মূককে করে জীবনমন্ত্র উচ্চারণে উন্মুখ।

এ প্রার্থনার কথা জানাইনি কাউকে। কাশীর দিদিমাকে পাঠিয়েছিলাম বার্ধক্যে বারাণসীর প্রথম খণ্ড। তাঁকেও জানাইনি কার নাম করে, কাকে প্রণাম করে ভারতাত্মা কাশীর দ্বিতীয়, অদ্বিতীয় কান্ড, প্রকাণ্ড দুঃসাহসের পাখায় ভর করে, না, সম্পূর্ণ নির্ভর করে যার কথা বলতে যাচ্ছি, তারই ওপর, আবার আরম্ভ হচ্ছে তার যার আরম্ভ নেই। কাশীর দিদিমা তার সোনারপুরার অন্ধকার ভাঙ্গা বাড়ির লণ্ঠন জ্বালা আলোয় প্রায় অন্ধ চোখের কালোয়, বাঁকা বাঁকা অক্ষরে, বিরামচিহ্নহীন চিঠিতে জানিয়েছেন আশীর্বাদ। তার সঙ্গে পাঠিয়েছেন একখানা বই। ছেঁড়াখোঁড়া, কত প্রাচীন বলা শক্ত, একখানা চটি পুস্তক নয়, পুস্তিকা! পুস্তিকার সঙ্গে আশীর্বাদী পত্রে দুটি কথা যোগ করে দিয়েছেন কাশীর দিদিমা, 'বইখানা পড়ে দেখো। কাশীর কথা লিখতে এই বই যদি তোমার কাজে লাগে তো ভালো! না লাগে তো আরও ভালো!'

গলা-পচা প্রাচীন সেই পুস্তিকার খুলে দেখি প্রথম পাতা। সেখানে যাঁর

নাম লেখা তাঁকে প্রণাম করেই আরম্ভ করবার সংকল্প করেছিলাম বার্ধক্যে বারাণসীর দ্বিতীয় অদ্বিতীয় উপাখ্যান। ভাস্করানন্দের জীবন কথা-ই সে সেই পুণ্য পুস্তিকায় প্রকাশিত। বইখানা হাতে নিয়ে সেই রোমাঞ্চ সঞ্চারিত হলো রোমকূপে, যার আনন্দ, যার বেদনা, যার বিস্ময়, যার বার্তা অনুভব করা যায়; ব্যক্ত করা যায় না।

বইখানা হাতে নিয়ে মনে হলো, মানুষের মাথায় বিনামেঘে বজ্রপাত-ই হয় না কেবল। কখনও কখনও অসীমের আলো অযাচিত এসে পড়ে সীমার কপালে; অনন্তের আনন্দাশ্রু টলমল করে অন্তের কপোলে। জীবনের বদ্ধদ্বার খুলে যায় কখনও বিনা প্রয়াসে! সংশয়ের অন্ধকার-আচ্ছন্ন অন্ধকার চোখে ভরে যায় জল। দুই চোখের সেই জল যা তৃতীয় দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্যে হলেও করে সুনিশ্চিত উজ্জ্বল!

অব্যক্ত আনন্দের ভাস্কর ভাস্করানন্দের অলৌকিক স্পর্শে আনন্দভাস্বর কাশীর এই দ্বিতীয় অধ্যায়, অদ্বিতীয় এই সন্ধ্যালোকে হোক স্পন্দিত!

আনন্দ-অবাধ কাশীর আনন্দবাগ! ভারতের তদানীন্তন সেনাধ্যক্ষ স্যর উইলিয়াম লক্‌হার্ট আনন্দবাগে উপস্থিত সেদিন। তাঁর সর্বাঙ্গে ঝলমল করছে পদক, তারকালাঞ্ছিত যুদ্ধের জয়ভূষণ; আর তিনি যাঁর সামনে উপস্থিত তাঁর অঙ্গে কৌপীন পর্যন্ত নেই। আকাশের মতো নির্মল, নির্মম উলঙ্গ এই সন্ন্যাসীর কাছে স্যর উইলিয়াম্ গল্প করছেন। তাঁর দিগ্বিজয়ের দুরন্ত রোমহর্ষক কাহিনী। আফ্রিদিদের হারাবার কুটনীতি আর দুঃসাহসের পরাকাষ্ঠা তাঁর নিজের পরাক্রমের নির্লজ্জ বিজ্ঞাপন শুনছেন সশিষ্য আনন্দবাগের সদানন্দ সেই সন্ন্যাসী। হঠাৎ কি খেয়াল হয় নাগা সাধুর, লক্‌হার্টকে পড়ে থাকা একটি অদূরবর্তী পেন্সিলকে তুলে দিতে বলেন তাঁর হাতে। লক্‌হার্ট চেষ্টা করেন, পারেন না। অবলীলাক্রমে যে হাত তুলে নিয়েছে ভারি ভারি রাইফেল, এখন সেই অপরাজিত দুই বাহুর সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়, কিন্তু হালকা একটা পেন্সিল কোন্ শক্তিতে মাটি আঁকড়ে পড়ে থাকে। লক্‌হার্ট যদি তার উৎস জানতো, তাহলে সে শক্তির নয়, নিরাসক্তির উপাসক হতো। আনন্দবাগের নগ্ন ওই সন্ন্যাসী, যাঁর নাম ভাস্করানন্দ সরস্বতী, তিনি এমনি করেই অহংকারের উদ্ধত পক্ষ ভগ্ন করতেন। লক্‌হার্ট যখন পেন্সিল ওঠাতে ব্যর্থ হলেন, তখনই অব্যর্থ কাজ করলো দ্য হোলিম্যান অফ কাশী, ভাস্করানন্দের উপদেশ: যুদ্ধে জয়লাভ অথবা পরাজয় এর কোনওটার জন্যেই, কৃতিত্বের জন্য অহংকার অথবা ব্যর্থতার জন্যে হতাশার অর্থ নেই কোনও। যাঁকে তিনি জেতান তাঁকে তিনি শক্তি দেন, যাঁকে হারান তাঁর শক্তি করেন হরণ! শক্তি নয়; নিরাসক্তির উপাসনাই ঈশ্বর-নির্ভরতা।

সাধারণ মানুষ অসাধারণ নির্বোধ কীর্তিমান কেউ কেউ বলেন, শুনি, সন্ন্যাসীরা সমাজের কি কাজে আসেন? গুহায় অথবা আশ্রমের নিরুপদ্রব নির্জনে ঈশ্বর চিন্তার চেয়ে বড় সামাজিক অপরাধ নাকি আর কিছু নেই। মানুষের একমাত্র কর্তব্য হচ্ছে কাজ, কাজ, কাজ। কর্মই ধর্ম; কর্মই ঈশ্বর। যাঁরা এমন কথা বলেন তাঁরা যে সবাই সর্বক্ষণ কর্মব্যস্ত এমন মনে করবার কারণ নেই কোনও। তবু তাঁদের মধ্যে এমন কেউ কেউ সত্যি সত্যি কখনও কখনও থাকেন, কর্ম যাদের ধ্যান, কর্ম যাদের জ্ঞান, কর্ম যাদের ভগবান। সেই কর্মযোগী পুরুষরা যোগী পুরুষদের ধর্ম বুঝতে না পেরে ভাবেন তাঁরা অলস, তাঁরা পরজীবী, তাঁরা সমাজের, সংসারের শত্রু! এবং এই সব কর্মীরাই মনে করেন, যে যুদ্ধজয়ের, যুদ্ধে পরাজয়ের কারণ তাঁদের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি। আসলে যারা শব ছাড়া কিছু নয়, তারাই মনে করে তারা সব। পিঁপড়ে থেকে বাসব পর্যন্ত সকলের এই অহংকারকে ভাঙতেই কৃষ্ণ থেকে রাম, রাম থেকে রামকৃষ্ণ পর্যন্ত সকল 'নিরাসক্তি'র আবির্ভাব শক্তির দম্ভ চূর্ণ করতে।

যোগীদের মধ্যে কর্মীশ্রেষ্ঠ, এবং কর্মীদের মধ্যে যোগীশ্রেষ্ঠ বিবেকানন্দর পর্যন্ত এমন ভ্রান্তি ঘটেছিলো একবার। ক্ষীর-ভবানীর পবিত্র প্রস্রবণ-এর সামনে ধ্যানমগ্ন ধূর্জটির মতন যোগাসীন স্বামীজীর ধ্যানভঙ্গ হয় হঠাৎ। দেখেন সামনের হিন্দুমন্দির ভগ্ন। স্বামীজীর নয়নে ক্রোধাদিত্যের রক্তরাগ ফেটে পড়ে মুহূর্তে। মনে মনে ভাবেন। মুসলমানরা এই হিন্দুমন্দির যখন ধ্বংস করে তখন বাহুতে অমিত শক্তি আর হৃদয়ে অবারণ ভক্তি সম্বল দুর্জয় একজন হিন্দুও কি ছিলো না, যে বাধা দিতে পারত তার জীবনের বিনিময়ে। আমি যদি বেঁচে থাকতাম, তাহলে বাঁচিয়ে রাখতাম মাতৃমন্দিরকে ধ্বংস দশা থেকে।

ভাবনার ছেদ পড়ে। দৈববাণী বাজে আকাশের বুকে। জগজ্জননীর জেগে ওঠে তীব্র তিরস্কার: মুসলমানরা আমার মন্দির যদি ধ্বংস করে থাকে তো তাতে তোর কি? তুই রক্ষাকর্তা আমার?

বিস্ময়বিচলিত স্বামীজী বুঝে উঠতে পারেন না, এ দৈববাণী না তাঁর শ্রবণের বিভ্রম। পরের দিন আবার দৃঢ় সংকল্প হন দুর্জয় দুর্নিবার দামাল জীবন-নদী যিনি রামকৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যাঁর পুণ্য পবিত্র পূর্ণ পরিচয় আজও পর্যাপ্ত প্রদীপ্ত নয়, সেই স্বামী বিবেকানন্দ। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেন, ভিক্ষালব্ধ অর্থে তিনি জীর্ণমন্দিরকে আবার যৌবনের দীপ্তি দেবেন, দেবেন জীবনের সম্মান। মনে করার সঙ্গে সঙ্গে, একসঙ্গে ধ্বনিত হয় দিগ্‌বিদিকে মাতৃ-কণ্ঠ: যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে এই মুহূর্তেই কি এই ভাঙা মন্দির সুবর্ণরাঙা সপ্ততল হতে পারে না? এই মন্দির যে ধ্বংস হয়েছে সে তবে আমার ছাড়া কার ইচ্ছায় আর?

মা'র ছাড়া আর কার? মা'র একার ইচ্ছা ছাড়া এ-কার ইচ্ছায় হতে পারে আর!

বিবেকানন্দ ক্ষান্ত হন ; ভ্রান্ত, উদ্‌ভ্রান্ত হন না আর। মাতৃমন্দির সংস্কার করার ব্যর্থ অহংকার নয় কেবল, তাঁর আমূল পরিবর্তন ধ্বনিত হয় শিষ্যাদের কাছে উক্ত একটি স্বীকৃতিতে : আমার কর্মের স্পৃহা স্বদেশপ্রেম সমস্ত অন্তর্হিত হইয়াছে। হরি ওঁ ! আমি ভুল করিয়াছিলাম, আমি যন্ত্র, তিনি যন্ত্রী !'

আমি যন্ত্র না, আমিই যন্ত্রী,—এইতেই যতেক যন্ত্রণা ! আমি যন্ত্রী নই, যন্ত্র মাত্র !—এইতেই যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি !

অহংকারী কর্মীর মতো পণ্ডিতমূঢ় আছে অসংখ্য যারা বলে, 'তুমি যন্ত্র, আমি যন্ত্রী,'—এই বলে চুপ করে বসে থাকলে খাওয়া জুটবে ? যারা শোনে তারা সঙ্গে সঙ্গে সায় দেয় সত্যিই তো, কর্ম না করে ধর্ম ধর্ম করলে খাওয়াবে কে ? পরাবে কে ? কিন্তু কেউ বলে না, এই পণ্ডিতমূঢ়দের যে, কিছু না করে চুপ করে বসে থাকো দেখি একবার, দেখবো তোমার সাধের তুলনায় সাধ্য কতদূর। চলার চেয়ে না চলা, বলার চেয়ে না বলা, শক্তির চেয়ে নিরাসক্তি যে কত বড়, কাশীর অনন্তবাগে আনন্দের ভাস্কর, ভাস্করানন্দ সরস্বতী তারই একমাত্র প্রমাণ নন। লক্‌হার্ট উপলক্ষ মাত্র, আমাদের লক্ষ করেই তাঁর এই চিরন্তনী বাণী জয়-পরাজয়ের কর্তা সেই একজন। আমি যেমন তোমার শক্তি হরণ করেছি, আর তাই তুমি এই পেন্‌সিলটিও তুলতে পারলে না, তিনিও তেমনই ইচ্ছে করলে হরণ করতে পারতেন তোমার শক্তি, হারিয়ে দিতে পারতেন তোমাকে আফ্রিদিদের মতোই !

ধন বা জয় বা ধনঞ্জয় ভব সংসারে সবাই নিমিত্ত মাত্র,—ভারতবর্ষের এই মৃত্যুহীন বাণীর জীবন্ত প্রমাণ দেবার জন্যেই ত্রৈলঙ্গ থেকে ভাস্করানন্দ থেকে এখন পর্যন্ত আগত, অনাগত বহু মহামানবের পদক্ষেপ ঘটেছে এবং ঘটবে।

একথা যে বলা হয় যে সকলের জন্যে নিরাসক্তি নয়, সে-কথা আপাত সত্য হলেও শেষ পর্যন্ত সত্য নয়। সত্য নয় তার কারণ যে কেউ এ-কথা বলে না, বা, বললেও তার কাজে তার সত্য প্রমাণিত হয় না। যিনি বলতে পারেন 'তুমি যন্ত্র আমি যন্ত্রী,' তিনিই ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মতো কোটিকে গোটিক। যখনই লক্‌হার্টের মতো কেউ মনে করে যে সেই সব, তখন রাইফেলধারী হাত দিয়ে পেন্‌সিল তুলতে না দিয়ে ভাস্করানন্দ প্রমাণ করেছেন, লক্‌হার্ট শব মাত্র ; আসলে তিনিই সব যাঁর ইচ্ছায় অক্ষৌহিণী সৈন্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তিনিই কেবল অক্ষয় হয়ে থাকেন।

আকাশ, আকাশচারী পাখি আর সন্ন্যাসীরই কেবল নেই সঞ্চয়ের অধিকার। কাল-বৈশাখীর খেলা ভাঙার খেলা, আশ্বিনের নিরুপম নীল, আষাঢ়ের প্রথম বর্ষণ, রামধনুর বিচিত্র রং—আকাশেই সব, তবু আকাশ এ-সবের কারুর নয়। কাউকে ধরে রাখে না সে, তাই বার বার এরা ধরা দেয় আকাশের বুকেই। ওই আকাশের মতোই নগ্ন আকাশের মতোই নির্লিপ্ত, নির্মম নিরাসক্ত যে সেই যথার্থ সন্ন্যাসী। ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মুখের কথাই ছিলো : সাধুর সম্বল আকাশবৃত্তি, অন্য সম্বলে তার অধিকার কি ?

কাশীর রাজা পাঠিয়েছেন প্রচুর সুস্বাদু পাকা ফল, ভাস্করানন্দর পায়ে প্রণাম! উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে তাকে বিলিয়ে দিয়েছেন স্বামীজী। অদূরে দাঁড়িয়ে ভক্ত রামচরণ। একটি ফলের টুকরোও ভাস্করানন্দের মুখে উঠলো না, —এই দুঃখ সে রাখবে কোথায়। সমস্ত ফল নিঃশেষে বিতরিত হবার আগে, সেবক রাম তেওয়ারি সরিয়ে ফেলে কিছু ফলপাকড়; পরের দিন ভাস্করানন্দের খাবার পাতে দেবার বাসনায়। যাঁর সমস্ত বাসনা সোনা হয়ে গেছে সেই ভাস্করানন্দের দৃষ্টি এড়ালো না সেবকের ফল-সরানো। হাসতে হাসতে বললেন: রামচরণ, তোম্ পরমহংসকো ভাণ্ডারা বনাতে হো? তারপর হো-হো করে হাসতে লাগলেন আবার। একটু বাদে অপ্রতিভ ভক্তকে ভালোবাসতে আবার ভগবান ভাস্করানন্দ বললেন: তুমি কি জানো না যে, আমার ভক্তদের মুখে আমি রোজ কি পরিমাণ খাই?

সেই এক সুরে বাঁধা। শ্রীরামকৃষ্ণ গলায় ক্ষতর জন্যে খেতে পারেন না। শিষ্যরা বলেন, মা-কে বলবার জন্যে যাতে তোমাকে খেতে দেন। ঠাকুর বলেন: মা-কে বলেছিলাম আমাকে খেতে দাও। মা বললেন সে কি-রে? এতগুলো ভক্তের মুখ দিয়ে রোজ এত খাস, তবু বলিস, খেতে দাও!

এ যে দেখতে পায়, সে কিছু না করলেও খেতে পায়! যে দেখতে না পায় সে সারাজীবন ক্ষেতে কাজ করে। তবু বলে: খেতে দাও, আরোও খেতে—। খেতে পেয়েও সে সারাজীবন খেদে কাটায়; কেঁদে কাটায় সে।

জীবনের শেষ দিন, অশেষ দিন পর্যন্ত ভাস্করানন্দ সরস্বতীর জল পান করবার কোনও পাত্র পর্যন্ত ছিলো না। অনাবৃত অঙ্গে, পৌষ প্রখর শীত জর্জর ঝিল্লিমুখর আনন্দবাগের ভুমিশয্যায় বাঁ-হাতের ওপর মাথা রেখে কাটিয়ে গেছেন ভূমার স্বপ্নে আচ্ছন্ন আনন্দ-ভরপুর ভাস্করানন্দ। নিদারুণ জলতৃষ্ণায় জল খাওয়া হয়নি। যতক্ষণ না কেউ তার লোটা এগিয়ে দিয়েছে জলভরে। করপুট-পাত্র সম্বল এই উলঙ্গ সন্ন্যাসীকে পাথরের পানপাত্র দান করা মাত্র তিনি তা অন্য লোককে দিয়ে দেন।

সাধু দর্শনে স্ত্রীলোকেরা এলে কখনও কখনও কারুর কাছ থেকে চেয়ে নেওয়া কটিবস্ত্রাবৃত হতেন সেই সময়টুকুর জন্যে ভাস্করানন্দ। তারপর কোটি বস্ত্রাচ্ছাদন দিলেও তা দূরে নিক্ষেপ করতেন অনায়াসে হেলায়।

এই ভাস্করানন্দকে রূপে ভোলাবার জন্যে একদা গণিকাকে পাঠিয়েছে এক রাজা। ঋষ্যশৃঙ্গ ঋষিকে ভোলাতে যেমন বনে পাঠাতে হয়েছিলো বারাঙ্গনাকে। ধ্যানভঙ্গে ক্রুদ্ধ ধূর্জটির তৃতীয় দৃষ্টিতে আবির্ভূত হলে প্রলয়ের বজ্রাগ্নিশিখা পালিয়ে যায় রূপসীর দল। শুধু সেই বারাঙ্গনাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রইলো একজন। নড়তে পারল না সে এক পা-ও। বিপুলকায় এক সাপ জড়িয়ে রইলো তার সর্বাঙ্গ। রাজা সেই অবস্থায় তার পাঠানো পতিতাকে রেখে পালিয়ে গেল।

সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সাপ নেমে গেল গা থেকে, অভিশাপ-মুক্ত হলো

অহল্যা। সেই দূষিতদেহ রমণী এই প্রথম রমণীয়ের সাক্ষাৎ পেলো জীবনে তাঁর আশীর্বাদে যাঁর কৃপায় কেবল রত্নাকর বাল্মীকি হয় না,—অভিনেত্রী বিনোদিনীর চৈতন্যের হয় উদয়।

স্বামী ভাস্করানন্দ সরস্বতী গার্হস্থ্য জীবনে ছিলেন কানপুরের অন্তর্গত মৈথেলালপুর-এর মিশ্রীলাল মিশ্রের সন্তান। নাম, মতিরাম! মতিরামের বিবাহ হবার পর যেদিন তাঁর পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে সেদিনই সন্ন্যাস জীবন গ্রহণের জন্যে বেরিয়ে পড়েন। দুগ্ধ-ফেননিভশয্যার আরাম, প্রিয়তমা রমণীর সান্নিধ্য, পুত্রমুখনিরীক্ষণের সৌভাগ্য, সব অস্বীকার করে বুদ্ধদেব একদিন যেমন বেরিয়ে পড়েছিলেন পথে, ঠিক সেই ইতিহাসেরই পুনরাবর্তন ঘটে গেছে কতবার মহামানবের সাগরতীর ভারতবর্ষে, কত লোক-এর জীবনে বুদ্ধের জীবন জয়যুক্ত হয়েছে। এ-কথা আমরা ভারতবর্ষের আত্মার ইতিহাস জানি না বলেই তা অজানা।

কাশী ভারতবর্ষের সেই আত্মা। ভাস্করানন্দ সরস্বতী সেই আত্মার আত্মীয়।

গৃহত্যাগের পর মোতিরাম উপস্থিত হন উজ্জয়িনীতে: পূর্ণানন্দ সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাসধর্মে দীক্ষিত হন সাতাশ বছর বয়সে। নতুন নাম হয় ভাস্করানন্দ সরস্বতী। সন্ন্যাসজীবনে প্রবেশের আগে জন্মস্থানে ফিরে আসেন একবার। একমাত্র পুত্র তাঁর তখন পরলোকে। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে যজ্ঞোপবীত ত্যাগী ভাস্করানন্দের আরম্ভ হয় তীর্থপরিক্রমা। এবং এক সময়ে কাশীতে এসে পৌঁছলেন তিনি। তাঁর তখনকার জীবন বর্ণনা থেকে জানা যায় কি পরমাশ্চর্য তপস্যার জ্যোতিদীপ্তি তাঁর আননে আনন্দযুক্ত হয়েছিলো সেদিন। শীতের দুরন্ত দিনে উলঙ্গ সাধুকে এক মাছের মতো ভেসে যেতে দেখেছে, এমন একজন প্রত্যক্ষদর্শীর এই বিবরণীই বলছে, যে এই একই মানুষকে দেখা গেছে রৌদ্ররুক্ষ বালুর' পরে নিষ্ঠুর নিদাঘবেলায় শুয়ে থাকতে এমনভাবে যেন পুষ্পের ওপর বসে আছে কোনও মধুপ। শীতে-গ্রীষ্মে-বর্ষায়-বসন্তে অন্যমনে অন্যন্যমনার আরাধনায় আত্মবিস্মৃত, আত্মস্থিত ভাস্করানন্দের সামনে আহার্য উপস্থিত করলে তিনি কেবল তাকান একবার। তারপর হেসে চলে যান কোথায় কে জানে! [ভারতের সাধক : প্রথম খণ্ড]

যে ঐশ্বর্যের সন্ধান পেলে মণিকে তুচ্ছ মানি, ক্ষুধা তৃষ্ণা ভোলায় যে সুধা, বসুধায় এমন কে আছে যে নিতে পারে তার গুরুভার। 'এই জ্যোতিসমুদ্র মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে' তার মধু পান করে যে, তাকে তৃপ্ত করবে কোন্ খাদ্য? দু' মুঠো অন্ন কেমন করে হবে তাঁর বরাদ্দ। যাঁর আরাধ্য স্বয়ং অন্নপূর্ণা।

ভাস্করানন্দ সরস্বতীর দিব্যজীবন লৌকিক এই জগতে অলৌকিক অবিনশ্বর শক্তির পদ্মরাগমণির প্রদীপ্ত ছটা। কাশীর আনন্দবাগ সেই ছটায় ভাস্বর

সেদিন। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি মনীষী স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র বসে আছেন পায়ের কাছে। বলছেন: আপনি যে বলেন এ জগৎ স্বপ্নবৎ, তার প্রমাণ পাই কোথায়? আপনার পা ছুঁই যখন তখন রক্ত-মাংসের সত্যকেই তো স্পর্শ করি। বলতে বলতে পা ছোঁন ভাস্করানন্দের। সেই হাত মাথায় ঠেকাবার আগেই দেখেন,—ভাস্করানন্দ স্বামী সেখানে নেই। একটু বাদে আবার দেখেন, এই তো সেই স্বামিজী বসে আছেন তাঁর সামনে, বলছেন: এই আছি, এই নেই,—তবু এই আমি-কে বলতে হবে সেই-আমি। জগৎ যদি স্বপ্নবৎ না হয় তা হলে তা থাকতে-থাকতেই থাকে না কেন?

রহস্যের জগতে আমরা যারা দিশাহারা তাদের অবগত করাতে জগতের রহস্য যাঁরা আসেন মরলোকে ভগবানের দূত তাঁরা যেখানেই থাকুন তাঁরা সবাই ৺কাশীর লোক। ৺কাশী কেবল তাঁদেরই আলোক।

মৃগনাভির গন্ধ, কৌস্তুভের দ্যুতি, কৃষ্ণের জন্যে রাধার আকুতি যেমন গোপন করা যায় না, তেমনই যোগশক্তিতে যোগ্যশ্রেষ্ঠ ভাস্করানন্দ আত্মগোপন করে থাকতে পারেননি কোথাও। কখনও কখনও ধরা দিয়েছেন নিজেই। অযোধ্যার রাজা ফিরে যাবেন ভাস্করানন্দকে প্রণাম করে অযোধ্যায়। স্বামিজী তাঁকে যেতে দেবেন না। অনুনয়-বিনয় কিছুতেই কি ভাস্করানন্দের মত হবার নয়? পরের গাড়িতে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অযোধ্যার রাজা শুনলেন, যে ট্রেণে যাবার জন্যে তিনি পীড়াপীড়ি করেছিলেন স্বামিজীকে, সে ট্রেন পথের মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে।

ট্রেন নয়। মানুষের অহংকার ভেঙ্গে চুরমার করে দেবার জন্যে, মুখ্যকে মুমুক্ষু করে তোলবার জন্যে যাঁরা জেগে আছেন, যাঁরা জেগে থাকেন নির্জন গুহার অন্ধকারে, নিঃসঙ্গ হিমালয়ের উন্মুক্ত বক্ষে অবিমুক্ত কাশীর গঙ্গাতীরে তাঁরা কি সমাজের শত্রু অকর্মার দল? অর্জুনই যোদ্ধা আর শ্রীকৃষ্ণই অযোদ্ধা,—একথা যে বলবে সে কি মহাভারতের পাঠক অথবা মহান ভারতের মানুষ?

কাকে বলে কর্ম, আর কাকে অকর্ম, কাকে বলে বিদ্যা আর অবিদ্যা কি, কে বলবে সে কথা? যে পণ্ডিতের 'দর্শন' হয়নি, সেই দর্শনের পণ্ডিত? না, বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় যাঁর নেমেছে সেই করুণাঘনের নীলাঞ্জন ছায়া, জ্ঞানাঞ্জনশলাকায় নয়, ব্যথায় বেদনায়, কান্নায় যে গলিয়েছে করুণার পাষাণকে সে-ই কেবল বলবে, বলতে পারবে, এ বসুন্ধরা কার? তোমার-আমার, না তাঁর একার? এক আকার যাঁর, তোমার-আমার-তার সকলের মধ্যে যিনি একাকার?

আনন্দবাগে আসন পাতবার আগে ভাস্করানন্দ বলিয়ে নিয়েছিলেন জমির মালিককে দিয়ে, যে, এখানে দর্শনার্থীর ভিড় যেন না হয়। সে কথা দিয়েও রাখতে পারেননি জমির মালিক আমেটির রাজা। মধুলোভী মৌমাছির পথ

আটকাবে কে ? আমেটির রাজা আনন্দবাগের মালিক ; কিন্তু আনন্দের অধীশ্বর যদি সেখানে আসন পাতেন তা হলে প্রত্যাখ্যানে নিরানন্দ হয় কেমন করে সে ভূমি। এইখানেই একদিন এক রাণী কেঁদে পড়েন মোকদ্দমায় হেরে। স্বামিজীর কথায় উচ্চতর আদালতে মোকদ্দমা নিয়ে গিয়ে শেষে জয়লাভ করে স্বামিজীকে কিছু দিতে চান ! স্বামিজী বলেন : আমি সন্ন্যাসী,—আমাকে তুমি কি দিবে ?

ভূমার সন্ধান যে পেয়েছে ভূমি তাকে কি দেবে আশ্রয় ? 'মা'-র ছেলে কেন হাত পাতবে 'তো'-মার কাছে।

মানুষ তার সমস্ত কীর্তির চেয়ে মহৎ কারণ কোনও সাম্রাজ্য তাকে ধরে রাখতে পারে না —সাজাহানকে উপলক্ষ করে উচ্চারিত এই কবি-কথিত উক্তির উৎস মানবপ্রেমের মহৎ অধিষ্ঠাত্রী তাজমহল। মানুষ তার কীর্তির চেয়ে বড়,—এর সব চেয়ে বড় প্রমাণ সাজাহান নন ; তাজমহল হতে পারে না এর একমাত্র উৎস ; সাজাহান মমতাজকে ভালোবেসেছিলেন সবুজ পোকা যেমন ভালোবাসে আগুনকে। সে আগুন নিভে গেলে অসময়ে, সবুজ পোকার আকাশভরা কান্নাকে চিরকালের কবিতা করে গেছেন সম্রাট ; পাথরের কঠিন বুকে বিরহের করুণ রাগ তাজমহল। সবুজ পোকার বাসনার মধ্যে যেটুকু সোনা সেটুকু মরেনি যে তার প্রমাণ ওই মহৎ কবিতা। তবু মমতাজের কাছে কিছু চেয়েছিলেন সম্রাট ; কিছু পেয়েছিলেন। পাওয়া বন্ধ হলেও চাওয়া ফুরোয়নি যার তাজমহল তারই তৈরী। চাওয়ার চেয়ে বড় পাওয়ার সন্ধানে সে লোকলোকান্তরের যাত্রী সেই মানুষই কেবলই তার সমস্ত কীর্তির চেয়েও মহৎ, কারণ কোনও দিন কোনও সাম্রাজ্য তাকে ধরে রাখতে পারেনি।

তবুও সাজাহান নয় তার একমাত্র, তাজমহল নয় এ কবিতার একমাত্র দৃষ্টান্ত। কিছুতেই নয়। রূপের চেয়ে অপরূপ যে বড়, কীর্তির চেয়ে মানুষ যে বড়, তার জন্যে যেতে হবে তীর্থে, তার জন্যে প্রণাম করব তীর্থংকরকে। তাজমহলে নয়, কাশীতে গঙ্গার ঘাটে যাঁরা বসে আছেন অনাদিকাল থেকে, আত্মার সুরভি আচ্ছন্ন যাদের চোখে পাওয়ার নেশা নয়, দেওয়ার করুণাধারা বইছে, বেদনার অশ্রু হচ্ছে উদ্গত, মানুষকে তার উদ্দেশ্যের অভিমুখে অগ্রসর করতে না পারার ব্যথায় বিদীর্ণ হচ্ছে যাদের বুক ;—তাঁরাই কেবল তাঁদের সমস্ত কীর্তির চেয়ে যথার্থ মহৎ। বিষয়কর্মী জগতে আনে কোলাহল, উন্মাদ দিগ্বিজয়ের স্বপ্নে রণকর্মীরা তুলছে জীবনসিন্ধু মন্থন করে মৃত্যু-হলাহল আর ধ্যানের আসনে ধূর্জটির মতো নিস্তব্ধ জীবনকর্মী সেই কোলাহল থেকে দূরে পান করছে হলাহল কিন্তু উদ্গীরণ করছে অমৃত : নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

এই চোখ নিয়ে যে না কাশীতে যাবে তারও বিশ্বনাথের মন্দির দেখা হবে ; দেখা হবে না কেবল এই সত্য, যে, সমস্ত বিশ্বই আসলে সেই বিশ্বনাথের মন্দির !

কুরুক্ষেত্রকে যারা কেবল কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধক্ষেত্র বলে জানবে তারাই পার্থকে শুধু মানবে তার নায়ক বলে : কুরুক্ষেত্রকে যারা জীবনমরণ রঙ্গভূমি বলে মানবে তারা জানবে ও যুদ্ধ কখনও শেষ হবার নয় ; এবং ওর একমাত্র নিয়ামক,—পার্থ নয়, পার্থসারথি। শুভের সঙ্গে অশুভের, সুন্দরের সঙ্গে অসুন্দরের, আলোর সঙ্গে কালোর, রৌদ্র-মেঘের খেলাই পাণ্ডব-কুরুর চিরন্তন রণক্ষেত্র। সেই রণ মরণে শেষ হয় না : ব্রজ-শরণে অশেষ রয়। আজও অব্যাহত সেই যুদ্ধে আমরা পার্থকেই মনে করেছি নায়ক, তাই ব্যর্থ হচ্ছি আমরা। পার্থসারথির পরিবর্তে ব্যর্থসারথি আজ পৃথিবীকে ঠেলে দিচ্ছে প্রলয়ের কোলে। তবু হতাশ হবার নেই কিছু, কারণ, তিনি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, সংশয়ের রাত্রির তিমির নিবিড় হলে তবেই উদয়ের পথে শোনা যাবে সেই সোনায়-পান্নায়, খোদিত আশ্বাস : সম্ভবামি যুগে যুগে।

অসম্ভবকে সম্ভব আর সম্ভবকে অসম্ভব করতেই আসেন ভগবানের দূতেরা। ভাস্করানন্দ সরস্বতীও তার ব্যতিক্রম নন। লৌকিক জগতে অলৌকিক প্রকাশ তাঁদের কেবল সংশয়ের কুজ্ঝটিকা কাটিয়ে অবিনশ্বর আশ্বাস জাগানোয়। মেঘের গায়ে লাগানোয় রামধনুর রং। বিষয়মরুর মরা বুকের তল খুঁড়ে দেখানোয় অমরা ফল্গু নদী। এই আশা নিয়ে,—আর কোনও প্রত্যাশা নিয়ে নয়। সীমার প্রতি সীমাহীন ভালোবাসা নিয়ে ; কাঁদা-হাসার জীবন গঙ্গা যমুনায় আলো আশায় ঘট ভরে নিয়ে যাবার ডাক দিতে আসেন এঁরা বহুদূরের কোন্ বন থেকে। সঙ্গে নিয়ে আসেন সেই সুধা বসুধাকে যা-ই কেবল করতে পারে ব্যাধিমুক্ত।

ভাস্করানন্দ সরস্বতীর মধ্যে ঈশ্বর প্রতিম সেই মানুষটিকেই দেখেছিলেন মার্ক টোয়েন। বলেছিলেন ইংলিশম্যান পত্রিকার প্রতিনিধিকে তাই যে, তাজমহলের রূপ কখনও এই অপরূপের সঙ্গে দাঁড়াতে পারে না তুলনায়। পাথর দিয়ে তৈরী প্রেমের কবিতা তাজমহলের রূপ হোক যত বিস্ময়কর, তবু তা বচনীয়। রক্তমাংসের তাল দিয়ে তৈরী এই মানুষটির অন্তরাত্মার আলো যে অনির্বচনীয়। কত মানুষ এই একটি মানুষের ওপর আস্থা রাখে তার ইয়ত্তা নেই। মার্ক টোয়েনের কাছে দৈনিকপত্রের প্রতিনিধি আশা করেছিলেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে নতুন কোনও তামাশা। ব্যঙ্গ বা রঙ্গ দিয়ে মার্ক টোয়েনকে যারা মেপেছে তারাই পরিমাপ করতে পারেনি হাকেলবেরি ফিন-এর অমর লেখককে। হাসির তলা দিয়ে অশ্রুর বন্যা অবারিত করেছেন মার্ক টোয়েন। নিজের দুঃখকে যিনি পরের হাসি করেছেন, ভাস্করানন্দ স্বামীকে দেখে তিনি অবাক হয়েছিলেন। কারণ ভাস্করানন্দ সরস্বতী, পরের পাপ, অপরের অপরাধ অন্যের দুঃখকে হরণ করেছিলেন হাসিমুখে।

যার জাত নেই আর যে অভিজাত, সামান্যের দৃষ্টি থেকে যারা কেবল কাচ, আর যারা অমূল্য কাঞ্চন, তাদের দুজনকেই সমমূল্য জ্ঞান করতেন যিনি তিনিই

ভাস্করানন্দ। রাজা-মহারাজা-পণ্ডিত পরিবেষ্টিত কোনও দিন, কোনও দিন আবার নীচু তলার লোকদের সঙ্গেই গলাগলি, যা কিছু বলাবলি সেদিন কেবল তাদেরই সঙ্গে। কে বলবে কোন রূপটা আসল, আসলে যে অপরূপ সেই উলঙ্গ সন্ন্যাসীর। সহাই তেলী,—নগণ্য মানুষ এসেছে গণ্যমান্যের আসরে। স্বামী তাঁকেই ডেকেছেন সর্বাগ্রে : আমার বাপ আয় !

শেষ জীবনে সেই অশেষ জীবনেশ্বর এসেছিলেন আরেকবার তাঁর জন্মস্থান, মৈথেলালপুরে। সেখানে তখন ভাস্করানন্দের মহিমা আকাশের ভাস্করের চেয়েও ভাস্বর ! তাঁকে সম্মান জানাবার জন্যে আয়োজিত আসরে মান্যগণ্যেরা উপস্থিত। থেকে থেকে ভাস্করানন্দের জহুরী চোখ খুঁজে বেড়ায় অনুপস্থিত কাকে যেন। ভাস্করানন্দ আদেশ করেন, ভীড়ের মধ্যে লছমন মালা বলে কে আছে,—তাকে বার কর ! সে আজ আমায় টানছে, পূর্ণিমা যেমন টানে সিন্ধুকে। লছমন মালা মাছ ধরে খায়। মূর্খ, দরিদ্র, দীনজন্মা। লছমন মালাকে সঙ্গে করে ভাস্করানন্দ ফিরছিলেন আনন্দবাগে। তাঁর জীবনের আনন্দমেলায় যাদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়, তার মধ্যে লছমন মালা অবিস্মরণীয়। রাজরাজড়া এসেছে তাঁর দুয়ারে হাতে নিয়ে দুর্মূল্য পুষ্পমাল্য। তবু সে মালার চেয়ে লছমন মালার দাম যে বেশি সেকথা কে বুঝবে সে ছাড়া, মালা যার কাছে মূল্যবান নয়, যার কাছে মন-ই অমূল্য। লছমন মালার ভেদজ্ঞান দূর হয়েছে বলে। ভাস্করানন্দ সরস্বতী তাকে রাজা এবং জ্ঞানীর চেয়ে বড় জ্ঞান করতেন বরাবর।

কাউকে অযাচিত কৃপা করতেন, কাউকে প্রত্যাখ্যান করতেন অনায়াসে। বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্য ভূতনাথ ঘোষকে বিদায় করছেন প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে। অন্যদিকে, দীক্ষাপ্রার্থী চণ্ডীচরণ বসুকে বলছেন তোমাকে দীক্ষা দেব, তবে তার আগে কুলগুরুর কাছে দীক্ষা নিতে হবে তোমাকে। চণ্ডীবাবু স্বামিজীর কথা বুঝলেন না। তিনি বুঝলেন, ভাস্করানন্দ তাঁকে দীক্ষা দিতে চান না আসলে, তাই কুলগুরুর কাছে দীক্ষার কথা তুললেন। কারণ কাশীতে কোথায় পাবেন সুদূর পূর্ববঙ্গের সেই কুলগুরুকে। এই কথা ভাবতে ভাবতে কাশীর পথ দিয়ে চলেছেন ব্যাধিগ্রস্ত চণ্ডীচরণ বসু। বহুমূত্র রোগে ভুগছেন তিনি। তাঁর মনে হচ্ছে জীবনের সায়াহ্ন সময় আসন্ন। এমন সময় দেখেন অদূরে কাশীর রাস্তা ধরে হেঁটে চলেছেন তাঁর কুলগুরু ? তাঁর কাছে দীক্ষার পর, ভাস্করানন্দ সরস্বতীও তাঁকে বিমুখ করেন না আর। এবং চণ্ডীচরণ ভাস্করানন্দর শিষ্য হবার পর দুরারোগ্য ব্যাধির হাত থেকেও বেঁচে যান।

(ভারতের সাধক ১ম)

বাঁকা-বাঁকা কাঁপা কাঁপা অক্ষরে কাশীর দিদিমা ভাস্করানন্দের দুটি দুরন্ত দয়া করার ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন, যা, ভাস্করানন্দর জীবনীতে পাওয়া যাবে না। একবার কাশীর দিদিমার কন্যা মৃত্যুশয্যায় বলে ওঠে, আনন্দবাগের ঠাকুরের মাথা থেকে ফুল নিয়ে এসে আমাকে দাও ; আমি সেরে যাব। দিদিমা

এবং তখন তাঁর মা-ও বেঁচে, দুজনে ছুটলেন আনন্দবাগে। কেঁদে করজোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন দিদিমার মা। আপনা থেকে ফুল এসে পড়ে হাতে। মেয়ের মাথায় সেই প্রসাদীফুল এসে পড়তেই কালব্যাধি অকালে প্রস্থান করে অগত্যাই। এবং আরেকবার কাশীর দিদিমার ভাইকে নিয়ে তাঁর মা গঙ্গায় ভরাডুবির অবস্থা হন ঝড়ের নৌকায়। ওই ভাই-ই একমাত্র বংশধর কাশীর দিদিমার পিতৃলোকে। দিদিমার মা ভাস্করানন্দের নাম নিচ্ছেন আর বলছেন। 'তুমি বলেছিলে তোমার শিষ্য কখনও নির্বংশ হয় না। সে কি তোমার মুখের কথা কেবল? মনের কথা নয়!'

ভাবনা শেষ হবার আগেই, দুর্ভাবনার শেষ হয়। দিদিমার ভাই চীৎকার করে ওঠে: তীরে এসে গেছি মা! আর ভয় নেই। তাঁর মা তাকিয়ে দেখেন তাদের তীরে উত্তীর্ণ করে দিয়ে উঠে যাচ্ছেন ভাস্করানন্দ!

দেবতার গ্রাস থেকে যে ছিনিয়ে আনে মায়ের সন্তানকে, কি দেব আমরা তাকে? কি দিতে পারি,—কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে অভিষিক্ত প্রণাম ছাড়া আর কি দেব সেই দেবতার চেয়েও দয়ায় বড় মানব-প্রেমিককে!

কিন্তু কাশী কি কেবল ধর্মের? না, অধর্মেরও। ধর্মের ষণ্ড আর অধর্মের পাষন্ড যেখানে অন্ধগলিতে গলাগলি করে আছে। বিশ্বের নাথের সেখানে বিশ্বের যতেক অনাথের সঙ্গে একত্রে বাস, সেই বিস্ময়ের আবাসভূমি এই বারাণসী। এখানে মুখ্য আর মুমুক্ষু, এখানে রমণীয়ের আর রমণীর ভক্ত, এখানে মহাত্মা আর দুরাত্মার একই সঙ্গে আসা-যাওয়া বারবার। বাধা না পেলে যার লীলা পোক্তাই হয় না। সেই বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করতে বিশ্বনাথই তাই পাঠান, শত্রুর মুখোশ পরা অকৃত্রিম ভক্তকে।

কাশীর ইতিহাস কেবল মন্দিরে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। মন্দির ধ্বংসের ইতিবৃত্তের মধ্যেও বিশ্বনাথের কৃপাকে দেখতে হবে। যার ইচ্ছায় সপ্ততল সুবর্ণ মন্দির ওঠে শূন্যে মুহূর্তের মধ্যে, তাঁর ইচ্ছেতেই কেন যবনের হাতে তাঁর বাসস্থান হয় অপবিত্র, এ না বুঝলে বোঝা হলো না হিন্দুর ধর্মকে।

কাশীতে গিয়ে কেবল মন্দিরে-মন্দিরে মাথা ঠুকলে। শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢাললে মণ মণ, গঙ্গায় স্নান করলেও রোজ, পুণ্য না হলেও শূন্য হয়ে যেতে পারে সব সঞ্চয়, কিন্তু পতিতার মধ্যে, বিশ্বের অনাথের মধ্যে বিশ্বনাথকে যে দর্শন করেনি সে একাশিবার বেনারস গেছে; কিন্তু ৺কাশী যায়নি একবারও!

যে গেছে শুধু সেই জানে, কাশী হিন্দুর কি এবং কে? সেই হিন্দুর কাশীকে একদা হিন্দু এক ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে গিয়েছিলো কেন, সেকথার *অল্পই লেখা আছে ইতিহাসে। তার অনেকটাই কিংবদন্তী। সেই কিংবদন্তীর নায়ক, কালাপাহাড়।*

॥ দুই ॥

রাবণ না হলে রামের, দুর্যোধন ছাড়া যুধিষ্ঠিরের, কংস ব্যতীত কৃষ্ণের, মাতাল ভক্ত ছাড়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণের, জগাই-মাধাই উদ্ধার না করা পর্যন্ত শ্রীচৈতন্যেরও মুক্তি কই ? আলো না হলে অন্ধকারের, কালো না হলে সাদার, রাগহীন অনুরাগের, কাঁটাবিহীন ফুলের, বিরহের ম্লানছায়াশূন্য মিলনের রক্তরাগের, মেঘের মেলা ছাড়া রোদের খেলা; পরাজয়ের সুগভীর বেদনা ব্যতিরেকে জয়ের গভীর আনন্দ কোথায় ? বিশ্বনাথের মন্দির ভাঙতে যদি না আসে কালাপাহাড়, তাহলে অবিশ্বাসের রৌদ্ররুক্ষ বক্ষ বেদনায় বিস্ফারিত হবে কেমন করে ? পাহাড়ের বুক ফেটে তবে কেমন করে উৎসারিত হবে করুণাধারার উৎস। দুর্গম মরুপর্বত পেরিয়ে তারা আসবে বার বার ভুবনমনোমোহিনীকে লুণ্ঠন করতে ; লুটে নিয়ে যেতে অমিত ঐশ্বর্যের অফুরন্ত ভাণ্ডার। মন্দিরের পবিত্র প্রাঙ্গণকে করবে অপবিত্র ; মায়ের গায়ে তারা হাত দেবে ! মশালের আলোয় জ্বলে উঠবে কালো রাত ; ঘোড়ার পায়ের ক্ষুর থেকে ছিট্‌কে ছিট্‌কে পড়বে স্ফুলিঙ্গ ! হয়রাজের হ্রেষাধ্বনিতে কাঁপবে কাপুরুষের বুক। মানুষের রক্তে মাতাল নরখাদক নর, লুব্ধ যারা, ক্ষুব্ধ যারা, মাংসগন্ধে মুগ্ধ, আত্মার দৃষ্টিহারা শ্মশানকুক্কুর দল বীভৎস চীৎকারে যখন হানা দেবে তাকে, মূর্তি ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে মাটিতে তখনও তারা জানবে না, সেই ভাগ্যনিহত হতভাগ্যের দল যে তারা তাঁকেই আঘাত করতে উদ্যত যিনি কেবল ওই মাটির মূর্তিতে নেই : 'মা'-টির গায়ে যে অভিমানী হাত দিয়েছে সেই বিদ্রোহেরও তিনিই মূর্ত বিগ্রহ ! যিনি রামে তিনিই পরশুরামে ! মহিষাসুরের মার ছাড়া মহিষাসুরমর্দিনী 'মা'-র আবির্ভাব যে অসম্ভব।

কালাপাহাড় এসেছিলো কাশীতে হিন্দুর তীর্থক্ষেত্রকে রণক্ষেত্রে রূপান্তরিত করতে। হনন করতে তাঁকে অগ্নি যাকে দগ্ধ করতে পারে না ; পবন পারে না স্পর্শ করতে, না পারে প্লাবন যাঁকে সূচ্যগ্রভূমি সরাতে।

কালাপাহাড়ের আসল নাম কেউ বলে কালাচাঁদ রায়। কেউ বলে রাজীবলোচন। দুর্ধর্ষ কালাচাঁদ জন্মে হিন্দু, রক্তে ব্রাহ্মণ। বীর্যবান, বলবান, বেপরোয়া বাল্যকাল থেকে। নিপুণ অশ্বারোহী, নির্ভীক চিত্ত। বাঙলা ও পারসি ভাষায় পণ্ডিত, কালাচাঁদের ইতিহাস কুহেলিকায় আচ্ছন্ন। শোনা গেছে যে তিনি অল্পবয়সে পিতৃহীন হওয়ায় মামার বাড়িতে মানুষ হন। তাঁর বিবাহ হয় একই সঙ্গে দুটি কন্যার সঙ্গে। খানিকটা সত্য আর অনেকটাই কল্পনায় মেশানো, এই বিবাহের, কারণ নাকি এই যে, দুজনের মধ্যে ছোটোটিকে তিনি বিবাহ করতে চেয়েছিলেন আর বড়র বিবাহ না হলে তা অসম্ভব ছিলো বলে, বড়টিকে বিবাহ করতে বাধ্য হন। এরপর তিনি গৌড়সম্রাটের ফৌজদার হন এবং যবন-সম্রাটের দুহিতার দুর্নিবার প্রণয়ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করতে না পেরে

মুসলমানীকে বিবাহ করে জাত দেন। এই যবনী-বিবাহ সম্পর্কেও অনুমিত হয় যে সম্রাটের ভয়ে নয়, সম্রাট কন্যার একনিষ্ঠ প্রণয়ের ফলেই কালাচাঁদ নিজের জীবন-যৌবন ব্যর্থ হবে জেনেও পরিণয়ে বাধ্য হন।

এর পরই আরম্ভ হয় অনুতাপের পালা। প্রায়শ্চিত্ত করেও পুনরায় হিন্দু সমাজে ঢুকতে না পেরে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে ধর্না দিয়েও, প্রত্যাদেশ না পেয়ে ক্ষেপে যান। তখন থেকে তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত হয় যবনের হয়ে হিন্দু মন্দির ধ্বংস। কালাচাঁদ তখন থেকেই লোকের কাছে কালাপাহাড়।

কোনও কোনও কল্পনায় ব্যক্ত হয়েছে যে শৈশবে কালাচাঁদের হাত দেখে করকোষ্ঠিকার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, কালাচাঁদ কালে কালাপাহাড় হবে!

সেই একদা কালাচাঁদকে যখন কালাপাহাড় বলে ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত নাম শুনলেই আতংকে, ঘৃণায় ধিক্কার দিচ্ছে, তখন তার নাম শোনা গেলো কাশী থেকে অদূরে! যৌবনের মধ্যাহ্ন তখন জীবনের সায়াহ্নে গড়িয়ে এসেছে প্রায়। কিন্তু তখনও ক্রোধের আশ্চর্য রাগ মিলিয়ে যায়নি মনের আকাশ থেকে। সমস্ত অন্তর জ্বলছে তৃষ্ণার্ত মরুভূমির মতো ধু-ধু করে। যত হিন্দু মন্দির দিগিবজয়, যত হিন্দু ললনার সম্মানহানি করছে তার সৈন্য, নিঃসঙ্গ সেই মানুষের মনের মরুর তৃষ্ণা বাড়ছে তত। শান্তি নেই; শ্রান্তি নেই। শুধু হিন্দু-নিধনের হিন্দু-মন্দির নির্বংশকরণের সঙ্গে ভুলে থাকার চেষ্টা নিজের অতীত; নিজের উৎস।

শংখঘণ্টা মুখরিত উত্তরবাহিনী গঙ্গার বক্ষে অনাদিকাল থেকে দণ্ডায়মান কাশীর রাজপথে সেদিন শ্রুত হলো অশ্রুত-পূর্ব অশ্বক্ষুরধ্বনি, সচকিত বিহ্বল ধর্মার্থীর দল, হিন্দু বিধবা, মন্দিরের পাণ্ডা, কান থেকে কানে ছড়িয়ে গেলো সেই ভয়-বার্তা, কালাপাহাড়! বিশ্বনাথের পায় জানতে চাইলো মুমূর্ষুর দল বাঁচার উপায়। চির অচল বিশ্বনাথের মূর্তিহীন মূর্তি সে প্রার্থনার উত্তরে রইলো অবিচল। সন্ধ্যা যখন গড়িয়ে গেছে নিশীথ রাতে তখন মত্ত ঝড়ের মতো হা হা রবে এলো মশালের আলোয় রাতের আকাশ রাঙা করে যবন সৈন্যেরা একদা হিন্দুশ্রেষ্ঠ কালাচাঁদের নয়, তখন যবনের চেয়েও হিন্দুর প্রতি প্রতিহিংসায় বেশী যবন কালাপাহাড়ের নেতৃত্বে!

মন্দিরের পর হিন্দু মন্দিরের মাথা লুটোয় মাটিতে। অচল বিশ্বনাথ তবু সচল হয় কই। কিন্তু নির্বিকার থাকতে পারেন না এক হিন্দু বিধবা! ধর্ষিতা সেই রমণী এসে দাঁড়ালেন কালাপাহাড়ের সামনে। বললেন: দেখো তো আমাকে চিনতে পার কি না? কালাপাহাড় তাঁকে চিনলো; তার মাতুলানী। কালাপাহাড়ের সামনেই তিনি আত্মহত্যা করলেন অভিশাপ দিতে দিতে। কালাপাহাড় টলে ওঠে সেই মুহূর্তে!

কালাপাহাড় এই ঘটনার পর কোথায় নিরুদ্দেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, সে কিংবদন্তীও সে সম্পর্কে একান্ত নীরব!

সেদিন বিশ্বনাথের মন্দিরকে যারা রক্ষা করতে পারেনি তাদের নিশ্চল নিবীর্য কর্মকীর্তিহীন বাহুকে নিন্দা করে লাভ নেই ! কারণ বাহুতে যিনি বীর্যের সঞ্চার করেন, শিরায় শোণিত, তিনিই সংবরণ করেন রক্ষা মন্ত্র ! কেন করেন, এ নিয়ে বাদানুবাদে চলে বিবাদমত্ত হওয়া, কিন্তু উত্তর দেওয়া চলে না এর। অথবা ক্ষীরভবানীর তীরে মহাশক্তি বিবেকানন্দর কানে যে দীপ্তবাণী যে দিব্যবাণীর অগ্নিমন্ত্র করেছিলেন উচ্চারণ, পুনরাবৃত্তি করা চলে তার : আমাকে তুই রক্ষা করিস, না তোকে আমি। কিংবা বলা চলে, তার সমস্ত দিগ্বিজয়ের কীর্তি নিয়ে, অনুতাপের নিয়ে অনিঃশেষ অনল কালাপাহাড় মুছে গেছে ভেসে গেছে মহাকালাবর্তে—জেগে আছেন এখনও চিরনিদ্রিত, চিরজাগ্রত যিনি জগৎ ভাঙা গড়া যাঁর একমাত্র খেলা, এক পলকের লীলা যাঁর, এক ঝলকের আলো-আঁধার !

কেবল কালাপাহাড় কি ? ঔরংজেব এসেছে আরও পরে। এবং স্বয়ং বিশ্বনাথের মন্দিরকেই চূর্ণ বিচূর্ণ করতে চেয়েছে। বিশ্বনাথের মন্দির ধ্বংস করে সেই ধ্বংসাবশেষের ওপর মন্দিরের পাথর দিয়ে মসজিদ তৈরী করেন। অচল বিশ্বনাথ তখন সচল হয়েছিলেন বলে হিন্দু ভক্তের বিশ্বাস। তাঁর নীল কণ্ঠে অভয় আশ্বাস উচ্চারিত হলো, বিশ্বনাথের অন্তর্ধানে অনাহারক্লিষ্ট ভক্তদের কানে : আমি আছি জ্ঞানবাপীর মধ্যে ! মন্দিরের দক্ষিণের জমিতে আমাকে প্রতিষ্ঠা করে নূতন করে পূজা কর। নূতন মন্দিরে বিশ্বনাথকে প্রতিষ্ঠা করবার সময়ে যে কোণে প্রথম রাখা হয় সেই কোণ থেকে তাঁকে সরিয়ে আনা যায়নি আর মধ্যস্থলে। যবনাক্রমণের সময়, বিশ্বনাথের বাহন বৃষভ মূর্তি চৈতন্যযুক্ত হয় এবং চীৎকার করে ওঠে। এই বৃষমূর্তিকে কেউ স্থানান্তরিত করতে পারেনি আজও !

ঔরংজেব তার হীরামণিমাণিক্যের ঘটা নিয়ে, দিগ্বিজয়ের দীপ্তছটা নিয়ে মিলিয়ে গেছে কবে ! বিশ্বনাথ তাঁর অচল আসনে আছেন আজও অবিচল।

যিনি জ্ঞানবাপীতে অন্তর্ধান করেন, যিনি আদেশ করেন নূতন প্রতিষ্ঠা, যিনি অহল্যাবাঈকে দিয়ে নিজের মন্দির তৈরীর, রণজিৎ সিংকে দিয়ে সেই মন্দিরের মাথা সোনা দিয়ে মুড়ে দেবার প্রেরণা দেন আবার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মচারীকে দিয়ে অপহরণ করিয়ে সোনা, সোনার সরু পাত দিয়ে মাত্র ঢেকেছেন নিজের মন্দিরের মাথা, তিনি কি ইচ্ছে করলেই, যবনদের হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে অসমর্থ হতেন ! কে বলবে, এ আমাদের দোষ তাঁর নাম নিয়ে ঢাকা দেবার চেষ্টা। সে যদি যে কেউ হয় তবে তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে না ; কিন্তু সে যদি হয় বিবেকানন্দ, মন্দিরসংস্কারে স্থিরপ্রতিজ্ঞ, তবে সে শুনতে পাবে সেই অনাদিকণ্ঠে এই আদি জিজ্ঞাসার জবাব : আমারই ইচ্ছায় মুসলমানরা যদি আমার মন্দির নষ্ট করে থাকে, তাতে তোর কি।

কালাপাহাড় তাঁর ভক্ত না তাঁর শত্রু কে বলবে ? যাঁর ইচ্ছায় রত্নাকর

রামভক্ত হয়, তাঁর ইচ্ছাতেই রামভক্ত হয় কিনা রাবণ, বলব কি করে? কংস কৃষ্ণের চেয়েও কৃষ্ণভক্ত কি না জানবে কে?

ঈশ্বর কোনও চার-হাত-পা সমন্বিত মূর্তি নন। ঈশ্বর এক অনাদি, অনন্ত অনুভূতি মাত্র! অনুভূতির অতীত এক অনুভূতি। তিনি সুখে দুঃখে, সন্তান জন্মে সন্তান মৃত্যুতে আছেন। তিনি রণে আছেন, আছেন শান্তিতে। তিনিই শকুনি হয়ে পাশাখেলায় হারাচ্ছেন যুধিষ্ঠিরকে; দুঃশাসন সেজে সাজমুক্ত করবার চেষ্টা করছেন দ্রৌপদীকে। তিনিই শংখচক্রগদাপদ্মপাণি— দ্রৌপদীকে যুগিয়ে যাচ্ছেন অনন্তবাস। অর্জুনকে বলছেন যুদ্ধ কর, বুদ্ধের মুখে বলছেন, যুদ্ধ বন্ধ কর? তিনিই ঈশ্বর যিনি মলে আছেন; আছেন পরিমলে। যিনি পুণ্যে এবং পাপে, ন্যায়ে এবং অন্যায়ে, তাপে এবং অনুতাপে বিরাজমান।

যারা বলে পাপকে ঘৃণা কর; পাপীকে নয়!—তারা পৃথিবীর সব চেয়ে অসত্য অর্ধসত্য বলে। পাপকে ঘৃণা করবে যে সে পুণ্যকে ভালোবাসবে কোন্ অধিকারে? অন্ধকারকে যে পরিহার করবে আলোকে গলার হার করবে,— এমন আকাশ কোথায়? রাবণের পরস্ত্রী-হরণের পাপ ছাড়া সীতার প্রত্যাবর্তনের পথ কোথায় জননী-গর্ভে, ধরণী-ক্রোড়ে!

কালাপাহাড়েরা আসবে বারবার তবেই তো শঙ্খের মুখে শোনা যাবে শংকাহরণের বাণী: সম্ভবামি যুগে যুগে।

পৃথিবী জুড়ে মৃত্যুর পদধ্বনি আজ! পরম মানবিক বিশ্বাসের ভিত্তি টলিয়ে দিতে এসেছে পরমাণবিক যুগ। ধ্বংসের দূতেরা বলছে: বসুন্ধরাকে দেব রসাতলে। সমস্ত রসের তলে যিনি, তিনও আসছেন আবার। যিনি ধ্বংসের দূত। তিনিই যে বিশ্বাসের অগ্রদূত। গেলো! গেলো!—রব উঠছে যত পশ্চিমাকাশে,—পূর্বদিগন্ত উদ্ভাসিত করে পাখির কলরবে তত জাগছে আশ্বাস: এলো! এলো। বিশ্বত্রাস যিনি তিনিই যে বিশ্বনাথ! মারমূর্তিতে যিনি,—'মা'-র মূর্তিতে তিনিই যে আশা দেন আবার! আশঙ্কা যেমন সত্য, আশা সত্য তার চেয়েও বেশি! কালাপাহাড় যত সত্য, কাশী সত্য তার চেয়ে কম নয়। কালাপাহাড়কে ভাঙতে হবে বলেই, কালাপাহাড় ভাঙতে আসে বিশ্বনাথের মন্দির!

নশ্বর বিশ্বে এই বিশ্বাসই কেবল অবিনশ্বর! এই বিশ্বাসই স্বয়ং ঈশ্বর!

এই বিশ্বাসেব মধ্যেই বেঁচে আছে ভারত! ভারতেই বেঁচে আছে এই বিশ্বাস। সেই বিশ্বাসের, সেই বাঁচার স্থানই-ই কাশী। কাশীর আত্মা আগত এবং অনাগত যত মহাত্মা!

এই বিশ্বাসের মৃত্যু নেই। কাশী মৃত্যুঞ্জয়। সেই কাশী যা আজকের নয়; নয় কালকের। অনাদি এবং অনন্তকালের সেই কাশীর ইতিহাস কে লিখবে!

বিদেশী ঐতিহাসিকের মুখর ভাষণে, কাশীর যে ইতিবৃত্ত বইয়ের পাতায়

পাওয়া যায় সে তার দেহের ওজনে মাপ। কাশীর সেই আত্মার কোনও ইতিহাস নেই. কারণ কোনও দেশে কালে নেই পরিমাপ যন্ত্র।

ঐতিহাসিকের চোখেও কাশী অতি প্রাচীন শহর। আর্যদের ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কাশীর পত্তন হয় [Picturesque India—কেন্]।

কিন্তু কাশীর সেই ইতিহাস এই 'বার্ধক্যে বারাণসী' নয়। কাশী যাঁদের আত্মার সৌরভে আচ্ছন্ন হয়ে আছে আজও,—কাশীর ইতিহাস কেবল তাদেরই। নিজেদের ধ্যান আর ধারণা দিয়ে। দিয়ে নিরবচ্ছিন্ন আরাধনার অমৃত, তিল তিল করে যাঁরা কাশীকে করেছেন তিলোত্তমা তাঁদের শব-সাধনার, সব-সাধনার লিখতে বসেছি ইতিহাস; এখানে কতো মন্দির আছে, এ নগরের বয়স কতো, কারা ছিলেন বংশপরম্পরায় কাশীর নৃপতি, তার তালিকা নয় কাশীর কর্মের আর মর্মের, জীবনরসজারিত ধর্মের নয় পরিচয়। তথ্য নয়; তত্ত্ব। শক্তি নয়; নিরাসক্তি। কাশী কেবল মুমুক্ষুর নয়। মূর্খ এবং জ্ঞানী, পাপ এবং পুণ্য, রাজা এবং প্রজা. অভিজাত এবং অজ্ঞাতকুলশীল.—কাশী সকলের। কিন্তু সকলের ওপর কাশী যে কোটিকে গোটিকের তাঁদের জীবন বৃত্তান্তই প্রধানত কাশীর ইতিবৃত্ত। কাশী যাঁদের আরাধনায় অস্থিমেদমজ্জায় গঠিত, আজও তাঁদের সাধনা লোকচক্ষুর আড়ালে কখনও, কখনও সর্বজন সমক্ষে, অব্যাহত। তাঁরা বারবার ঘুরে ঘুরে আসেন এই কাশীতে; আবার তাঁরা আসবেন, এই আশার যেখানে মৃত্যু নেই, সেই অজরা. অমরা কাশীকাণ্ডের যাঁরা মূল তাঁদের নাম করি; আর প্রণাম করি এমনই একজন অবিস্মরণীয়কে আজ, কাশীর আকাশবাতাসে গঙ্গায়, পথেঘাটে যাঁর জীবনের মধু ক্ষরিত হবে চিরকাল;—তাঁর পুণ্যপবিত্র নাম, মধুসূদন সরস্বতী;—যাঁকে প্রণাম করলেই হয়ে যায় সরস্বতী পূজা সমাপ্ত।

মধুসূদন সরস্বতী কাশীর তা-ই, পূর্ণিমার রাত তাজমহলের যা!

সুদীর্ঘজীবী মধুসূদনের জীবনের প্রান্তরপ্রান্তে যখন গোধূলির আলো আঁধার মুহূর্তে দীর্ঘ ছায়া ফেলে পায়ে পায়ে এগিয়ে আনছে শেষের অশেষ ক্ষণ, তখন একদিন মহাযোগসিদ্ধ প্রসিদ্ধ গোরক্ষনাথের বিদেহী সত্তার আবির্ভাব হয় মধুসূদনের স্থূলচক্ষে। গঙ্গা স্নান সেরে সিঁড়ি ভেঙ্গে উঠে আসছেন উপরে; তীরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন সূক্ষ্ম জ্যোতির্দেহে স্বয়ং গোরক্ষনাথ। জীবন্ত গঙ্গা-যমুনা দাঁড়িয়ে মুখোমুখী প্রভাতরবির প্রসন্ন কর স্পর্শ করেছে জ্ঞানরত্নাকর মধুসূদন সরস্বতীর ভাগ্যবান ললাট। পাখির কাকলি, গঙ্গার কুলুকুলু, অদূর থেকে ভেসে আসা প্রভাতী পূজার শঙ্খঘণ্টার পবিত্র শব্দ নিস্তব্ধ চরাচরে অভ্যর্থনা করতে উদ্যত সেই যুগলদর্শনকে। যোগী গোরক্ষনাথ একটি পাথর তুলে ধরলেন মধুসূদনের চোখের সামনে। সূর্যের আলোকে হার মানালো তার দীপ্তি, হেরে গেলো মধুসূদনের নিরাসক্ত দৃষ্টির কাছে। গোরক্ষনাথের বিদেহী

কণ্ঠ তখন সেই পাথরের পরমাশ্চর্য ক্ষমতাকে বিবৃত করলো : এই পরমকাম্য পাথর আমি কাকে দেব ভেবে পাইনি, তোমাকে দেখবার আগে। এ বস্তুর কাছে যে বস্তু চাইবে তাই পাবে তুমি। তোমাকে দিলাম এই দুর্লভ রতন।

হাসিতে দুচোখ ভরে গেলো মধুসূদন সরস্বতীর, সেই আশ্চর্য অনুপম অন্তের জন্য বেদনার অশ্রুজল থেকে উৎসারিত অনন্তের হাসি, —বিশ্বের বিচিত্র বাঁশিতে যার সুর মর্ত্যলোকে ক্বচিৎশ্রুত। ফুল যেমন করে বলে পাখিকে প্রয়োজন নেই তার কৃত্রিম রংএর, তেমনই করে গ্রহীতার সেই হাসি বললো দাতাকে : প্রয়োজন কি সেই পাথরের তার কাছে, অনাবশ্যক ভার ছাড়া যার মধুসূদনকে দেবার আর কিছুই নেই। যে ধনে ধনী হলে মণিরে মণি বলে মানে না স্বয়ং ভগবানের নীল নয়নমণি,—ভক্ত, সেই ধনবান, ঐশ্বর্যবান, সব চাওয়া-পাওয়ার ঊর্ধ্বে যার অবস্থান সেই মধুসূদনকে পরীক্ষার পালা তবু শেষ হয় না, গোরক্ষনাথের। তিনি সব জেনেও পীড়াপীড়ি করতে থাকেন মধুসূদনকে পাথর নেবার জন্যে। মধুসূদন স্বীকৃত হন একটি শর্তে। শর্ত হচ্ছে, মধুসূদন সেই পাথর নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা তাই করতে পারবেন। গোরক্ষনাথ মেনে নিলেন শর্ত। তখন মধুসূদন পাথরটি গ্রহণ করলেন এবং সেই মুহূর্তেই বিসর্জন দিলেন গঙ্গায়।

গোরক্ষনাথ তাকিয়ে আছেন তখন সেই দিকে যেখানে তাঁর যত কিছু দেওয়াকে না-দেওয়া করে হারিয়ে গেছে সেই পাথর অতল জলের অতলে। মধুসূদনের দিকে মুখ ফিরিয়ে তারপর বললেন : শুধু তুমি নও ; আমিও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছি মধুসূদন। তোমাকে ছাড়া এমনি আর কারুর হাতে নয় দেবার, চেয়ে দেখো ওই গঙ্গার জলের দিকে আর আনন্দে উৎসারিত আমার চোখের জলের দিকে, সে সিদ্ধান্ত আমার অভ্রান্ত। তাকে অপ্রমাণ করবার উপায় তোমার হাতেও এই মুহূর্তে আর নেই।

[ভারতের সাধক : দ্বিতীয় খণ্ড]

মধুসূদন, সরস্বতীর কাছে ছাড়া আর কারুর কাছে হার মানেননি জীবনে। সরস্বতীও হার মানতে রাজি ছিলেন বুঝি তাঁর কণ্ঠহারে শ্রেষ্ঠ ভূষণ, মধুসূদন সরস্বতীর কাছেই কেবল ; কাশীর পণ্ডিতেরা এই প্রতিভার দিকে তাকিয়ে পলক ফেলতে বিস্মৃত হয়েছেন বহুবার। বিস্মিত তাঁরা বলেছেন :

বেত্তি পারং সরস্বত্যাঃ মধুসূদন সরস্বতী।
মধুসূদন সরস্বত্যাঃ পারং বেত্তি সরস্বতী ॥

জ্ঞানের এপার-ওপার জেনেছেন দুজন। সরস্বতীর জ্ঞানের পার জেনেছেন মধুসূদন ; মধুসূদনের জ্ঞানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন শুধু সরস্বতী।

জীবনের প্রশমঃ দিবসেও যেমন, জীবনের প্রথম দিবসেও মধুসূদনের চেহারা এক। সর্বশেষ দিনে যেমন অনিঃশেষ দানের মহিমায় অশেষ দীপ্ত দুর্মূল্য দুর্লভমণি ফেলে দেওয়া জলে, প্রথম দিনেও তেমনই রাজার কাছ থেকে পিতাকে

প্রত্যাখ্যাত হয়ে ফিরতে দেখে জগতের যিনি রাজা কেবল তাঁর জন্যেই আকুল হওয়া।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে অদ্বিতীয় এই প্রতিভার আবির্ভাব দক্ষিণ বাঙলার চন্দ্রদ্বীপের অন্তর্গত কোটালিপাড়ায় পণ্ডিত পুরন্দরাচার্যের পুত্ররূপে। পুত্রকে নিয়ে স্বাধীন দক্ষিণ বঙ্গেশ্বর দর্পনারায়ণের দ্বারে উপস্থিত প্রবীণ পণ্ডিত পিতা। পুত্রের প্রতিভার পরিচয় দিতে চান রাজসমীপে। কিন্তু সময় হয় না রাজার সেই বালকবীরের কাব্য প্রতিভায় কান দেবার। সময় না হবার কারণ অবজ্ঞা নয়; দুঃসময়। মানসিংহের নেতৃত্বে দিল্লির বাদশা সৈন্য প্রেরণ করেছেন দর্পনারায়ণের দর্প চূর্ণ করতে। তাই সময় নেই কাব্যালোচনার। প্রত্যাখ্যাত পুরন্দর পুত্রকে নিয়ে ফিরছেন নদীপথে।

অনন্ত কাল ধরে বয়ে যাওয়া নদীর ওপর রাত নামছে, নির্জন, নিরুপম নিস্তব্ধ রাত তার কালো পাখা মেলে নেমে আসছে তপ্তসলিল নদীর বুক স্নিগ্ধতায় ভরে দিতে। শেষ বিহঙ্গ বন্ধ করেছে তার পাখা। নীলাঞ্জন ছায়ায় সমস্ত নদীতীরে মানুষের পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বিষণ্ণতার জীবন্ত দুই প্রতিমূর্তি বসে আছেন চুপ করে নৌকার ছই-এর নিচে। পিতা পুরন্দর; পুত্র মধুসূদন।

দীর্ঘ স্তব্ধতার ঢাকা খুলে গেলো হঠাৎ! প্রত্যাখ্যাত পিতার কোল ঘেঁসে পুত্র মধুসূদন বললো: বাবা, তুমি ফিরে যাও বাড়িতে। রাজার প্রাসাদ নয় আর; জগতের যিনি রাজা তাঁর প্রসাদ পাবার জন্যে পথে নামব আমি। দেখি, তিনি আমাকে প্রত্যাখ্যান করেন কি না!

মাথার ওপরে রাত্রির প্রহরের চাঁদের আলো সেই এসে পেঁছিলো নদীর জলে। আকাশের আশীর্বাদ এসে পেঁছিলো পৃথিবীর কপালে। যাত্রা হলো শুরু। জীবনের জয়যাত্রা!

॥ তিন ॥

দেশের রাজা বিমুখ করলে সব কালের সব দেশের যিনি অদৃশ্য মালিক, যিনি জগতের রাজা তাঁর দিকে মুখ তুললেন মধুসূদন সরস্বতী। চোখের জলে নদীর জলে এক হয়ে যাওয়া সন্ধ্যায় নৌকার ওপর দিয়ে নদীপারের কথা মনে হলো না সেই বালক বীরের। তার মন উন্মুখ হলো সেই সোনার তরীর জন্যে জীবনের বন্ধনমুক্তির তীরে পেঁছে দিতে পারে যে-ই শুধু। আকাশের তারারা আজ চোখের তারায় জেবলে দিলো সহসা সেই দীপ, যার আলোয় চেনাপথের নিরাপদ রাস্তা ছেড়ে অচেনার, যুগে যুগে যিনিই কেবল চিরচেনা, তাঁর উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুবার অনুমতি প্রার্থনা করলেন পিতৃপদে বালক মধুসূদন!

জ্ঞানবৃদ্ধ পুরন্দরাচার্য দর্শনের পাতায় যাঁকে হাতড়ে মরেছেন এতকাল, আজ তাঁরই আত্মজ, তাঁর আত্মজ চোখের পাতায় তাকে দর্শন করবার চাইছে নির্দেশ।

কি করে তিনি তাকে বলেন,—'না'? মধুসূদনের কাব্যপ্রতিভা, স্মৃতিশক্তি বয়সের তুলনায় অনেক বেশী বিদ্যার পিতৃ অহংকার আজ পুত্রের বিদায় প্রার্থনায় কেঁদে উঠলো করুণ বিপ্রলম্ভে। তবু বলতে পারলেন না, যেতে দেব না। কারণ সেই বিদ্যাবৃদ্ধ আচার্য জানতেন, বালক বিস্ময়ের অন্তরে এসেছে সেই বিস্ময়কর আহ্বান, যার ডাকে সাড়া না দিয়ে মানুষ সকল দেশে সকল কালে একান্ত নিরুপায়! সেই আহ্বান, অন্তরের অন্তস্তল থেকে উৎসারিত সেই উদাত্ত আহ্বান একবার যার কানে গেছে কোটি জন্মে আহৃত সুকৃতির কারণে নয়, অহৈতুকী কৃপার অকারণে, তার প্রাণে জেগেছে সর্বনাশের সাধ। যাঁর আশ করলে তিনি সর্বনাশ করেন; তবুও যাঁর আশ করলে তবেই হন যিনি দাসানুদাস,—আজ অপরূপ রূপকথার মতোই আধো আলোছায়ার রাতে নির্জন নদীতীরে নৌকার ওপর অশ্রুধৌত বালকের চোখের সীমায় সহসা ধরা দেয় অসীমের আভাস!

সাক্ষী থাকে শুধু অনন্তকালের সঙ্গে অন্তকালের মুহূর্তের জন্য মাল্য-বদলের মিলনক্ষণে জ্বালা পূর্ণচন্দ্র।

চোখের জলে নদীর জলে একাকার অন্ধকারে হঠাৎ ছড়িয়ে যায় বাঁধ ভেঙ্গে চাঁদের হাসি। সেই আলো অলৌকিক, কিন্তু অলীক নয়। সেই আলোতে ভালো করে পুত্রমুখ নিরীক্ষণ করলেন দুর্লভভাগ্য পিতা পুরন্দরাচার্য। দেখলেন সেই দুর্মর দীপ্তি উদ্ভাসিত অরুণবহ্নি-আলোকিত আননে, সেই ছবি, যে ছবি নিশীথ রাত্রে দুগ্ধফেননিভ শয্যায় শায়িত আপন রমণী ও পুত্রকে পরিত্যাগ করে পথে বহির্গত রাজপুত্র গৌতমকে দেখে থাকে যদি কেউ শুধু সে-ই দেখেছে; সেই ছবি,—নিদ্রিত বিষ্ণুপ্রিয়ার কাছ থেকে বিদায় মুহূর্তে নিমাই-এর মুখে যার আশ্চর্য আলো জ্বলেছিল সে কবে, সেই এক ছবি—সেই 'এক'-এর ছবি যার মনে জেগেছে একবার আর মুছে গেছে জগতের সব ছবি। সেই এক-এর ছবিতে জগতের সব ছবি-র যাতে একদিন হতেই হবে একাকার!

জীবনের চলচ্ছবি মুছে যায় পুরন্দরাচার্যের কাছ থেকে; জেগে থাকে নদীর ওপর দিয়ে ভেসে যাওয়া পুত্রের মুখচ্ছবি! সেই 'এক'-এর জন্যে একান্ত উন্মুখ এক ছবি!

পিতার কাছ থেকে অনুমতি পেলেন মধুসূদন। কিন্তু মায়ের কাছ থেকে? অনেক চোখের জলে আর পুত্রের একটি কথার শেষ পর্যন্ত কথা দিতে হলো মাকেও। মধুসূদন কথা দিলেন যে তিনি একেবারে নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছেন না; শ্রীগৌরাঙ্গ দর্শনে যাচ্ছেন এখন নবদ্বীপে।

নবদ্বীপে-ই তো যেতে হবে প্রথমে; নবদ্বীপ জ্বলেছে যাঁর চোখে, চৈতন্যের প্রথম প্রদীপে ভগবান শ্রীচৈতন্য ছাড়া আর কাকে চোখে পড়বে তাঁর?

যাবার আগে পুরন্দরাচার্য বললেন পুত্রকে: সন্ন্যাস গ্রহণের আগে প্রকৃত

জ্ঞান গ্রহণের চেষ্টা কোরো। কবি হলে পুরন্দরাচার্য বলতেন, তিনি শুধু গানের ওপারে নয়, তিনি দাঁড়িয়ে আছেন জ্ঞানের ওপারেও। তবু জ্ঞানের অধিকার না পেলে তাঁর জয়গানের অধিকার থেকে যায় অকরায়ত্ত!

ঘর থেকে পথে নামলেন সেই বালক, পথ থেকে উঠবার সময় হয়নি যার তখনও।

নিঃসম্বল, ঘরছাড়া, পথহারা আত্মহারা এক বালক এসে পেঁছয় নদীতীরে। যার ওপারে চলেছে পথ নবদ্বীপে পেঁছবার পা নির কড়িবিহীন সেই প্রতিভাধর বিস্ময়কর বালককে কে পেঁছে দেবে ওপারে? কে পেঁছে দেবে? কে পেঁছে দেয় কোনও কোনও ভাগ্যবানের সোনার তরী তাঁর পায় এ পৃথিবীর অসীম সিন্ধু যে কৃপাসিন্ধুর সীমার জন্যে সীমাহীন অশ্রুজলের প্রতীক মাত্র!

কে পার করে আর সে ছাড়া অনাদি অনন্তকাল ধরে পারাপার জানি না যার সে ছাড়া কে আর! পঙ্গুকে যে দেয় পা পাহাড় ডিঙোবার, অন্ধকে যে দেয় আলো। অসীমকে যে দেয় সীমা, দ্রৌপদীকে যে রক্ষা করে দুঃশাসন থেকে, সেই মধুসূদন ছাড়া মধুসূদনকে কে নিয়ে যাবে সেই পারে যার এপারে মধুসূদন ওপারে সরস্বতী;—মাঝখানে বয়ে চলোছ স্রোতস্বতী,— নিত্যবহমান বলে সে-ই শুধু সৎ, শুধু সতী সে-ই!

দিব্যবিভায় দিগ্‌দিগন্ত দীপ্ত করে স্রোতস্বতীর অতল থেকে উঠে আসেন সরস্বতী আশীর্বাদ হাতে করে মধুসূদনের মাথায় ঠেকাতে: পার হও তুমি নদী!

পার হও নদী তুমি তবেই, বিনা পারানিতে, যদি সরস্বতীর বীণা পারো নিতে তুলে হাতে। বাজাতে পার সেই ছন্দে যে আনন্দে সকাল-সন্ধ্যে হয়, বন্ধ্যা বসুন্ধরা হয় ধনধান্য পুষ্পভরা, নদীতে বান ডাকে, সমুদ্রে লাগে পূর্ণিমার প্রেম, পাখি গান গায়, বাতাস বয়ে আনে তার খবর অনাদিকাল ধরে, আকাশ যার অভিসারে হয় নীলাম্বরী, সেই নীরব সরস্বতী যার কণ্ঠস্বর তিনি ছাড়া আর কে পেঁছে দেব মধুসূদন সরস্বতীকে ওপারে, যে পারে জীবনের কেকা এখনও নীরব কেন, এপারে যার কুহু মুখর হয়ে উঠেছে এই মুহূর্তে,— কে জানে!

একটু বাদেই দেখা গেলো জেলেদের নৌকা আসছে পারানির কড়িহীন বালককে পেঁছে দিতে ওপারে!

নন্দপুরচন্দ্রহীন বৃন্দাবনের মতোই নিমাইবিহীন নবদ্বীপ তখন অচৈতন্যপ্রায়। শ্রীগৌরাঙ্গ চলে গেছেন তখন নীলাচলে; নবদ্বীপ ছেড়ে। মধুসূদন তবুও নবদ্বীপেই রয়ে গেলেন ন্যায়শাস্ত্রাধ্যয়নে। পাঠ করলেন আচার্য মথুরানাথের পায়ের কাছে বসে; কিন্তু শান্তি পেলেন না। শ্রীগৌরাঙ্গের স্বপ্নে বিভোর

মধুসূদন। প্রস্তুত হলেন শ্রীগৌরাঙ্গের দ্বৈততত্ত্বের উজ্জ্বল বিকাশের সমর্থনে মহাগ্রন্থ রচনায়। কিন্তু দ্বৈতবাদ সমর্থনের আগে পারঙ্গম হওয়া প্রয়োজন অদ্বৈতবাদে। অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন না করলে দ্বৈতবাদ দাঁড়ায় না। আর অদ্বৈতবাদের জটিল অরণ্যে পৌঁছবার একমাত্র পথ বারাণসী। কাশীতে গিয়ে উঠলেন মধুসূদন স্বামী রামতীর্থের সান্নিধ্যে।

তিনি যাকে আঘাত করবার জন্য উদ্যত হয়ে এসেছিলেন কাশীতে এসে দেখলেন তিনিই 'সেই'। তিনি এবং ব্রহ্ম অভেদ এই জ্ঞান তাঁকে নবদ্বীপ দেয়নি; দিলো কাশী। তিনি অনুতপ্ত হলেন। বিবেকের কাছে অপরাধী হলেন কেন অদ্বৈতবাদকে খণ্ডন করবার কারণে কপটাচরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন গুরু রামতীর্থের কাছে।

রামতীর্থ বললেন: তুমি আজ যাকে হনন করতে এসেছিলে তাকেই বরণ করেছ, তোমার পাপ কোথায়? তবুও যদি অনুতাপ-অনলে জ্বলতে থাকো অহর্নিশ তাহলে সন্ন্যাস গ্রহণ কর তুমি; সর্বপাপ-মুক্ত হবে মুহূর্তে। আর? আর রচনা কর, দ্বৈতবাদীদের ন্যায়ামৃত গ্রন্থের প্রতিবাদ। এমনভাবে খণ্ডন করো তাকে যাতে অদ্বৈতবাদ অস্বীকারের দুঃসাহস না হয় আর কারুর।

বিশ্বেশ্বর সরস্বতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পর মধুসূদন সরস্বতী সেই মহাগ্রন্থ রচনা করেন যার নাম অদ্বৈতসিদ্ধিঃ। একাধারে নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক মধুসূদন সরস্বতী এই গ্রন্থে দ্বৈতবাদী আচার্য ব্যাসতীর্থের ন্যায়ামৃতকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলেন।

এই মহাপ্রাজ্ঞ মহৎ বিজ্ঞানী অদ্বিতীয় অদ্বৈতবাদী মধুসূদন আবার নিজের কলমের মুখেই বলেছেন: কৃষ্ণের চেয়ে বড়, কৃষ্ণের পর আর কি পরতত্ত্ব আছে তা তিনি জানেন না। এ কথায় যাঁরা মর্মাহত হন মধুসূদন তাঁদের মর্মগত নন। সাকার থেকে নিরাকার, উপাস্য পরতত্ত্ব থেকে নির্গুণ পরমতত্ত্বে প্রয়াণের পথে মধুসূদনের কৃষ্ণতত্ত্ব, মধুসূদনের অদ্বৈততত্ত্বের খণ্ডন নয়; মুখশ্রীমণ্ডন।

মধুসূদন সরস্বতীর কাছে অদ্বৈতবাদের দুর্বলতা জানতে আসেন দ্বৈতবাদী ব্যাসরাম প্রেরিত কপট দূত। ঠিক যেমন করে নিজের অভিপ্রায় গোপন ক'রে একদিন মধুসূদন গিয়েছিলেন স্বামী রামতীর্থের কাছে। আজ বিধির বিধানে একই উদ্দেশ্যে ব্যাসরাম এসেছেন মধুসূদনের কাছে। পার্থক্যের মধ্যে কেবল এই যে, মধুসূদন জেনেছেন ব্যাসরামের আসার উদ্দেশ্য। তবুও, তবুও বিমুখ করেন না প্রার্থীকে। কর্ণ যেমন প্রাণরক্ষার কবচকুণ্ডল খুলে দেন প্রার্থীকে সব জেনে; কারণ প্রার্থনার উত্তরে 'না' বলতে পারেন নি কারুর কর্ণে মহাবীর কর্ণ, তেমনই মধুসূদন হাসেন তাঁকে হত্যায় উদ্যত মুষ্টিতে তুলে দিতে গিয়ে মধুসূদন-বধের সবচেয়ে সাংঘাতিক মারণাস্ত্র!

একদিন, অনেক দিন আগে নিমাই পণ্ডিত তাঁর পুঁথি ফেলে দিয়েছিলেন জলে, সহপাঠীর চোখে জল দেখে। নিমাই-এর পুঁথি বেঁচে থাকলে তার রচনার

মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, এই চিন্তায় ম্রিয়মাণ বন্ধুর চোখের ওপর নৌকা থেকে নদীতে ফেলে দিয়েছিলেন নিজের কীর্তি—সমস্ত কীর্তির চেয়ে মানুষ যে অনেক মহৎ তারই প্রমাণ দিতে। আজ আরেক দিন, অনেক দিন পরে শ্রীকৃষ্ণভক্ত, শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যভক্ত অথচ অদ্বৈতবাদী, অদ্বিতীয় বৈদান্তিক আরেক জন, –একথা জেনে যে তাঁর কাছে অদ্বৈতবাদের রহস্য জানতে এসেছে অদ্বৈতবাদ খণ্ডনের জন্যে, তবুও ফেরালেন না সেই প্রার্থীকে ; কেন ? এর রহস্য যে অবগত হবে সেই কেবল মর্মগত করতে পারবে বৈদান্তিক মধুসূদনের এই পরমাশ্চর্য প্রণতি শ্রীকৃষ্ণের পায় :

কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে ॥

দুটি সাধনার ধারাই, ভক্তি ও জ্ঞানের, মধুসূদনের ধ্যেয়ানে, মিলিত হয়েছে তারা। তাই সেই মধুসূদনের সঙ্গেই নাম করি এই মধুসূদনের। তাই, সরস্বতীর সঙ্গেই প্রণাম করি মধুসূদন সরস্বতীকেও।

॥ চার ॥

ভারতবর্ষের পথে এই কাশীতে একদিন এসেছিলেন সেই চির পথখ্যাপা হুয়েন সাং। আর ফা-হিয়েন। কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত তাঁদের লিপিতে আশ্চর্য বাস্তব। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও সপ্তম শতাব্দীর কাশীকাণ্ডের সেই বর্ণনা পড়লে রোমাঞ্চিত হতে হয়। ধন-জন-যৌবনের গরিমায় নয় ; বিদ্যা, ধর্ম, সংস্কৃতির মহিমায় কাশীর মস্তক সেদিনও সব চেয়ে উন্নত। কাশী এই অনাদি অনন্ত ভারতের মতোই চির নূতন ও চির পুরাতন।

আত্মার যেমন মৃত্যু নেই, তেমনই ভারতাত্মা কাশীও অমর।

এই কাশীবৃত্তান্তের কথা বলতে গিয়ে প্রায় সব বিদেশী পর্যটক এক বাক্যে বলেছেন যে, আর্যদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপনেরও আগে কাশীর পত্তন। হ্যাভেল সাহেব বলছেন যে, it is not unreasonable to conjecture that even before the Aryan Tribes established themselves in the Ganges Valley, Benares may have been a great centre of primitive Sun-worship, and that the special sanctity with which the Brahmins have invested the city, is only a tradition of those primeval days, borrowed, with so many of their rites and symbols, from their turanian predecessors.

[Benares, the Sacred City : E. B. Havell]

কিন্তু ঘটে যা তা সব সত্য নয়' ; ভারতের আত্মা কাশীর সেই কবি কোথায় —যাঁকে বলব : 'কবি, তব মনোভূমি' কাশীর জন্মস্থান, ইতিহাসের চেয়ে অনেক বেশি সত্য জেনো।

কাশীই সেই একমাত্র স্থান ভারতবর্ষে যার বয়েস হয়েছে কিন্তু যার বার্ধক্য নেই। চিরকালের সেই ভারত, দিনযাপনের দুশ্চিন্তা, প্রাণধারণের গ্লানি থেকে মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করেছে যে নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় বলে সে ক্ষেত্র বন্ধন-মুক্তির কুরুক্ষেত্র কাশী ছাড়া আর কি! এখনও এর পথের ধুলো সেই পায়ের ছাপে পবিত্র ভারতবর্ষের ইতিহাস বলতে আমি যাঁদের পদচিহ্নকেই কেবল বুঝি। ইতিহাস যুদ্ধের নয়; ইতিহাস বুদ্ধের। ইতিহাস যুদ্ধের—ঠিক; কিন্তু মানুষের ইতিহাস শুভের সঙ্গে অশুভের, ভালোর সঙ্গে মন্দের আলোর সঙ্গে ছায়ার। নিত্যের সঙ্গে অনিত্যের নিরন্তর দ্বন্দ্বের চিরন্তন দর্পণ ছাড়া আর কিছু নয়। এবং কাশী ভারতের অবিনাশী দর্পণ।

ভারতবর্ষের কবি বলেছেন, 'ওরা কাজ করে'! কারা? যারা জলে জাল ফেলে, যারা মাঠে ধান বোনে, যারা তাঁত চালায়। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হলেও বিধ্বংস হয় না যারা, তারা কেবল জেলে-চাষী-তাঁতি-কুমোর-ধোপা-মুচি-মেথর নয়; কবি বললেও—নয়। এরা আমাদের প্রাণধারণের দিনযাপনের অপরিহার্য অঙ্গ। এরা সংসারের চাকা চালু রাখে। ঠিক। কিন্তু সংসার এক চাকায় চলে না। তার আরেক চাকা যারা চালায় তারা জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-ধ্যানী-প্রেমী-সন্ন্যাসী। মানুষের সংসারে কেবল ব্রেড নয়; কেবল বাটার নয়; তার ওপরে বাটারফ্লায়ের স্বপ্ন। শত শত সাম্রাজ্য গুঁড়িয়ে যায়, মুড়িয়ে যায় উন্নত উদ্ধত রাজমস্তক, তার ওপরে যারা থাকে মানুষের ধ্যানে, মানুষের অশ্রুতে হাসিতে, বিরহে ভালোবাসায়, গ্রহ-গ্রহান্তরের জয়যাত্রায় ছায়া ফেলে যারা তারাও মানুষের আলো আশার প্রতীক। মানুষের মনের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে ওরা কাজ করে'। জ্ঞানী-বিজ্ঞানী-কবি-ধ্যানী-প্রেমী-সন্ন্যাসী,—এরা মনের কুমোর মানুষের। অনন্তকাল ধরে মানুষের মন নিয়ে ভাঙা-জোড়ার খেলা শত শত সাম্রাজ্য ভাঙ্গা-চোরার পরেও শেষ হবার নয় কোনওদিন।

কোনও কোনও আধুনিক পণ্ডিত ধর্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিবাহদানের নূতন প্রস্তাবে নূতন কিছু বলবার আনন্দে দেখতে পাই আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন অতি সাম্প্রতিক কালে। রেলিজিয়ান কথাটা জিবে এলে তাঁদের সেকুলার ব্যক্তিত্বের জাত যায়; তাই রেলিজিয়ান বা ধর্মের বদলে স্পিরিচুয়ালিজম বা আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে সায়ান্স বা বিজ্ঞানের মিতালীর কথা বলেন। তাঁরা হিন্দু ভারতের ধর্ম বা বিজ্ঞান কি, কোনওটারই খবর রাখেন না। হিন্দুর কাছে ধর্ম হচ্ছে তাই যার মধ্যে মানুষের কর্ম, জ্ঞান-বিজ্ঞান-আধ্যাত্মিকতা ওতপ্রোত হয়ে আছে। ভারতবর্ষের ধর্ম কোনও অদৃশ্যলোকে অদ্ভুত কোনও বাক্সবন্দী আজব বস্তু নয়। ধর্ম বলতে ভারত কি বোঝে আধুনিক ভারত যেদিন আবার তা বুঝবে সেদিনই সে বুঝবে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের চেয়ে মানুষের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব কত বেশি কাম্য; কত দুরন্ত প্রয়োজন।

কেউ কেউ একথাও বলেন ওই দলের যাঁরা দলী সে সাধুরাই ভারতবর্ষের

সর্বনাশ করেছে! কারণ সাধুরা কোনও কাজ করে না। সাধু বলতে এরা বোঝে সন্ন্যাসীর ছদ্মবেশকে। সাধু মাত্রই সন্ন্যাসী; কিন্তু সন্ন্যাসী মাত্রই সাধু নয়। শ্রীরামকৃষ্ণশিষ্য নাগ মহাশয় সন্ন্যাসী ছিলেন না প্রচলিত অর্থে। সাধু ছিলেন তিনি; কিন্তু তাঁর চেয়ে বড় সন্ন্যাসী তো সম্ভবত সেকালে এবং একালে, এদেশে এবং ওদেশে কোথাওই হাত বাড়ালেই মেলে না। স্বামীজী স্বয়ং স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হননি যে নাগ মহাশয়ের মতো মহাপুরুষ তিনি আর একটিও দেখলেন না।

ভারতবর্ষের ইতিহাস ধর্মের ইতিহাস; সাধুদের স্বপ্ন, আর সাধনা দিয়ে গড়া! কাশী তাই ভারতের মর্ম এবং কর্মকেন্দ্র। ওরা কাজ করে! নিরলস নিরন্তর কাজ করে চলেছে ওরা। ওই যারা পথের উপর পেতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সিংহাসন। রোগ-শোক দুঃখ-যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ-মৃত্যু-মহামারী জর্জরিত মানুষের প্রতি মুহূর্তের ভয় বিদূরিত করার, নিঃশঙ্ক, নির্মল, নিরুপম মুক্তি মন্ত্র উচ্চারণের দুঃসাহস যাদের! অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতয় মানুষকে নিয়ে যাবার নির্লিপ্ত সাধনা যাদের যুগযুগান্তরের কখনও নিষ্প্রভ হবার নয়। শত শত সাম্রাজ্যের ধ্বংস শেষ পরে আজও ওরা কাজ করে, যাদের ক্রোধে আমরা হনন করেছি, সংশয়ে রক্তাক্ত করেছি। এখন প্রেমে যাকে পুনরাবিষ্কার করব আবার!

পশ্চিম দিগন্ত জুড়ে প্রলয়ের ঝড় আসছে যখন, মানবসভ্যতা বিলুপ্তির গুণছে বিষম প্রহর তখন কবিকণ্ঠে আমরা বলব ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর, এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা! ভারতবর্ষের, অনাদি অনন্তকালের সেই বিহঙ্গ গান থেমে যাবার নয়, যাদের কণ্ঠে মানুষকে অমৃতের পুত্র বলে প্রথম আহবান হয়েছে ধ্বনিত এবং ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাসে আজও যা বিরামহীন প্রতিধ্বনিত!

সেই ভারতবর্ষকে পুনরাবিষ্কার করছি কাশীর এই ইতিবৃত্তে! কারণ কাশীই ভারতবর্ষের ইতিহাস।

॥ পাঁচ ॥

পরমাশ্চর্য সেই পদ্মগন্ধ আসছে কোথা থেকে? অনেক দূরের কোনও দুরন্ত দর্গম বন থেকে? নাকি কারুর গভীর আনন্দে উজ্জ্বল, সীমার জন্যে সীমাহীন বেদনায় উচ্ছল কোনও মন থেকে, আজ বহুক্ষণ থেকে কেন আসছে তাঁর সুবাস,—দূষিত মল যাঁর করুণায় হয় পূজার পরিমল; পদ্মের দেহ থেকে নয়; সেই দেহপদ্ম থেকে আসছে এই দুঃখ দূর করার দুরন্ত গন্ধ, নিঃসন্দেহ! কিন্তু সে কি করে সম্ভব? মরলোকের আকাশ কেন ছেয়ে যাবে অমরলোকের

আলোয় ? অন্তের ইন্দ্রিয়ে লাগবে কেমন করে ইন্দ্রিয়াতীত অনন্তের কাননে ফোটা পারিজাত ! পুষ্পের পুণ্য, পূর্ণ স্পর্শ ? অন্তহীন দুঃখের অমারাত্র রাঙবে কেন অকস্মাৎ অনন্তের আনন্দ-পূর্ণিমায় । রোগীর কালো মুখে ছড়িয়ে যায় আরোগ্যের আলো । ম্লান বিষণ্ন মুমূর্ষু অবসন্ন হতাশ হতভাগ্য প্রকোষ্ঠে মুহূর্তে উৎসারিত হয়ে ওঠে জীবন নির্ঝরিণী প্রচণ্ড আবেগে ! মৃত্যুর কিংকিণী দূরশ্রুত হয়ে আসে অচিরে । পাপ পরিশ্রুত হয় পুণ্যের মার্জনায় । দুঃখের মৌন আনন্দমুখর হয় সেই । আর শয্যার ওপর উঠে বসে হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদীর বালিকাকন্যা । অন্তের পদধ্বনি মিলিয়ে যায় দূরে । কাছে আসে অনন্তের পদধ্বনি । মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চ লাগে সেই ! ওই মহামানব আসে । সুবাসে ভরে যায় বাতাস । আলোয় আকাশ ভরে ।

বিছানায় উঠে বসে বালিকা । উঠে বসে নির্দ্বিধায় নিষ্কম্প্র কণ্ঠে বলে : বাবা, গুরুজী এসেছিলেন আজ ! এইমাত্র আমার মাথার কাছে এসে, হেসে ভালোবেসে বলে গেলেন : বাপ থাকতে আবার মেয়ের ভয় কি রে !

মৃত্যুর মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসে জীবনের মৃত্যুহীন সংগীত !

আসতে হবে তাকে ; হাসতে হবে ; ভালোবাসতেই হবে যে তাঁকে । এই পৃথিবীর পথে পথে কাঁকর ছড়ানো হোক যত,—তারই ওপর যে তাঁর বার বার অপার করুণার ঝরণা ঝরানো ।

হীরালাল ভোগীলাল ত্রিবেদীর বালিকা কন্যার মৃত্যুশয্যার পাশে এসে যিনি দাঁড়িয়েছিলেন ; হেসে, ভালোবেসে বলেছিলেন, দেহত্যাগ করে যাবার ছ'বছর পর, 'ভয় নেই,' তিনিই কাশীর বিশুদ্ধাত্মা বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস । কাশীর আবালবৃদ্ধবনিতা যাঁকে আদর করে ডাকে, গন্ধবাবা । দেহত্যাগ করে যাবার পরেও আজ যিনি শিষ্যের অকালে দেহত্যাগ রোধ করতে এসে দাঁড়িয়েছেন সেই মুহূর্তকে অশেষ মুহূর্তে উত্তরিত করতে । ভগবানের দূতকে দেখে আজ ফিরে গেছে তাই মৃত্যুদূত ! কথা রেখেছেন তিনি ! শঙ্খের মুখে যাঁর অসংখ্যবার ঘোষণা : সম্ভবামি যুগে-যুগে । শুধু রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত আহত ধর্মের আরোগ্যে নয় ; ভক্তের বোঝা বইতে ভগবানের দূতেরা আসেন বার-বার শয়তানের কবল থেকে ছিনিয়ে নিতে শরণাগতকে ।

মরদেহে অমরদেহের অধীশ্বর গন্ধবাবা ; যতদিন জীবিত ছিলেন সেই চির-জীবিত বার-বার বলেছেন : সেই হচ্ছে গুরু যাঁর শক্তি আছে শিষ্যের গুরুভার বইবার । নিশ্চয় তাই । গুরুর চেয়ে সম্পদ বা বিপদ কখনও নয় গুরুতর ! চোখের সামনে যিনি নেই ; চোখের সামনে যাঁর শিষ্য জেগে আছে সর্বক্ষণ তাঁর অকালমৃত্যুকে যদি রোধ না করতে পারেন তিনি ; মৃত্যুদূতের পথ অবরোধ না করে দাঁড়াতে পারেন ; তবে তিনি কেন হবেন ; ভগবানের দূত ।

যাঁর দু'পায় নেই জীবন-মৃত্যুর পারে পৌঁছবার উপায় ; তাঁর অন্তর তবে বিশুদ্ধ হবে কেন ?

সীমার গণ্ডিতে অসীমের আহ্বান কোনও কোনও ভাগ্যবানের কানে আসে অতি অল্প বয়সে। প্রাণে বাজে বিজয়াহীন পূজার আরতির আলো ; এসে পড়ে জীবনের আকাশে ভোরের আলো ভালো করে জাগতে না জাগতে। লোকে অবাক হয় ; ভাবে এ-বুঝি অলৌকিক কিছু। 'ক' বলতে প্রহলাদ যে কৃষ্ণ বলে ; তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই ; অবিশ্বাসেরও না। ধ্রুবকে নিয়ে জলবিহারে বেরিয়েছেন নারায়ণ। মনুষ্য অস্থির পাহাড়ে ঠেকছে সেই তরণী। বিস্ময়াবিট বালক প্রশ্ন করেছে নারায়ণকে : এ কার হাড়। শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি উত্তর দিয়েছেন : তোমার ; ধ্রুব আবার প্রশ্ন করেছে : আমার ?—হ্যাঁ তোমার ; তোমার জন্ম-জন্মান্তরের হাড় জমে জমে হয়েছে পাহাড় ; বহু জন্মের সাধনার বাকী ছিলো যেটুকু, সেটুকু শেষ করতে এসেছ এবার ; তাই জন্মেই তুমি চেয়েছ আমাকে !

শুধু ভগবানকে নয়। জন্মেই কেউ লেখে, কেউ গান গায়, কেউ ছবি আঁকে, কেউ সন্ন্যাসী হতে চায়, যে, এর কারণ আর কিছুই নয়, কেবল জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার ছাড়া। তুমি যা করতে এসেছ, পাঁক তুলতে, অথবা পদ্ম ফোটাতে, কিংবা পদ্মনাভের দেখা পেতে, তোমার উপায় নেই, কেবল তাই না করে !

বিশুদ্ধানন্দ পরমহংসর বাল্যকালের নাম ছিলো ভোলানাথ। বারো বছর বয়সে, এক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে অঘটন ঘটন যাঁর কৃপায় তাঁর দু'পায় জীবন মৃত্যুর বন্ধন মোচনের উপায় জানবার আহ্বান আসে জীবনে। সেই আহ্বান, যা যার কানে গেছে, সব বাসনা তার সোনা হয়ে গেছে, ঘর যার কাছে মনে হয়েছে কারাগার, পথ যাকে করেছে পাগল, সব পথের শেষ যে 'এক' দাঁড়িয়ে আছে গানের ওপারে ; জ্ঞানের ওপারে, তারই জন্যে তুচ্ছ করে আরাম আর নিরাপদ আশ্রয়ের বিলাস বেরিয়ে গেছে সে জন্ম-মৃত্যুর নাগপাশ থেকে চিরকালের মতো ! সেই আহবান জীবনের প্রভাত বেলায় ডাক দিলো শিশু ভোলানাথকে।

বারো বছরের বালক। কুকুর কামড়ানোর দুরারোগ্য যন্ত্রণায় নদীগর্ভে আত্মবিসর্জনে উদ্যত। সেই একই সময়ে এক সন্ন্যাসীও জলে নেমেছেন উদাত্তকণ্ঠে জীবনের স্তোত্র উচ্চারণ করতে। মরতে প্রতিজ্ঞ বালক ; তাকে বাঁচাতে বদ্ধপরিকর তপস্বী। কি হয়েছে তোমার ? বালককে প্রশ্ন করেন চিরবালক সন্ন্যাসী। শিশু ভোলানাথের ওপর ভোলানাথ চিরশিশুর করুণা জেগে ওঠে। চোখের জলে নদীর জলে একাকার হয়ে যাওয়া নিশীথ রাত্রে নির্জন নদীকূলে বিস্ময়ে বেদনায় অভিভূত বাষ্পরুদ্ধ আবেগোচ্ছল কম্প্রকণ্ঠে উত্তর দেয় : বড় যন্ত্রণা ! কোথায় যন্ত্রণা ? বলতে বলতে সন্ন্যাসী করস্পর্শ করেন ক্ষতস্থানে। বেদনা দূর হয় ; যন্ত্রণার হয় উপশম। উধাও হয় সাধু। ক্ষতস্থান থেকে অক্ষত অবস্থানে প্রত্যাবৃত বালক ভাবে, একি অলীক, না, অলৌকিক ? স্বপ্ন, না মায়া ? ইন্দ্রজাল, না, ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি।

ভোলানাথের পক্ষে ভোলা অসম্ভব হয় আরোগ্যের উৎস সন্ন্যাসী চিরভোলানাথকে।

আবার পরের দিন সেই নির্জন নদীতীরে। এদিন আরও বিস্ময়ের বাকী ছিলো। সন্ন্যাসীকে নদীর জল তুলে নিতে হয় না। প্রসারিত হস্তে নদী আপনি এসে ওঠে; আপনি নেমে যায়। ভোলানাথ কেঁদে তাঁর দু'পায় পড়ে। কুকুর কামড়ানোর যন্ত্রণা থেকে নয়; জীব-যন্ত্রণার হাত থেকে উদ্ধারের উপায় জানতে চায় এক শিশু আরেক শিশুর দু'পায় পড়ে। সাধু কাছে এসে, হেসে, ভালোবেসে বলেন : সময় হলেই সব দুঃসময় দূর হবে। এখন কানে তোমার যে বীজ দিচ্ছি তাকে প্রাণের বীণায় বাজাও রোজ।

সেই বীজ থেকে সেই বীর্য থেকে যে বীরের আবির্ভাব উত্তরকালে বারাণসীতে আবালবৃদ্ধবনিতা আদর করে তাঁরই নাম দিয়েছিলো গন্ধবাবা।

বর্ধমানের রাজপথে একদিন সেই কিশোর ভোলানাথের কানে এলো জীবনের রাজপথে বেরিয়ে পড়ার ব্যাকুল আহবান। এক অলৌকিক কীর্তির চেয়ে মহৎ এক মানুষের কথা শুনে ভোলানাথ ঢাকায় যাবার জন্যে মায়ের অনুমতি নিতে স্বগ্রাম বণ্ডুলে এলেন। বণ্ডুলের সবাই কিশোরের বাউণ্ডুলে জীবনযাত্রার বিরুদ্ধে রায় দিলেন। কেবল ভোলানাথের মা বললেন : যে যাবেই তাকে যেতে দাও। বাইশ বছর ওর আয়ু! যদি কোনও পরমশক্তির কৃপায় ওর পরমায়ু বাড়ে, চরমের কোনও সন্ধান ও পায়, তবে বাধা দেবার নিমিত্ত হই কেন?

ভোলানাথের মায়ের নাম রাজরাজেশ্বরী; জগতের যিনি মা, তিনিও রাজরাজেশ্বরী। এই মা আর সেই মা-য় তফাত কি!

রমনার বনে ভোলানাথের জীবনে দ্বিতীয় রমণীয় ঘটনা। ভোলানাথ সঙ্গ চায় নিঃসঙ্গ এক মহাপুরুষের। অনেক কাঁদাকাটা, অনেক পায়ে ধরে শেষ পর্যন্ত উপায় হয় ভোলানাথের। সন্ন্যাসী তাকে সঙ্গে নিতে রাজি হয়। যোগীর হাত ধরে ভোলানাথ চোখ বাঁধা অবস্থায় যেখানে গিয়ে ওঠে, সে স্থানের নাম, বিন্ধ্যাচল। সেখান থেকে তিব্বতের মালভূমিতে উপস্থিত হলেন তাঁরা। বিরল শক্তিধর পুরুষের অবিরল ধারায় অভিসিক্ত সেই দুর্লভপুরীকে ভোলানাথ বিশুদ্ধানন্দ পরমহংস হবার পর, জ্ঞানগঞ্জ নামে অভিহিত করতেন [ভারতের সাধক : তৃতীয় খণ্ড]।

যাঁর কৃপায় বালকের দু'পায় পর্বত লঙ্ঘনের প্রেরণা জাগে তাঁর নাম নীমানন্দ।

নীমানন্দ নিয়ে যান ভোলানাথকে আরও উচ্চে অবস্থিত গুরু স্বামী মহাতপার কাছে। আট বৎসর দুশ্চর মহাতপস্যায় উত্তীর্ণ ভোলানাথের নূতন নাম হয় বিশুদ্ধানন্দ। সাধনার শেষে অশেষ ক্ষমতার অধিকারী বিশুদ্ধানন্দের ওপর আদেশ হয় ঘরে ফিরে গিয়ে ঘরনী নিয়ে চিকিৎসাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করবার।

ঘরে ফেরবার তাঁর বাধা কোথায়, ঘোরে পড়বার বিপদ যার কেটে গেছে চিরকালের মতো।

সংসার করবার সময় চিকিৎসা বিদ্যার চেয়ে অবিদ্যা মুক্তির ঐশ্বর্যই বিশুদ্ধানন্দের কাছে টেনে আনতো সকলকে। সেই সময় স্বনামধন্য রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যে স্ত্রীর কাছে পাঁচটি গিনি লুকিয়ে রেখে আসেন। এবং এসে বিশুদ্ধানন্দকে বলেন : আপনার বিভূতির কথা শুনে এসেছি। বিশুদ্ধ আনন্দে উদ্ভাসিত আনন বলে উঠে : আমার বিভূতি কি স্ত্রীর কাছে রেখে আসা পাঁচ গিনির চেয়েও কম মনে কর তুমি, যে আমাকে পরীক্ষা করতে আস?

লৌকিক শক্তির মূল্য যত হোক অলৌকিক শক্তি যে অমূল্য, রমেশচন্দ্র তা বুঝলেন।

লৌকিক জগতে বিশুদ্ধানন্দ অলৌকিক শক্তির পরিচয় দিতেন অবিশ্বাসীকে বিশ্বাস দিতে ; সীমাকে দিতে অসীমের নিশ্বাস। ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারকে বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন চর্মচক্ষে দেখা যায় না এমন অসংখ্য দ্বার মনুষ্যদেহে বর্তমান রয়েছে, মর্মচক্ষেই যার উদ্ঘাটন সম্ভব কেবল। নিজের মুখ দিয়ে ঘিয়ে ভেজানো কাপড় ঢুকিয়ে নাভিদেশ দিয়ে তা বার করে দেখালে ডাক্তার সরকার বলেছিলেন : দেহবিজ্ঞান যে কত অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী আজ এই অভয়ংকরী শক্তির প্রকাশে তার তত্ত্ব অবগত হলাম।

দর্শন যাকে দর্শন করেনি, মন্দিরে দর্শনী দিয়ে যার দেখা পাওয়া যায়নি কোনও কালে, নিজে দেখা দিলে তবেই দেখানো যায় এই দেহতে দেহাতীতের শক্তি!

সাধুর বেশে এক অসাধু এসেছে সেবার বিশুদ্ধানন্দের কাছে। সাধুর সম্বল এক শিবলিঙ্গ। তার দিকে কেউ তাকাতে পারে না বেশীক্ষণ। বিশুদ্ধানন্দ দৃষ্টি দিলেন তার ওপর। সেটি খণ্ড খণ্ড হয়ে ভেঙ্গে গেলো তৎক্ষণাৎ। কেঁদে উঠলো অসাধু। সাধুকে পরীক্ষা করতে আসার অনুশোচনায় নয়। শিবলিঙ্গটি অন্যের। ভাঙা শিবলিঙ্গ এখন জোড়া লাগায় কে? কান্নায় বিগলিত বিশুদ্ধানন্দের চোখজোড়ায় কৃপা নামে। নিজের হাতে তাকে জুড়ে দেন তেমনই অনায়াসে, এ বিশ্বকে অনন্তকাল ধরে প্রলয় পয়োধিজলে ভাসাবার পর যেমন করে আবার জোড়েন সব ভাঙাগড়ার মূলে যিনি তাঁরই মতো দৃষ্টিপাত মাত্র সৃষ্টি করেন আবার নূতন শিবলিঙ্গ। অক্ষত অনাহত ; অভঙ্গ।

দর্শনের দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যাতা স্বর্গত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তকে বিশুদ্ধানন্দ বলেছিলেন : তুমি কেন মিথ্যে করে বলছ, তোমার কিছু হলো না? অর্থ হোলো, নাম হোলো, আর অহংকার, তা তো হোলো সব চেয়ে বেশী। আর তো তুমি কিছু চাওনি। কাশীতে হনুমান ঘাটে বাস করেন তখন বিশুদ্ধানন্দ। কিন্তু বর্ধমান জেলার এক বালিকা কাশীতে চিঠি লিখে জানায়

সেখানে বিশুদ্ধানন্দ তাকে দেখা দিয়ে বলেছেন যে তাঁর নাম ভোলানাথ, উপস্থিত প্রকাশ বিশুদ্ধানন্দ নামে ; কাশীতে বর্তমান অবস্থান [ভারতের সাধক ; তৃতীয় ভাগ]।

ধর্মকে রক্ষা করবার জন্যেই তাঁর আবির্ভাব এ কথা কে বলে ? অধর্মের মুক্তি প্রার্থনায়ও করুণার মুক্তধারা নামে অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখর, অসীমকালের মহাগহ্বর থেকে। অহল্যার শাপবিমোচনের জন্যেই তো শ্রীরামচন্দ্রের অশ্রু-মোচন। জগাই মাধাই উদ্ধার যদি না হলো তো চৈতন্য সার্থক হবে কি করে। হিংসার পূজারী যদি অহিংসার পূজায় শোক থেকে উত্তীর্ণ না হোলো অশোকে তো বুদ্ধের প্রবুদ্ধের আর প্রয়োজন কি। বিশুদ্ধানন্দের কাছে অশুদ্ধ আনন্দের রসিকেরা এসে যদি তার সন্ধান না পেলো, স্পর্শ না পেলো রমণের চেয়ে সীমাহীন রোমাঞ্চের আকর পরম রমণীয়র, তা হলে ভগবানের দূতেরা কেন বলবেন বারবার : ক্ষমা কর ; ভালোবাসো।

জগৎ জুড়ে যত জমা কর পাপ, জগদীশ্বরের দূতেরা তত ক্ষমা কর সেই প্রতাপ।

বিশুদ্ধানন্দের দীক্ষিত এক শিষ্য এক সময়ে দুশ্চরিত্রা এক রমণীর পাল্লায় পড়েছিলো। বিবাহের পরেও কমলি তাকে ছাড়তে নারাজ। ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে সে একদিন যাচ্ছে কমলির কাছে। ধড়মড় করে উঠেছে স্ত্রী ; কেঁদে বলেছে ; আবার তুমি তার কাছে যাচ্ছো !

কেমন করে জানলে তার কাছে যাচ্ছি ? নির্লজ্জ প্রশ্ন করে তবুও স্বামী।

বাবা বিশুদ্ধানন্দ যে আমাকে ঘুম থেকে তুলে দিয়ে বললেন, তুই ঘুমিয়ে এখনও ? ওদিকে তোর সব চেয়ে বড় সম্পদ যে চুরি হতে চললো।

বিশুদ্ধানন্দ যত দূরেই থাকুন বিপদে যিনি শিষ্যের সমীপবর্তী নন, গুরুতর বিপদে নন মুক্তির দূত, তিনি কি করে হবেন কারুর গুরু।

বিশুদ্ধানন্দের কাছে এসেছেন আনন্দময়ী মা। ফুল থেকে বিশুদ্ধানন্দ তখন তৈরী করছেন স্ফটিকের দানা। শিষ্যর বিস্ময়ে হতবাক। আনন্দময়ী মা হাসছেন। বলছেন : বাবা এসব কি দেখাও ? যা নিয়ে মণিরে মণি বলে মানে না মুনিরা। তাই দাও এদের। বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন : নেয় কে ?

নেয় কে ? দেয় কে ? এর উত্তর কে দেবে ? সমুদ্রের কল্লোলে এই প্রশ্নের : উত্তরেই তো হিমালয় চির নিরুত্তর। কাশীতে বিশুদ্ধ আনন্দের সেই ধারা মরুর তলা দিয়ে ফল্গুর মতো, মরার বুকে অমরার মতো আজও অব্যাহত। দেবার জন্যে তিনি উন্মুখ। তাঁর দিকে মুখ তোলে কে ? তাঁকে চায় কে, যাঁকে চেয়ে রাজকুমার বেরিয়েছে ঘর ছেড়ে। স্ত্রৈণ ত্যাগ করেছে রূপসী নারীকে, বেলা যায় শুনে বেরিয়ে গেছে ধনীর দুলাল।

সেই কাশীর কোল আলো করে এখনও রয়েছেন আনন্দময়ী মা। শুধু কাশীর নন ; জগতের সব জায়গা জুড়ে রয়েছেন, অবিশ্বাসের অমানিশীথেও জেগে আছেন যিনি তিনি আনন্দময়ী মা নন ; আনন্দ-পূর্ণিমা।

॥ ছয় ॥

উত্তর ভারতে একদিন আর্যরা এসেছিলেন দিগ্বিজয়ের স্বপ্ন নিয়ে, হয়রাজের হ্রেষাধ্বনিতে কাশীর আকাশের কেঁপেছিলো বুক। প্রথম যুগের সেই আর্য বসবাসীরা অনার্য আদিবাসীদের বলেছিলেন 'রাক্ষস'। দ্রাবিড়দের সঙ্গে আর্যদের যুদ্ধ এবং সন্ধির ইতিহাসই কাশীর প্রাচীন ইতিবৃত্ত। দ্রাবিড়ীরা ভারতবর্ষে এসেছিলো উত্তর-পশ্চিম কোণ দিয়ে। আর্যদের মধ্যেও দ্বন্দ্ব এবং দলের অভাব ছিলো না। দুটি প্রধান দলের নেতৃত্ব ছিলো ব্রাহ্মণ বশিষ্ঠ; এবং ক্ষত্রিয় বিশ্বামিত্রের হাতে। বশিষ্ঠ ছিলেন রক্ষণশীল নীতির রক্ষণাবেক্ষক। বিশ্বামিত্র ছিলেন অনার্যগোষ্ঠীর নেতা ও উপদেষ্টা। এই অনার্যরা তাঁর নেতৃত্বে আর্যদের শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণে হয়েছিলো বদ্ধপরিকর। আর্যরা নিজেরা অগণিত অন্যগোষ্ঠীর অক্ষৌহিণীর দ্বারা প্রতিমুহূর্তে বিধ্বস্ত হবার, ছিন্ন ও ভিন্ন হবার, ছিন্নভিন্ন হবার আতংকের মধ্যে বাস করতেন। সংখ্যায় তাঁরা সেই অসংখ্যের তুলনায় ছিলেন অতি সামান্য। পাতার তুলনায় বৃক্ষের মতো; সাপের তুলনায় সাপের মাথার মণির মতো; বিদ্যার তুলনায় বইয়ের মতো আর্যরা পরিবেষ্টিত ছিলেন। সুবিপুল সমুদ্রস্রোতের দ্বারা একমুঠো দ্বীপের মতো। অসীম অন্ধকারের আচ্ছন্নতার মধ্যে দীপের মতো; কুসংস্কার, কুরুচি, কুরীতি, হত্যা, হানাহানি, অজ্ঞান অনার্যলোকে তাঁরা এনেছিলেন সভ্যতার, সুরুচির, সংস্কৃতির শুভবুদ্ধির আলোকবর্তিকা।

বিশ্বামিত্র কিন্তু আর্যদের অতিরক্ষণশীলতার বিপদ সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। যদিও সেই প্রথমদিনে, আর্যরা নিজেদের ধর্মের মধ্যে আত্মরক্ষাকারী কচ্ছপের মতো অনার্যদের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলতে চেয়েছিলো : "For a long time however, pride of race kept most of the Aryans aloof from their dark-skinned neighbours, and Brahmaarta, 'that land created by the Gods, which lies between the two divine rivers Saraswati, and Drishadati, or the part of the Punjub which they first occupied, was held to be the only soil fit for the faithful people." [Benares, the sacred city : E. B. HAVELL.]

তবুও শেষ পর্যন্ত আর্যরা গা বাঁচিয়ে চলতে পারলে না। মেনে নিতেই হলো তাঁদের তথাকথিত 'Turanian'-দের সংস্পর্শ। আর্য শিক্ষার স্রোতে এসে মিশলো আদিম স্থানীয় বিশ্বাসের উদ্দাম প্রাণবন্যা; তার পূর্ণ বিশুদ্ধ ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সঙ্গম ঘটলো আর্যমনীষার। এর ফলে জন্ম নিলো বর্ণাশ্রম ধর্ম। মনু যদিও ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র,—এই চার বর্ণের কথাই মাত্র বললেন, কিন্তু ইতিহাস বলছে, ব্রাহ্মণেরা নানা প্রদেশ, নানা সম্প্রদায়, নানা

রীতিতে এতদূর আলাদা হয়ে গেলেন যে এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আরেক শ্রেণীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে পানাহারে, পুত্রকন্যার বিবাহ-বিনিময়ে পর্যন্ত অপ্রস্তুত হলেন।

হাভেল সাহেব বলছেন, বর্ণাশ্রম যদিও বহু কুসংস্কারকে কোল দিয়েছে তবুও আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বিশুদ্ধ রাখবার প্রয়াসে বর্ণাশ্রমের প্রয়োজন ও গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। আর্য সভ্যতাকে ভারতীয় পরিবেশ এমন ভাবে আত্মসাৎ করেছে যে তার আদি ও অকৃত্রিম রূপ আজ আর কোথাও চোখে পড়ার নয়, তবুও একথা ঠিক যে এই আর্য সংস্কৃতি ও দর্শনই হিন্দুসমাজকে একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত অদৃশ্য সূত্রে বহু বৈচিত্র্যের মানিক দিয়ে গাঁথা একখানা মালার মতো ধরে রেখেছে। সেই ভুবনমনোমোহিনী মালার নাম ভারতবর্ষ আর তার বুকের মধ্যমণি তাঁর আত্মার আলোয় অবিরাম বিচ্ছুরিত যে, তারই নাম কাশী। এই কাশীতেই কেবল ভারতবর্ষের স্মরণাতীত জন্ম-জন্মান্তরের লীলা প্রত্যক্ষ করবার।

অনন্তকাল ধরে অসীম আনন্দের সেই লীলাই আনন্দময়ী মায়ের ইহলীলা!

ওপরে যে ইতিহাস বিধৃত করেছি তা ভারতবর্ষের দেহের ইতিবৃত্ত। তার আত্মার ইতিহাস আজও লেখা হয়ে চলেছে কেবল কাশীতেই। যার শুরু নেই, আর যা অশেষ তা নিয়ে কাব্য হয়; কিন্তু ইতিহাস হয় না। কাশীর তাই কোনও ইতিহাস নেই; আত্মার নেই যেমন কোনও বয়স।

এই কাশীতেই একদিন, ভারতবর্ষের চির নূতন 'পুরাণ' বলছে, রাজা ত্রিশঙ্কু সশরীরে স্বর্গে যাবার উদ্ধত, উদ্যত বাসনায় যজ্ঞ শুরু করলেন! সেই যজ্ঞের, অভাবিত, অভূতপূর্ব সেই যজ্ঞের যোগ্য পুরোহিত ধার্য করলেন ক্ষত্রিয়-বীর্য আর ব্রহ্মশৌর্যের অধিকারী বিশ্বামিত্রকে। দেবলোকে ইন্দ্রের নিশীথ-রাত্রের নিদ্রা দুঃস্বপ্নে ক্ষতবিক্ষত হতে থাকলো। স্বর্গলোকের পথে উত্থিত ত্রিশঙ্কুকে নিরস্ত করবার জন্যে ইন্দ্র প্রশ্ন করলেন: কি তোমার এমন পুণ্যকর্ম, যার জোরে এমন অভিলাষ তোমাকে সাজে? ত্রিশঙ্কু নিজেই নিজের গুণব্যাখ্যা করতে বসলেন। আর খসতে থাকলো তাঁর পুণ্যকর্মের পাখা। নামতে থাকলেন আবার নিচের দিকে। বিশ্বামিত্র তাই দেখে বললেন: তিষ্ঠ! স্বর্গ-মর্ত্যের মাঝখানে ত্রিশঙ্কু দাঁড়িয়ে গেলেন। কিন্তু বিশ্বামিত্রের থামলো না প্রয়াস; নবস্বর্গ রচনা করে দিলেন মধ্যপথে; নব নব গ্রহ উপগ্রহ তারকায় দীপ্যমান সেই দ্বিতীয় স্বর্গে দীপ্তিমান হলেন ত্রিশঙ্কু, অদ্বিতীয় বিশ্বামিত্র বরে।

ইতিহাসের অমোঘ পুনরাবৃত্তি আজ চোখের ওপরেই প্রমাণ করছে যে, পুরাণ আজও পুরানো নয়। আজও স্বর্গ-মর্ত্য, বিশ্বাস ও বিজ্ঞানের মাঝখানে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলছে মানুষ। দ্বিতীয় আরেক অদ্বিতীয় স্বর্গের সন্ধান দেবে তাকে এমন বিশ্ব-মিত্র কই।

কবি বলেছেন বিশ্বামিত্র, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের ত্রিবিদ্যা করায়ত্ত করেছিলেন এই কাশীতেই।

ইতিহাস বলছে, বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ দুই বিবদমান দলের নেতা। পুরাণ বলছে, বিশ্বামিত্র আর বশিষ্ঠ, মানুষের মধ্যে চিরন্তন বিরোধের, বিবদমান দুই সত্তার আভাস। বেদকে রক্ষা করবার জন্যে ভারতের মনু এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করলেন, বিনা অনুমতিতে যে বেদ-মন্ত্রের আবৃত্তি শ্রবণ করবে, নরকবাস হবে তার নির্মম নিয়তি। এবং গৌতম যিনি আরেকজন বিখ্যাত সংহিতাকার, তিনিও বলেছেন, কোনও শূদ্র ইচ্ছা করে বেদমন্ত্র শুনলে, তার কানে গরম সীসে ঢেলে দিতে হবে; বেদ আবৃত্তি করলে কেটে ফেলতে হবে তার জিব। এই ভারতবর্ষই আবার বিশ্বামিত্রকে স্বীকার করেছে, ব্রাহ্মণ বলে। দুশ্চর তপস্যার জন্যে নয়; অবপচয়িত বীর্যের জন্যেও নয়; হিংসার হিংস্রতা থেকে মুক্ত হতে পারার কারণে। বিশ্বামিত্র যখন বশিষ্ঠকে নষ্ট করবার জন্যে জ্বালা সজ্ঞাগ্নিতে আহুতি দেবার জন্যে বশিষ্ঠকেই আহ্বান করলেন, এবং বশিষ্ঠ নির্ভয়, নিষ্কম্প কন্ঠে উচ্চারণ করলেন আপন মৃত্যুমন্ত্র,—তখন, কেবল বিশ্বামিত্র, সেই জীবনের জ্যোতির্ময় দীপ্তিতে দীপ্ত দিব্য আননে 'মৃত্যু'র মহিমান্বিত মৃত্যু লক্ষ্য করতেই, পা জড়িয়ে ধরলেন বশিষ্ঠের। আর? আর তখনই কেবল, পৌঁছুতে পারলেন তাঁর লক্ষ্যে। ক্ষত্রিয়জন্মের পর আবার দ্বিতীয় অদ্বিতীয় জন্ম হলো তাঁর। মহাভুজ হলেন, মহৎ দ্বিজ।

ভারতবর্ষ, দ্বিজকে দিয়ে দ্বিজোত্তম অব্রাক্ষণকে প্রণাম করিয়েছে বারবার!

এই কাশীতেই বারবার এসেছেন, হেসেছেন, ভালবেসেছেন ভগবানের দূত, বোধিসত্ত্ব থেকে যিনি হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এই কাশীতেই তিনি এসেছেন কতবার, ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে। এই কাশীর পথ দিয়ে গিয়েছিলেন চিরকুমার ভীষ্ম। কাশীরাজ দিবোদাসের তিন কন্যা, অম্বা, অম্বিকা, অম্বালিকাকে তুলে আনেন স্বয়ংবর সভা থেকে। অম্বিকা ও অম্বালিকার সঙ্গে বিবাহ দেন নিজের দুই ভাইয়ের। হরিশ্চন্দ্র এই কাশীতেই মানবজীবনের মহত্তম অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। এই কাশীতেই কবি তুলসীদাস রমণীপ্রেম থেকে রমণীয়ের প্রেমে উত্তীর্ণ হন। এখানে কবীর আবির্ভূত হন, জগৎ-কবির যিনি শ্রেষ্ঠ বন্দনাকার।

কবি বলেছেন, কাশীতে কেউ অভুক্ত না থাকার প্রতিশ্রুতি, কালে তার সীমা অতিক্রম করবে। এখানে মানুষের মনের ক্ষুধাও মিটবে। মানুষের মন চেয়েছে, জগৎ পারাবারের তীরে সকল দেশের, সকল জাতের শিশুরা খেলবে, ধর্ম, বর্ণ, ধনী-নির্ধনের দ্বেষ-বিদ্বেষ ভুলবে। আত্মার সঙ্গে আত্মার আত্মীয়তা হবে এই কাশীতেই। এই কাশীতেই মহর্ষি ব্যাস, যাঁর মৃত্যুহীন নাম কৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন নূতন কাশীর স্বপ্ন দেখেছিলেন। গায়ের রং কালো বলে, কৃষ্ণ; আর দ্বীপে আবির্ভূত বলে দ্বৈপায়ন। বেদকে চারভাগে ভাগ করেন বলে, এঁর নাম বেদব্যাস। ইনিই মহাভারতকার কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস। কিংবদন্তী আছে, শিবের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জন্মমৃত্যুহীন নূতন কাশী তৈরীর সাধনা এঁর অন্নপূর্ণা ব্যর্থ করে দেন, শিবমহিমা ক্ষুণ্ণ হবার আশংকায়। কিন্তু কবি

বলছেন, ব্যাসের প্রয়াস ব্যর্থ হবার নয়। এই বারাণসীতেই সমস্ত মানুষকে মিলতেই হবে একদিন, জয় করতে হবে মৃত্যুকে। কাশীতেই জন্ম নেবে সেই চিরনূতন কাশী।

মানুষের আত্মা যে অবিনাশী, ভারতবর্ষের এই বার্তাই হচ্ছে—বারাণসী।

এই কাশীতেই আজকে আসন পেতেছেন অনাদিকালের আনন্দ, আনন্দময়ী মা রূপে। জ্ঞানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে তাঁরই জন্যে গানের সুরের আসন পেতেছেন তিনি কাশীতে। যিনি কীর্তির অতীত তাঁর সংকীর্তনের বসিয়েছেন আসর। যাঁর নাম নেই তাঁকে প্রণাম জানাবার জন্যে তুলে নিয়েছেন জীবনের শঙ্খ। সেই শঙ্খে অসংখ্যবার যাঁর মুখে উচ্চারিত এই মৃত্যুহীন বাণী ; নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আনন্দময়ী মায়ের মুখের হাসিতে সেই বাঁশী বাজে, যে বাঁশীতে অসুর হয়ে হয়ে যায় সুর ; যে সুর দিয়ে শুরু তাঁর যার সারাও নেই, শুরুও নেই। তাঁর মধ্যে প্রত্যক্ষ করি সেই অপ্রত্যক্ষের আলো, যে আলোই কেবল পৃথিবীকে তমসা থেকে জ্যোতিতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অসৎ থেকে সতে উত্তীর্ণ করেছে। এই শেষ, অশেষ আলোই ভারতবর্ষকে আরেকবার পথ দেখাতে এসেছে, যা ছাড়া, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। বিদ্যা নয়, বিভূতি নয়। নয় বিচার ; বিশ্বাস। স্মরণের অতীত এক কাল থেকে এই মুহূর্তের সকাল পর্যন্ত সে বিশ্বাসই সকলের শেষ আশ্বাস। তিনি আছেন। মৃত্যু, দুঃখ, বিরহ বিচ্ছেদ, হাহাকার, হতাশা, গ্লানি, অর্থ, অনর্থ, খ্যাতি, অখ্যাতি, প্রতিপত্তি, দৈন্য, সব কিছুর মধ্যে, সব কিছু পার হয়ে আছে এক অপার বিস্ময়। সে বিস্ময় অনন্ত নীলে, অব্যাহত অনিলে। এই বিশ্বের সমস্ত নিঃশেষ পান করবার পর সে বিস্ময় আনন্দময় রূপ নিয়েছে, অপরূপ আনন্দময়ী মা হয়ে আছেন আজও।—সে-ত এই কাশীতেই।

শ্রীঅরবিন্দ তাঁর জীবদ্দশায় তিনজন মুক্ত পুরুষ আছেন ভারতবর্ষে, বলেছিলেন। আনন্দময়ী তাঁর একজন,—বলেছিলেন, ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দাসত্ব থেকে মুক্তিকামী নন শুধু, সমস্ত মানুষের সর্বপ্রকার বন্ধন মুক্তিকামী নবীন ঋষি শ্রীঅরবিন্দ।

এই আকাশভরা আলোর মতো বাতাসঝরা সুরভিক্ষরা ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন আনন্দময়ী মা। নিরুপম এই মহিমা দলের পর দল মেলা শতদলের সঙ্গেই বুঝি তুলনীয় কেবল। এখনও সেই দল মেলার শেষ হয়নি। ফুলের হাসি, আলোর খুশি তাঁর মুখে এমন ঝলমল করে যে মনে না হয়ে পারে না যে, যিনি জ্ঞানের ওপারে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি এসে আসন পেতেছেন, গানের সুরের আসন পেতেছেন, যেখানে মা আনন্দময়ী। এই ভুবনে, সেই সিন্ধুতে, ওই গগনে, পাহাড়ে, অরণ্যে, পথে, প্রান্তে যে মধু ক্ষরিত হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে, একথা মা-কে দেখলে, শাস্ত্রপ্রমাণের প্রয়োজন হয় না। গৃহস্থের পরিভাষা অতি সামান্য। অতি সাধারণ ঘরের, অতি নগণ্য শিক্ষার অধিকারী এই মানবতনুর

অণুতে অণুতে আনন্দের বাঁশি বেজেছে সেই কোন্ সকালে কেউ তা জানে না। মায়ের নাম তখন নির্মলা। ভূমিষ্ঠ হবার মুহূর্তে কান্না নয়, হাসিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ চেয়ে দেখছে নির্মলার, বেড়ার ফাঁক দিয়ে আমগাছ। জন্মের পর তের দিনের দিন যে নন্দন চক্রবর্তী তাঁকে দেখতে এসেছিলেন আজও মায়ের তা মনে আছে। শিবমন্দিরের দরজায় বসিয়ে রেখে গেছে নির্মলাকে। মন্দির দেখা শেষ হলে ডাক দিয়েছে নির্মলাকে, বাড়ি চল। নির্মলার কানে যায় না সেকথা। যাবে কি করে? প্রাণে বাজছে তার তখনও, পাথরের মূর্তির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসা শিবের নৃত্যের গুঞ্জন। যে নৃত্যের তালে তালে বাজে মহাকালের মন্দিরা, যার তালে তালে সকাল সন্ধ্যা হয়, ফুল ফোটে, পাখি ছোটে, ঝরণা জাগে দোলা লাগে পাতায় পাতায়। আনন্দের বেদনায় রাঙে গোধূলির আকাশ।

বালিকা নির্মলা বলছে তার মা-কে : পুজোয় আম দেবে না? মা উত্তর করেন : আম কোথায় পাব? কোথায় পাবে? মুহূর্তের মধ্যে নির্মলা এনে দেয় পাকা আম, বাড়ির গাছেরই সব চেয়ে উঁচু ডালে পেকে আছে, মায়ের পুজোয় লাগবে বলেই যেন! কোথায় পাব, বোলো না ; বল কোথায় পাব না। সর্বত্র পাব, মায়ের পূজার উপকরণ। মলে আছেন যিনি, যিনি আছেন পরিমলে, সুধায় যাঁর অবস্থান, বসুধায় সমস্ত বিশ্বে যিনি মিশে আছেন। অনলে আছেন যিনি, অনিলেও আছেন, কাঁটায় এবং ফুলে, জোয়ারে এবং ভাঁটায়, সুখে-দুঃখে, শঙ্কায়-আনন্দে, মৃতে-অমৃতে যাঁর সমান আসক্তি আবার একই রকম নিরাসক্তি, তাঁর পূজায় তাঁরই দু'পায় আছে, সব পাবার উপায়। তাই বলো, কি চাই তোমার! কি করে পাবে, তার ভাবনা নয় তোমার। কারণ পূজাও যে তোমার নয় ;—মা'র ?

আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে থাকা আনমনা এই বালিকা কার কথা সেদিন ভাবত কে জানে। মা দিয়েছেন নির্মলার হাতে পাথরের বাটি তুলে। দিয়ে বলেছেন, দেখিস আবার পারলে ভেঙে নিয়ে আসিস। নির্মলার হাত থেকে পড়ে বাটিটা ভেঙে গেল সত্যি সত্যি। সেই ভাঙা বাটির প্রত্যেকটি টুকরো এনে বালিকা তুলে দেয় তার মায়ের হাতে : তুমি বলেছিলে সব নিয়ে আসতে। এই নাও সব—

ভাঙাকে জোড়া লাগাবার খেলা খেলতে এসেছেন যিনি, জোড়াকে ভাঙার কাজই তো তাঁর প্রথম লীলা। নির্মলার মা বলতেন, নির্মলা সোজা ; বুদ্ধিসুদ্ধি নেই মোটে। কলসী কাঁখে বঙ্কিম ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে মা বলতেন : এই তো আমি বাঁকা! বাঁকাকে সোজা, সোজাকে বাঁকানো,—এরই জন্যে তো মায়ের আসা, হাসা, মায়ের অফুরন্ত ভালবাসা মানুষের জন্যে।

বালিকার বয়স যখন বারো তখন লৌকিক বিবাহের ডাক এলো নির্মলার জীবনে। স্বামীর নাম ভোলানাথ। ভোলানাথের বড় দাদা রেবতীমোহন

চক্রবর্তীর ওখানে প্রচণ্ড সাংসারিক শৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে নির্মলা নিজেকে আষ্টেপৃষ্টে বাঁধলো। গৃহের সবাই অত্যন্ত খুশি। ঘড়ির কাঁটার চেয়েও নিয়মিতরূপে রাত্রিদিনের কাজকর্মের পালা সাঙ্গ করেন নববধূ। কিন্তু যে এসেছে সংসারের সং ত্যাগ করে, সারকে তুলে ধরতে সকলের চোখের ওপর, এ খোলস তার কতদিন টিকবে। নির্মলার মধ্যে জেগে ওঠে সেই আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা আনমনা চিরবালিকা। রান্না পুড়ে দুর্গন্ধে ভরে যায় ঘর, হুঁস হয় না বউয়ের। বড়জা ছুটে আসেন। তিরস্কার করেন, 'বৌ বড় ঘুমোয়'।

ঘুমোয় না নির্মলা। মানুষের ঘুম ভাঙাতে যে আসছে তার মধ্যে তারই সাড়া পেয়ে সব কাজ ভুল হয়ে যায় তার। স্বামী ভোলানাথ আসেন মাঝে মাঝে দাদার বাড়িতে। সাধারণ স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক নয়; স্ত্রীর সব চেয়ে কাছে, তবু দুস্তর ব্যবধান যেন। শ্রীঅরবিন্দ তার স্ত্রীকে বলেছিলেন, তুমি এমন একজন লোককে বিবাহ করেছ, যে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতো নয়। নির্মলা সামান্য লেখাপড়া জানা বাঙালী বউ। নিশ্চয়ই স্বামীকে তা বলেননি। কিন্তু তবুও নির্মলার সেই নিরুপম নির্মল মুখে স্বামী ভোলানাথ কি সে বার্তা পড়তে পারেননি, যে জয়বার্তা ঘোষণা করতে এসেছে ভারতীয় নারীরা বারবার : যা আমায় অমৃত দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?

অন্ধ যে, যে দেখতে পায় না লঘুপক্ষ সাদা মেঘের ভেলায় আশ্বিনের আশ্চর্য সমারোহ আকাশে, শিউলির সুবাসে, ঢাকের বাদ্যিতে, তারও প্রাণের দ্বারে কি এসে দাঁড়ান না সিংহবাহিনী, অসুরনাশিনী, দশভুজা দুর্গা! চিনতে কি ভুল হয় অন্ধেরও?

আনন্দময়ী মায়ের দু' চোখের করুণা ঘন দৃষ্টিতে আর তাঁর পরমাশ্চর্য পবিত্র হাসিতে জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর নীরব উচ্চারিত। পথে চলার ক্লান্তি, পিছিয়ে পড়ার লজ্জা, বাসনার গিল্টি করা সোনার মুখ বেরিয়ে পড়ার ব্যর্থতা, আত্মগ্লানির পীড়ন, দুঃখ, বিরহ, বিচ্ছেদ বেদনা সব মুছে যায় ওই চোখের দিকে তাকালে। দর্শনের পাতায় নেই তার উত্তর, মায়ের চোখের পাতায় উজ্জ্বল সে উত্তরণের ইঙ্গিত। তৃষ্ণায় মুমূর্ষু যে ব্যক্তি, তার কাছে 'এইচ-টু-ও এই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার চেয়ে একটু নির্মল, শীতল, টলটলে জলের দেখা পাওয়ায় যে ভাগ্যের উদয়, ভ্রান্ত উদ্‌ভ্রান্ত ভারতের মরীচিকায় আনন্দময়ী মায়ের দর্শন সেই 'সম্ভবামি যুগে যুগে'; এই অব্যর্থ প্রতিশ্রুতি রক্ষার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এবারেও তিনি এসেছেন ধর্মসংস্থাপনের প্রতীক্ষায় অশ্বে আরূঢ় হয়ে; এবারেও তিনি এসেছেন ঠিক তখনই যখন ভারতবর্ষের বুক ভরে গেছে গ্লানিতে, এবারেও এসেছেন তিনি অধর্মের উদ্যত উদ্ধত বজ্রমুষ্টির ঊর্ধ্বে তুলে ধরতে ধর্মের বিশ্বাসের, মৃত্যুহীন বাণীর বিজয় পতাকা উড্ডীন করতে। ভারতবর্ষের যে নৈতিক পতাকা রাজনৈতিক পরাধীনতায়ও কোনওদিন নমিত হবার নয় : নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

কিন্তু এবারে তিনি মার মূর্তি-তে নয়; 'মা'-র মূর্তিতে মূর্ত হয়েছেন; ক্ষমার মূর্তিতে বিমূর্ত!

এবারে এসে, হেসে, ভালোবেসে হারিয়ে দেবেন তিনি অবিশ্বাস আর সংশয়ের অসুরকে। আণবিক আঘাতকে মানবিক অশ্রুতে প্রত্যাঘাত করতে এসেছেন যিনি, তিনি এবার সিংহবাহিনী দশভুজা নন। পায়ে হেঁটে এসেছেন তিনি। দু' পায়ে শত দুঃখ দলতে নয়; শত দুঃখের দলকে সতত আনন্দের শতদল করতে। দুঃখময়ী ধরায় এসেছেন তাই এবারে আনন্দময়ী অধরা।

যারা বিষাক্ত করছে বাতাস, অন্ধকার করছে তোমার আকাশ, তুমি কি তাদের ক্ষমা করেছ,—কবির এই প্রশ্ন; আনন্দময়ী মা হচ্ছেন এই প্রশ্নের মধ্যেই উচ্চারিত, জগৎকবির অশেষ উত্তর। এই প্রশ্ন জগৎ আবার করবে; আর বারবার আসবেন জগদীশ্বরের দূতরা। তাঁরা বলবেন, ক্ষমা কর; ভালোবাসো। অসংখ্য পাপের, দুঃসহ তাপের দুর্বহ জ্বালা জুড়োতে ক্ষমার প্রতিমূর্তি আনন্দময়ী মা'র দু' চোখের করুণাধারায়, হাসির মুক্তধারায় সেই ধ্বনিরই প্রতিধ্বনি।

মায়ের কাছে কোনও প্রশ্ন করলেই তিনি হাসেন। কখনও বলেন উপস্থিত কোনও মহামহোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে: বাবা, আমাকে তো তুমি কিছু শেখাওনি। উত্তর দিতে ভুল হলে ঠিক করে দিও। তারপর দুরূহ জটিল দুর্গম দর্শনের পাতায় যার জবাব নেই, সেই জ্যোতির্ময় উত্তর আপনি এসে দাঁড়ায় মায়ের অপরূপ দুটি চোখের পাতায়। প্রশ্ন করে জিজ্ঞাসু: সবই যদি কর্মফল তবে বর প্রার্থনা কেন? মা উত্তর করেন: বর প্রার্থনাও তোমার কর্মফল যে! যত চাইবে তত বাধা পড়বে কর্মফলের অনন্ত বন্ধনে। তত বাধা পড়বে তোমার পথ কেটে বেরুনোর পথে; যত ফুরোবে পাথেয়, পথও ফুরোবে তত।

দ্রৌপদী যতক্ষণ কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে ততক্ষণ লজ্জা। ততক্ষণ দেখা নেই 'লজ্জাহর'-র। যেই দু' হাত তুলে দিয়েছে ওপরে, শরণ নিয়েছে ব্রজের, স্মরণ করেছে তাঁকে, সেই দেখা দিয়েছেন শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-পাণি। সেই ক্লান্ত হয়েছে, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণে উদ্যত, উদ্ধত দু' হাত দুঃশাসনের ক্লান্ত হয়েছে; ক্ষান্ত হয়েছে বস্ত্রবিমোচনে।

আনন্দময়ী জোর করেন না বলেই তাঁর এত জোর। বিপদের আভাস দেন ইঙ্গিতে; বুঝে নিতে হয়। আগুন, আগুন!—বলে উঠতেই মা একদিন, শিষ্যা বাড়ি দৌড়েছে। সিগারেটের আগুন থেকে ঘরে জ্বলছে দাউদাউ করে মৃত্যুর শিখা, ঘুমন্ত স্বামীর ঘরে; দরজা ভেঙে স্বামীকে আসন্ন মৃত্যু থেকে রক্ষা করেন যিনি, সেই মা'র আশীর্বাদকে মারবে কে!

মৃত্যুর আভাসও দেন, বিচ্ছেদের পূর্বাভাস অমনই সংকেতে। পুরীতে সশিষ্য গল্প করতে করতেই অসংলগ্নভাবে মা বললেন: 'বিপদ আসছে। তোমরা কী করবে তাই বলো।' আর একটি কথাও নয়। মায়ের ভক্ত একজনের বড়

ছেলে, তার নাম সন্তোষ, কয়েক দিনের মধ্যেই, কূপের মধ্যে তার মৃত দেহ পাওয়া গেল একদিন। ছেলেটির মৃগীরোগ ছিলো। [আনন্দময়ী মা ; শ্রীবিভুপদ কীর্তি]

জোরও করেন তিনি কখনও কখনও।

আনন্দময়ী মায়ের লৌকিক স্বামী ভোলানাথের দীক্ষা হয়েছে কি না, প্রশ্ন করতে, মা বললেন, না। পাঁচ মাস পরে, আগামী পনেরই অঘ্রান হবে ; অমুক বার, অমুক তিথি, অমুক নক্ষত্র। নক্ষত্রটা বোঝা গেল না ঠিক, একজন জানালেন! মা বললেন, পুকুরে জানকীবাবু মাছ ধরছে, সে বুঝবে। জানকী-বাবু বুঝলেন। স্বামী ভোলানাথ সব শুনে মনে মনে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হলেন, ওই সময়ে ওই ক্ষণে কিছুতেই দীক্ষা নয়।

১৫ই অগ্রহায়ণ আসে এক সময়ে। স্বামী ভোলানাথ ভোর না হতেই বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন। জলখাবার পর্যন্ত না খেয়ে। দীক্ষার লগ্ন এগিয়ে আসে দ্রুত পায়ে। আনন্দময়ী মা ডেকে পাঠান স্বামীকে। ভোলানাথ আসতে অস্বীকার করেন। তারপর কি হয় কোথায় কে জানে, বাড়ির পথ ধরেন হঠাৎ ভোলানাথ। তখনও মনে মনে সংকল্প, বাড়ি যাবেন বটে, তবে দীক্ষা নেবেন না। এসে দেখেন বাড়িতে, মায়ের মুখে উৎসারিত হচ্ছে স্তোত্রের নির্ঝরিণী। ভোলানাথকে হাতে একখানা কাপড় দিয়ে বললেন স্নান করে আসতে। মন্ত্রের বন্যার মুখে সম্মুখে খড়কুঠোর মতো ভেসে গেলো ভোলানাথের দীক্ষা না নেবার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা [শোন বলি মায়ের কথা ; শৈলেশ ব্রহ্মচারী]।

কখনও জোর কখনও করজোড়। মায়ের ভাষা বোঝার আশা দিয়েছে জলাঞ্জলি,—বলে তাই মাতৃভক্ত। কোনও কথা না বলেই তিনি বলে যান সব। তাঁর কথা যে রাখতেই হবে। সব কথা হতে পারে শব-কথা। তোমার আমার কথা করতে পারে অস্বীকার! কিন্তু 'মা'-র কথা,—সেই যে সব কথা, শব-কথা নয় কিছুতেই।

অন্তহীন অন্ধকারের ওপারে যে অনন্ত জ্যোতির্ময় সত্তা নিত্য বিরাজমান, সব ভগবানের দূতেরাই তাঁরই এক টুকরো আলো ছিটকে এসে পড়েছেন বারবার এই মাটির ঢেলার ওপর পৃথিবী যার প্রিয় নাম। এঁরা সবাই নিয়ে এসেছেন সেই পতাকা, যা বহন করবার শক্তির উৎস হচ্ছে নিরাসক্তি। আনন্দময়ী মা-ও সেই আলোরই দেহমূর্তি,—নিঃসন্দেহ। তাঁর জীবনে পরমাশ্চর্যের যে প্রকাশ তা তাঁর নিজের ইচ্ছায় নয় ; এও তাঁরই ইচ্ছায় যিনিই কেবল ফুল ফুটাতে পারেন। সবাই পারে কেবল আঘাত করতে বোঁটাতে। যে মণিহার মায়ের গলায়, অনন্ত আনন্দের নীলমণি হার সে কেবল আনন্দময়ী মায়েতেই সাজে ; আর কেউ পরতে গেলে তা যে গুরুভার বাজে,—এও তাঁর ইচ্ছায় যাঁর ইচ্ছায় সেপাই হয় দিগ্বিজয়ী সম্রাট ; গণ্ডগ্রামের প্রায় অশিক্ষিত বধূ হন নিত্যবোধের নিরন্তর ভোক্তা।

চেষ্টায় হয় না। আনন্দময়ী মা চেষ্টা করে কিছু পাননি। তাঁর মধ্যে

আনন্দের একটি শতদল সতত পাপড়ি মেলছে। তাঁর দেহকে আশ্রয় করে দেহাতীতের যে অলৌকিক প্রকাশ, তা সাধনায় সাধ্য নয়। তিনি নিজেও জানেন না, কেন হয়, কখন হয়, কেমন করে হয়। যদি জানতে পারত মানুষ, তাহলে সব লীলার হতো অবসান; সব খেলার শেষ; সব সৃষ্টির কৌতুক নিঃশেষ। মা নিজেও বলেছেন সেকথা বার বার.

"রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি অবতারদের খেলাগুলিকে লীলা বলিয়া গিয়াছে। লীলা কি, না যাহা লয় হয়, তিনি যাকে লন। তিনিই তাহাতে মিশাইয়া লন! তিনি স্বয়ং বহু। তিনিই নিজেকে নিয়ে নিজে খেলেন। তাই লীলা; প্রকৃতিই লীলা করেন। প্রকৃতি পুরুষে লয় হইয়া যায়। এই যে প্রকৃতি, ইহা সবই সমান ভাবে গ্রহণ করেন। যেমন নদী, ময়লা ও চন্দন সবই ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে, বাতাস, সুগন্ধ ও দুর্গন্ধ সবই বহন করিয়া নিয়া যাইতেছে, সূর্য সর্বত্রই সমান আলো দিতেছেন। এই সবই প্রকৃতির খেলা। নদী যতক্ষণ সমুদ্রে না মিলে ততক্ষণই তার নাম নদী, যেই গিয়া সমুদ্রে পড়িল, অমনি তার নাম হইল সমুদ্র। আসলে সবই—এক মহানের খেলা [শ্রীশ্রীআনন্দময়ী : ৫ম ভাগ : ব্রহ্মচারিণী গুরুপ্রিয়া]।

সেই মহানের খেলার নাম কখনও রাম, কখনও কৃষ্ণ, কখনও শ্রীরামকৃষ্ণ। এই মুহূর্তে কাশীকে কেন্দ্র করে সেই মহানের খেলার নাম,—এবারে, আনন্দময়ী মা। তাঁকে প্রণাম।

॥ সাত ॥

স্মরণের অতীতকালের অবিস্মরণীয় এই কাশীতে রাজা ব্রহ্মদত্ত ছদ্মবেশে বেরিয়েছিলেন দেশ দেখতে। নিজের দেশ নিজে দেখবেন, এই মহৎ সংকল্প নিয়ে বেরিয়েছিলেন রাজধানী ছেড়ে রাজপথে। তাঁর রাজ্যে ধনী, দরিদ্র, জ্ঞানী এবং মূঢ়, সাধু এবং পাপী কে কেমন থাকে, গুণী তার প্রাপ্য পায় কি না, দোষী পায় কি না সাজা, সবাই জানে কিনা, মানে কি না দেশের একজন রাজা আছেন, রাজা নিজেই বেরিয়েছিলেন তার সঠিক সন্ধানে। রাজসভায় বসে, পালঙ্কে শুয়ে, পার্ষদের স্তবে বাস্তবকে উপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না কাশীর রাজা ব্রহ্মদত্ত। চোখ আর কান খুলে রেখে এবং সেই সঙ্গে খুলে রেখে রাজবেশ ব্রহ্মদত্ত বেরিয়েছিলেন, রাজা বলে তাঁকে চিনতে না পারলে রাজ্যের লোক রাজা সম্বন্ধে তাঁকে কি বলে তাই শুনতে আর রাজ্যের আসল চেহারা চোখে দেখতে। নিজের আসল চেহারা গোপন রাখতে না পারলে রাজ্যের আসল চেহারা দেখা অসম্ভব—সেকাল পর্যন্ত এ জ্ঞান রাজ্যের যিনি মাথা তাঁর মাথায় ছিলো। এই কাহিনী সেই কালের; সেই কাশীর।

রাজপুরোহিতকে সঙ্গে করে ছদ্মবেশী রাজা জনপদ ঘুরতে ঘুরতে এসে পেঁছলেন এক গ্রামের এক জমিদার-বাড়িতে। জমিদার তাঁকে রাজা বলে চিনতে পারলেন না কিন্তু সন্দেহ করলেন অত্যন্ত ধনী, অত্যন্ত সম্ভ্রান্তবংশের মানুষ বলে। ছদ্মবেশ রাজঅঙ্গকে রক্ষা করতে পারে, কিন্তু রাজমহিমাকে সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করবে কেমন করে? ধুলোয় ঢাকা হীরে জহুরীর দৃষ্টিকে তীক্ষ্ণতর করে তুলবার কারণ হতে পারে, কিন্তু তার চোখে কাঁচ বলে চলবার চেষ্টা করলে পারবে কেন? রাজা ব্রহ্মদত্ত-ও তাই পুরো ফাঁকি দিতে পারলেন না জমিদারকে। দ্বিপ্রহরে স্নানের পর জমিদার ছদ্মবেশী রাজার জন্য রাজকীয় আহার্যের আয়োজনই করলেন। চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় ভরে দিলেন পাত্রের পর পাত্র। আহারে আমন্ত্রিত মাননীয় অতিথিকে ব্যজনের ব্যবস্থা করলেন। রাজভোগ্য খাবার খেতে ডাকলেন অতিথিকে জমিদার, আর পুরোহিতকে জমিদারের দেবালয়ে প্রসাদ গ্রহণ করতে অনুরোধ করা হলো।

ছদ্মবেশী রাজা ব্রহ্মদত্ত সেই রাজকীয় আহার্য স্পর্শ করলেন না। পুরোহিতকে এগিয়ে দিলেন খাবারের থালা। রাজা ব্রহ্মদত্তর পুরোহিত রাজা ব্রহ্মদত্তরই যোগ্য। তিনি সেই আহারের পাত্র তুলে দিলেন জমিদার-বাড়ির দরজায় দণ্ডায়মান এক তাপসের হাতে। ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল আনন তাপস হাসলেন। তারপর তাকিয়ে দেখলেন, পথ দিয়ে যাচ্ছে বৌদ্ধভিক্ষু। তাঁর হাতে তুলে দিলেন খাবারের থালা। বৌদ্ধভিক্ষু খাবারের থালা হাতে প্রবেশ করলেন জমিদার-বাড়িতে। ছদ্মবেশী রাজা ব্রহ্মদত্তের পায়ের কাছে থালা রেখে বললেন বৌদ্ধভিক্ষু: রাজন্, এ আহার্য আপনারই সেবার জন্যে, আপনি গ্রহণ করুন।

বিস্ময়ে বিমূঢ় জমিদার। রাজার জন্যে প্রস্তুত অন্নপাত্র অন্য পাত্রে না গিয়ে ফিরে এলো রাজার কাছেই। যেন রাজার যিনি রাজা, এ তাঁরই কোনও খেলা। অনেকক্ষণ স্তব্ধতার পর রাজাকে প্রশ্ন করলেন জমিদার: আপনার খাবার অন্যকে দিলেন কেন?

রাজা বললেন: আপনার দানের যোগ্য ব্রাহ্মণ আমি নই, আমি আজন্ম আরামে অভ্যস্ত। আর যিনি সদ ব্রাহ্মণ তিনি সমাজকে দেন তাঁর শাস্ত্রব্যাখ্যা, শিষ্যকে দেন মহৎ উত্তরাধিকার, রাজাকে দেন সুপরামর্শ, পৃথিবীকে দেন পুণ্যের সূর্যের স্পর্শ। এমন একজন যোগ্য পাত্র উপস্থিত থাকতে এই দানের অমর্যাদা আমি কি করে করি?

তখন পুরোহিতকে পুনরায় একই প্রশ্ন করলেন জমিদার: আপনিও অন্যকে দিয়ে দিলেন কেন আপনার প্রাপ্য? রাজপুরোহিত বললেন নির্দ্বিধায়: আমি যোগ্য নই আপনার দেওয়া আর ওঁর কাছ থেকে পাওয়া এই দুর্লভ আহার্য গ্রহণের। কারণ আমি শাস্ত্রজ্ঞ কিন্তু প্রকৃত সত্য সম্পর্কে আমি আজও অজ্ঞ আমার সংসার আছে, ছেলে আছে, আছে সহধর্মিণী। রাজসেবার বিনিময়ে ভোগেসুখে

আমার লালসা যায়নি আজও। কিন্তু আপনার দরজায় দণ্ডায়মান ওই তাপসকে দেখে আমার ভুল হয়নি যে উনিই এর যথার্থ যোগ্য। কারণ উনি ভোগলিপ্সু নন; উনি যেখানে যা পান তাই খান। ওঁর তৃপ্তিতে আমার পুণ্য, এই বিশ্বাসে ওঁকে দিয়েছি আমার অপ্রাপ্য।

তাপসকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনিও কেন বিমুখ করলেন মুখের গ্রাসকে।

প্রশান্ত হাস্যে প্রসন্নানন মহাপ্রাণ যে উত্তর দিলেন, সে উত্তর এক তাঁর মুখেই মানায়: আমি সংসারমুক্ত বটে, তবে আমিও মুক্ত পুরুষ নই। মাথার ওপর চাল আছে আমার অরণ্যাশ্রমে; বনে আমার জন্যে রয়েছে ফলমূল, লোকালয়ে আছে সংসারীর দান। আমার শয্যা আছে হরিণচর্ম; বারিপূর্ণ কলসী আছে তৃষ্ণায় শান্তি দিতে; ঘরের অন্ধকার দূর করতে আমার আছে মাটির প্রদীপ। আহারের চিন্তা আজও আমাকে উদ্বিগ্ন করে। তাই, মুক্ত বলতে যা বোঝায়, সেই খাঁটি মুক্ত হতে পারিনি আজও। কিন্তু এই যে ভিক্ষু, সর্বলোভমুক্ত এই মানুষটির ঘর নেই, নেই শয্যা, নেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়, সুনিশ্চিত আহার, সঞ্চয়ের প্রয়োজন হয় না, উপবাসে ভীত নন, তৃষ্ণায় নদীর অথবা পুষ্করিণীর জল, লজ্জা নিবারণ করেন ছিন্নবস্ত্রের টুকরো পরিধান করে। এঁকে দিলে দানের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়,—তাই আমার নয় যা তা দিয়েছি এঁকে। ইনিই যোগ্য।

জমিদার ভিক্ষুর দুটি হাত ধরে জানতে চাইলেন, ক্ষুধার্ত, উপবাসী ভিক্ষু এমন সুখাদ্যের সন্ধান পেয়েও কেন ফিরিয়ে দিলেন রাজাকে দানপাত্র।

বৌদ্ধভিক্ষু উত্তর করলেন, সাধারণ প্রশ্নের অসাধারণ উত্তর: আমি ক্ষুধার্ত —একথা সত্য, আমি উপবাসী একথাও সত্য। কিন্তু এর চেয়েও বড় সত্য এই যে,—এ খাদ্যের যোগ্য আমি নই। রাজার জন্যে প্রস্তুত এই চর্ব-চুষ্য-লেহ্য-পেয় আমার আহার্য নয়। এ খাদ্য নিলে আমার ধর্মরক্ষা অসম্ভব হয়। রাজার যেমন ধর্ম আছে, ভিক্ষুরও তেমনি ধর্ম আছে জানবেন। রাজার খাদ্য ভিক্ষু খেলে ভিক্ষুর চলে না, যেমন ভিক্ষুর খাদ্য রাজার পক্ষে অচল। তাই রাজার যোগ্য আহার্য রাজপাত্রে দিলাম। মনে রাখবেন, দান করলেই হয় না। যোগ্যকে দান করলে তবেই দান করা হয় যথার্থ। গরীব লোককে হাতি, কুকুরকে পায়েস, সন্ন্যাসীকে শাল-দোশালা দিতে নেই কখনই। [জাতকের গল্প: কালিদাস রায়]

উপবাসী ভিক্ষু পর্যন্ত জানতো ভিক্ষা দেওয়া এবং নেওয়ার নিগূঢ় তাৎপর্য। এই অনাদি অনন্তকালের ভারতের আত্মার আলোই কাশী। বার্ধক্যে বারাণসী সেই কাশীরই আলোকচ্ছটা।

এই কাশীতেই সেই সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ-শংকরের সঙ্গে স্বয়ং জগন্মাতার সাক্ষাৎকার সেবায়। আর কোথায়,—কাশী ছাড়া আর কোথায় দেখা হতে পারে অসীম কালের সঙ্গে অনন্ত আকাশের? কাশী ছাড়া আর কে বহন করতে

পারে তার বুকে একই সঙ্গে বিশ্বনাথের আসন আর বিশ্বের যত অনাথের জন্যে উত্তরবাহিনী গঙ্গার মৃতসঞ্জীবনী ? কাশী ছাড়া আর কার এই উদাত্ত আহ্বান মৃত্যু হেথায় অমৃতের সেতু, শব নাই—শুধু শিব। এই শিবভূমিতে—অদ্বিতীয় শংকরের ধ্যানভূমিতে—দ্বিতীয় শংকর—অদ্বিতীয় বিবেকানন্দ প্রথম দেখেছিলেন দুই চোখে জাহ্নবী-যমুনা বিগলিত করুণা যশোদা মাঈকে সেদিন গগন রায়ের বালিকা কন্যা মণিকার মধ্যে। শিশিরের মধ্যে পেয়েছিলেন সিন্ধুর সম্ভাবনা। সন্নিকটের মধ্যে দেখেছিলেন দূরের ভাবনা। রক্তের মধ্যে শুনেছিলেন অনুরক্তের পদধ্বনি! পৃথিবীর মহত্তম সেই আবিষ্কারের কথা ইতিহাসের পাতায় নেই বিধৃত। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার সন তারিখ খুঁটিনাটি সহ পাঠ্য ছেলেমেয়েদের। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে ত্রৈলঙ্গের, স্বামী বিবেকানন্দর সঙ্গে বালিকা যশোদামাঈর, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আইনস্টিনের সাক্ষাৎ, মহত্তম জাতীয় সম্পত্তি, জাতির ইতিবৃত্তে কোথাও নেই সেই বৃত্তান্ত তবুও, যা পড়ে ছেলেমেয়েরা আবিষ্কার করবে নিজের মধ্যে বিশ্বের, বিস্ময়ের যোগসূত্র। আর নেই বলেই ইতিহাসের বইতে ভারতবর্ষের নামটুকুই চোখে পড়ে তাদের, ভারতবর্ষের সত্য, জীবন্ত, উজ্জীবন্ত ইতিহাস তাদের চোখে পড়ে না। দেশের বালককে তাই রবীন্দ্রনাথ যখন প্রশ্ন করেন, নদী দেখেছ? তখন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে নদীর সংজ্ঞামুখস্থ বালক বলে, না, নদী দেখিনি।

ভারতবর্ষের ইতিহাস তার নদ নদী, সমুদ্র, পর্বত, মরুকান্তার ছাড়িয়ে যেমন তেমনই আচার্য শংকর থেকে শুরু করে বিবেকানন্দ পর্যন্ত সে ইতিহাস পেঁৗছেও থেমে যায়নি। সে ইতিহাস লেখা হয়ে চলেছে আজও, মহৎ মানুষের জীবন দিয়ে লেখা সেই তমো থেকে মহত্তমে উত্তীর্ণ হবার সেই ইতিহাসই ভারতবর্ষের অন্তরের ইতিহাস। অন্তর দিয়েই তবে পেতে হয় তার পরিচয়। ভারতবর্ষের অন্তরতম সেই ইতিহাসের নামই কাশী।

সন ১৮৯০। স্বামী বিবেকানন্দ এসেছেন কাশীতে। ভারতবর্ষের অন্তর-ইতিহাসের অন্তরতম পরিচয় পেতে এসেছেন কাশীর অন্তর্গত গাজীপুরে। গাজীপুর হচ্ছে যোগীশ্রেষ্ঠ পাওহারী বাবার জায়গা। এই গাজীপুরেরই গগন রায়ের মেয়ে মণিকা। তখন তার বয়স ন'বছর। বিবেকানন্দ মণিকার মধ্যে কি দেখলেন, সেকথা এক তিনিই বলতে পারেন—যিনি বিবেকানন্দের মধ্যে একদিন আঠারো সূর্যের আলো জ্বলতে দেখেছিলেন। অথবা বলা যায় সে কথাও। মণিকার মধ্যে যশোদামাঈকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বিবেকানন্দ; নরেন্দ্রনাথ দত্তের মধ্যে একদিন যেমন বিবেকানন্দকে দেখেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। খালি চোখে মানুষ লক্ষ কোটি মাইল দূরের তারাদের দেখতে পায়। সেই মানুষেরই চোখে খালি পড়ে না ঘরের কাছের 'একটি ধানের শিষের ওপর একটি শিশিরবিন্দু'। বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, রমণীর মধ্যে রমণীয়কে আবিষ্কার, মৃত্যুর মধ্যে অমৃতের আস্বাদ, ক্ষুদ্রের মধ্যে রুদ্রের আভাস, রূপের মধ্যে

অপরূপের, বচনীয়ের মধ্যে অনির্বচনীয়ের স্পর্শ পান যাঁরা, তাঁরাই তাঁদের শৈশবে অন্যের লক্ষ্যে পড়েন না ; যৌবনে পরিগণিত হন খ্যাপা বলে। এবং কেউ কেউ যাদের জন্যে তাঁরা আসেন মর্ত্যলোকে তাদের হাতেই ক্রুসবিদ্ধ হন। কিন্তু ক্রুদ্ধ হন না। বলেন : এদের ক্ষমা করো, এরা জানে না এরা কি করছে!

একটি বালিককে দেখিয়ে বিবেকানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন গগন রায়কে, এ কে? গগন রায় বললেন : ওকে আশীর্বাদ করুন ; ও আমার মেয়ে। ওর নাম মণিকা! আবার তাকালেন ন'বছরের বালিকা মণিকার দিকে। মণিকা নয়, এ সেই মণিহার যা সাজে না সকলের কণ্ঠে। শত সূর্যের দীপ্তি এর অন্তরের আলোর কাছে কালো দেখায় রীতিমতো। সমুদ্রের গভীরতা, ধূর্জটির ধ্যান এর আয়ত চোখের অতলে অদৃশ্য দৃশ্যমান। কিন্তু সে চোখ কার আর, স্বামীজীর ছাড়া যার দৃষ্টির প্রদীপে দেখা দেবে সামান্য বালিকার মধ্যে জগন্মাতার প্রতিমূর্তি। পাথরে যে দেখবে থরথর কাঁপতে জাগ্রতচৈতন্যকে, শিলায় যে দেখবে অন্তঃসলিলাকে, কেবল সেই তো দেখবে মণিকা-র মধ্যে সেই মণিকারকে—এই জগৎ যাঁর মণিহার!

স্বামিজী বলেন : এই মেয়েটিকে আপনার, আমি পূজা করব। কুমারীর মধ্যে কুমার-জননীকে জাগাবো আমি।

পূজা করলেন মণিকাকে বিবেকানন্দ। কুমারী পূজা। পূজার শেষে ধ্যানাবিষ্ট স্বামী বিবেকানন্দ উক্তি করলেন, স্মরণীয় উক্তি করলেন অবিস্মরণীয় স্বামিজী : এ মানবদেহে নিয়ে এসেছে ঐশী শক্তির স্রোতকে। বহু জন্মের সাধনাতে ছাড়া এর মধ্যে যার প্রকাশ দেখেছি তা কারুর সাধ্য নয়।

মণিকাই পরবর্তী জীবনে যশোদামাঈ হয়ে ওঠেন। রূপ, গুণ, যশ থেকে আরও ঊর্ধ্বে উঠলে তবেই যশোদামাঈ হওয়া যায়। যশ দাও,—মানুষের মহৎ প্রার্থনা! যশোদার প্রার্থনা তার চেয়েও মহৎ। সেই প্রার্থনার চেহারা মণিকার মধ্যে দেখেছিলেন স্বামিজী। মানুষের মহত্তম প্রার্থনার উত্তরেই উত্তরকালে মণিকার মধ্যে উড্ডীন হয়েছিলো যশোদার উত্তরীয়।

যশোদার বিবাহ হয় জ্ঞানশংকর চক্রবর্তীর সঙ্গে। বিবাহিত জীবনের সমস্ত ব্যবস্থাকে অটুট রেখে সংসারের সব সংসাজাদের মধ্যে সারকে খোঁজার অন্বেষণ শুরু হয় তাঁর। দেশ বিদেশে ঘোরেন তিনি স্বামীর সঙ্গে। বেশভূষায় ফ্যাশান দুরস্ত মহিলা. একই সঙ্গে একই অঙ্গে প্রসাধনে সজ্জিতা, সাধনে বিসর্জিত এক বিচিত্র বিমুগ্ধকর পবিত্র পরমাশ্চর্য অভিজ্ঞতা। লখনৌ-র অভিজাত-সমাজের মধ্যমণি মণিকার মধ্যে তখনই জেগে উঠেছে জন্মপূর্ব সংস্কারের অন্তঃসলিলা। সমস্ত দিনের কাজের মধ্যেই আসে সেই আহ্বান, যা কানে গেলে প্রাণে বাজলে রাধার মতোই উপায় থাকে না অভিসারে না বেরিয়ে। সংসার-যাত্রা থেকে অভিসার-যাত্রার লগ্ন ঘনিয়ে আসে যশোদার। টি ও ডিনার পার্টি, হৈহৈ, জলসা, তর্ক, বিতর্ক, নানারকম আলোচনার নানান রকম আলোর উৎস লখনউ-

এর সেই বিখ্যাত গৃহ, মণিকার অধ্যাপক স্বামী জ্ঞানশংকরের বিদ্যা ও জীবন-চর্চার ক্ষেত্র। সেই তীর্থক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়েছে এক ইংরেজ তরুণ; নাম —রোনাল্ড নিকসন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে বিমানবাহিনীর কর্মী ছিলেন কেমব্রিজের বিদ্যোৎসাহী ছাত্র নিকসন। সেই সময় একদিন শত্রু-ঘাঁটিতে বোমা ফেলার আদেশ নিয়ে বিমানে বহির্গত নিকসনকে অনুসরণ করে শত্রুর বিমান। নিকসন তা জানতেন না এবং যখন শত্রুর আঘাতে বিধ্বস্ত হবার মুহূর্ত উপস্থিত, তখনই নিকসন হঠাৎ অনুভব করলেন বিমানের চালক তিনি নন। কোন্ অদৃশ্য চালক যেন বিমানের মুখ ঘুরিয়ে দিয়ে সুনিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখ থেকে সুনিশ্চিততর জীবনের নব নব চারণক্ষেত্রে ফিরিয়ে নিয়ে এলো। নিয়ে না এলে নিকসন ফিরতে পারতেন না সেদিন। শত্রুরা ওৎ পেতে ছিলো সেখানে; কোনও ব্রিটিশ বিমান সেদিনকার যুদ্ধশেষে ফিরে আসেনি। নিক্সন্ ফিরে এসেছিলেন বললে ভুল হবে। কেউ তাঁকে সেদিন ফিরিয়ে নিয়ে এসেছিলো। ফিরে আসবার পর, বারবার নিকসনের মনে তোলপাড় করে ফেরে এক প্রশ্ন—কে সে, যে সেদিন তাঁকে বাঁচালে—সে কে?

এতদিনে ইংরেজ নিকসন-এর কাছে সবার উপরে ছিলো নেশন; এখন থেকে তাঁর আরম্ভ হলো অন্বেষণ। সব নেশনের সব ধর্মের চেয়ে যিনি বড়, যাঁর আনন্দময়ী ছাড়া অন্য কোনও নাম নেই, এক গোরা বৈমানিক-সৈনিকের শুরু হলো তাঁরই জন্যে মহৎ অন্বেষণ। ভারতবর্ষে এলেন তিনি। চরমবিদ্যা, পরমজ্ঞানের ধাত্রী ভুবনমনোমোহিনী ভারতবর্ষে এলেন। জ্ঞানশংকর চক্রবর্তী নিয়ে এলেন তাঁকে লখনউ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করে, সেইখানে আনন্দময়ী সদানন্দময়ী মণিকার মধ্যে যশোদা মা-কে পেলেন রোনাল্ড নিকসন নন—রোনাল্ড নিকসনের মধ্যে যিনি নব জন্মগ্রহণের জন্য অপেক্ষা করছেন, সেই,—কৃষ্ণপ্রেম।

এই রোনল্ড নিকসন লখনউতে জ্ঞানশংকরের বিদুষী স্ত্রী মণিকাকে মা বলে ডাকেন না শুধু, মায়ের মতোই দেখেন। নিকসনকে মণিকা ডাকেন, গোপাল বলে। নিকসন দেখেন তার মণিকা মা, হাসি গল্পগুজবে মেতে আছেন, পার্টিতে যাচ্ছেন, 'অ্যাট হোম' দিচ্ছেন, স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন দেশ-বিদেশে। সবই করছেন, তবুও সবার থেকে যেন অনেক দূরে ঘুরে বেড়ায় মায়ের দুটি চোখ। সেই চোখে কখনও কখনও নিকসন যেন তাঁর ছায়া দেখতে পান, যাঁর অন্বেষণে সাত সমুদ্র পারের দেশ থেকে এসেছেন মহামানবের সাগর-তীরে তিনি। একদিন ধরা পড়ে যান গোপালের চোখে মা মণিকা। গল্পগুজবে যখন ফেটে পড়ছে অধ্যক্ষ জ্ঞানশংকরের গৃহ, তখন সকলের অলক্ষ্যে চকিতে দিশাহারা মণিকা নিষ্ক্রান্ত হন সে-ঘর থেকে। গিয়ে ঢোকেন নিজের ঘরে। কেবল তাঁর লক্ষ্য এড়াতে পারেন না যাঁকে তিনি গোপাল বলে ডাকেন। মাকে অনুসরণ করে নিকসন এসে দেখেন, ধ্যানাবিষ্ট এ যেন আরেকজন কে? এই ধরার আসনে উপবিষ্ট কে অধরার আভাসে মুহূর্তে মুহূর্তে রোমাঞ্চিত।

মণিকা তাঁর গোপালের কাছে লুকোতে পারলেন না নিজেকে। সংসারের গুটিপোকা থেকে ভক্তির প্রজাপতি বেরুনোর খবর অন্বেষণে বহির্গতের দৃষ্টি এড়াবে কি করে ? মন্দিরের চূড়া চোখে পড়বে না তীর্থংকরের ?

যশোদামাঈর জীবনে তখন অন্তরতমের ডাক এসে পৌঁছেছে। বালগোপাল এসে দাঁড়ান যশোদার চোখের সামনে যখন-তখন। এবং তখন আর বহিরঙ্গ জীবন ধরে রাখতে পারে না তাঁকে। বন্ধু-বান্ধব, হৈহৈ গল্প-গুজব মিথ্যে হয়ে যায় সব। সত্য হয়ে দেখা দেয় শুধু অনির্বচনীয় অনুভূতি। ইন্দ্রিয়াতীত দর্শন-শ্রবণে ব্যাকুল যশোদার রূপান্তর ঘটে যায় কখন ; যশোদামাঈর জীবনের সেই নিগূঢ় সত্য দিন থেকে দিনে নিকসনের জীবনেও প্রতিফলিত হয়।

সাধ্যে নয়, সাধনায় নয় ; বেদনায়। তিনি ধরা দেন, সেই অধরা, অহেতুক বেদনায়। কাকে দেন, কেন দেন, তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলে, কিন্তু আশা করা চলে না উত্তর। একজনের জন্যে প্রাণ কাঁদে, সেই পরম একজনের। দর্শনের পাতায় নয়, চোখের পাতায় এসে দাঁড়ান তিনি। জ্ঞানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে গানের ওপারে, তিনি দয়া করেন প্রমাণ দেন, তিনি আছেন। আমরা যারা সব কিছুর কারণ খুঁজি, তারা বলি, পূর্বজন্মের সংস্কার। কিন্তু সমস্ত কারণের যিনি অতীত, কে বলবে কি কারণে, নাকি অকারণেই তাঁর আবির্ভাব বিশেষ একজনের স্থূলদৃষ্টির সামনে। ডাকলে যিনি সাড়া দেন না, না-ডাকতেই তিনি এসে দাঁড়ান জ্ঞানের এপারে, গানের এপারে, একজনের হৃদয়যমুনার তীরে এসে দাঁড়ান বংশীধারী।

সেই পরমাশ্চর্য পবিত্র অঘটন ঘটে গেল কখন মণিকার জীবনে। জীবনের মণিকার কখন নিজের গলার হার অযাচিতভাবে পরিয়ে দিয়েছেন ভক্তের কণ্ঠে,— খ্যাপা খুঁজে খুঁজে পেয়েছে কখন পরশপাথর, সে মুহূর্তটির সন্ধান পায় না, সে-ও যে জানার মাঝে অজানার পেয়ে গেছে সন্ধান।

আলো এসে পড়েছে মণিকার জীবনে। চরমের পরম আলোক। সেই আলোকে যশোদামাঈ নয় কেবল, দলের পর দল মেলে ফুটে উঠেছে শতদল, রোনাল্ড নিকসন। যার অন্বেষণে বহির্গত এই তরুণ বিদেশী, সে আজ পেয়ে গেছে সেই খনির সন্ধান, অজানা খনির নূতন মণি'র পেয়েছে পথ। আর তাকে ঠেকায় কে ? এখন শুধু উজাড় করে, কুড়িয়ে নেবার অপেক্ষা কেবল।

রোনাল্ড নিকসন নয় ; কৃষ্ণপ্রেম। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমের জীবন্ত প্রমাণ এই কৃষ্ণপ্রেম। যশোদামাঈর জীবন-ব্যাখ্যা কৃষ্ণপ্রেমের আলোয় না পড়লে অনুধাবন করা অসম্ভব। কৃষ্ণের অযাচিত প্রেমে রূপান্তরিতা যশোদামাঈর অযাচিত স্নেহে উজ্জীবিত কৃষ্ণপ্রেম।

যে কৃষ্ণ, সেই যশোদার বালগোপাল। যশোদার গোপাল যে, সেই কৃষ্ণপ্রেম।

॥ আট ॥

আলমোড়া। হিমালয়ের কোলে নিরুপম নির্জন নিঃসঙ্গ নিস্তব্ধ ভয়ংকর সুন্দর একটি পাহাড়। তার নাম মের্তোলা। ভারতবর্ষের অনামী তীর্থ এই মের্তোলার পাহাড়। কুমায়ুনের দুর্দান্ত শীতে সূর্যোদয়ের আগে এখানে বেজে ওঠে বংশীধারীর বন্দনা। তাঁর ভোগের আয়োজন আরম্ভ হয়ে যায় দিন শুরু হবার আগেই। ঠাকুরের শয্যাত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলারতি, পুজোয় উদ্‌বোধন হয় একটি প্রসন্ন পবিত্র দিনের। সমস্ত দিন ধরে চলে তাঁর সেবা। ফুল তোলা, চন্দন ঘষা, রান্না,বাসন মাজা, ঘরপরিষ্কার, কোনও কাজে গতানু-গতিকতার ছন্দপতন নেই, নেই বিরক্তি। ঘড়ির কাঁটার চেয়েও নিয়মিত মের্তোলার পাহাড়ে দণ্ডায়মান এই আশ্রমের সকাল-সন্ধ্যা। ঠাকুর বিশ্রাম করতে না যাওয়া পর্যন্ত অবিশ্রাম চলেছে কর্মস্রোত।

আশ্রমের আশ্রয়দাতা পাহাড়ের বুকের ওপর রৌদ্ররুক্ষ মাটির বুকের ওপর ফসল ফলানো দুঃসাধ্য অধ্যবসায়ের সঙ্গে চলেছে রীতিমতো। সেই ফসল থেকেই প্রস্তুত হয় গোপাল-ভোগ। তার থেকেই অতিথিসেবা, দরিদ্রনারায়ণের মুখে তুলে দেওয়া দুমুঠো, তারপর নিজেদের প্রাণরক্ষার প্রয়োজনে যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকুই গ্রহণ। এই সেবাই এই ঠাকুরের পুজোর একমাত্র প্রণাম।

ভারতবর্ষের যত তীর্থ আছে তার মধ্যে সব চেয়ে নিরহংকার সেবায় শুদ্ধ পবিত্র মের্তোলার পাহাড়ে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রম। এর কোনও বিজ্ঞাপন নেই; নেই কোনও চাঁদা অথবা প্রণামী। শুধু প্রণাম, শুধু নাম, শুধু সেবা। যুগলমূর্তির চরণে যুগলকরকমলের প্রণামে প্রতিষ্ঠিত রাধারাণী আর রাধারমণের বিগ্রহ স্থাপন করেন এখানে যশোদামাঈ। যশোদামাঈ তাঁর লীলা সাঙ্গ করে চলে গেছেন এখান থেকে অথবা তিনি এখনও যাননি। তাঁর পুণ্য পবিত্র স্পর্শ, লেগে আছে মের্তোলার পাহাড়ে। সেই স্পর্শের পরিচয়ে যিনি প্রদীপ্ত তিনিই কৃষ্ণপ্রেম।

মের্তোলা পাহাড়ের চেয়ে বড় তীর্থক্ষেত্র, কৃষ্ণপ্রেমের চেয়েও বড় তীর্থংকর এই মুহূর্তে আমার চোখে অনুপস্থিত। আত্মসেবা নয়; আত্মার সেবা। যশ নয়; যশোদামাঈ। কৃষ্ণতত্ত্ব নয়, কৃষ্ণপ্রেম দিয়ে ঘেরা মের্তোলার পাহাড়। অযুতনিযুত বৎসরের সূর্যপ্রদক্ষিণের পথে অমরতার দাবী না করা, কোনও মোহ নিয়ে নয় দাঁড়াবো তাঁর সম্মুখে, একটি মুহূর্ত যদি কখনও আমাদের চোখের সামনে কোথাও মূর্ত হয়ে থাকে, তো তা এই মুহূর্তে কেবল এইখানেই,—যেখানে হিমালয়ের কোলে আলমোড়া, আলমোড়ার কোলে মের্তোলা পাহাড় মর্ত্য ও অমর্ত্যলোকের মাল্যবদলের মিলনরাত্রের পরমাশ্চর্য প্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

মের্তোলা পাহাড় নয়। মের্তোলা একটি 'প্রতীক্ষা' যেখানে মানব তার তৃতীয় নেত্র একদিন মেলবে।

আকাশপথে শত্রুবিধ্বস্ত হবার মুহূর্তে বিমানের মুখ ঘুরিয়ে দেবার মুহূর্ত থেকেই রোনাল্ড নিকসন হয়েছিলেন অন্তর্মুখী। নিরন্তর সেই জীবন-জিজ্ঞাসায় ক্ষতবিক্ষত রোনাল্ড নিকসন মণিকা-মায়ের মধ্যে তার উত্তরের উত্তরীয় উড্ডীন দেখলেন। নিকসন তখন কৃষ্ণপ্রেম হননি ; মণিকা হননি যশোদামাঈ। নিকসন দেখলেন পার্টিপরিবৃতা, প্রসাধিতা, বিদুষী এই মহিলার বাইরের চেহারা তাঁর আসল রূপ নয়। মণিকা যেদিন ধরা পড়লেন নিকসনের কাছে, সেদিন স্বীকার করতে বাধ্য হলেন যে অধরা ধরা দিয়েছেন তাঁর কাছে, স্বেচ্ছায়, সেদিন থেকেই তিনি তাঁর গোপালের কাছে যশোদামাঈ ; নিকসন সেদিন থেকেই কৃষ্ণপ্রেম।

কৃষ্ণপ্রেম সেদিন থেকে যশোদামাঈ ছাড়া আর কাউকে জানাতে যাননি ; জানতে যাননি আর কারুর কাছে জীবনের পবিত্রতম জিজ্ঞাসা।

এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতেই তাঁর ভারতবর্ষে আসা। এই জিজ্ঞাসার জবাব খুঁজতে তিনি ডুব দিয়েছিলেন বৌদ্ধ দর্শনের অতলে। এখন এই জিজ্ঞাসার জবাব পেতে তিনি তাকালেন যশোদামাঈর দর্পণে। যেখানে অপরূপের অরূপ বিম্ব প্রতিমুহূর্তে ফুটে উঠছে যশোদামাঈয়েরও অজান্তে। চোখের সামনে সহসা উদঘাটিত হয় : 'সেই বৃন্দাবনের লীলা অভিসার' ; সেই অপরূপ রূপরাগ। কেন হয়, কোন্ সুকৃতির সুপুণ্যে কে জানে। নিরবধি কাল ধরে, বিপুলা পৃথ্বী জুড়ে কত মানুষ বেরুলো ঘর ছেড়ে পথে, পথ ছেড়ে দুর্গম বনে, খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফিরলো পরশ পাথর। দুগ্ধফেননিভ শয্যা, রূপসীভার্যা অনিন্দ্যকান্তি তনয় ত্যাগ করে, পরিত্যাগ করে খ্যাতির মুকুট, পরিহার করে কীর্তির কুসুমাস্তীর্ণ পথ, সর্বস্ব পণ করে বেরুলো তারা তাঁকে খুঁজতে লোভে যাঁকে আমরা হত্যা করেছি, প্রেমে যাকে আমরা পুনর্জীবিত করব। দেখা পেল কই ? কোটিকে গোটিকেও সাড়া পেল কই তাঁর,—সমুদ্র যাঁর জিজ্ঞাসা, হিমালয় যার জবাবে চিরনিরুত্তর।

আর যে পেল তাঁর দেখা, সে পেয়ে গেল ঘরে বসে। অধ্যয়নে নয়, কঠোর তপস্যায় নয়, নয় কঠোরতর আত্মনির্যাতনে। হেসে খেলে গান গেয়ে পার্টি করে প্রসাধন করে সেজেগুজে সমাজের কলরব মুখরিত প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে আছে যে মধ্যমণি হয়ে, সেই মণিকা-র অন্তর অঙ্গন জুড়ে আলো করে এসে, হেসে, ভালোবেসে দাঁড়ায় ত্রিজগতের সেই মণিকার যাঁর দ্যুতি ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে পড়ে যেখানে পা পড়ে সামান্য মানবীর সেখানেই উছলে উছলে পড়ে নীলকান্তমণি পেয়ালা থেকে উচ্ছ্বসিত মাধুরী।

কেন এমন হয় ? চাইলে যে তাঁকে, তাকে চাইলে না চোখ তুলে। না চাইতেই পাওয়া গেল তাকে,—কোন্ পুণ্যের ফলে কে বলবে। গাছ যদি জানত কেমন করে ফুল ফোটে তাহলে ফুল ফুটত কি অনাদিকাল ধরে !

যশোদামাঈয়ের কাছে পথের দিশা প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণপ্রেমী। যশোদামাঈ

জবাব দিলেন, 'আগে ভারতবর্ষকে জানো তারপর জেনো তার পরমধনকে।' যশোদামাঈর নির্দেশ মাথা পেতে নিলেন তাঁর গোপাল। ভারতীয় ভাষায় শিক্ষিত হলেন স্বয়ং যশোদামাঈর সাহায্যে। রামায়ণ মহাভারত পাঠ করে শোনালেন অনুবাদের মধ্যে দিয়ে মা। বৈষ্ণবসাধনার মধুর রসে সিক্ত হলো বিদেশের কঠিন মাটির বুক। ধর্মাসনে অভিষিক্ত হলেন ইংরাজ যুবক রোনাল্ড নিকলন। কিন্তু নিকসনের মন নরম হলেও পরমের চরম নির্দেশ না পাওয়া পর্যন্ত শান্তি কই? সমুদ্রে না পেঁছিনো পর্যন্ত নদীর ক্ষান্তি কই পথ চলায়। আবার প্রার্থনা করলেন কৃষ্ণপ্রেম, দীক্ষা দাও। আমাকে উজ্জীবিত কর নবজীবন মন্ত্রে। চাতক বললে আকাশকে, কৃষ্ণবর্ণ হও তুমি তারপর ঝরে পড় অমৃতবিন্দু। আস্বাদ করতে দাও তোমার মধুর সাধনকে। কিন্তু হায়, আকাশ যে তখনও মেঘকজ্জল নয়! কেমন করে দেবে সে নিজেকে নীরবিন্দুতে সিন্ধুর আস্বাদ অমৃত-অভিলাষী চাতককে। স্বয়ং যশোদামাঈরই যে তখনও সন্ন্যাস নেওয়া হয়নি।

নিকসনকে নিবৃত্ত করতে মণিকা বললেন: সংসারে থেকেই তো সারকে অন্বেষণ করা যায়। তুমি কেন ঘর ছাড়বে, তুমি কেন নেবে ভিক্ষার ঝুলি? তোমার ঝুলি থেকেই তে ভিক্ষা নেবে অন্যেরা। কীর্তি আর প্রতিপত্তি, লোকমান আর পার্থিব রজতের বাঁধ, পথ ছেড়ে তুমি কেন বৈরাগী হবে গোপাল?

কৃষ্ণপ্রেম তাঁর কৃষ্ণপ্রেমে অবিচল: লোকমান নয়, দ্রৌপদীর মান রক্ষা করেছিলেন যিনি তাঁর সন্ধানব্রতই আমার জীবনের একমাত্র কর্ম। সন্ন্যাস দাও আমাকে। তমো থেকে আমায় নিয়ে চলো মহত্তমে।

কুন্তীকে বললেন শ্রীকৃষ্ণ: বর চাও। কুন্তী বললেন: আমার জীবন থেকে দুঃখের মেঘ দূর কোর না, কারণ তাহলেই তোমাকে ভুলে যাব!

আকাশে কালো মেঘে যে দেখে কৃষ্ণছায়া তাকে ভোলাবে কোন রঙিন মায়ায়? সমুদ্রের ডাক পেঁছেছে যার কানে অন্তহীন দূর সেই নদীকে কি ভয় দেখাবে? জ্যোতিসমুদ্রের মাঝখানে যে পদ্ম বিরাজ করে তার মধুলুব্ধ যে সে মৌমাছি কোন দুঃখে লোকমানের মল-মুগ্ধ মাছি হতে চাইবে?

দিতেই হলো সম্মতি মণিকাকে। গোপালকে দিতে হলো সন্ন্যাসসম্মতি।

তাঁর আগে মণিকা নিজে নিলেন সন্ন্যাস। রাধারাণীর অনুমতি পেলেন মণিকা, গোপালকে দীক্ষা দেবার সানন্দ ছাড়পত্র। কিন্তু তার আগে নিজের জন্যে বাহুল্য সন্ন্যাসব্রত সমাধা করতে চললেন বৃন্দাবনে। বালকৃষ্ণদাস গোস্বামীর কাছে গ্রহণ করলেন বৈষ্ণবীয় সন্ন্যাস, [যশোদামাঈ: শংকরনাথ রায়]।

এবং তারপর নিকসনকে নবজন্ম দিলেন সন্ন্যাসদীক্ষায়; নব নাম দিলেন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্‌কালে প্রতিশ্রুত হলেন কৃষ্ণপ্রেম, যে তিনি যশোদামাঈর

সাধনার পথ কখনও পরিত্যাগ করবেন না। আর অলৌকিক দর্শন বা শক্তির জন্যে কাতর হবেন না কখনও।

সেই প্রতিশ্রুতিতে আজও পরম প্রোজ্জ্বল মেতোলার পাহাড়।

লক্ষ্ণৌ থেকে বারাণসীতে নূতন শিক্ষায়তনে যোগ দিতে এলেন যশোদামাঈর স্বামী। যশোদামাঈও এলেন কাশীতে; এই কাশীতেই যশোদামাঈর অধ্যাত্ম-জীবন দলের পর দল মেলে বিস্ময়ের শতদল হয়ে ফুটে ওঠে। অ্যানি বেসান্ত তাঁর কাছে দীক্ষা চান। কিন্তু যশোদামাঈ তা দিতে অস্বীকার করেন। কেন করেন তা তিনিই জানেন। সম্ভবত যে প্রতিশ্রুতি অক্ষত থাকবার সম্ভাবনা কৃষ্ণপ্রেমের মধ্যে দেখেছিলেন। বেসান্তের মধ্যে তা সুদূর পরাহত ছিলো তখনও।

সন্ন্যাস নেবার পর যশোদামাঈ এলেন আলমোড়ায়। চিরকালের জন্যে। এলেন মেতোলায় নূতন ঘর পাতলেন,—রাধারাণী আর রাধারমণের ঘর। সঙ্গে কৃষ্ণপ্রেম এবং আরও কয়েকজন। শহর থেকে দূরে, সভ্যতা থেকে সরে গিয়ে স্বপ্ন আর সাধনায়, সেবা আর আরাধনার আসন পাতলেন পাহাড় ঘেরা পথের ধূলায়। যেদিকে তাকাও শুধু পাহাড় আর আকাশ। ধূসর আর নীল। অদূরে দাঁড়িয়ে 'নন্দাদেবী'। তুষারস্নাত শুভ্র মাথা ত্রিশূলের; তারই ওপর ধূম্রজটা বুঝি ধূর্জটির।

কৃচ্ছ্রসাধনার আহ্বান জানালেন যশোদামাঈ। কৃষ্ণপ্রেমকে বললেন: গৃহস্থের দরজায় দরজায় গিয়ে দাঁড়াও; বলো: ভিক্ষাং দেহি মে। ভিক্ষাপাত্র ভরে আনো প্রভুর সেবার জন্যে আর আনো অহংকার ভেঙ্গে চুরমার করতে। গৌরতনু সেই সন্ন্যাসী গিয়ে দাঁড়ায় মানুষের দরজায়। সুকান্ত, সুদীর্ঘ, সুঠাম এক ইংরেজ কালা আদমির কাছে হাত পাতার সেই দৃশ্যের স্মৃতির স্পর্শ আলমোড়ার পথে প্রান্তরে লেগে আছে আজও [যশোদামাঈ : শংকরনাথ]।

যশোদামাঈ কৃষ্ণসেবাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণপ্রেম মনে করতেন।

কৃষ্ণপ্রেম নিজেও বলেছেন সেকথা; সেবার মধ্যে দিয়েই মন অমন কৃষ্ণে মজে। মায়ের অনুগ্রহ আর বিগ্রহসেবা—এই হচ্ছে রাধারাণীর পূজা। এছাড়া আর আমি কিছু জানিনে।

আমি নয়; স্বামী তুমিই সব,—অহংকার ভঙ্গই, বিশ্বনাথের অঙ্গে মানুষের শ্রেষ্ঠ অলংকার!

আরও বলেছেন কৃষ্ণপ্রেম। বলেছেন সংসার এবং সার এক সঙ্গে হবে না। দুহাত দিয়ে না ধরলে রাধারাণী ধরা দেন না। সব দিয়ে পেতে হয় সব। অনন্যমনে যে চায় তাঁকে সে পায় শুধু। দু'-নৌকায় পা দিয়ে পায় না কেউ তীরে ওঠবার উপায়। এক মনে, এক চিন্তায়, এক স্বপ্নে, এক সাধনায়, এক আরাধনায় কৃষ্ণপ্রেম সম্ভব। বাসনা যার সোনা হয়ে যায়নি তার কানে শোনা যাবে না সেই মুরলীধ্বনি।

দ্রৌপদী যতক্ষণ বস্ত্রের খুঁটো চেপে ধরে আছেন ততক্ষণ দেখা নেই সুদর্শন চক্রধারীর। যে মুহূর্তে দুহাত তুলে দিয়েছেন দ্রৌপদী সব লজ্জা বিস্মৃত হয়ে তখনই দেখা দিয়েছেন সেই চারহাত ; শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি।

মের্তোলার এই রাধারাণী আর রাধারমণের বিগ্রহের সামনে গান গাইছেন সেবার পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়। পাশের ঘরে শয্যাত্যাগে অশক্ত শুয়ে আছেন যশোদামাঈ। গানের সুরের পাখা গুঞ্জরণ করে উঠলো মূর্তির সামনে ! ছড়িয়ে গেল সুরের আলো ঘরময়। সুরে সুবাসে ভরে গেল মের্তোলার পাহাড়। ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হলো দৈবকণ্ঠ পাহাড়ে পাহাড়ে ! সুরের ঝরণা-তলায় এসে বসলো সবাই। শুধু শয্যায় খুঁজে পাওয়া গেল না উত্থানশক্তি রহিত যশোদামাঈকে। কোথায় গেলেন তিনি ?

যশোদামাঈকে পাওয়া গেল মন্দিরে। ধ্যানাশ্রু গড়িয়ে পড়ছে দু চোখ দিয়ে। পঙ্গুকে যিনি চলার শক্তি দেন আজ তিনি স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছিলেন দিলীপকুমারের পেছনে। সুরের জালে সেদিন ধরা দিয়েছেন এই পৃথিবী যাঁর পরমাশ্চর্য ইন্দ্রজাল। যশোদামাঈ নিজে বলেছেন সুরের ভাস্কর দিলীপকুমারকে লীলাময় স্বয়ং আজ তোমার সুরের ঝরণাতলায় এসেছিলেন স্নান করতে। আমি স্বচক্ষে দেখলাম।

স্বচক্ষে ; তবে সকলের চোখে নয়। সেই চোখেই শুধু এ দেখা সম্ভব যে চোখের নীলমণিতে সবাই নীলমণি। মণিকার ছাড়া সে নীলমণি আর কার !

যশোদামাঈর মরদেহ মের্তোলা ছেড়ে যাবার পরেও দিব্য চেতনা দিনে দিনে দীপ্ত হয়েছে কৃষ্ণপ্রেমে। মের্তোলা আশ্রমে যাবার জন্যে সেবার ব্যাকুল হয়েছে সুনীল আর আরতি। যাবার পাথেয় নেই। আরতির হাতের বালা বিক্রি করে যোগাড় হলো টাকা। কারণ যেতেই হবে। মের্তোলা আশ্রমে পূজা সাঙ্গ হয়েছে সবে একদিন। কৃষ্ণপ্রেমের হাতে দেখা গেল শ্রীরাধারাণীর বালা। আরতিকে প্রশ্ন করেন কৃষ্ণপ্রেম : তোমার হাত খালি কেন ? বালা কি করলে তোমার। মুখ নীচু করে আরতি দাঁড়িয়ে রইলো। জবাব যোগালো না তার মুখে।

প্রসন্ন বেদনায় বিচ্ছুরিত হাস্য কৃষ্ণপ্রেম : রাধারাণী তাঁর নিজের হাতের বালা পরিয়ে দিতে বলেছেন তোমার হাতে। তুমি এখানে আসবার জন্যে যা খুলে দিতে বাধ্য হয়েছ, যার জন্যে করেছ এই কাজ, তিনি আজ নিজের হাত খালি করে বললেন তোমার হাত ভরে দিতে [যশোদামাঈ : শঙ্করনাথ রায়]।

এ সেই বালা যা বিক্রি করা যায় না ; সে বালার কাছে যুগে যুগে আমরা সবাই বিক্রীত।

মের্তোলা পাহাড়ে যশোদামাঈর দিব্য চেতনার দূত আলোকের রাখী পরিয়ে চলেছেন পথিকজনের হাতে আজও। সমস্ত দিনের 'দুঃখধন্দার রিক্ত প্রান্তে' বিশ্বাস রিক্ত কর্মসর্বস্ব মানুষের প্রাণে আনন্দের বীণা বাজাবার ভার যাঁরা পেয়েছেন তাঁরা ভগবানের দূত। মানুষ যতবার বিষিয়ে দেবে এই বসুন্ধরার

মধু বায়ু, আলোকে করতে চাইবে অবিশ্বাসের অন্ধকার, ততবার আসবেন ভগবানের দূতেরা। ততবার ভালোবাসবেন তাদের যারা হিংসার বদলে প্রতিহিংসা, মারের বদলে মার, বিভীষিকার উত্তরে বিভীষিকার পালা রচনা করতে আসবে পৃথিবীতে। বলবেন. 'ক্ষমা কর, ভালবাসো'।

আর কোনও আশা নয়। শুধু ভালোবাসা, ধন নয়, মান নয় একখানি ভালোবাসা। যে ভালোবাসতে পেরেছে সে পেরেছে হাসতে 'পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দরিদ্রের অত্যাচারে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে।'

মের্তোলায় যশোদামাঈর সেই ভালোবাসার নামই কৃষ্ণ-প্রেম !

ভারতবর্ষের তেত্রিশ কোটি দেবতাদের আত্মা অবিনশ্বর হিমালয়ের কোলে আলমোড়ার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ তীর্থ মের্তোলার পাহাড়। সেই পাহাড়ের দরিদ্র কুটীরে মূর্ত নারায়ণ মূর্তির অর্চনা অনলস আয়োজনে ব্যাপ্ত একটি মানুষ, যাঁকে দেখে অনুভব করা যায় প্রেমে কৃষ্ণকে পাওয়া যায়। তাঁর নাম কৃষ্ণপ্রেম। যোদ্ধা নয়, রাজনৈতিক নেতা নয়। লাখ-টাকার নয় অভিনেতা, জনপ্রিয় ব্যবহারজীবী, বাগ্মী অথবা সাহিত্যিক শিল্পী নয় ; একজন সম্পূর্ণ মানুষ। মানবজীবনের পূর্ণমূল্য যিনি পেয়েছেন কৃষ্ণ-প্রেমে। কবির সেই প্রার্থনা।

'আমি চাইনা হতে, নবযুগের নববঙ্গের চালক
কোনও জন্মে পারি যদি হতে ব্রজের রাখাল বালক'

—তারই উত্তরে রোনাল্ড নিকসনের উত্তরীয় রাঙানো। সেই উত্তরীয়ের নামই 'কৃষ্ণপ্রেম'। যশোদামাঈ দীক্ষামুহূর্তে বলেছিলেন তাঁর মানস-সন্তানকে : এ জীবনে ঈশ্বর দর্শন হোক বা না হোক···

ঈশ্বর কে জানি না ! শুধু জানি, কৃষ্ণকে দর্শন দিতেই হবে কৃষ্ণপ্রেমকে। তাঁকে আসতেই হবে মের্তোলার পাহাড়ের ওই ভালোবাসায়। ভক্তের বুক ছাড়া ভগবানের পা ফেলার জায়গা কোথায় আর এত বড় পৃথিবীতে।

মের্তোলা পাহাড় বারাণসী থেকে অনেক দূরে ; কিন্তু কৃষ্ণপ্রেমের চেয়ে বিশ্বনাথের এত কাছাকাছি আর কে ?

॥ নয় ॥

ভারতবর্ষের বিস্ময় কাশী ; কাশীর বিস্ময় পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজ।

দর্শনের ঈশ্বর গোপীনাথ. ঈশ্বর দর্শনের জন্যে ব্যাকুল হয়ে বেড়াচ্ছেন আজও। 'যেখানে দেখিবে ছাই, উড়াইয়া দেখ তাই, পেলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।' যদি সত্যি সত্যি কেউ ছাই-চাপা আগুনের মধ্যে পরশমণির স্পর্শ পাবার জন্যে আকাশ-পাতাল করে বেড়ান আজও, তবে তিনি এই

গোপীনাথ ছাড়া আর কে? তাঁর কথা মনে হলেই আমার রবীন্দ্রনাথের সেই একটি কবিতার কথা মনে হয়। সেই যে একটি মাত্র কবিতা—যা এই মুহূর্তে একমাত্র গোপীনাথের জীবনকাব্য বলে প্রতীত হয়—'খ্যাপা খুঁজে খুঁজে ফেরে পরশপাথর।' পণ্ডিত গোপীনাথ কবিরাজের মাথায় ধুলোয় কাদায় কটা বৃহৎ জটা নেই; তাঁর কলেবর ক্ষীণ নয়। চালচুলাহীন ধূসর কৌপীন সম্বল ছাইমাখা ধুলোয় ঢাকা নন পণ্ডিত গোপীনাথ;—ঠিক। কিন্তু নিবিড় অমা নিশীথে খদ্যোতের মতন তাঁর চোখ দুটোও কাকে যেন খুঁজে বেড়ায় 'নিজের আলোকে'। সোনারুপা তুচ্ছ মনে করেন; রাজ-সম্পদের জন্যে এতটুকু কাতর নন এই গোপীনাথও। তাঁর দশা দেখে সংসারী লোক আমাদের হাসি পায় না, কেবল উপহাসই পায়। পায়, কারণ 'যে ধনে হইয়া ধনী' মানুষ 'মণিকে মানে না মণি বলে,' সে ধন সত্যি সত্যি কেউ বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় দেখতে চায়, এ যে আরব্য উপন্যাসের চেয়েও অলীক, অলৌকিক। তাই 'দশা দেখে হাসি পায়, আর কিছু নাহি চায়' একেবারে পেতে চায় পরশপাথর।'

পরমাত্মীয়ের মৃত্যুতে অবিচল গোপীনাথকে তারাই মনে করে পাথর, 'পরশ-পাথর' যাদের কাছে হাসির কথা, উপহাসির উপলক্ষ্য।

বার্ধক্যে বারাণসী ভূমিষ্ঠ হবো হবো করছে তখন। দীর্ঘ রক্তাক্ত যন্ত্রণার দিন অবসান হয়ে একটি রক্তিম সৃষ্টি প্রসূত হবার প্রতীক্ষায় প্রহর গুণছে। আর দেরি করবার কথা ভাবতে পারলাম না। দেবলোকের দেখা পেতে হলে সিদ্ধিদাতা গণেশের আলোকে জানাতে হয় প্রণাম। বিশ্বনাথের বার্তা জগতে অবারিত করবার পূর্বাহ্ণে প্রয়োজন গোপীনাথের দর্শন। গোপীনাথ কাশী সম্পর্কে বই লিখছি শুনে জিজ্ঞেস করলেন: বইয়ের নাম কি দিয়েছেন? বললাম: বার্ধক্যে বারাণসী। মনে আছে, কবিরাজমশাই বলেছিলেন, নামটি তো ভালো। আরও মনে আছে আমার স্বভাবসিদ্ধ অবিনয়ের সঙ্গে, সঙ্গে সঙ্গে কমেন্ট করেছিলাম: শুধু নামটা কেন, বইটিও খুব ভাল হবে। তারপর প্রশ্ন করেছিলাম: কাশীতে ভূত ভবিষ্যৎ বলতে পারে, সত্যি সত্যি এমন জ্যোতিষী কেউ আপনার জানা আছে? উত্তর হলো: বাঙালীটোলায় একজন ছিলেন, উত্তরপ্রদেশের লোক। এখন কেউ আছেন কি না জানি না। প্রশ্নের উত্তর দেবার ভঙ্গি থেকে অনুমান করলাম জ্যোতিষে কৌতূহলী নন কবিরাজ।

কৌতূহলী না হবারই কথা। পরশপাথরের অনুগ্রহ-অভিলাষী, গ্রহশান্তির তুচ্ছ পাথরের খবর করবে কোন্ দুঃখে? জাহাজের কারবারী কেন হ'তে চাইবে আদার ব্যাপারী? জীবন-সূর্য যাবার আগে জ্বলে উঠছে যাঁর চলার পথ আলো করে, অপরূপ জ্যোতি-রাগে, সে কেন খবর করবে—টাইগার-হিলে সূর্যোদয় দেখতে হলে, ক'টার সময় প্রয়োজন হয় শয্যাত্যাগের?

সূর্যমুখী কেন তারা গুণবে রাত্রি প্রভাতের অপেক্ষায়, সূর্যের আলোয় যে সুনিশ্চিত মেলবে চোখ ?

ডক্টর গোপীনাথকে আবার প্রশ্ন করেছিলাম : যে সব সাধুদের দর্শন করলে দর্শন পর্বের প্রয়োজন তুচ্ছ হয়ে যায়, তেমন মহাত্মা এখন কাশীতে কেউ আছেন বলে আপনি জানেন ? আমি তাঁদের নাম ঠিকানা জানতে চাইনি, তিনিও জানাতে চাননি তা। শুধু বলেছিলেন : আছেন।

সঙ্গে সঙ্গে স্মরণের অতীতকালের একটি কণ্ঠ উচ্চারণ করলে আমার কানে : অন্ধকারের পারে আছেন একজন, যাঁকে লক্ষ্য করে অগ্রসর হলে তবেই পৌঁছবে তুমি মৃত্যু থেকে অমৃতে। শুধু এক সে-ই আছে ; আর পথ নেই। নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়। ব্যূহের মধ্যে প্রবেশের পথ অনন্ত। ব্যূহ থেকে বেরুবার পথ কেবল একটি। সপ্তরথী ভেদ করে 'অভিমান'-এর বেরুবার সেই এক পথ,—যে পথে এক পার্থকেই নিয়ে যেতে পারেন এক পার্থসারথি।

সেই পথের প্রান্তে বিশ্বনাথ, যেই পথের প্রারম্ভে গোপীনাথ। দুজনকেই জানাই দুই করযুক্ত প্রণাম।

গোপীনাথ কবিরাজ মহাপ্রাজ্ঞ, গোপীনাথ কবিরাজ শ্রেষ্ঠ তান্ত্রিক, গোপীনাথ কবিরাজ দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। কিন্তু সবার ওপরে গোপীনাথ কবিরাজ 'পরম ভাগবত,'—বলেছেন পণ্ডিচেরীর দিলীপকুমার রায়। ঠিক বলেছেন তিনি। গোপীনাথ কবিরাজ পরম খ্যাপা পুরুষ। আমি জানি। আমি জানি যে, গোপীনাথ কবিরাজ যাঁদের কাছে পণ্ডিত বলে আদৃত, তাঁদের কাছেই খ্যাপা বলে উপহসিত। এই নিয়ম, এই হয়। কারুর বেলাতেই এর ব্যতিক্রম হবার নয়। অলডাস্ হাক্সলি ঈশ্বরকে ব্যঙ্গ করার জন্যে নন্দিত হয়েছিলেন যৌবন-কালে। জীবনের সায়াহ্ন বেলায় ঈশ্বর-ব্যাকুলতার জন্যে আজ নিন্দিত। শ্রীঅরবিন্দ রাষ্ট্র বিপ্লবের গুরু বলে বন্দিত আজও। এই জগতের আদ্যন্ত-কালের ইতিহাসে অভূতপূর্ব আধ্যাত্মিক বিপ্লবের পথিকৃত বললে শ্রীঅরবিন্দকে, তৎক্ষণাৎ আপনার বক্তব্য হলো অন্ধ ভক্তির উচ্ছ্বাসমাত্র। রবীন্দ্রনাথ বলাকার কবি—এ বললে আপত্তি নেই ; গীতাঞ্জলির কবি রবীন্দ্রনাথ বললেই বিপত্তি।

এই ভক্ত গোপীনাথ দিলীপকুমার রায়কে এক পত্রে লিখেছেন :

·····'কি যেন একটা মহাক্ষণের প্রতীক্ষায় ব্যাকুলভাবে বসিয়া আছি—একমাত্র সেইদিকেই সচেতন লক্ষ্য রহিয়াছে। সেই মহাক্ষণ যে কোনো সময়ে ফুটিতে পারে। আশীর্বাদ করুন এবং ঠাকুরের নিকট প্রার্থনা করুন যেন সেই মহাক্ষণের প্রকাশে আমি ধন্য হইয়া যাই। ক্ষর পুরুষ ও অক্ষর পুরুষের মহা-সন্ধিরূপে সেই মহাক্ষণ পুরুষোত্তমের আকারে আত্মপ্রকাশ করে। গুরোঃ কৃপা হি কেবলম্। কালের অতীত সর্বকালময় সেই মহাক্ষণেই যাত্রার অবসান ও একমাত্র বিশ্রাম।'

চিঠির শেষে আবার :

"কিন্তু সে অবসানও অবসান নয়। সেই অবসানের মধ্যেই অসীম স্পন্দনের অভিনব লীলার প্রারম্ভ—যে লীলার অবসান নাই।"

যে মুহূর্তটি জীবনে মূর্ত হবার অপেক্ষায় গোপীনাথ আছেন, সেই অনন্ত মুহূর্ত তাঁর সমস্ত বাসনাকে সোনা করে দিয়েছে। গোপীনাথ কত জানেন। কেবল এইটুকুই আজও জানেন না। মহৎ মানুষের মহত্তম ট্র্যাজিডিই এই। আজও তিনি খ্যাপার মতন খুঁজে বেড়াচ্ছেন সেই অপ্রত্যক্ষকে—যিনি প্রত্যক্ষ গোপীনাথ নিজেই! পরশপাথরের স্পর্শে বাসনার লোহা যার সোনা হয়ে গেছে, সেই মহৎ ভাগ্যবান গোপীনাথ ছাড়া আর কে? এবং সে খবর আজও যে নিজে রাখে না, সেই বৃহৎ হতভাগ্যও গোপীনাথ ছাড়া আর কে?

'সন্ন্যাসী চমকি ওঠে, শিকল সোনার বটে
লোহা সে হয়েছে সোনা জানে না কখন।'

একা গোপীনাথ নন। এমনই কত খ্যাপা দেশে দেশে কালে কালে নটরাজের নৃত্যের তালে তালে কত সন্ধ্যা কত সকালে বন্ধনমুক্তির পরশপাথর পেয়ে ফেলে দিয়েছে দূরে, ফেলে দিয়েছে, ছুঁড়ে:

'কেবল অভ্যাসমত নুড়ি কুড়াইত কত
ঠন করে ঠেকাইত শিকলের' পর—
চেয়ে দেখিত না নুড়ি দূরে ফেলে দিত ছুঁড়ি
কখন ফেলেছে ছুঁড়ে পরশপাথর।'

পরশপাথর ছুঁড়ে ফেলে—পরশপাথর দূরে ফেলে—আমরা সবাই পাথরের নুড়ি বয়ে বেড়াচ্ছি আঙুলে। এই পৃথিবী যাঁর প্রত্যক্ষ বিগ্রহ, তার অসংখ্য মানুষকে সর্বপ্রকার বন্ধনের মধ্যে রেখে মুক্তির আশায় চোখ বন্ধ করে বসেছি আমরা। চোখ চাইলে দেখতাম বিশ্বের তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে অনাথ রেখে, উপবাসী রেখে বিশ্বনাথের মাথায় বেলপাতা, গঙ্গাজল, দুধ ঢেলেছি। চোখ মেলে দেখলে আমরা দেখতাম, পবিত্রতার, ন্যাসের, বীর্যের, সুন্দরের প্রতীক 'সতী' আবার দেহত্যাগ করেছেন অপমানিত শুভ ও শিব-এর অসম্মানে। চোখ মেলে দেখলে আমরা দেখতাম, শিব আবার ধারণ করেছেন সংহারমূর্তি। জটার বাঁধন খুলে পড়েছে আবার! প্রলয়নৃত্যের সূচনায় বিশ্বের আকাশ ঝড়ের আগে থমথম করছে।

চোখ মেলে বিশ্বনাথের পূজা করেছিলেন শুধু একজন। তিনি বিশ্বনাথপুত্র বীরেশ্বর বিবেকানন্দ! বিলে, বীরেশ্বর, নরেন্দ্র—এ সবই যাঁর পুণ্য নাম—সেই স্বামী বিবেকানন্দ, ঈশ্বরের পায়ে 'দক্ষিণেশ্বর'-এর যিনি অদ্বিতীয় প্রণাম।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ আমাকে যে বলেছিলেন, কাশীতে এখনও তাঁরা আছেন—যাঁদের জন্যে ভারতবর্ষ আজও ভারতবর্ষ, কাশী এখনও কাশী, তাঁদের কারুর কথা তিনি লিখেছেন তাঁর একটি বইতে। বইটির নাম,—'সাধুদর্শন ও

সৎপ্রসঙ্গ'। এই বইতে যাঁদের কথা তিনি লিখেছেন, তাঁরা সবাই কাশীর লোক নন, কিন্তু কাশী তাঁদের সকলেরই একমাত্র লোক। বস্তুত ভারতবর্ষে এখনও পর্যন্ত যত মহাত্মা এসেছেন, কাশী তাঁদের সকলেরই আত্মার আলোক।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ডের শেষে ডক্টর গোপীনাথ আমাদের একটি অদ্ভুত বালকের কথা শুনিয়েছেন। ১৯৩৭ সালের অক্টোবর মাসে এই অদ্ভুত বালকের কথা গোপীনাথকে তাঁর এক বন্ধু প্রথম শ্রুতিগোচর করান। কাশীতে তখনই এই বালক বহু লোকের এবং কোন কোন কাগজেরও আলোচনার বিষয় হয়েছে। শোনা গেছে যে, বালকটি নাকি তার স্থূল শরীর ত্যাগ করে সূক্ষ্ম দেহে লোক-লোকান্তর ঘুরে এসে সব্যাখ্যা তার আশ্চর্য বর্ণনা দেয়। কাশীর জঙ্গম-বাড়িতে সেই অদ্ভুত ছেলেটির বাস। তার নাম কেদারনাথ। জাতি মালাবার, এবং বয়স ষোল বৎসর। মা এবং বড় বোন ছাড়া বালকের অভিভাবক ছিলো না কেউ। বাঙালীটোলা উচ্চ বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণীতে তখন পাঠরত ছিলো এই অদ্ভুত বালক।

গোপীনাথ তাঁর মা ও দিদির সঙ্গে আলাপ করে বুঝলেন যে, তাঁদের এবং তাঁদের পরামর্শদাতাদের ধারণা বালকটিকে ভূতে পেয়েছে অথবা বায়ুর কোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। চিকিৎসায় ফল না পেয়ে, তাঁরা ওঝাও ডেকেছেন। তাতেও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। বালকের মা তাঁর একমাত্র পুত্রের আরোগ্য কামনায় সাধ্যের ত্রুটি করেননি সর্বপ্রকার চিকিৎসার। এই অবস্থায় ডক্টর গোপীনাথ গেলেন কেদারের কাছে। কেদারকে প্রশ্ন করতে সে তার পূর্ব — তার অপূর্ব—ইতিহাস এইভাবে ব্যক্ত করে :

'আমার কোন রোগ হয় নাই, এবং কোন প্রকার বিকারও আমাতে উৎপন্ন হয় নাই। কিন্তু মা তাহা বুঝিতে পারিতেছেন না। আমার চলাফেরা, কথাবার্তা ও সাধারণ ব্যবহার অন্য লোক হইতে একটু পৃথক ভাবের বলিয়া উঁহারা আমাকে রোগী বলিয়া মনে করিতেছেন। কিন্তু আমি রোগী নহি। আমি যখন দেহ হইতে বাহির হইয়া যাই—তখন আমার জ্ঞান থাকে, বাহিরে যাইয়া নানা স্থান দর্শন করিয়া পুনর্বার যখন নিজ দেহে ফিরিয়া আসি, তখনও বোধ থাকে এবং পূর্বের স্মৃতি বর্তমান থাকে। শুধু তাহাই নহে, সূক্ষ্ম-জগতে বিচরণ করিবার সময় একটা ক্রম ধরিয়া বিচরণ করি এবং ক্রম আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, একদিনের অভিজ্ঞতার সহিত অন্য দিনের অভিজ্ঞতার সম্বন্ধ আছে। সুতরাং আমি ইহাকে বিকৃতি বলিয়া মনে করি না।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃ ১৬০-১৬১]

কাশীর জঙ্গম-বাড়ির কেদার নামে এই অদ্ভুত বালকের পূর্ব বা অপূর্ব অভিজ্ঞতা এইরকম। ডক্টর গোপীনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাতের এক অথবা দেড়মাস আগে, ১৯৩৭ সালের আগস্ট বা সেপ্টেম্বর মাসে একটি বন্ধুর সঙ্গে কেদার দশাশ্বমেধ বাজারে যায়। বাজারে ঢোকবার আগে একটি রক্তবর্ণ পুরুষকে

কেদারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে দেখে সে। কেদারের এমনও মনে হয় যে, কেদারের শরীর স্পর্শ করবার জন্যে সে সচেষ্ট ছিলো। বাজারে যাবার সময় আগাগোড়া কেদার সেই বন্ধুর গলা জড়িয়ে ধরে ছিলো। বাজারের মুখে বন্ধুটি বিদায় নিলে, সেই রক্তবর্ণ পুরুষ কেদারকে ছুঁয়ে দেয়। তারপর সে অদৃশ্য হয়; কেদার বাজার করে বাড়ি ফেরে; এবং একসময়ে সব ভুলে যায় এসব কথাই। রাতে তার জ্বর আসে এবং কয়েকদিন ধরে সেই জ্বর থাকে। এই জ্বরের সময়ে একদিন সে তার স্বর্গত বাবাকে দেখে; বাবার সঙ্গে ছিলেন বাবার মৃত গুরু রসিকবাবু। তাঁরা কেদারকে দেহ থেকে বেরিয়ে তাঁদের সঙ্গে যেতে বলেন। কেদার প্রথমে রাজি হয় না। তাছাড়া দেহ থেকে সজ্ঞানে বেরুবার উপায়ই বা সে জানবে কোথা থেকে। কিন্তু একদিন এঁদেরই প্রভাবে কেদার দেহ থেকে বেরিয়ে পড়ে। কিভাবে দেহ থেকে সূক্ষ্মদেহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাও দেখলো এবং পরলোকগতদের অনুসরণ করে কেদার বহু লোক-লোকান্তর পরিভ্রমণ করে আসে।

এরপর কেদার রোজই একবার, কখনও কখনও একদিনে একাধিকবার সূক্ষ্ম দেহে বেরিয়ে পড়তো এবং এই সময়েই তার মা ও দিদি তাকে বিকারগ্রস্ত মনে করেছিলেন। এই সময়েই কবিরাজমশাই তাকে দেখেন এবং প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে সুনিশ্চিত হন যে, কেদারের দেহের বা মনের বিকার নয় ব্যাপারটা, অলৌকিক শক্তির ক্রীড়ার ফল। কেদারের মা, দিদি ও অন্যান্য হিতৈষীদেরও তা বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

প্রথম প্রথম কেদারকে নিয়ে যেতো এবং আবার মর্ত্য শরীরের কাছে পৌঁছে দিত দেবদূতেরা। কেদার তার সূক্ষ্ম শরীর ত্যাগ করে স্থূল দেহে প্রবেশ করত নিজেই। পরে দেবদূতের প্রয়োজন হত না; সে নিজেই যেত এবং ফিরে আসতে পারত। প্রথম প্রথম তার পরিত্যক্ত স্থূল দেহ স্পর্শ করে থাকতে হত কাউকে না কাউকে। একদিন যার স্পর্শ করে থাকার কথা সে অল্পসময়ের জন্যে দেহ ছেড়ে অন্যত্র গেলে একটি দুষ্ট স্বভাবের বিদেহী জোর করে কেদারের পরিত্যক্ত দেহে প্রবেশ করবার চেষ্টা করে। ভাগ্যক্রমে কেদারের সূক্ষ্ম শরীর তখনই তার স্থূল শরীরের কাছে এসে পড়ে এবং সে রক্ষা পায়।

কেদার যেসব জায়গায় যেত ওই স্তরে সে জীবিত ও পরলোকগত দু'রকম অবস্থায় স্থিত আত্মাদের দেখতে পেত। কাশীর প্রসিদ্ধ উলঙ্গ তাপস হরিহর বাবা তখন জীবিত। কিন্তু কেদার সূক্ষ্ম শরীরে ধ্রুবলোক থেকে ফিরে এসে বলে: "হরিহর বাবা আর অধিকদিন এ জগতে থাকিবেন না, কারণ ধ্রুবলোকের নিকট তাঁহার সত্তা অধিক পরিমাণে স্থিতি লাভ করিয়াছে। ঐটি তাঁহার মুক্ত আত্মার স্থিতি-ভূমি। তিনি ইচ্ছামৃত্যু বলিয়া ঐ ঊর্ধ্বস্থিত আত্মার ইচ্ছানুসারেই তাঁহার দেহাশ্রিত আত্মা আকৃষ্ট হইয়া দেহত্যাগ করিয়া ঊর্ধ্বে চলিয়া যাইবে। এই মহাপুরুষের কর্ম কাটিয়া গিয়াছে।" [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃ ১৬৫]

কেদারের স্থূলদেহ ত্যাগ করে সূক্ষ্ম শরীরে প্রবেশ করার সম্পর্কে ডক্টর গোপীনাথ লিখছেন :

"কেদার প্রায়ই বামচক্ষু দিয়া বাহির হইত। কখনও কখনও দক্ষিণ চক্ষু দিয়াও হইত। তিনবার মুখ দিয়া বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তখন বাহির হওয়ার প্রণালী জ্ঞানগোচর হয় নাই। সে বলিত—চক্ষুর রাস্তাটি শুদ্ধ—মুখের রাস্তাটি এত শুদ্ধ নহে। অন্যান্য রাস্তা আরও অধিক অশুদ্ধ। এক চক্ষু দিয়া বাহির হইয়া অন্য চক্ষু দিয়া ঢোকা যায়. তাহাতে কোন বাধা হয় না। সে আরও বলিত যে, দেহে ঢুকিবার পূর্বে দেহস্থ চক্রের ক্রিয়া শিথিল হইয়া পড়িত।—ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চক্ষুর নিকটবর্তী চক্রটির সঙ্গে যুক্ত হবার ফলে চক্রটি বেগে চলিতে থাকিত। এদিকে অন্যান্য চক্রের চলনক্রিয়াও পূর্বাপেক্ষা তীব্র হইত। এতক্ষণ ঐ সব চক্রও ধীরগতি ও স্তিমিত-প্রায় হইয়াছিল। একটি অঙ্গুষ্ঠ-প্রমাণ জিনিস সমস্ত দেহে ছড়াইয়া থাকে, ব্যাপ্ত থাকে, তাই সব চক্র চলে। দেহ হইতে বাহির হইবার সময় ঐ তেজোময় পদার্থটিকে গুটাইয়া কোন দ্বার দিয়া বাহির হইতে হয়। তখন দৈহিক চক্রগুলি আবার নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

[সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃ ১৬৪-১৬৫]

ক্রমে এমন অবস্থা হয়েছিলো কেদারের—যখন তাকে স্থূল দেহ ত্যাগ করে যেতে হত না। স্থূল দেহেই দেশগত ব্যবধান দূর করে লোক-লোকান্তরের দৃশ্য সামনে উদ্‌ঘাটিত হতো। এই অবস্থায় একজন সিদ্ধ পুরুষ কেদারকে বিশেষ অনুগ্রহ করেছিলেন। সে ঘটনা চমৎকারিত্বে ব্যাখ্যা ও বুদ্ধির অনধিগম্য। এখন সে কথাই বলব।

॥ দশ ॥

কেদার বলে ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ-কথিত সেই অদ্ভুত বালকের কাছে একদিন এক দিব্যপুরুষ এসে বললেন, মহাসিদ্ধ এক লোকোত্তর লোকের সঙ্গে কেদারকে দেখা করতে হবে, পরের দিন বিকেল ৪-টেয় একটি চিহ্নিত জায়গায়। যে দিব্যপুরুষ কেদারের কাছে এসেছিলেন, তিনি দূত মাত্র। পথ ও পরিচয়ক্ষেত্রের বিবরণ দিলেন তিনি এই রকম, 'তুমি চকের রাস্তা ধরে বিশ্বেশ্বরগঞ্জ পর্যন্ত গেলেই আর জিজ্ঞেস করবার দরকার হবে না।' পরের দিন বিকেলে, বেলা ৪-টেয় সাইকেলে চেপে কেদার পৌঁছলো বিশ্বেশ্বরগঞ্জে; পৌঁছনমাত্র একটি ময়দান দেখতে পেলো, সে ময়দান এর আগে সেখানে কখনও দেখেনি কেদার। এসব কথা তখন তার মনে ওঠেনি। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ থেকে একটা সোজা রাস্তা সেই ময়দানে গিয়ে মিশেছে, দুধারে চাষ ক্ষেত, ময়দানের মাঝখানে একখানা

পাথর, তার ওপর বসে আছেন একজন পুরুষ, কেদার বুঝলো, ইনিই গতকাল দূত পাঠিয়ে ডেকেছেন আজকে কেদারকে।

সাইকেল থেকে নেমে কেদার হাতে সাইকেল ঠেলে হেঁটে এগুতে লাগলো পাথরের দিকে। সেই পরশপাথর—কত খ্যাপা যা আজও খুঁজে খুঁজে ফেরে, এই অদ্ভুত বালক তার দেখা পেয়ে গেল না চাইতেই। পূর্বজন্মের কোন্ পুণ্যের ফলে এই অপূর্ব জন্ম কে বলবে।

ঠিক জায়গায় পৌঁছে সাইকেল রেখে, জুতো ছেড়ে, মহান সেই পুরুষের সামনে নত হলো অদ্ভুত এক বালক। প্রণত হলো। তারপর দুজনে যেকথা গোপীনাথ সেকথা আমাদের জানান নি। বলেছেন কেবল এইটুকু যে সেকথা ব্যক্তিগত, সেকথা গোপনীয়, সাধারণের অনুপযোগী। যোগীর সঙ্গে যোগীর কথা সে আর অন্যের পক্ষে উপযোগী নয়,—একথা বলবার সম্পূর্ণ উপযোগী যিনি, তিনিই বলেছেন একথা, অতএব তা শিরোধার্য। সব কথা সকলের জন্যে নয়, একথা যদি আমরা জানতাম তাহলে শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে যা বলেছিলেন তা আর কাউকে কেন বলেননি,. একথা আমরা জানতাম, আমরা মানতাম। ময়ূরকে যা সাজে তা দাঁড়কাকের মাথায় লাঠি বাজে, এই সহজ সত্য যেদিন আপামরের মনুষ্যত্বে উদ্বোধিত হবে সেদিন জগতের চেহারা না পালটাক, জগদ্বাসীর চেহারায় আসবে রূপান্তর। অধিকারী অনধিকারী, এই দুই পার্থক্যে আমাদের প্রাচীন পুরুষরা এত জোর দিয়েছেন কেন সেকথা বোঝা যায় যখন ভগবান শ্রীচৈতন্য স্ত্রীলোকের কাছে ভিক্ষালব্ধতার অপরাধে একজনের ওপর রাগ করেন, আবার যখন স্ত্রীলোকের বাড়ি গেছেন শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ অনুরাগ করেন এই বলে যে নরেন সেই আগুন সেখানে রূপ ও গুণ পুড়ে রূপাতীত ও গুণাতীতকে পায়।

রূপের মধ্যে অরূপকে যে দেখতে পায়, মায়ের অহৈতুকী কৃপায়, সেই যোগ্য আমাদের ঈর্ষাযোগ্য হতে পারে; কিন্তু তাঁকে যা মানায় তা যে আমাদের পক্ষে মানা, এ সত্য স্বীকারে মনুষ্যত্বের মহিমা বাড়ে, কমে না।

দু'তিন ঘণ্টার আলাপ শেষে, সেই মোহান্ত পুরুষ একসময়ে কেদারকে বললেন: 'কেদার এবার তুমি বাড়ি যাও। তোমার মা তোমার জন্যে চিন্তিত হয়েছেন।' এই কথা বলে জাদুকরের মতো হাত নাড়লেন সিদ্ধযোগী। সঙ্গে সঙ্গে ব্যবধান দূর হলো। কেদার তার বাড়ির লোকজনদের দেখতে পেল, শুনতে পেল তাদের কথা। বিস্ময় বিস্ফারিত দুচোখে কেদার জানতে চাইলো, সে কোথায় আছে? উত্তর হলো, আমরা এখন যেখানে আছি, সেখান থেকে পৃথিবীর এমন কোনও দৃশ্য নেই যা চর্মচক্ষে অদৃশ্য থাকতে পারে।

কেদার আবার জিজ্ঞেস করে, আপনি যে পাথরের ওপরে বসে আছেন, তার তলায় কি আছে। যোগীর হাতে সৃষ্টি রহস্যের যবনিকা উত্তোলিত হলো

সহসা। কেদার যা দেখলো তা রবীন্দ্রনাথের ধ্যানদৃষ্টিতে অবারিত হয়েছে অনবদ্য সঙ্গীতে :

'অতি দুর্গম সৃষ্টি শিখরে
অসীমকালের মহা কন্দরে
সতত বিশ্ব নির্ঝর ঝরে
ঝরঝর সঙ্গীতে।
স্বরতরঙ্গ যত গ্রহ তারা
ছুটিছে শূন্যে উদ্দেশহারা...।'

কেদার তাকিয়ে দেখলো সেই পাথরের তলায় সংখ্যাহীন নক্ষত্রপুঞ্জে দীপ্ত এক আকাশ,—সে আকাশ আমাদের আকাশ থেকে বুঝি অনেক বড়।

আমাদের এই বুদ্ধির আকাশে উড্ডীন মানুষ এখনও সে আকাশের খবর না পেয়ে ঠাট্টা করেছে এই বলে যে, ভগবান তিন চাকার গাড়িতে ঘুরছেন।

দর্শন দেবার সময় তাঁর হয়ে এলো। চক্রেই তিনি দেখা দেবেন আবার। সুদর্শন চক্রে যাঁর ঘোষণা সম্ভবামি যুগে যুগে।

কেদার নিজের মুখে বলেছে যে পাথরের নিচে সৃষ্টির অফুরন্ত ঐশ্বর্যে বিহ্বল তার মনে হয়েছিলো যেন 'মহাপুরুষ সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের ঊর্ধ্বস্থিত ছিদ্রের উপর আসনে উপবিষ্ট। মহাপুরুষ দর্শনের পর প্রত্যাবর্তনের পথও রোমাঞ্চকর।

জুতো পরে সাইকেল হাতে ঠেলে যেমন এসেছিল তেমনই ফিরবে ভেবেছিলো কেদার। কিন্তু তা হয়ে উঠলো না। ময়দান থেকে বিশ্বেশ্বরগঞ্জে পৌঁছনোর রাস্তা শেষ হতে সে দেখলো, এলাহাবাদ রোডে ভক্ত কবিরের আবির্ভাব স্থান লহর তারার কাছে। বিশ্বেশ্বরগঞ্জ থেকে দূরত্ব তিন মাইল। কেদার গিয়েছিলো পূর্ব দিকে কিন্তু ফিরে এলো পশ্চিম দিক থেকে। সে রহস্যের কিছুই বুঝলো না।

ডক্টর গোপীনাথের কাছে পরের দিন ঘটনার বিবৃতি দিতে গিয়ে কেদার বলতে পারেনি সেই সিদ্ধযোগীর পাথরের বেদী কাশীর কোন্ দিকে এবং কতদূরে। সেই একই জায়গায় কেদারের সঙ্গে সেই মহাত্মার একাধিকবার দেখা হয়েছিলো এর পরেও। কিন্তু যাবার আর আসবার পথ কোনও বারই এক হয়নি। দূরত্বেও ব্যবধান ছিলো। এবং ক্রমশ কেদার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বেশি দূর যাবার আগেই দেখতে পেত সেই ময়দান এবং ময়দানের মধ্যে সেই সিদ্ধাসন।

পণ্ডিত গোপীনাথ তাঁর অনবদ্য অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করা মহৎ গ্রন্থ, সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ-এ এর ব্যাখ্যা করেছেন তা তাঁর পক্ষেই সম্ভব। গোপীনাথ কবিরাজ বলছেন :

"সিদ্ধভূমির ইহাই বৈশিষ্ট্য যে ইহা সর্বদা ও সর্বত্রই আপন ভাবে স্থিত থাকে। উহা জাগতিক বিচারে লৌকিক বলিয়া প্রতীত হইলেও বাস্তবিক পক্ষে অতি লৌকিক। ইহা অখণ্ড এবং অবিভাজ্য। উহার অংশ হয় না, এবং

সিদ্ধা পুরুষের ইচ্ছানুসারে অংশরূপে প্রতীত হইলেও উহা সমগ্র এবং অখণ্ডই থাকে। লৌকিক জগতে যে কোন স্থান হইতে উহা প্রাপ্ত হওয়া যায় যদি ঐ ভূমির অধিষ্ঠাতা পুরুষ কাহাকেও আকর্ষণ করিতে ইচ্ছা করেন অথবা দর্শন দিবার জন্য উৎসুক হন। শুধু তাহাই নহে, লৌকিক দেখা কালের সহিত ইহা এমন আশ্চর্যভাবে যুক্ত হইয়া যায় যে উভয়ের মধ্যে কোন ব্যবধান বুঝিতে পারা যায় না। ইহা স্থূল নহে, সূক্ষ্মও নহে, অথচ একেবারে স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয়েই।" [সাধু দর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড পৃ ১৬৯]

এর প্রমাণ ওই অদ্ভুত বালক কেদার। গোপীনাথ যাঁর ব্যাখ্যা দিয়েছেন কেদার সেই ব্যাখ্যার অতীতকে জেনেছেন।

কেদার যখন মহাপুরুষ সাক্ষাতে যেতে আদিষ্ট হ'তো তখন সে স্থূল শরীরে সাইকেল সঙ্গে যেত। লৌকিক জগতে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমরা যেভাবে যাই অবিকল সেইভাবে যেত। স্বপ্নে, ধ্যানে অথবা সূক্ষ্মদেহে নয়। ডক্টর কবিরাজের মতে সিদ্ধ স্থানটি অতি লৌকিক বলে লৌকিকজগতের যেখানে ইচ্ছা আত্মপ্রকাশ করতে পারে ; লৌকিকজগতের সঙ্গে ইচ্ছামাত্রই পারে যুক্ত হতে। ইচ্ছা করলেই আবার চলে যেতে পারে স্থানান্তরে। কিন্তু লৌকিকজগতের এমন কোনও ক্ষমতা নেই যাতে জানার মাঝে অজানাকে সে সন্ধান করে বার করতে পারে তার ঠিকানা। কিন্তু পাথরের ওপর বসে সেই জ্যান্ত পুরুষ কাউকে দেখা দিতে চাইলে লৌকিক সত্তার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে মুহূর্তের মধ্যে পারেন আত্মপ্রকাশ করতে।

কেদার ওই মোহান্ত, ওই মোহান্ত পুরুষের অনুগ্রহেই লোক-লোকান্তর, দেশ-দেশান্তরের ব্যবধান দূরে ফেলে চোখের পলক ফেলবার আগেই যেতে পারত সেই জায়গায়।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের সঙ্গে কেদারের পরিচয় হবার পর কেদার মাত্র পাঁচ ছয় বছর মরলোকে ছিলো। কবিরাজ মশায়ের মতে, কেদার, 'পূর্ব জন্মেই আধ্যাত্মিক উন্নতির উচ্চস্তরে আরোহণ করিয়াছিলো। কোন বিশেষ প্রয়োজনে তাহাকে একবার মর্ত্যলোকে দেহ ধারণ করিতে হইয়াছিল। দেহ ধারণ করিয়াও নিজের প্রয়োজন সাধন করিয়া সে নিজের পূর্ব নির্দিষ্টস্থানে ফিরিয়া গিয়াছে। জগতের কোন মলিনতা তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে নাই।'

এই অদ্ভুত বালকের অলৌকিক অভিজ্ঞতার ইতিহাস, কবিরাজমশাই বলেছেন, একটি স্বতন্ত্র স্বয়ং সম্পূর্ণ গ্রন্থের উপাদান হতে পারে। সে বৃত্তান্ত আলোচনার তিনি কোনও প্রয়োজন দেখেন নি। তার পরিবর্তে কেদারের অনুভূতিলব্ধ কোনও কোনও তত্ত্ব তিনি প্রকাশ করেছেন। এই দীপ্ত অনুভূতি, এই দিব্য অনুভূতি, বার্ধক্যে বারাণসী-র পাঠক-পাঠিকার একজনকেও যদি উদ্দীপ্ত করে সেই আশায় তার কয়েকটি এখানে উদ্ধার করে দিলাম।

'মানুষ ইচ্ছা করিয়াই জন্ম নেয় অর্থাৎ সে জন্ম চায় বলিয়াই তাহার জন্ম

হয়। কিন্তু যে মানুষের সব বাসনা এই দেহ থাকিতে থাকিতেই কাটিয়া যায় তাহার কোনো আকাঙ্ক্ষা জাগে না। স্মৃতি হইতে ইচ্ছা হয়, তদনুসারে জন্ম হয়। মূলে মায়া না থাকিলে কি প্রকারে জন্ম হইবে?'

'এক একটি লোক এক এক প্রকার আকার বিশিষ্ট। ইন্দ্রপুরীটি শঙ্খের মতন। চন্দ্রলোক, দেবলোক, কৈলাস, স্বর্গ, ইন্দ্রলোক ও ধ্রুবলোক—এই ছয়টি লোক সমষ্টিভাবে পুচ্ছহীন হস্তীর মতন। সূর্যলোক, ভীষ্মলোক ও বৈকুণ্ঠ, এই তিনটি লোক সমষ্টিভাবে মণিহীন তৃতীয় চক্ষুর মতন। চন্দ্রলোক হইতে এই তিনটি লোক এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাকে সূর্যলোক বলা হয়, তাহা ঐ তৃতীয় চক্ষুর মণি বা তারা। পৃথকভাবে উহা বুঝা যায়। যমলোক, প্রেতলোক ও পিশাচলোক সমষ্টিভাবে মহিষের মস্তকের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হয়। আকাশটি দেখা যায় ছত্রাকার এবং আকাশের নীচ হইতে পৃথিবীটি দেখা যায় অন্ধকার অর্ধচন্দ্রের ন্যায়।'

'চন্দ্রলোকে মনুষ্যের কর্ম সঞ্চিত হয়। এখানে যে যাহা করে সেখানে তাহার সব কিছুই জমা হয়, ইহা প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।'

'ইন্দ্রপুরীকে আনন্দধামও বলা চলে। সেখানে গেলে এখানে ফিরিয়া আসিতে ইচ্ছা হয় না। মানুষ মৃত্যুর পর পিতৃলোকে যায়। আমি (কেদার) গো-মেষ প্রভৃতি পশুকেও ঐখানে যাইতে দেখিয়াছি। তবে পশুদের স্থান আলাদা, মনুষ্যের স্থান আলাদা। কিন্তু ছোট ছোট জীব যেমন ছারপোকা, মশা, মাছি ইত্যাদি। ইহারা মরিয়া এই লোকে যায় না। এই সকল ক্ষুদ্র জীব ঊর্ধ্ব বায়ুমণ্ডল পর্যন্ত যাইতে পারে। যে স্থানে প্রবলবেগে বায়ু বহিতেছে সেই পর্যন্তই ইহাদের গতি। ইহারা সেইখান হইতে নামিয়া আসে ও আবার জন্ম নেয়।'

'পিতা-মাতাদের মরণের পর অশৌচকালে শরীরে ঘা প্রভৃতি থাকিলে মৃতের আত্মাকে উহা লাগে। ঐ সময় মৃতের আত্মার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকে।'

'জন্মগ্রহণের সময় নারায়ণ পূর্ব স্মৃতি কাড়িয়া নেন তবে তিনি উহা নিজের অধীনে রাখেন না, কুণ্ডলিনীতে চাপা দিয়া রাখিয়া দেন। কুণ্ডলিনীকে নাড়া দিতে পারিলে ঐ স্মৃতি আবার জাগিয়া উঠিতে পারে।'

'মনুষ্যের জন্যই শুধু চিত্রগুপ্তের খাতা। যখন তারা আসে, অর্থাৎ যখন গর্ভসঞ্চার হয়, তখনই খাতায় নাম উঠে। সঙ্গে সঙ্গে নাম লেখা হয়, ঐ নামই পরে—জন্মের পরে রাখা হয়। আয়ু শেষ অথবা সময় পূর্ণ হইলে দূতগণ নাম দেখিতে পায়। তখনই তাহারা আত্মাকে নিবার জন্য নামিয়া আসে। ইহা কালমৃত্যুর কথা। অকালমৃত্যুতে দূত আসে না, হঠাৎ মৃত্যু হইলে ঝটিকাতে অর্থাৎ ঊর্ধ্বে বায়ুমণ্ডলে যেখানে সর্বদা তরঙ্গ খেলিতেছে সেখানে নাম উঠে। ঐখানে ভূত প্রেতাদি দেবযোনি অনেক থাকে। তাহারাই দূতরূপে আসিয়া আত্মাকে নিয়া পিতৃলোকাদি দর্শন করাইয়া দেয়। তখন যমদূত আসে

না। তবে যদি বহু লোকের সঙ্গে অকালমৃত্যু হয় ;—যেমন নৌকা বা জাহাজ ডুবিয়া—তখন ঝটিকাতে বহু নাম তরঙ্গে ভাসিয়া উঠে ও পরস্পর সংঘর্ষের ফলে একটা উত্তেজনা জন্মে, উহাতে যমরাজ চঞ্চল হইয়া উঠেন। তিনি ক্রোধ সহকারে নিজে নামিয়া আসেন ও পাশ দিয়া জড়াইয়া ধরিয়া আত্মাদিগকে লইয়া যান। পোকা মাকড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব মৃত্যুর পর ঝটিকাতে যাইয়া মিশিয়া যায় ; বহু ক্ষুদ্র জীব একসঙ্গে মরিলে এইখানেই বায়ুমণ্ডলে মিশিয়া যায় ; ঝটিকাতে যায় না। ক্ষুদ্র জীবের মধ্যে কিছুই নাই। মশা, মাছি প্রভৃতি সূর্যের তেজে ও পৃথিবী হইতে যে তেজ উঠিতেছে, তাহাতে জীবিত থাকে। লোকের শ্বাস-প্রশ্বাসে স্বভাবতঃ একটা তেজ উপরে উঠিতেছে উহাতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীব জীবন ধারণ করে। পারাবত প্রভৃতির মধ্যে একটা জিনিষ আছে অতি সামান্য জিনিষ ; দেখিতে জলের মতন। বিশেষ কিছু না। মধ্যে ভগবান ও ব্রহ্মা আছেন, বানরের মধ্যেও একটি দেবতা আছেন। যে দেবতা ঘোড়াতে আছেন তিনি ঘোড়ার মুখে থাকেন, হৃদয়ে নহে। বানরের আত্মা লেজ দিয়া বাহির হইয়া যায়—অন্যান্য জীবের আত্মাও লেজ বা মুখ দিয়া বাহির হয়। মানুষ ভিন্ন অন্য কোন জীবের মধ্যে ঐ সাদা পাথরের জ্যোতি থাকে না।'

কর্মফলে মানুষ পশুরূপে জন্মগ্রহণ করিলেও অন্য পশু হইতে তাহার পার্থক্য থাকে। পশুর চক্ষু দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে ঐটি বাস্তবিক পশু বা পশুযোনিতে উদ্ভূত মানুষ। পূর্বে মানুষ অবস্থায় যে সাদা জ্যোতিটি বর্তমান ছিল পশুদেহ ধারণ করিলেও উহা থাকে। উহা চক্ষু দিয়া বাহির হয়—পশুদেহের মৃত্যুর সময় উহা অন্য পশুর ন্যায় বাহির হয় না!'

কবিরাজমশাই গ্রন্থের শেষে উপসংহার করেছেন এই বলে যে, 'আমার মনে হয় আধ্যাত্মিক সাহিত্যে ইহা সংরক্ষিত হইবার যোগ্য।'

বিদ্যা মানুষকে বিনয় দান করে। বিদ্যার এবং বিনয়ের অবতার ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ যাকে সাহিত্যে সংরক্ষণের যোগ্য মাত্র বলেছেন, আমি বলি মানবজীবনে তার চেয়ে বড় সংরক্ষণের বস্তু আর কিছু নেই।

কেদারের কাহিনী আপনি অলীক বলবেন অথবা বলবেন অলৌকিক আমি জানি না। আমি শুধু জানি সব কিছু বিশ্বাস করা যেমন বুদ্ধিমানের কাজ নয়, তেমনই সব কিছু অবিশ্বাস করা আরও বড় নির্বুদ্ধিতার পরিচয়। আরও জানি। আরও মানি যে অবিশ্বাস করে নিজেকে ঠকানোর চেয়ে বিশ্বাস করে ঠকাও কম ক্ষতির কারণ হয় জীবন ও জীবিকার প্রায় সকল ক্ষেত্রেই।

বিশ্বাসে কৃষ্ণ মেলে কি না বলতে পারি না। শুধু বলতে পারি শুধু অবিশ্বাসে মেলে বিষ। আমি বিষ আশ করে মরতে চাই না। আমি বিশ্বাস করে চাই বাঁচতে।

॥ এগার ॥

আরেকটি আশ্চর্যতর জীবনের আমরণ উন্মোচন করেছেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ তাঁর অধ্যাত্ম-অভিজ্ঞতার দিনপঞ্জীর পাতা থেকে। এই পরমাশ্চর্য পবিত্র পুণ্যজীবনের শতদল পাপড়ির পর পাপড়ি মেলে বিস্ময়কর বিকশিত একটি মহৎ গ্রন্থের প্রারম্ভেই, কবিরাজমশায়ের কলমে সে গ্রন্থের পরিচয় হয়েছে, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ [১ম খণ্ড]। যাঁর কথা দিয়ে ডক্টর গোপীনাথের অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্তের সূচনা, তাঁর আসল নামে তাঁকে উপস্থিত না করে, ছদ্মনামে হাজির করেছেন লেখক। 'মহাত্মা জ্যোতিজী' শিরোনামায় যাঁর জীবনবৃত্তান্ত কবিরাজ মশায় আরম্ভেই উপহার দিয়েছেন, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের আগেই তাঁর কথা একাধিকবার কানে এসেছে তাঁর। এবং প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে ডক্টর গোপীনাথের, যে, মহাত্মা জ্যোতির সঙ্গে যেন তাঁর একবার দেখা হয়। সব আকুল আন্তরিক প্রার্থনাই যে এক-জনের পায়ে গিয়ে পেঁছায় তার প্রমাণ পেতে খুব বেশী দূর যেতে হয়নি কবিরাজ মহাশয়কে, মহাত্মা জ্যোতিজীর বেলায়। দর্শনের দুর্ধর্ষ পণ্ডিত, ঈশ্বরদর্শনের জন্যে ব্যাকুল গোপীনাথের জীবনের দরজায় কড়া ধরে নিজে থেকে কত বার নাড়া দিয়েছেন ঈশ্বরপ্রেরিত পুরুষরা তার সংখ্যা কে বলবে।

ভক্তের জীবনে ভগবানের দূতেরা এমনই করে নিয়ে আসেন হতাশার হিংস্রতম তমসায় ভগবৎচিন্তায় বিভোর জীবনের প্রথম পরমাশ্চর্য "ভোর"। কখনও অনেক ডাকেও আসেন না, কখনও না ডাকতেই আসেন। আসেন ছদ্মবেশে। কখনও পাগল, কখনও পিশাচ। কখনও শিশুর বেশে, কখনও ছদ্মবেশে জড়ভরতের। ছাই চাপা তাঁদের আগুনের আঁচ পেতে পেতেই তাঁরা চলে যান নটরাজের আহ্বানে কালের কোন্ নূতন নৃত্যমঞ্চে! যাবার আগে ঈশ্বরখ্যাপা পরশ-পাথর সোনা করে দিয়ে যায় জীবনের শতেক তুচ্ছ বাসনাকে। ধন নয়, মান নয়, নয় দেহসুখ অথবা চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র দুরন্ত সম্ভোগ। তাঁরা জাগিয়ে দিয়ে যান চরমের পরম পিপাসা। যে পিপাসায় জীবন বৈশাখের মতো ধুধু করে জ্বলে না উঠলে আষাঢ়ের কালো চোখে নামে না করুণার কান্না। ক্রুশে বিদ্ধ, কলসীর কানার আঘাতে রক্তাক্ত বিষের পাত্র হাতে মৃত্যুদীপ্ত এই সাধক, এই প্রেমিক এই পাগল, এরা কোন আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে নিয়ে ধরায় আসে, কবির এই জিজ্ঞাসা কালে কালে ; নটরাজের নৃত্যের তালে তালে তার উত্তর উচ্চারিত অনাদিকাল থেকে : তোমার আমার এই বিরহের অন্তরালে—।

ভগবান স্বয়ং আসেন দুঃখের দীপে আনন্দের আলো নিজের হাতে জ্বেলে দিতে। যখন 'পাওয়া'-র জন্যে উন্মুখ হয় ভক্ত তখন নয়। যখন মনে হয়, পাওয়ার সময় গেছে পার হয়ে, বেদনায় ভরে গেছে জীবনের পেয়ালা, তখন ঝড়ের রাতে পরান-সখা বন্ধুর সময় হয় অভিসারের। সকালবেলার আলোয় হতাশায়

ব্যর্থতায় বেদনায় গ্লানিতে মুদিত আলোয় কমলকলিকা চোখ মেলে। চেয়ে দেখে ঘরভরা শূন্যতার বুকের ওপরে দাঁড়িয়েছে এসে সেই পরিপূর্ণ! শূকরী-বিষ্ঠার সঙ্গে তুলনীয় লোকসান প্যাওয়া নয় সেই 'পাওয়া'। নারীদেহ ভোগের যযাতি চাওয়া নয় সেই 'চাওয়া'। অপরিমিত অর্থের, দেব-দানব-মানবকুলের ঈর্ষাযোগ্য সামর্থ্যের অনেক ঊর্ধ্বে চোখ তুলে চাওয়ার ভাগ্য না হ'লে কারুর ভগবান হন না ভক্তের কামা। ভগবানকে পাওয়ার জন্যে ভক্তের চাওয়া, সূর্যের জন্যে সূর্যমুখীর চোখ খুলে 'চাওয়া' হওয়া চাই?

ডক্টর গোপীনাথের, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ সেই চাওয়া-পাওয়ার অনবদ্য হাসি কান্নার হীরা-পান্না। কাশীরামদাস ব'লেছেন, মহাভারতের কথা অমৃত সমান কথা যে শোনে, সে পুণ্যবান। আমি বলি, গোপীনাথের এই ভগবান-কথায় যে একবারও কান দেয়, সে ভাগ্যবান।

এই গ্রন্থের মধ্যমণি, মহাত্মা জ্যোতিজীর আখ্যান। এই 'জ্যোতি'-র সমুদ্রে যে শতদল পদ্ম বিরাজিত, গোপীনাথ তার বিস্ময়ের পর বিস্ময়ের দলগুলি মেলে ধরেছেন নিরাসক্ত চিত্তে। তাই এই একটি ঐশী লেখনীকেই জানাই একটি অক্ষম ঐহিক কলমে কোটি কোটি প্রণাম।

১৯২৫ সালের কথা বলছেন গোপীনাথ। তাঁর মা তখন সবে মারা গেছেন। গোপীনাথ বিষণ্ণ চিত্তে বসে আছেন তাঁর পড়ার ঘরে। এমন সময় এক সৌম্যমূর্তি যুবক এসে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কি গোপীনাথ কবিরাজের বাড়ি? সম্মতিসূচক উত্তরে যুবক তাঁর নিজের পরিচয় দিলেন। কবিরাজমশাই বুঝলেন, যুবকই জ্যোতিজী। বুঝতে পারার কারণ, জ্যোতিজীর অনেক অবাক-কাণ্ড এর আগেই তিনি তাঁর এক বন্ধুর কাছে শুনেছেন।

জ্যোতিজী বাঙলাদেশ ছেড়ে তখন কাশীতে গেছেন। কাশীতে তাঁর থাকবার জায়গা হলো তখনকার মতো গোপীনাথের বাড়িতেই। পরে কাশীর অন্যত্র উঠে গেলেও গোপীনাথের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিলো বরাবর।

জ্যোতিজী গৃহস্থ, অত্যন্ত বিনয়ী এবং তাঁর অলৌকিক ঐশ্বর্য সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনতা অবলম্বন করতেন। কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেই বলতেন: 'আমি কি জানি! আপনারা সাধু মহাজনদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন, আমি তো সাধু নহি।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ, ১ম খণ্ড]

জ্যোতিজীর জীবনে করুণাধারা নেমেছে খুব কম বয়সে। শ্রীহট্টের মৌলবী-বাজারে বাস তখন তাঁর। কালীবাড়িতে গৈরিক কাপড়ের বেশভূষায় এক সন্ন্যাসী বেলাশেষের আলোয় ঈশ্বর ভজনা করেন; সুরের অঞ্জলি দিয়ে সারা হয় দিন। কাছ থেকে আসে, দূর থেকে আসে কত মানুষ সেই গানের সুরের আসরের এক পাশে বসতে। জ্যোতিজীর বয়স তখনও তের পার হয়নি। সন্ন্যাসীর সেই সুরে সুর মেলাতে আসতেন সাঁঝবেলায় কিশোর জ্যোতিজী। প্রথম আসার দিনে গান শেষ হয়ে গেলে সবাই যখন ফিরে গেল নিজের কুলায়

তখনও সেই কিশোরকে বসে থাকতে দেখে সন্ন্যাসী বললেন : 'বালক, তুমি গেলে না যে'।

যাবার সময় হয়েছে বোঝে কিশোর। তবু যেতে চায় কই তার পা। ক্ষণে ক্ষণে জন্ম-জন্মান্তরের ওপারে থেকে ঘুরে ঘুরে একটি কথাই কেবল বুকে বাজে। এ সন্ন্যাসী তার অন্তরের মানুষ। এর সঙ্গে তার আলাপ আজকের নয়। কে এ সাধু মহৎ পুরুষ !

মনের কথা মুখে প্রকাশ না করে কিশোর কেবল বলে : যেতে ইচ্ছে করছে না যে—যেতে কেমন করে ইচ্ছে করবে, ফুলের সৌরভ থেকে কেন ইচ্ছে করবে সরে যেতে মৌমাছির ! আকাশের আঙ্গিনা থেকে ইচ্ছে করেছে কবে পাখির অন্ধকার নীড়ে ফিরে আসতে ? সব পাখির নয়, সেই পাখির, পড়তে পড়তে যার ডিম ফেটে ছানা বেরিয়েই ডানা মেলে উড়ে যেতে চায় আবার আকাশে। যেতে ইচ্ছে করেছে কবে, ফিরে যেতে ইচ্ছে করেছে কবে সেই ঢেউয়ের, সে ঢেউ সিন্ধুর নয়, যে ঢেউ কৃপাসিন্ধুর। যে ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে বুদ্ধ- শংকর-বিবেকানন্দকে অতল অন্ধকার থেকে অকুল আলোতে !

সন্ন্যাসী কিশোর জ্যোতির কথা শুনে হাসেন : আজ এই মুহূর্তে আমার সঙ্গ কেন তোমার এত ভালো লাগছে তা বুঝছ না বটে, কিন্তু তা না বুঝে তোমার মুক্তি নেই —। তুমি কাল আবার এসো।

পূর্ব স্মৃতি। অপূর্ব এক স্মৃতি-বিস্মৃত বালকের জন্যেই সেই সন্ন্যাসী আসন পেতেছিলেন যেন মৌলবীবাজারে। ধর্ম সংস্থাপনের জন্য, গ্লানি মুক্ত করতে ভারতকে শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন দক্ষিণেশ্বরে। কে না স্বীকার করবে সে কথা ! কিন্তু তবুও অস্বীকার করবে কে, যে ঠাকুর বিশেষ করে এসেছিলেন অসংখ্য নরের মধ্যে এক নরেন্দ্রকে দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে। পার্থকে দিয়ে যেমন এসেছিলেন একদিন পার্থসারথি অন্যায়ের অক্ষৌহিণীকে নিশ্চিহ্ন করে প্রতিষ্ঠা করতে ধর্মরাজ্যের।

পথের ধারে বোধি গাছ সকলকেই ছায়া দেবে। কেবল সিদ্ধার্থকে করে দেবে বুদ্ধ !

কয়েকদিন পর, সন্ন্যাসী প্রশ্ন করলেন : তুমি ঈশ্বর আছেন বলে মানো ?

জ্যোতিজী বললেন : মানি : দেবতা বলে আমরা যাঁদের পূজা করি, শুনেছি তাঁরা সেই 'এক'-এরই অনেক রূপ। এর বেশী জানি না আমি !

সন্ন্যাসী খুশি হলেন না কিশোরের উত্তরে। বললেন, চেয়ে দেখো, তুমিই ঈশ্বর।

একটি অপার্থিব আশ্চর্য আলো এসে মিলে গেলো কিশোর জ্যোতিজীর সত্তায়। ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব আনন্দের স্রোতে ভেসে গেল একূল ওকূল। তারই মধ্যে ডুবে গেল এতকাল কিশোর যাকে 'আমি' বলে জানতো, 'সে'। নূতন আমির জন্ম হলো সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্ত জুড়ে। যেদিকে তাকায়

কিশোর দেখে, 'সে'-ই যেন সব কিছু হয়ে আছে। দেখলেন এক 'আমি' জগতের সব 'আমি'-র মূলে। পশু-পক্ষী লতা-পাতা আর কিশোর জ্যোতি সব সেই এক 'আমি' থেকে উৎসারিত। নিজেকেই বালক সব বলে দেখতে পেল। আনন্দে ভরে গেল জীবনের পেয়ালা।

একটি বেড়াল এসেছিলো দুধ খেতে। জ্যোতিজী অনুভব করলো, 'আমিই বেড়াল।'

প্রথমে মনে হলো মাথার বিকার। বেড়ালটাকেই ধরতে গিয়ে কিশোর দেখলো বেড়াল নেই। সে নিজেই বেড়াল। গোপীনাথের ভাষায়:

"তখন তাঁহার মনুষ্য দেহের সংস্কার কিয়ৎকালের জন্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল –মানবীয় দেহের সহিত জড়িত যাবতীয় ভাব তখন কিয়ৎক্ষণের জন্য ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে বিড়াল দেহের বাসনা ও সংস্কার এবং প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি তাঁহার ভিতর জাগিয়া উঠিয়াছিল। অথবা সত্যসত্যই তিনি বিড়াল হইয়া গিয়াছিলেন . ।"

এই অপূর্ব ভাব কেটে গিয়ে জ্যোতিজীর পূর্বভাব অর্থাৎ বারো বছরের একটি ছেলে এক সন্ন্যাসীর গান শুনতে এসেছেন সন্ধ্যাবেলায় মন্দিরে, এই স্মৃতির তলায় 'আত্মদর্শন'-এর মুহূর্তটি মিলিয়ে গেল বুদ্‌বুদের মতোই। সন্ন্যাসীর মুখে স্বর্গীয় হাসি। 'ঈশ্বরদর্শন' বলে একেই। ঈশ্বরদর্শন মানে আত্মদর্শন, সকল বস্তুর মধ্যেই নিজেকে দেখিতে পাওয়া অর্থাৎ আমিই সব, এই ভাবে সর্বত্র আত্মাকে দর্শন করা, ইহাই ঈশ্বর দর্শনের সোপান। 'আমি'কে বাদ দিয়া ঈশ্বর-সত্তার কোন অস্তিত্ব নাই।' জ্যোতিজীকে বললেন সেই সন্ন্যাসী। [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : মহাত্মা জ্যোতিজী : ১ম খণ্ড]

জ্যোতিজীকে আরেকদিন এই সন্ন্যাসীই বললেন : 'চল, আমার সঙ্গে চল।'

শুরু হয়ে গেল চলা। আকাশপথে সূক্ষ্মশরীরে শুরু হলো যাত্রা। স্থূল শরীর পরিত্যক্ত খোলসের মতো পড়ে রইলো মন্দিরে। মানবজীবনের মূলে পৌঁছাবার পথে স্মৃতিভ্রষ্ট পূর্বজন্মের অপূর্ব অপূর্ণ সাধনার তীর্থক্ষেত্রে গিয়ে পৌঁছলেন জ্যোতিজী সন্ন্যাসীর সঙ্গে। সেখানে যাত্রার বিরাম,—সে জায়গা হিমালয়ের গহন কোণ ও অভ্যন্তর, সেখানে মন্দিরে মা কালীর মূর্তি বিরাজিত। পার্বত্য গুহার পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে খুব ছোটো পাহাড়ী নদী। জনবহুল সভ্যতার ভয়ংকরী ব্যস্ততা থেকে অনেক দূরে নিঃশব্দ শান্ত সেই তপোবন জ্যোতিজীর স্মৃতিতে পূর্বজন্মের ভুলে যাওয়া ইতিহাসকে একেবারে মুখোমুখি এনে হাজির করলো জাদুকরের মতো। মরুভূমির শুকনো বুকে সরে গিয়ে দেখা দিলো যেন অপূর্ব কোন আশ্চর্য সরোবর।

সেই সরোবরের স্বচ্ছ দর্পণে জ্যোতিজী স্পষ্ট তাঁর পূর্ব জীবনের প্রতিচ্ছবি জাগতে দেখলেন। বিস্মৃতির নদীতল থেকে উঠে এলো স্মৃতির একটুকরো চর। জ্যোতিজীর মনে পড়ল সব। তাঁর সঙ্গে এই জায়গার সম্পর্ক কি? এই

সন্ন্যাসী কে। সাধনার অবস্থায় পূর্বজন্মে এক সন্ন্যাসীর প্রতি অসদ্ব্যবহারের অপরাধে তাঁকে ফিরে জন্ম নিতে হয় লোকালয়ে। এবং তাঁকে উদ্ধার করবার জন্যেই আহত সন্ন্যাসীও সঙ্গে সঙ্গে নেমে এসেছেন লোকালয়ে। কালী মন্দিরের এই সন্ন্যাসীই যে সেই সন্ন্যাসী তা বুঝতে পারলেন জ্যোতিজী,—যাঁর প্রতি তিনি অন্যায় করেছিলেন একদা তাঁরই দয়ায়।

ভূতপূর্ব জীবনের অভূতপূর্ব দর্শন সাঙ্গ হলে কালী মন্দিরে ফেলে যাওয়া স্থূল শরীরে ফিরে এলেন জ্যোতিজী। সন্ন্যাসী এর বাইরে তাঁর আর কোনও পরিচয় দিলেন না, বললেন 'আমি যেখানেই থাকি তোমার জানিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যখন তোমার প্রযোজন হবে তখনই আমার দর্শন পাইবে।'

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের কথায় জ্যোতিজীকে তাঁর পূর্বজীবনের সঙ্গী, এ জীবনের সহায় সেই সন্ন্যাসী কোনও মুদ্রা বা মন্ত্র কিংবা কোনও যোগক্রিয়া দিয়ে যাননি। যাবার আগে শুধু বলেছিলেন : "সত্যের অন্বেষণ কর, নৈতিক জীবনের উৎকর্ষ সাধন কর, নিজে দ্রষ্টা হইয়া অবস্থান করিবার জন্য চেষ্টা কর, এবং প্রকৃত পরিব্রাজকের ন্যায় ঘুরিয়া ফিরিয়া এই বিরাট বিশ্বরচনার সব কিছু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দেখিবার চেষ্টা কর। তোমার যোগাভ্যাসের প্রয়োজন হইবে না, যে কোন সময় তুমি দেহ হইতে বাহির হইতে ইচ্ছা করিবে, আমাকে স্মরণ করিলেই আমার শক্তি তোমার মধ্যে কার্য করিবে।

[সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]

১৫-১৬ বছর বয়সে জ্যোতিজীর সন্ন্যাসজীবন যাপনের বাসনা দুর্নিবার হয়ে উঠলো। ইতিমধ্যেই তাঁর সূক্ষ্মশরীরে লোক-লোকান্তর ভ্রমণের অলৌকিক ক্ষমতার কথা ছড়িয়ে গেছে। কিন্তু জ্যোতিজী নিজে এতে তৃপ্তি লাভ করেন নি। ক্ষণিক আত্মদর্শনের সেই সৌভাগ্যকে চিরস্থায়ী করবার সাধনাই তাঁর স্থূলদেহের সাধ হয়ে উঠলো। সাধের সঙ্গে সাধ্যের দুর্লভ সাক্ষাতের মুহূর্তটির জন্যে তাঁর অপেক্ষা আর ধৈর্য মানতে চায় না। মনের এই অবস্থায় তাঁর ধারণা হলো ভগবানকে দেখাই যদি মানবজীবনের সব হয়, আর সব হয় শুধু শব, তবে শব দিয়েই এই সব পেতে হবে। সন্ন্যাসজীবন যাপন না করলে বাসনা কি করে সোনা হবে তাঁর ?

মৌলবীবাজার থেকে বাড়ি ফিরে গিয়ে এক বন্ধুকে জানালেন সন্ন্যাস বাসনা। বন্ধুটি তাঁকে বললো : 'আমি প্রথমে তারকেশ্বরে যাইব। আমি সেখানে পৌঁছিয়া পত্র দ্বারা তোমাকে সংবাদ দিব এবং তুমি আমার পত্র পাওয়া মাত্র বাড়ী হইতে রওনা হইবে ও তারকেশ্বরে আমার সহিত দেখা করিবে।'

সেই বহু প্রতীক্ষিত পত্র এলো জ্যোতিজীর জীবনে। তিনি বাড়ি ছেড়ে এই প্রথম বিরাট শহর কলকাতার দিকে পা বাড়ালেন একা। সঙ্গে হরিণের একটি চামড়া, একখানি ভগবদগীতা। হাওড়া স্টেশানে তিনি বিপন্ন হয়ে

পড়েন। তবুও শেষ পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলেন তারকেশ্বরে। সেখানে গিয়ে শুনলেন বন্ধুটির যে ঠিকানায় থাকার কথা সে ঠিকানায় বন্ধুটি নেই। জ্যোতিজী সেই সম্পূর্ণ অচেনা জায়গায় সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ অবস্থায় ঈশ্বরের পায়ে আত্মসমর্পণ করলেন। করতে বাধ্য হলেন তিনি বিপদে উত্তীর্ণ হতে, ভগবানের পদেই ভরসা করতে। একজন পাণ্ডা ভগবদ্ করুণার উপলক্ষ্য হলো। তারকেশ্বরের মন্দিরে পৌঁছে জ্যোতিজী লিঙ্গমূর্তির বদলে দেখলেন বেনারসী শাড়ি পরা এক মহিলা ; তার অদূরে শিবের ছায়ামূর্তি। এই চিন্ময় ভগবতী মূর্তি দর্শনের কোন মূল্য দেন নি মহাত্মা জ্যোতিজী পরবর্তী জীবনে। তিনি বলেছেন : 'যেখানে সাধকের ব্যক্তিত্ব থাকে না, যেখানে তাহার আমিত্ব বোধ অন্যের উপর নির্ভর করে, যেখানে বিবেক নিষ্ক্রিয় অবস্থায় থাকে, সেখানে বুঝিতে হইবে ইহা মনের ফাঁকি অথবা মস্তিষ্কের বিকার।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]

তারকেশ্বরে তিনি মহাপুরুষ প্রদত্ত শক্তিতে বুঝলেন বন্ধুটি ত্রিবেণীতে। জ্যোতিজীও ত্রিবেণীতে উপস্থিত হলেন। সেখানে গিয়ে জানলেন তাঁর বন্ধু সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প ত্যাগ করে কলকাতায় চলে গেছেন। জ্যোতিজী আবার নিরাশ্রয় নির্বান্ধব অবস্থায় দু'পয়সার মুড়ি খেয়ে ওইখানেই একটি খাটিয়া ভাড়া করে দু'রাত কাটালেন। তৃতীয় রাত্রি প্রভাত হবার পূর্বে লাল রংএর শাড়ি পরা এক মহিলা, হাতে সোনার রেকাবি ও থালা, লাবণ্যময়ী মূর্তিতে দেখা দিলেন। সমস্ত অন্ধকার দিব্য তীব্র জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করে যিনি এসে দাঁড়ালেন তাঁর দিকে তাকানো যায় না।

করুণা উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে তাঁর জ্যোতিজীকে জিজ্ঞেস করলো : 'গঙ্গায় স্নান করবে না ?'

জ্যোতিজী বললেন : 'তিল, হরীতকী, ধূপ কোথায় পাবো ? এ না হলে তো গঙ্গাস্নান হয় না—'।

কথা শেষ হবার আগেই জ্যোতিজী দেখলেন সেই জ্যোতির্ময়ীর হাতে ধরা সোনার থালায় তিল, হরীতকী, ধূপ।

ভুবনমনোমোহিনী হাসিতে অপরূপা বললেন : তুমি এখানে কেন ? আমি সবার মধ্যেই তো আছি। জ্যোতিজীর কানে তখন একটি বীণার শব্দ বাজছিলো : মহিলা তাঁকে 'হাঁ' করতে বললেন। জ্যোতিজী হাঁ করতেই দেখলেন তাঁর মুখ ও কানের ভেতর দিয়ে উঠছে সেই শব্দ। মহিলা আবার বলেন : 'ওই শব্দের পেছনে আলো হয়ে আছি আমি। সেই আলোর পেছনে রয়েছি—সর্ব সাক্ষীরূপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপ্ত হয়ে এই আমি।'

গঙ্গা তীরবর্তী শ্মশানে গেলেন দু'জনে। সেখানে সেই 'আলো' আবার আশীর্বাদ করলো জ্যোতিজীকে : 'বাড়ি ফিরে যাও। তোমার বাড়িতে মন্দিরে থাকব আমি। তোমার দুঃখে তোমার গর্ভধারিণী মা উন্মাদপ্রায়—।'

জ্যোতিজী সেই মুহূর্তে ত্রিবেণীতে বসেই দেখতে পেলেন তাঁর মাকে। বললেন : 'আমি কাশী যাব'।

উত্তর হলো কাশীতে কি পাবি? কত লোক তো কাশী গেলো,—কিছু পেলো তারা? [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ১ম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী]।

'কাশীতে কি পাবি'? সত্যিই, কাশীতে গেলেও কিছু পাওয়া যাবে না। কাশীতে মরলেও মিলবে না বৈকুণ্ঠ। গঙ্গায় ডুব দিলেই হবে না পাপমোচন। দুর্লভ তিথিতেও হলেও গঙ্গার অতিথি, হবে না তুমি মুক্ত। কারণ তুমি কি চাও তারই ওপর নির্ভর করে তুমি কি পাও তার হিসাব। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঈশ্বর অন্বেষণে কাশী কাঞ্চী গোদাবরী করেননি। নিজের মা-কে ভালোবেসেছিলেন। দরিদ্রের মধ্যে নারায়ণের চেয়ে যিনি বড়, সেবা করেছিলেন তাঁকে। বিধবার দুঃখে মান-সম্মান-অর্থ-সামর্থ্য কিছুরই করেন নি খেয়াল। সমস্ত দিনের দুঃখধান্দার পর, একাদশীর অকৃপায় ন'বছরের বিধবা, বিয়ে যে কি তাই বোঝে না, সারাদিন এক ফোঁটা জল মুখে না দিয়ে বাপের জন্যে চর্ব্য-চুষ্য-লেহ্য-পেয়র আয়োজন করে যে হাসিমুখে তার কান্না যার বুকে বেজেছে ঈশ্বর তার কাছে নিজে থেকে এসেছিলেন। দক্ষিণেশ্বর। বলেছিলেন, সাগরে এসে পড়লাম।

কাসিতে মারা যাবে যে তার মুক্তি নেই। কাশীতে যে মারা যাবে তার আছে। কাশী কেবল উত্তর ভারতের একটি প্রদেশ নয়। কাশী সকলের দেশ। বিশ্বের যত অনাথ যতক্ষণ পর্যন্ত অভুক্ত থাকছে ততক্ষণ পর্যন্ত যার ভোগ থাকছে অসম্পূর্ণ,—কাশী সেই বিশ্বনাথের বাসভূমি।

সেই কাশীকে প্রত্যক্ষ কর বিশ্বের যতেক অনাথের মুখে অন্ন দেবার সেবার মধ্যে; তারই মধ্যে কর অন্নপূর্ণার অন্নরিক্ত স্বামী বিশ্বনাথকে পূজা।

এ পূজাই যিনি কেবল গ্রহণ করেন তিনিই শিব। যে লোকে এ পূজা সম্পন্ন হয় তাই শিবলোক।

॥ বার ॥

নিখিল বিশ্বের সকল বিস্ময়ের যিনি উৎস, শব্দের পেছনে যিনি আলো, তমসার ওপারে যিনি জ্যোতির্ময়ী, সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত উদ্ভাসিত করে তিনিই এসেছিলেন ত্রিবেণীর ঘাটে সেদিন। মহাত্মা জ্যোতিজী, ডক্টর গোপীনাথকে বলেছেন—এ দর্শন সত্য, কারণ যিনিই কেবল শাশ্বত, বিবেকযুক্ত অবস্থায় সেদিন সেই সাক্ষাৎ পূর্ণ ব্রহ্মময়ীর সাক্ষাৎই পেয়েছিলেন তিনি এবং ত্রিবেণীর ঘাট থেকে স্থূল-তনুতে আবির্ভূতা জগজ্জননীর সঙ্গে যে কথা বলেছিলেন, কোটিকে গোটিক ভাগ্যবান মহাত্মা, সেকথা বোধ ও বিবেকযুক্ত অবস্থায় আর

পাঁচজনের সঙ্গে জাগতিক ভাষায় যেমনভাবে আলাপ করেন তেমনভাবেই বলেছিলেন তিনি। আত্মার সেই আলো ত্রিবেণীক্ষেত্রে অকস্মাৎ দেখা দিয়ে অকস্মাৎ মিলিয়ে গেল বটে, কিন্তু জ্যোতিজীর মনে তা জাগিয়ে গেলো অন্বেষণের, অনন্ত অন্বেষণের অনন্যমত প্রয়াস। খ্যাপার মতো ত্রিবেণীর তীরে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। গোপীনাথের ভাষায়,—'ধেনুহারা বৎসের' মতো। রাত্রি শেষ হলো তারও অনেক পরে। জীবনের স্মরণীয়তম রাত্রির অবসানে উদিত হলো জীবনের অবিস্মরণীয়তম সূর্যস্নাতপ্রসন্ন প্রথম প্রভাত।

তম থেকে মহত্তমে উত্তীর্ণ হবার দুঃসাধ্য অধ্যবসায় আরম্ভ হলো সেই। প্রাণের প্রদীপে একটি জ্যোতির্ময়ী অনির্বাণ শিখা জ্বালিয়ে দিলো সমস্ত জঞ্জালকে ; জাগিয়ে দিলো সব দিয়ে সব পাবার সর্বনাশা নেশা।

জ্যোতিজী বলেছেন কবিরাজমশাইকে নিজের মুখে, এ দেখাতে ও এই শাশ্বতকে সত্য করে দেখাতেও জীবনে চরমের পরম উদ্দেশ্য নয় উদ্‌যাপিত। একে পেতে হলে সর্ব সময়ের জন্যে যেতে হবে আরও অনেক দূর। জ্যোতিজীর মতে, কেউ কেউ যে মনে করেন বিবেক অনবলুপ্ত অবস্থায় একবার এই চরমের দর্শন হলেই জীবনের পরম পাওনা পাওয়া হয়ে গেল এটা ঠিক মনে করা নয়। স্থায়ীভাবে ঐ দর্শনকে ধরতে হলে, বিবেক সংস্কারে নৈতিক জীবনের মধ্য দিয়ে সাধন পথে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক। যে সত্য দর্শন জীবনের শাশ্বত রূপান্তর না ঘটায় তা চরমের পরম দর্শন নয়। এবং সে দর্শনের জন্যে তাঁর কৃপা চাই যাঁর কৃপায় পঙ্গু পায় তার খোঁড়া-পায় পাহাড় ডিঙোবার উপায়। গোপীনাথের ভাষায় জ্যোতিজীর একটি উপমা তাঁর বক্তব্যকে বুঝতে সাহায্য করে: 'অন্ন যেমন আগুনের সম্পর্কে থাকিলে অন্নই থাকে, কিন্তু আগুন হইতে দূরে সরিয়া গেলে উহার পূর্ব স্বরূপ তণ্ডুল অবস্থা প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করে, মানুষের জীবনেও ঠিক সেই প্রকারই ঘটিয়া থাকে। জীবনের পথে এই সকল দৃষ্টান্তের সার্থকতা খুবই আছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিশ্বকর্তার দয়া লাভ করিতে হইলে ইহা পর্যাপ্ত নহে, তাহার জন্য অভ্যাসযোগকে আশ্রয় করিয়া বিবেক ও বিচারের সহিত কর্তব্যের পথে অগ্রসর হইতে হয়। এইজন্য জাগতিক সাধন-ক্রমেরও মূল্য কম নহে।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ: ১ম খণ্ড: মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ]।

ত্রিবেণীতে জগজ্জননীর সঙ্গে নিরুপম সাক্ষাতের পর, যার বাড়িতে তিনি উঠেছিলেন সেখান থেকে তিনি স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯১৭ সালে জ্যোতিজী জীবনে প্রথমবার কাশী যান। সেখানে অগস্ত্যকুণ্ডে একজনের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন গৃহকর্তার নামে লেখা জ্যোতিজীর এক বন্ধুর পরিচয়পত্র সম্বল করে। সেই বাড়িতে চিঠিখানা নিয়ে যখন জ্যোতিজী হাজির হলেন তখন গৃহস্বামী বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু চিঠিটি পড়ে তাঁর কন্যা তিনতলার একখানা ঘর ছেড়ে দিলেন জ্যোতিজীকে। সেখানে মাদুরের ওপর

শুয়ে ৺বিশ্বেশ্বর ও ৺কাশীশ্বরী অন্নপূর্ণার কথা তিনি ভাবতে লাগলেন। একই চেতনা নানাভাবে প্রকটিত কি না এই জিজ্ঞাসায় আকাশ-পাতাল ঢুঁড়ছিলো তাঁর চিন্তা। এমন সময় একটি রমণী কোলে এক শিশুকে নিয়ে ওপরে উঠে এলেন সিঁড়ি দিয়ে জ্যোতিজীর তিনতলার ঘরে। এসে উত্তর দিলেন জ্যোতিজীর অনুচ্চারিত প্রশ্নের: 'বাবা তুমি যা ভাবছ তা সত্যি। ভগবান আছেন সব জায়গায়, ভক্তরা তাঁকে নানাভাবে প্রকট করে থাকেন।'

এই কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে আরেক মহিলা তাঁকে স্নান শেষ করে খাবার অনুরোধ জানাতে এলেন। যে মহিলা এর আগে শিশু কোলে এসেছিলেন তিনি ঐ একই সিঁড়ি দিয়ে তখন নেমে গেছেন, যে সিঁড়ি দিয়ে দ্বিতীয় মহিলা খাবার জন্যে অনুরোধ জানাতে উঠে এসেছেন। অথচ এই দ্বিতীয় মহিলা ঐ অদ্বিতীয়া শক্তিকে লক্ষ্য করবার সৌভাগ্যবঞ্চিতা হলেন।

জ্যোতিজী বুঝলেন, পূর্ণ ব্রহ্মময়ী স্বয়ং অন্নপূর্ণাই সেই প্রথম মাতৃরূপিণী, কোলে যার এক শিশু। শুধু তাই নয়, ঐ শিশু জ্যোতিজীরই ক্ষুদ্র রূপ। তাঁর 'দেহের যাবতীয় লক্ষণ ও বৈশিষ্ট্য ঐ শিশুদেহে বিদ্যমান ছিলো'। ডক্টর গোপীনাথ এ প্রসঙ্গে পৌঁছবার আগেই কাশীতে জ্যোতিজীর পদার্পণকে উপলক্ষ্য করে বলেছেন: 'জগজ্জননী, তিনি কাশীর অধিশ্বরী। তাঁহারই একটি ক্ষুদ্র শিশু তাঁহার রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

অন্নপূর্ণা স্বয়ং এসে শিশু ভোলানাথকে কোলে করে বলে গেলেন—তিনিই সর্বত্র। ভক্ত যেখানেই থাক ভগবান সেখানেই আছেন। জীবমাত্রই শিব।

লোকলোকান্তরের অনায়াস যাত্রায় মহাত্মা জ্যোতিজী একদা ধ্রুবলোকে উপস্থিত হয়েছিলেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তিনি গোপীনাথের কাছে ব্যক্ত করেছেন অকপটে। মহাত্মা যখন ধ্রুবলোকে উপস্থিত হয়েছেন সবে, তখন ধ্রুব ভক্ত পরিবেষ্টিত অবস্থায় জিজ্ঞাসুদের উপদেশ দিচ্ছেন। ভক্তশ্রেষ্ঠ ধ্রুব শ্রীহরির স্থূল বিগ্রহ দর্শনের জন্যে কি কঠোর সাধনা করেছিলেন তাঁর সেই পূর্ব অপূর্ব জীবনের স্মৃতিকথা বলছিলেন। মহাত্মা জ্যোতিজী যে কেবল ধ্রুবের মুখে সেই ইতিকথা শুনছিলেন, তাই নয়। সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যগুলিও সংঘটিত হচ্ছিলো তাঁর চোখের সামনে। কারণ শুদ্ধস্তরে শব্দের এমনই মহিমা যে, উহার উচ্চারণের সঙ্গে প্রতিপাদ্য অর্থও সম্মুখে আবির্ভূত হয়।"

জ্যোতিজী দেখতে পেলেন: "বালক ধ্রুব ব্যাকুলতা সহকারে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলিয়া একলক্ষ্য একপ্রাণ হইয়া বনে বনে পরিভ্রমণ করিতেছেন। আরও দেখিলেন কখনও কখনও তিনি কোন বিশিষ্ট স্থানে উপবেশন পূর্বক শ্রীহরিকে আহবান করিতেছেন।"

ঐ সময় তাঁহার হৃদয়ের ভাব কি প্রকার ছিল তাহা জ্যোতিজীর হৃদয়ে প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছিল। ধ্রুব জগতের প্রতি বস্তুতে শ্রীহরির চৈতন্যময় সত্তা অনুভব করার ফলে অধিকাংশ সময় আত্মবিস্মৃত হইয়া থাকিতেন।

জ্যোতিজী আরও দেখিলেন, কোন সময় ধ্রুব ভীষণ হিংস্র পশুকে পদ্মপলাশলোচন শ্রীহরি মনে করিয়া আকুলপ্রাণে জড়াইয়া ধরিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ঐভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া হিংস্র পশু হিংসা ভুলিয়া গিয়া শান্তভাবে স্থির হইয়া রহিয়াছে। ধ্রুবের সে তীব্র ব্যাকুলতা এবং হৃদয়ের আর্ত-পিপাসা ভাষা দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। ধ্রুব নিজ মুখে নিজের আন্তরিক অবস্থার অথবা বাহ্য ঘটনার কোন বর্ণনা জ্যোতিজীর নিকট করেন নাই, কিন্তু তথাপি তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তলে পর পর সব অবস্থাই স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইয়াছিল। জ্যোতিজী দেখিতে পাইলেন, এত গভীর বিরহভাব সত্ত্বেও ধ্রুব শ্রীহরির দর্শন পাইতেছিলেন না। যদিও তিনি প্রতি বস্তুতে, বৃক্ষ-লতায়, পুষ্পে-পত্রে, পশু-পক্ষীতে, জলে-স্থলে, আকাশের ভিতরে এবং বাহিরে শ্রীহরির অখণ্ড সত্তা অনুভব করিতেছিলেন তথাপি ঐটি তাঁহার বিরহের ভাবনাতে দেখা। কারণ স্থূলে সম্মুখে শ্রীহরির মঙ্গলময় বিগ্রহ তখনও তিনি দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতিজী ইহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন, প্রেমের পূর্ণ বিকাশ না হওয়া পর্যন্ত মূর্তির আবির্ভাব হয় না।

ইহার পর জ্যোতিজীর মনে হইল, ধ্রুব শ্রীহরির মূর্তরূপ দর্শন লাভের জন্য কি ক্রম অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা দেখিতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে দেখিতে পাইলেন, শব্দ ও জ্যোতির স্তর আয়ত্ত করিয়া ধ্রুব তাহাতে গভীরভাবে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এই মগ্ন অবস্থাতে যে মুহূর্তে তাঁহার রূপ দর্শনের ইচ্ছা জাগ্রত হইল সেই মুহূর্তেই সঙ্গে সঙ্গে জ্যোতি হইতে মূর্তির আবির্ভাব হইল। জ্যোতি ও মূর্তি স্বরূপে সেই একই জিনিস তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা হইলেও জ্যোতি-দর্শন ও রূপ-দর্শন একই সঙ্গে হয় না। জ্যোতি-দর্শন হওয়ার পর জ্যোতিতে প্রতিষ্ঠা হইলে, যদি ইচ্ছার উদয় হয় তাহা হইলে ঐ জ্যোতিই ইচ্ছানুরূপ মূর্তির আকারে বিকাশ প্রাপ্ত হইয়া উঠে। জ্যোতিতে স্থিতি লাভ না করিয়া যে রূপ দর্শন হয়, তাহা মনের কল্পনা মাত্র, তাহার পারমার্থিক মূল্য অনেক কম। তখন শ্রীহরির মূর্তি দর্শন প্রাপ্ত হইয়া আনন্দে আপ্লুত হইয়া ধ্রুব জ্যোতিজীর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন, এই প্রকার ব্যাকুলতা ও প্রীতি যখন শ্রীহরির প্রতি উৎপন্ন হইবে তখন তুমিও তাহার দর্শন পাইবে।" [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : প্রথম খণ্ড : মহাত্মা জ্যোতিজী : পৃ ২৮-৩১]

জ্যোতিজী তবুও এই দর্শনকে বলেছেন কৃত্রিম। কারণ একজন মহাশক্তিধর পুরুষ যোগবলে তাঁকে ধ্রুবতত্ত্ব প্রত্যক্ষ দেখাবার জন্যে এই সমস্ত সৃষ্টি করেছিলেন। এই মহাশক্তিধর পুরুষের সাহায্য ব্যতিরেকে যদি এ ঘটন ঘটানো সম্ভব হ'তো তবেই তা হতো অকৃত্রিম। এই দর্শনের অবশ্য প্রয়োজনীয়তা মহাত্মা জ্যোতিজী কোনও সময়েই কারুর কাছেই একবারও অস্বীকার করেন নি।

মহাত্মা জ্যোতিজীর সঙ্গে মহামহোপাধ্যায় গোপীনাথ কবিরাজের নানা

প্রশ্নোত্তরের মধ্যে দিয়ে সাধারণ মানুষের অতি সাধারণ অনেক কৌতূহলের অসাধারণ নিবৃত্তির উৎস অবারিত হয়েছে সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ গ্রন্থের প্রথম পর্বে। যেমন, বহু যোগীর আসনে বসে বাহ্যিক সাহায্য ছাড়া যোগবলে আসন ছেড়ে শূন্যে ওঠা কি করে সম্ভব এ নিয়ে তর্কাতর্কির আজও শেষ নেই। কেউ বলেন,—ব্যাপারটা অলীক; কেউ বলেন,—অলৌকিক। মহাত্মা জ্যোতিজী বলেন, ব্যাপারটা অলীকও নয়, অলৌকিকও নয়।

'ইহার কারণ অন্য কিছু নহে! যেমন লৌহ জলে ভাসে না কিন্তু পারদের ওপর ভাসে, আমাদের ঠিক সেই প্রকার অবস্থা। যতদিন মন অথবা ইচ্ছা বাসনায় আবৃত থাকে ততদিন ইহা ভাবসমুদ্রের নিম্নে পড়িয়া থাকে। তেজ অত্যন্ত লঘু পদার্থ, ইহা বায়ু সমুদ্রের ঊর্ধ্বে উত্থিত হইবে তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছুই নাই। দেহ তেজোময় হওয়ার ফলে লঘু হয় বলিয়া স্বভাবতঃই উপরে উত্থিত হয়।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ]

বেতারে গান শুনলে আমরা অবাক হই না। টেলিভিসানে নাটক দেখলে ওরা অবাক হয় না আজ। মেশিনে দুরূহ আঁক অনায়াসে করে দিলে তা অস্বাভাবিক মনে হয় না; কিন্তু যে মানুষ এই বিস্ময়কর যন্ত্রের স্রষ্টা সেই মানুষ নিজের অন্তর্নিহিত শক্তিতে বাইরের সাহায্য ছাড়া কোনও দৈহিক ক্রিয়া দেখাতে পারলে আমরা হতবাক হই। স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র যখন মানুষের মতো কথা বলে, গান গায়, প্রশ্নের উত্তর দেয়,—তখন আমরা যন্ত্রকে নমো বলি বটে কিন্তু জানি আসলে প্রণম্য হচ্ছে মানুষ—যে এই যন্ত্রের স্রষ্টা। অথচ মানুষ, ভগবানের শ্রেষ্ঠ যন্ত্র যখন দুনিয়া চালায়, নতুন উপগ্রহ সৃষ্টি করে, জলে-স্থলে-নভোতলে নতুনতর দিগ্বিজয়ের স্বাক্ষর রাখে, তখন মানুষকে আমরা পূজা করি; মানুষ-যন্ত্রের যিনি স্রষ্টা সেই ঈশ্বরকে বলি, তিনি নেই।

মানুষের ট্রাজিডি সেই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের যে হতভাগ্য জানে না তার সব ক্রিয়াই স্বয়ং সেই একজনের যিনি আপন আনন্দে বহু হয়েছেন। মানুষের কমিডি হচ্ছে এই যে, সে বেচারা জানে না যে বাইরের সমস্ত শক্তির মূলে আছে অন্তরের নিরুপম নিরাসক্তি। যেদিন মানুষ এ কথা জানবে সেদিন জন্ম নেবে নতুন মানুষ এই পুরোনো পৃথিবীতে। সেই দিব্যচেতনায় দীপ্ত উদ্দীপ্ত মানুষ ফানুস চাইবে না গ্রহে গ্রহান্তরে যেতে। মনে আবার বাসনা জাগা মাত্র লোক-লোকান্তরের যাত্রী হতে পারবে সে।

এ কথা বিশ্বাস করা অসংখ্য কোটি মানুষের পক্ষে যেমন অসম্ভব তেমন একটি কি দুটি মানুষের পক্ষে এ কথা অবিশ্বাস করা তার চেয়েও অসম্ভব।

১৯২৬ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি, মহাত্মা জ্যোতিজী, যিনি একজন ভালো হোমিওপ্যাথ চিকিৎসকও বটে, ঐ তারিখে, 'শরীরের কোথায় কোন যন্ত্র আছে এবং কোন ইন্দ্রিয়ের বিশেষ ক্রিয়া হয় আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে তা বোঝবার জন্যে এক মহিলা রোগীর দৈহিক যন্ত্রের ওপর ষটচক্রের ক্রিয়া ও প্রভাব বুঝবার চেষ্টা

করতে গিয়ে ষটচক্র ভেদ করতে না পেরে ষটচক্রের মধ্যেই অবরুদ্ধ হবার মতো হলেন। ষটচক্র ভেদের প্রথম স্তরে পুরুষ কামময়ী রমণীর এবং স্ত্রীলোক মনোহর পুরুষমানুষকে দেখে, মহাত্মা জ্যোতিজীর সেদিন ষটচক্র ভেদ করতে না পারার কারণ সাময়িক মানসিক মালিন্য। তবুও শেষ পর্যন্ত বিবেকবোধ থাকায় তিনি বেঁচে গেলেন। কিন্তু ক্ষণিক এই পাপবোধের প্রতিকার কিসে তার কোনও উপায় তিনি খুঁজে পেলেন না। রমণীটির চিকিৎসা করা ছেড়ে দিলেও এই গ্লানির বোধ তাঁকে ত্যাগ করল না।

অবসন্ন মহাত্মা জ্যোতিজীর কাছে প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ আবার এলেন। তাঁর হাতে একখানা ব্রহ্মচর্য চিত্র ছিলো। জ্যোতিজীকে সঙ্গে নিয়ে সেই মহাপুরুষ সবে খেলা সাঙ্গ হওয়া মাঠে পৌঁছেই অন্তর্হিত হলেন। জ্যোতিজী মহাপুরুষের নিয়ে যাওয়া রাস্তা ছেড়ে অন্য রাস্তা দিয়ে আসবার পথে আরেকজন স্থূলদেহ সন্ন্যাসীর দেখা পেলেন। সেই সন্ন্যাসী জ্যোতিজীকে, ঐ রাস্তা ধরে এগিয়ে গেলে একজন পঞ্চমকারের সাধককে দেখা যাবে বললেন। এবং তাঁর প্রণালীতে সাধনা করলে ঈশ্বরদর্শন করা যাবে,—এ কথাও বললেন।

মহাত্মা জ্যোতিজী এর প্রতিবাদে বললেন : পঞ্চমকারের সাধনায় যে দর্শন হয় তা 'ঠিক ঠিক দিব্য চৈতন্যময়' নয়।

প্রহারে উদ্যত ক্রোধদীপ্ত সাধুকে লক্ষ্য করে অতঃপর জ্যোতিজী তাঁর ছেড়ে আসা স্থূলদেহের মধ্যে পুনঃপ্রবেশের জন্যে পরিত্যক্ত শরীরের কাছে পৌঁছে দেখলেন, ত্রিবেণীর ঘাটে যাঁকে দেখেছিলেন তিনিই জ্যোতিজীর মর্ত্যদেহ বেষ্টন করে বসে আছেন। তিনি জ্যোতিজীকে বললেন : 'আমি তোমার সেই মা' বলে জ্যোতিজীর মনের মলিন মেঘকে বিদ্যুতের মতো দ্বিখণ্ডিত করে মিলিয়ে গেলেন মুহূর্তে। জ্যোতিজী তাঁর হারানো মনোভাব ফিরে পেলেন। জ্যোতিজীর কথায় : 'মন আমাকে আর ফাঁকি দিতে পারিল না। একেবারে যেন নতুন মানুষ হইয়া গেলাম। সেই গ্লানির ভাব, সেই অশান্তি সব দূর হইয়া গেল। আজ আমি বুঝিতে পারিলাম, মহাপুরুষ আমার মনোময় দেহকে পোড়াইয়া আমার ভুলভ্রান্তি দেখাইয়া দিয়াছিলেন।' [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ]।

তিন চারদিন পর রোগিণী সেই স্ত্রীলোকটি আবার এসেছিলেন জ্যোতিজীর কাছে। কিন্তু এবারে আর বিকারের সম্ভাবনা ছিলো না। তখন সমস্ত রমণী মহাত্মা জ্যোতিজীর চোখে পরমরমণীয় মাতৃমূর্তির প্রতিরূপ মাত্র।

॥ তের ॥

এরই মধ্যে বারাণসী দৌড়েছিলাম একবার। বিশ্বনাথ-দর্শনে নয়, গোপীনাথ-দর্শনে। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজকে প্রশ্ন করেছিলাম, মহাত্মা জ্যোতিজী

যদি সূক্ষ্মদেহে মহাপুরুষ-কৃপায় লোক-লোকান্তর ঘুরে আসতে পারেন তো বন্ধুকে খুঁজতে গিয়ে তারকেশ্বরে এবং ত্রিবেণীতে এত কষ্ট করার দরকার কি ছিলো? পথের কষ্ট, খাবার কষ্ট, থাকার কষ্টর মধ্যে না গিয়ে সূক্ষ্মদেহেই তো পৌঁছতে পারতেন তারকেশ্বরে ত্রিবেণীতে। গোপীনাথ বললেন: না। পারলেও তাঁরা তা করেন না। এমন কি অনেক সময় সূক্ষ্ম-দেহেরও প্রয়োজন হয় না। স্থূল দেহে কোথাও না গিয়েও লোক-লোকান্তরের রহস্যকে আহ্বান মাত্র পারেন আবাহন করতে। আবরণ পারেন উন্মোচন করতে মুহূর্তে। তবুও তাঁরা অত্যন্ত গুরুতর প্রয়োজন ছাড়া এবং প্রায়ই গুরুনির্দেশ ছাড়া এই শক্তিকে কাজে লাগান না। সামান্যের জন্যে অসামান্যের অপব্যবহার করেন না।

কথা বলতে চোখ বুজে ফেলেন গোপীনাথ। তখন মনে হয় জ্যোতিদীপ্ত এই একটি লোক, চিরন্তন ভারতের শেষ অশেষ আলোক বিশ্বনাথ সন্নিকট গোপীনাথ নিজের সঙ্গে নিজেই কথা বলছেন। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও যা, গোপীনাথের ক্ষেত্রেও তাই। নিজের সঙ্গে ছাড়া আর কার সঙ্গে কথা হবে এঁদের। রবীন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর সঙ্গ করবেন কার। পথে যেতে দেখা হবে অনেকের সঙ্গে। পথ যেখানে শেষ হবে সেখানে জীবনদেব ও রবীন্দ্রনাথ একা। পথে চলতে কথা বলতে হবে বৈ কি গোপীনাথের অনেকের সঙ্গে: দর্শন, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ, তর্ক, বিতর্ক, বিচার, কথার পরে কথার মালা গাঁথা। তারপর; তারপর চরম মুহূর্তের প্রতীক্ষায় প্রার্থনা; 'এই জীবনের আলোকেতে পারি তোমায় দেখে যেতে, পরিয়ে যেতে পারি তোমায় আমার গলার মালা।'

রবীন্দ্রনাথই বলো, গোপীনাথই বলো, জীবনদেবতাই বলো, কিংবা বলো বিশ্বনাথ;—সমস্ত সন্ধ্যা সমস্ত প্রভাত দিয়ে যেতে হবে তাঁকে যাঁর কাছে থেকে রবীন্দ্রনাথ পেয়েছেন বাঁশি, গোপীনাথ পেয়েছেন মেধা। এজন্ম অথবা পরজন্ম, কোটিজন্ম পরে তোমাকে বুঝতে হবে তুমি 'সে'-ই। কেউ এসেই বোঝে সেকথা, কেউ বোঝে না অনেক কেঁদে হেসেও। কেউ ভালোবেসেই পেয়ে যায় তাঁকে।

গোপীনাথ বলছেন আমি শুনছি। মর্ত্যলোকের মৃৎপাত্রে উচ্ছলিত অমৃত দান করছেন অযোগ্যকে। মধু ক্ষরিত হচ্ছে বিষাক্ত বায়ুতে, শিখা নিবে আসা বাতিতে জ্বলছে মৃত্যুহীন দীপ্তি। বুদ্ধদেবের কথা বলছেন গোপীনাথ। লৌকিক সাধনার শেষে লোকোত্তর জ্ঞানের আসন পেতেছেন পথের ধারে গাছের ছায়ায় বুদ্ধদেব। এ জ্ঞান নিজেকে পেতে হয়। এ কেউ কাউকে দিতে পারে না। চরমের পরম নির্দেশধন্য বুদ্ধদেবকে প্রশ্ন করছেন আনন্দ: তিনি কি আছেন? বুদ্ধদেব উত্তর দিচ্ছেন: তাতো বলিনি। আবার আনন্দজনক প্রশ্ন: তিনি কি নেই? আবার প্রবুদ্ধ উত্তর: তাতো বলিনি। আনন্দ তখন চেপে ধরেছেন বুদ্ধকে: তিনি কি আছেন এবং নেই এক সঙ্গে? মুহূর্তে প্রশ্নচ্যুত করেছেন আনন্দময় গুরু: তাও তো বলিনি! তবে? আনন্দাসনের

দিকে তাকিয়ে আনন্দাতীত অবস্থা আদেশ করেছে : তবে তুমি নিজে ডুব দাও। উত্তর পাবে তোমার প্রশ্নের। তোমার চরম প্রশ্নের পরম উত্তর।

এই একই কথা কি রবীন্দ্রনাথের কবিতা নয়? রূপনারায়ণের তীরে জীবনের প্রথম সূর্যে সে প্রশ্নে উদীত তুমি কে? জীবনের শেষ সূর্যে তার উত্তর কি মুদিত নয়। কেন উত্তর পাননি কবি? পাননি কারণ সমুদ্রের ও প্রশ্ন উত্তরেই হিমালয় চিরনিরুত্তরের প্রতীক। শ্রীরামকৃষ্ণ ত্রৈলঙ্গকে ঐ প্রশ্নই অন্যভাবে করেছিলেন। ত্রৈলঙ্গ নিরুত্তর থেকে উত্তর দিয়েছিলেন তার। শিষ্যরা বলেছিলো ত্রৈলঙ্গকে দেখিয়ে : উনি আজ কিছুকাল হলো কথা বলেন না। অবাক শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্গে সঙ্গে বলেছেন : কথা বলেন তো!

কথা বলেন তিনি ততক্ষণ, যতক্ষণ আমি 'কে' এর উত্তর পাইনি আমি। মাকে জানা মানেই আমাকে জানা। আমাকে জানা মানেই মাকে জানা। তারপর আবার কথা কেন? তারপর আবার কার কথা? পথ যতক্ষণ চলেছে ততক্ষণই পায়ের শব্দ; পথ যেখানে শেষ সেখানে আকাশ নিস্তব্ধ; সেখানে পথিক নিঃশব্দ।

গোপীনাথের কণ্ঠে সেদিন বিশ্বনাথের কৃপা বুঝি ভর করেছে আমারই ওপর অহৈতুকী কৃপায়। ফোর্থ ডাইমেনশান পর্যন্ত ভাবতেই বিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের দম বন্ধ হয়ে আসছে, গোপীনাথ বলছেন দশ ডাইমেনশানের কথা। গতকাল আজ এবং আগামীকাল বলে কিছু নেই। ইটার্নাল প্রেসেন্ট পড়ে আছে অখণ্ড জ্যোতিসমুদ্রের মতো। আমরা তাকে ভাগ করেছি, অতীত, বর্তমান ভবিষ্যতের ফিতেয়। হিমালয়কে যেমন বলেছি, ঊনত্রিশ হাজার দু' ফিট। শ্রীচৈতন্যকে বলেছি অমুক সময়ের লোক। খণ্ড দৃষ্টিতে অখণ্ডর বিচার। হিমালয়ের কোনও মাপ নেই; যেমন বয়স বলে কিছু নেই শ্রীচৈতন্যের। হিমালয়ের চর্মচক্ষে যেটুকু দেখা যায় সেটুকুর সীমাহীন ঊর্ধ্বে আছেন হিমালয় দাঁড়িয়ে। শ্রীচৈতন্য কোনও বিশেষ সময়ের লোক নন? তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, কেবল তিনিই থাকবেন। দ্য ইটার্নাল প্রেসেন্ট।

জন্ম-মৃত্যু, কর্ম-অকর্ম, পাপ-পুণ্য আছে : আবার নেইও। কি রকম? গোপীনাথের চোখ বন্ধ হয়ে আসছে আবার কথা বলতে বলতে। আর তাঁর কথা শুনতে শুনতে খুলে যাচ্ছে আমার চোখ।

অনেক অনেক যুগের ওপার থেকে, বহুবিস্মৃত সেই কণ্ঠস্বর, যা কখনও মরে না কারণ তা সত্য, শতশতাব্দীর বিস্মৃতির অতলে যা হারায় না কখনও, অপমানে যা টলে না, অধৈর্য হয় না যে, আঘাতে হয় না অস্থির, সেই অমৃতবাণী উচ্চারিত হচ্ছে বিশ্বনাথের কাশীতে গোপীনাথের কণ্ঠে; আমার মনে হচ্ছে, পূর্ব দিগন্তে ভোর হচ্ছে আবার, লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, মাংসগন্ধে মুগ্ধ ক্ষমতা-বিভোর মানব-অসভ্যতার হচ্ছে লয়। জেগে উঠছে অপরাজিত মনষ্যত্বের মুখে সেই সত্য, সেই শাশ্বত,—আরেকবার হাওয়া-বন্ধ বদ্ধঘর, বহু ব্যবহারে জীর্ণ

জরাগ্রস্ত চৌকি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বহু মূল্যবান চিঠি, বই, পাণ্ডুলিপি, পার্স এবং কি নয়। মেঝেয় মাদুর পাতা। তার ওপর কাঠের চেয়ার একখানা। তবু মনে হচ্ছে অলকাপুরী। মনে হচ্ছে, সেই চির নূতন যুগের সকালে সেই চিরকালের ফুল ফুটছে। তার গন্ধে মধুলোভী মন ভুলেছে তার পরিবেশ। ফ্যানের হাওয়া নয়; সুবাতাস বইছে মন্দ মন্দ। সেই বাতাসে, অল্পবিদ্যার তাসের ঘর ভেঙে পড়ে নিজের অবিদ্যার ভারে। আর লোকোত্তর বিদার গর্ভ থেকে প্রসূত হয় বেদনার পুষ্প। যে বেদনা স্রষ্টার একার। যে বেদনায় বিদীর্ণ হবেন বলে তিনি বহু হয়েছেন। যে বেদনার সঙ্গে শুধু অভিন্নহৃদয় যে, তার নাম আনন্দ।

গোপীনাথ ব্যাখ্যা করছেন জন্ম-মৃত্যু, পাপ-পুণ্যের রহস্য। যতক্ষণ ভুলে থাকা যে আমিই 'সে'-ই ততক্ষণ কর্ম-অকর্ম পাপ-পুণ্য, ততক্ষণ জন্ম-জন্মান্তর। এ পর্যন্ত অন্যমুখেও শুনেছি, পড়েছিও অনেক বইতে। গোপীনাথের অনন্য-মুখে একথা শুনতে আসিনি। তবুও বাধা দিলাম না। কথার ঝরণা বেদনার পাথর ঠেলে নামছে। তাকে নামতে দাও। সূর্যের আলোয় ঝরণার জলে রং-বেরঙের খেলা দাও দেখতে। তারপর সেই স্রোত হবে স্রোতস্বতী। নদী বেরুবে সিন্ধুর উদ্দেশে। তারপর প্রবেশ করবে সিন্ধুর গভীরে। উচ্ছ্বাসহীন এবং গতিহীন সমুদ্রের গভীরে মুখর কবিকে হতে হবে নীরব। এহ বাহ্য। তারও পরে কথা আছে। ঐ মহাসমুদ্রের ওপার থেকে ভেসে আসবে কি সংগীত, —কান পেতে রইলাম তারই জন্যে। বুঝবার জন্যে নয়। বাজবার জন্যে। ইন্দ্রিয়কে তৈরী কর ইন্দ্রিয়াতীতের হাতে বাজবার জন্যে। শূন্যে ভরা থাক না রে বাঁশি, বলেছেন কবি, বাজাবার যিনি বাজাবেন আসি।

একটু পরেই খুলে গেল অমরলোকের দ্বার। মহাসূর্যের আলো এসে পৌঁছলো মরলোকে। গোপীনাথের কণ্ঠে আবির্ভূত হলো বিশ্বনাথের সৃষ্টি সৃজনরহস্যের, বিশ্ববিহীন বিজনবাসের কান্না। এই গোপীনাথের মধ্যে যে নিত্য সত্য শাশ্বত গোপীনাথের বাস তিনি বললেন: কর্ম আমরা পথ চলতে কুড়িয়ে পেয়েছি। আরম্ভে কর্ম ছিলো না। মনে করুন, গোপীনাথ চোখ বুজিয়ে ফেলেছেন, মনে করুন, রাজার ছেলে নেমেছে ভিখিরির ছেলের ভূমিকায়। নিজেকে রাজার ছেলে মনে রাখলে অভিনয় জমে না। তাই ভোলা, তাই নিজেকে ভুলে থাকা। বার বার নানা ভূমিকায় নানান সংস্কারের বেশ নিয়ে বাঁশি বাজানো। যে মুহূর্তে মনে পড়ে, আমি সেই রাজার ছেলে সে মুহূর্তেই ছুটি। অথবা তার ওপরে, 'আবার যদি ইচ্ছে কর আবার আসি ফিরে'। ইচ্ছে কর নয়, ওটা হবে 'আবার যদি ইচ্ছে করি'। সত্যিই, সকলি তোমার ইচ্ছা নয়, সকলি আমারই ইচ্ছা। কারণ আমিই সেই ইচ্ছাময়ী তারা। এ আমি সে আমি নয় যে আমি চাকরি করি, প্রভিডেন্ট ফন্ডের টাকায় বাড়ি করি, মেয়ের জন্য সৎ পাত্র খুঁজি, ছেলের জন্যে ভালো চাকরি। যে আমি সন্তান মৃত্যুতে কাঁদি,

নিজের নাম কাগজে ছাপা হলে খুশি হই। ডক্টরেট পেলে ভাবি আমি পণ্ডিত, না পেলে গাল পাড়ি আমার প্রতি অবিচার হয়েছে বলে,—এ-আমি সে-আমি নয়। এ আমি, সেই আমি যার মনে পড়ছে সে রাজার ছেলে, ইচ্ছে করেই নেমেছে ভিখিরির ছেলের ভূমিকায়। তাই ইচ্ছে করেই ভুলে আছে নিজেকে। কারণ মনে পড়লেই একথা যে, 'সে রাজার ছেলে'; তখন আর ভিখিরির ছেলের ভূমিকায় কি বলতে হবে তা মনে পড়বে কি করে। এই ভোলা, এই জট পাকানো, আবার তা খোলা, আবার মনে করা, আবার ইচ্ছে করা। এরই মধ্যে জন্ম-মৃত্যু পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-মর্ত্যের সমস্ত রহস্যই আছে, আবার কোনও রহস্যই নেই।

স্বামীজী যে বলেছিলেন অথবা স্বামীজীকে যে বলেছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। যে স্বামীজীর যে মুহূর্তেই মনে পড়বে তিনি কে, সে মুহূর্তেই তাঁর মর্ত্যলীলার সংবরণ, একথা সত্য। কেবল স্বামীজীর ক্ষেত্রে সত্য যে তা নয়। তোমার আমার সকলেরই বেলায়ই তা সত্য। সত্য এবং শাশ্বত! আমাদেরও যেদিন মনে পড়বে আমরা কে, সেদিন আমাদেরও ছুটি। যতক্ষণ মনে পড়ছে না, ততক্ষণই ছুটোছুটি।

তবে যিনি জেনেছেন তিনি কি করে কখনও কখনও আবার আসেন খেলা করতে? সে ঐ, আবার যদি ইচ্ছে কর আবার আসি ফিরে। ইচ্ছে কর নয়। আবার বলি: যদি ইচ্ছে করি!

চার্বাকের কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম ডক্টর গোপীনাথকে। বলেছিলাম, চার্বাক তো বলেছেন, খাও, দাও, ফুর্তি করো। ইট, ড্রিংক এন্ড বি মেরি। ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনম্ কুতঃ। সেই একদিন উত্তেজিত হতে দেখেছিলাম, সমুদ্রের গভীরে দেখেছিলাম তরঙ্গের ফণা তুলতে, যিনি শান্ত তাঁকে দেখেছিলাম হাত দিয়ে হাতের ওপর আঘাত করে বোঝাতে যে চার্বাককে যারা বিশুদ্ধ মেটেরিয়ালিজম্-এর প্রবক্তা মনে করে, তারা অল্পবিদ্যা ভয়ংকরী ওয়েস্টার্ন বক্তা মাত্র। চার্বাকের দর্শন বৃহস্পতির দর্শন। সে দর্শনে ধরা পড়েছে এই দেহের মধ্যেই তাঁর বাস যিনি সন্দেহের অতীত। দেহকে জানলেই সকল সন্দেহ গেলো। জানা গেলো অজানাকে। আমাকে বললেন: ইন্দ্রিয়গুলো বাইরের দিকে বার করে আছে লালায়িত মুখ। সেগুলোকে অন্তর অভিমুখী করুন কিছুক্ষণের জন্যে; দেখবেন যা ঐ দেহে নেই তা নেই কোথাও। দেহতত্ত্বের গান, সহজিয়া সাধনা ওরই ক্রুড ফর্ম।

এই দেহকে ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো। বাইরের দুটো চোখের আলোয় দেখছ তাই ঐ দেহ পঞ্চভূত। প্রদীপের সেই আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে দেখো যে আলো সাধকের, প্রেমিকের, পাগলের; দেখবে,—তোমার ও দেহ ভূত নয়। ওতেই আবির্ভূত আছেন তিনি, যিনি ভস্মীভূত হন না কখনও। আগুন যাঁকে দগ্ধ করতে পারে না! পবন স্পর্শ করতে পারে না যাঁকে, সিন্ধুর সমস্ত

জল ভাসাতে পারে না যাঁর চরণতল, মানবদেহই তাঁর মহত্তম বিশ্ব – যাঁর নাম। এখানেই বাস করেন বিশ্বনাথ।

কাশী ভারতবর্ষের সেই দেহ যা চিরকাল ধরে রাখবে তাঁকে যিনি নিঃসন্দেহ। এই জন্যেই আমরা যাকে চর্মচক্ষে বিশ্ব বলি, আসল বারাণসীর অবস্থান তার বাইরে। মর্মচক্ষে এই কাশী হচ্ছে সেই জায়গা। সেখানে আত্মার সঙ্গে আমার আত্মীয়তা হবে একদিন। এই বাহ্য। ধর্মচক্ষেই কেবল বারাণসীর অন্তরাত্মার উদ্ঘাটন।

চর্মচক্ষে কাশীর গলিতে সাধু, সিঁড়ি আর বিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ। মর্মচক্ষে কাশী হচ্ছে তীর্থ, বহু মন্দির, ঘাট, রামায়ণ-মহাভারত কথকতার ক্ষেত্র—স্মরণাতীতকালের স্মৃতি। ধর্মচক্ষে কাশী ভারতবর্ষের আত্মার আলো, বহু মানুষের ধ্যান দিয়ে গড়া। এহ বাহ্য। এরও পরে আরেক চক্ষু আছে সে-দৃষ্টিতে কাশী আর অন্য কোনও স্থানে কোনও তফাৎ নেই। সে-দৃষ্টিতে ত্রৈলঙ্গ এবং শুধুই উলঙ্গে নেই কোনও পার্থক্য। যে ইচ্ছেয় মহোত্তমের দিকে যাত্রা তমের সেই একই ইচ্ছে সৃষ্টি হয়ে চলেছে গাছের পাতা। সেই ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছেয় খুলে গেছে যার লোকোত্তর চোখ সে আর কথা বলে না। শুধু দেখে। দেখে,—'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনাজালে হে ছলনাময়ী।' এই ছলনা যে অনায়াসে সইতে পেরেছে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার। বিদ্যায় নয়, বুদ্ধিতে নয়, বোধিতেও নয়—ছলনাকে উত্তীর্ণ হওয়া যায় শুধু ভালোবাসায়। বিশ্বনাথের সবচেয়ে ভালোবাসা ছাড়া আর কিছু নয়।

বুঝেছি কি বুঝি নি এ তর্ক যার, তার ট্র্যাজিডির শেষ নেই। ভালো লেগেছিলো,—মাত্র এইটুকু যার মনে রইলো,—তার হাতেই শেষ পর্যন্ত রইলো শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এবারের গোপীনাথ-প্রসঙ্গের আরম্ভেই বলেছি যে, গোপীনাথ আমাকে বলেছেন, শক্তিমান পুরুষেরা সামান্যের জন্যে অসামান্যের শরণ নেন না। সেকথার সব চেয়ে বড় প্রমাণ তো গোপীনাথ নিজেই। তাঁর ছেলে মারা গেছে। মারা যাবার আগে তিনি জানতেন, মৃত্যু থেকে রক্ষা করবার প্রার্থনাও জানতেন তিনি। তবুও সন্তান মৃত্যুতে চোখের জল ফেলেন নি গোপীনাথ। এ জন্যে নয় যে, তাঁর মতো পণ্ডিতের চোখে জল দেখা দেবার নয়। এই জন্যেই শুধু যে, তাঁর মতো প্রেমিক জানেন 'মৃত্যু'র চেয়ে 'মিথ্যা' আর কিছু নেই। জীবনে যে চোখের সামনে থাকে মৃত্যুতে সে চোখের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। তখন যেদিকে তাকাও সেদিকেই দেখতে পাও তাকে। অরণ্যের সবুজে, আকাশের নীলে, সমস্ত অনিলে তার আশ্চর্য ইশারা। মুদিত আলোয় কমল-কলিকা নবপ্রভাতের তীরে তরুণ কমল হয়ে ফুটে উঠবে বলেই সন্ধ্যা তাকে গোপন রেখেছে আঁধার পর্ণপুটে,—এই ইশারাই তো তারার আলোয়

অনাদিকাল ধরে কাঁপছে। এই ইশারাই সকালের প্রথম আলোয়, সন্ধ্যাকাশের গলানো সোনায়, নিশীথ রাতের বাদল অন্ধকারে রুক্ষ দিনের দুঃখ না পেলে জীবনের দরজায় বন্ধুর রথ এসে কেন থামবে। ঝড়ের রাত না হলে পরাণসখা বন্ধুর অভিসার ব্যর্থ হবে যে !

ডক্টর গোপীনাথ নিজেও নিদারুণ দেহ-দুঃখ পেয়েছেন এবং তাকেও বলেছেন ভাগবতী করুণা : 'আমি বলছি জোর গলায়ই যে, দুঃখ বেদনাকে ঠিক মত গ্রহণ করতে শিখলে সাধন পথে সত্যিই এমন উপলব্ধি হয় যে, বেদনাকে মনে হয় ভগবানের দান । [স্মৃতিচারণ : দ্বিতীয় খণ্ড : দিলীপকুমার রায়]

জীবনে যে দুঃখ পায়নি সে 'শব' পেয়েছে এবং শব ছাড়া আর সব পাওয়াই বাকী আছে তার।

গোপীনাথ কবিরাজের বয়স যখন এখনকার চেয়ে অনেক কম তখন তাঁর এক বন্ধু তাকে বলেন এক শক্তিধর পুরুষের কথা। সেই শক্তিমানের বৈশিষ্ট্য কি জানতে চান কবিরাজ। উত্তর হয় : তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্তমান বলতে পারেন বিন্দুবিসর্গ কারুর না জেনেই। গোপীনাথ বলেন অলৌকিক বিদ্যার সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ তখন গভীর ছিলো না। তবু তিনি বললেন যে, সেই শক্তিবিশিষ্ট লোকটি কাশীতে এলে তাঁকে যেন খবর দেন তাঁর বন্ধু ; তিনি দেখা করতে যাবেন। তারপর যথাসময়ে খবর এলো, তিনি এসেছেন। সমিত্র গোপীনাথ চললেন শক্তি-দর্শনে।

সেখানে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখাশোনা আলাপ-পরিচয়ের পর গোপীনাথ বললেন ; আলাপ হলো। এবারে চলি। বিস্মিত শক্তিধর পুরুষ বলেন : সে কি ! আমার কাছে আপনি কিছু দেখবেন না। অব্যাহতবাক কবিরাজ তৎক্ষণাৎ উত্তর করেন এই বলে যে. আমি কিছু দেখবার আগ্রহী নই। তবে আপনি কিছু দেখাতে চাইলে নিশ্চয়ই দেখব।

ভদ্রলোক তখন কতগুলো কাগজ কেটে তাতে কি-সব লিখে চাপা দিয়ে রেখে দিলেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করলেন গোপীনাথকে : আপনি তো ম্যাট্রিক পাস করেছেন অনেকদিন।

আমার সময় এন্ট্রান্স ছিলো—

পাঠ্য-পুস্তকের কোনও বাঙলা পদ্য মনে আছে ?

আছে।

বলুন তো—

গোপীনাথ একটা লাইন আবৃত্তি করলেন। ভদ্রলোক প্রথম কাগজটি খুলে দেখালেন, গোপীনাথ-আবৃত্ত লাইনটি হুবহু সেখানে লেখা হয়ে আছে আগেই।

আবার প্রশ্ন করলেন ভদ্রলোক : কলেজে গিয়ে শেক্সপীয়ারের নাটক পড়তে হয়েছে তো ?

গোপীনাথ তার উত্তর দিলেন : হ্যাঁ।

বেশ, শেক্সপীয়ারের একটা লাইন বলুন তো? গোপীনাথ সেক্সপীয়ারের একটা লাইন বলতে দেখা গেলো, দ্বিতীয় কাগজটিতে সেই লাইনটি আগেই লেখা হয়ে গেছে।

গোপীনাথের সঙ্গে যে বন্ধু পরিচয় করাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি এবার বলেন, 'আমার একটা—,' পুরো কথা বলতে না দিয়েই শক্তিসম্পন্ন সেই ব্যক্তি বলেন, এই দেখুন আপনি কি প্রশ্ন করবেন, আমি তা এই তৃতীয় কাগজটিতে লিখে রেখেছি। প্রশ্নটি ছিলো কাশীর একজন প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু-রহস্য সংক্রান্ত। বাড়ির ওপর থেকে পড়ে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর ব্যাপার নিয়ে কাশীতে তখনও দারুণ চাঞ্চল্য অব্যাহত। পুলিশ তদন্ত চলছে।

গোপীনাথের বন্ধু আবার প্রশ্ন করেন: আপনি বলতে পারেন এ মৃত্যু দুর্ঘটনা না হত্যাজনিত?

অলৌকিক শক্তির বিকাশ দেখাতে ব্যস্ত ভদ্রলোকটি গোপীনাথের বন্ধুকে বললেন: আপনার এ প্রশ্নের উত্তরও আমি জানি; কিন্তু আমি তা এখনই এখানে আপনাকে বলব না। বলব না কারণ, এই মৃত্যু নিয়ে থানা-পুলিশ চলছে। আমি যে শক্তির সাহায্যে এর নির্ভুল উত্তর দিতে পারব, সে শক্তিতে পুলিশের বিশ্বাস নেই। কাজেই সে আমাকে এই রহস্যের সঙ্গে জড়িয়ে দেবে। তার মধ্যে আমি পা দেব না। তবে কখনও যদি একা আসেন আপনি আমার কাছে, আর আমার যদি মন হয় তাহলে বলে দেব এ মৃত্যু হত্যা না আত্মহত্যা না দুর্ঘটনা।

এই ভদ্রলোকই আরেকদিন ডক্টর গোপীনাথকে তাজ্জব করে দেন সেই বয়সে, অঙ্কর উত্তর আগে থেকে কষে রেখে। গোপীনাথ আমাকে বলেছেন যে, ব্যাপারটা থট রিডিং নয়। নয়, তার কারণ গোপীনাথ সে সময়ে এন্ট্রান্স পাঠ্যের কোনও চিন্তাই করছিলেন না। তাছাড়া তিনি কি লাইন বলবেন সেটা জেনে রেখে, আগে থেকে তার উত্তর লিখে রাখা থট রিডিং-এর কর্ম নয়। এই বিদ্যার কখনও ভুল হয় কি না সে প্রশ্ন ঐ শক্তিমান লোকটিকে করেছিলেন গোপীনাথ। তিনি বলেছিলেন হয়। ইকোয়েশান করে অঙ্কের উত্তর যখন করেন তখন কোটিকে গোটিক ভুল হয় ত' হয়। হয় ত' কেন,—হয়। তবে ভিসন্ থেকে যখন বলি তখন আর ভুলের কোনও সম্ভাবনা নেই। কোটিতে একবার না।

হ্যাঁ! ভুল হয়। গোপীনাথকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম: আপনি যাদের অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী মনে করেন, তাদের সম্পর্কে আপনার ধারণা ভুল প্রমাণ হয় না কখনও? এ প্রশ্ন আমি একটি বিশেষ লোকের কথা মনে রেখে করেছিলাম। ডক্টর গোপীনাথ তাকে নিজের বাড়িতে এনে রাখেন। সেখানেই একদিন ধরা পড়ে যায় তার চালাকি। তারপরেও গোপীনাথ তার কোনও অসম্মান করেন নি; কাউকে বলেন নি এ কথা। আমাকেও কিছুই বললেন

না ; শুধু এইটুকু বললেন যে, হ্যাঁ, আমি তাকে যা ভেবেছিলাম সেটা ঠিক নয়। তারপর শুধু বললেন : এ ভুলেরও দরকার ছিলো।

যে কোনও লোক নিন্দায় কুৎসিত কদর্য হতে পারত বিশ্বস্ত কেউ বিশ্বাস নষ্ট করলে। গোপীনাথ পণ্ডিত হিসেবে নয়, মানুষ হিসেবেও ব্যতিক্রম। নিন্দার্হ ব্যক্তির দোষ নিজের ঘাড়ে নিলেন। বললেন ; ভুল করেছি। এ ভুলের দরকার ছিলো।

এই গোপীনাথকে আমি ভালোবাসি। এই গোপীনাথকে না দেখলে আমার বিশ্বনাথ দর্শন অসমাপ্ত থাকতো।

কাশীতে এখন একজন আছেন যাঁর নাম লালবাবা। উলঙ্গ। বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কিছুদূরে তাঁর বাস। এঁর কাছে গেলে ইনি মারতে আসেন, ভাগিয়ে দেন। আবার কারুর জন্যে নিজে থেকেই বাড়িয়ে বসে আছেন বিপুল ঐশ্বর্যের হাত। দিলীপকুমার রায় তাঁর স্মৃতিচারণ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এঁর কথা লিখেছেন। লালগোলার হেডমাস্টার বিখ্যাত বরদাবাবুই দিলীপকুমারকে লালবাবার কথা বলেন। চির উলঙ্গ, তিব্বতে যোগসিদ্ধ লালবাবা দূর থেকেই অনেক সময়ে বহু যোগীকে সাহায্য করেন। বরদাবাবুকেও করেছিলেন চাক্ষুষ দর্শন ছাড়াই।

দিলীপকুমার কাশীতে লালবাবার সন্ধানে গিয়ে দেখেন, লালবাবা দোতলায় উলঙ্গ হয়ে খাটে বসে আসেন। তিনি দিলীপকুমারকে দেখা করতে দেবেন না। লালবাবাকেও ছাড়বেন না দিলীপকুমার। লালবাবাকে দিলীপকুমার বললেন : কেন ভান করছেন ? জানেন তো আমি ঐহিক কামনা নিয়ে আসি নি। পরের দিন সাক্ষাতের অনুমতি মিললো। পরের দিন দিলীপকুমারকে একটি উল্লেখযোগ্য কথা বললেন : 'আমার সাহায্য পেতে হলে আমার দেখা পাবার দরকার নেই—বরদাবাবু যে আমার সাহায্য পেয়েছিলেন সে কি আমার দেখা পেয়ে ? তোমাকে যখন তিনি আমার কাছে এসে ধর্ণা দিতে বলেন, তখন কি বলেন নি তোমাকে যে আমি বহু দূর থেকেই তাঁকে সাহায্য করেছিলাম।'

বরদাবাবু সে কথাই বলেছিলেন দিলীপকুমারকে, সে কথা লালবাবার জানবার কথা নয়। [স্মৃতিচারণ : দ্বিতীয় খণ্ড : পৃ ১৯৯-২০০]

কাশীতে বার্ধক্যে বারাণসীর কোনও পাঠক-পাঠিকা গেলে, সব কিছু দেখবার পর লালবাবাকে একবার দেখে আসবেন। গণেশ তার মা-কে প্রদক্ষিণ করেই হারিয়ে দিয়েছিলো কার্তিককে জগৎ প্রদক্ষিণ করতে পারে কে আগে সেই খেলায়। কাশীতে গিয়ে লালবাবাকে দেখলে কাশী দেখা সম্পূর্ণ হয়।

চর্মচক্ষে দেখার কথাই বলছি। মর্মচক্ষে কাশী এবং লালবাবাকে কলকাতায় বসেই দেখা যায়। কেবল লালবাবাই যে দূরে থেকে সাহায্য করেন তা নয়। যার তৃতীয় চক্ষু খুলে গেছে সে-ও শুধু লালবাবাকে নয়, বাবা বিশ্বনাথকেও টেনে আনতে পারে নিজের কাছে।

এ কথায় বিশ্বাস করা টেলিভিসনের পরেও শক্ত, জানি। সেই সঙ্গে এও জানি, টেলিভিসনের যুগ শেষ হয়ে ভিসানের যুগান্তর ঘটতে যাচ্ছে। মানের দুর্দিন শেষ হয়ে সুপারম্যানের দিন।

॥ চৌদ্দ ॥

১৯৫০ সালে কলকাতায় অধ্যাত্ম-পত্র 'হিমাদ্রি' কার্যালয়ে একদিন কে একজন বলেন, শ্রীমুন্সী এবং আরও কোনও কোনও ভারতীয় নেতারা ১৯৫২ সালে শ্রীঅরবিন্দের জন্মোৎসব পালন করবেন। শ্রীঅরবিন্দের বয়স হবে যখন আশী। সেখানে উপস্থিত একজন বললেন: শ্রীঅরবিন্দ অতদিন মরলোকে থাকবেনই না। এ নিয়ে তর্কের প্রমাণযুক্ত কাগজে শ্রীঅরবিন্দের মহৎ প্রয়াণের তারিখটি একটি জায়গায় লিখে রাখতে দিলেন ভবিষ্যদ্বাণীকার। যাঁকে দিলেন রাখতে তাকে বলে দিলেন কাগজটা শ্রীঅরবিন্দের প্রত্যাবর্তন-দিবসে খুলে দেখতে; তার আগে গোপন রাখতে। যাঁকে দিলেন তিনি দু'দিন পর ফিরিয়ে দিলেন কাগজ। বললেন: আমি কৌতূহল রাখতে পারবো না; আপনিই রাখুন এ কাগজ। তখন ভবিষ্যদ্বক্তা ভদ্রলোক আরেকজনের জিম্মায় রাখলেন কাগজটা।

১৯৫০-এর ৫-ই ডিসেম্বার শ্রীঅরবিন্দ ফিরে গেলেন একদিন যেখান থেকে স্বেচ্ছায় এসেছিলেন তিনি। কাগজ খুলে দেখা গেল তাতে তারিখটি লেখা আছে—৫ই ডিসেম্বার ১৯৫০।

ভবিষ্যৎবক্তা ভদ্রলোকের নাম কালীপদ গুহরায়। এখন কাশীতে আছেন কেদারঘাট ডাকঘরের ওপরে। মানস সরোবরও বলে বাইরের লোকে। এবারে কাশীতে কেবল গোপীনাথের সঙ্গে নয়, কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গেও সাক্ষাৎ হয়েছে। এ যাত্রায় কাশী-যাত্রা আমার সার্থক হয়েছে। গোপীনাথ এবং কালীপদ, সোহাগা এবং সোনা দর্শনজ্ঞাত এবং দর্শনপ্রাপ্ত, অতল বিদ্যার সঙ্গে অকূল আনন্দের গঙ্গা-যমুনায় স্নান করেছি। ঘট ভরেছি, নিয়েছি বিদায়।

কিন্তু আমি যাঁকে ভালোবেসেছি সেই কালীপদ গুহরায় অধ্যাত্মবিদ্যার অধীশ্বর নন খালি। তিনি সেই মানুষ যাঁর ঐশ্বরিক ক্ষমতার চেয়ে মানুষকে ভালোবাসার ক্ষমতা অনেক বেশী। তিনি যাঁকে খুঁজছেন তাঁর দেখা পেয়েছেন কি না আমি জানি না। আমি যাঁকে খুঁজছি না, তাঁর দেখা আমি কালীপদ গুহরায়ের মধ্যে পেয়েছি। সাধারণ মানুষ আমরা। অসাধারণের স্পর্শে এলে ক্ষণকালের জন্যে যে চিরকালের স্পর্শ পাওয়া যায়, কালীপদ গুহরায়ের সান্নিধ্যে এবার তার স্পর্শ পেয়েছি, তাই যে আমি রোজ নগণ্য, সে আমি আজ ধন্য,—এ কথাই মনে হয়েছে গঙ্গার বুকে ভগীরথের আসনের কাছে পেঁাছে।

মানুষ যে মানুষের চেয়ে কত বড়, এ কথা যে মানুষ জানে তেমনই একটি মানুষকে জেনে এসেছি এবার কাশীতে গিয়ে। কাশীতে না গিয়েও যেদিন তাঁর স্পর্শ পাবো সেদিন জানবো কাশী যাওয়া সত্যিই সফল হয়েছে তাঁর কৃপায় যাঁর কৃপায় পঙ্গুর দু'পায় গজায় পাহাড় ডিঙোবার আশ্চর্য উপায়। যেখানেই তাকাও সেখানেই দেখো কালীকে, তবেই কালীঘাট দেখা হলো। না হলে খালি ঘাট দেখাই হলো ; কালীঘাট দেখা হলো না আর। কাশীতে না গিয়েও বিশ্বনাথ-দর্শন হবে যখন, তখনই কাশীদর্শন হলো। না হলে একাশীবার বারাণসী গেলেও গঙ্গায় স্নান করলেও সারাদিন শুধু সর্দিকাশি হলো ;—কাশী-প্রাপ্তিও হলো, হলো না কেবল কাশীতে যেজন্যে যাওয়া সেই কাজটি। সে কাজ কি ? সে কাজ হচ্ছে বিশ্বের যতেক অনাথের মধ্যে বিশ্বনাথকে দর্শন। সে কথা হচ্ছে, বিশ্বের একটি অনাথও যতক্ষণ অভুক্ত ততক্ষণ বিশ্বনাথের ভোগ অসম্পূর্ণ। বিশ্বের সমস্ত অনাথ যতক্ষণ না আশ্রয় পাচ্ছে ততক্ষণ বিশ্বনাথের মন্দিরে নেই বিশ্বনাথ। বিশ্বের প্রত্যেকটি অনাথকে ভালোবাসা বিশ্বনাথের সব চেয়ে ভালো বাসা,—একথা না বোঝা পর্যন্ত সমস্ত দর্শন মূঢ়ের মাথায় পাণ্ডিত্যের বোঝা মাত্র। মালা জপা সেই বোঝার ওপর শাকের আঁটি ছাড়া আর কি !

কালীপদ গুহরায় কি পেয়েছেন আমি জানি না। কালীপদ গুহরায় কি পাননি, তা জানি। তিনি অধ্যাত্ম ক্ষমতার দম্ভ এখনও পাননি। যেদিন পাবেন, সেদিন 'কালী'-পদ থেকে কালীপদ দূরে সরে যাবেন মুহূর্তে। সেদিন যেন কখনও না আসে কালী-পদে কালীপদের এ প্রার্থনা সত্য ও শাশ্বত হোক,—আমার দুই কালীপদেই এইমাত্র কামনা। আর কোনও কামনা নেই আমার। সে 'কালী'-পদেও না ; এ কালীপদের কাছেও না।

কলকাতা থেকে কাশী যাবার আগে চুঁচুড়ায় একজনকে বলেছিলাম এবার কাশী গেলে কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে দেখা করব। যাকে বলেছিলাম তিনি কাশীর প্রত্যেকটি ইটপাথরকে পর্যন্ত জানেন। অথচ তিনি আমাকে বললেন, তিনি কালীপদ গুহরায়কে জানেন না। আমি কাশী যাবার আগেই চুঁচুড়ার সেই একজন কালীপদ গুহরায়ের কাছে হাজির। কালীপদবাবুকে তিনি বললেন যে, আমি কলকাতায় তাঁর খোঁজ করেছিলাম। সব শুনে গুহরায় মশাই তিরস্কার করলেন তাঁকে : আপনি আমাকে চেনেন তবুও কেন কলকাতায় মিথ্যে বললেন যে, আমাকে চেনেন না ? চুঁচুড়াবাসী জানালেন যে আমি কালীপদ গুহরায় সম্পর্কে কাগজে কিছু লিখতে পারি এবং যেহেতু কালীপদ গুহরায় যাঁর সম্পর্কে একটি কথাও লেখা হোক কোথাও তা চান না, সেই হেতুই তিনি সেল্‌ফ্‌ ডিফেন্সে মিথ্যে বলেছেন।

চুঁচুড়ার লোকটি কালীপদবাবুকে চেনেন না একথা মিথ্যে হলেও, একথা তাঁর মিথ্যা নয় যে, কালীপদ গুহরায় তাঁর সাধনা ও শক্তি সম্পর্কে নীরবতায় জেনুইনলি বিশ্বাসী।

কালীপদ গুহরায় এত জানেন, এটুকু জানেন না যে পদ্মের গন্ধ বাতাসে ছড়াবেই। যে মানুষ বড়মানুষের সঙ্গ একা চায়, তার চেয়ে অমানুষ আর কে? শ্রীরামকৃষ্ণ রাম এবং কৃষ্ণ দুয়ের চেয়েই আমাদের অনেক কাছের মানুষ যে তার কারণ 'সময়' নয়। তার কারণ তিনি তাঁর মা-কে নিজের জন্যেই কেবল ডাকেননি, ডেকেছিলেন তোমাকে আমাকে তোমার আমার আসক্তি থেকে নিরা-সক্তিতে উত্তীর্ণ করে দিয়ে যাবার জন্যে। বাল্মীকির লেখনীর মূল্য কি যদি তা শ্রীরামচন্দ্রের বন্দনায় মুখর না হলো। শ্রীরামচন্দ্রের চরিত্র ধরা পড়বেই বা আর কার প্রতিভার দর্শনে যদি সে চরিত্র আঁকবার দর্প এ পৃথিবীতে একমাত্র মানায় যাঁকে সেই বাল্মীকি না হন রত্নাকর থেকে রামায়ণকার!

কাশীর কথা বলব কালীপদ গুহরায়ের কথা বলব না! পাথর খুঁজতে খুঁজতে পরশপাথর পেয়ে গেলাম যদি দৈবাৎ তাহলে তার কথা বলতে পারব না কারণ পরশপাথরের তা বলতে বারণ আছে। পরশপাথর তো বলতে চাইবেন না, তার কারণ সে শুধু পাথর নয়, পরশপাথর। তাকে বলতে হয় না, ছুঁতে হয় শুধু। সমস্ত বাসনাকে সে সোনা করে দেয়, মৃতকে দেয় অমৃত করে, পঞ্চশরবিদ্ধ মানুষকে মুহূর্তে করে ঈশ্বরসিদ্ধ শিব, তার কথা যদি আমার একমাত্র বলবার কথা না হয়, তাহলে তো ঈশ্বরের কথাও বলা চলে না, দক্ষিণেশ্বরের কথাও না।

কালীপদ গুহরায়ের বক্তব্য যদি এই হয় যে, এখনও তাঁর সাধনা শেষ হয়নি, তাই তিনি থাকতে চান মনে, বনে, কোণে, তাহলে বলব একথা ঠিক এবং ঠিক নয়ও বটে। পুষ্পলুব্ধ মধুকর গুঞ্জরনে যদি ছায়াতল না কাঁপে, তাহলে বুঝতে হবে সে ফুল কাগজের কিংবা মৌমাছির ডানা ভাঙা। এই আকাশ ওই বাতাস, এই পৃথিবী ওই শূন্য, এই বেদনা ওই আনন্দ, এই পরিশ্রম ওই অবকাশ যদি সেই একজনের কথা মনে না করায় তাহলে বহুজনের মধ্যে কোনো একজনকে কেন দাও কখনো কখনো সূর্যাঙ্গের স্পর্শ? অগ্নিময়ী বাণীর অক্ষর তবে কেন আনো সারা রাত ধরে নিঃশব্দ নীলিমার পায়ে কেন উজাড় করে দাও!

হিমালয় হোক নিস্তব্ধ. সমুদ্র নিঃশব্দ হবে কেন?

কালীপদ গুহরায়। এখনও পর্যন্ত যত মানুষ আমি ঘেঁটেছি তাদের সকলের চেয়ে এত বড়, যত বড় নয় আমার চেয়ে আমার লেখনীও। কাশীতে এই প্রথম দেখা তাঁর সঙ্গে, নাম শোনা. তাও খুব বেশি দিনের নয়। এবারের দেখা আরও অল্প সময়ের জন্যে। সর্বসাকুল্যে তিন বা চারিদিনের মতো, রোজ কয়েক ঘণ্টার জন্যে এই সময়টুকুর মধ্যে একটা মানুষকে দেখে তার সম্পর্কে এত বড় কথা বলা যায় কি না, এ প্রশ্ন অনেকের মনে যেমন উঠতেই পারে, তেমনি আমার মনে কখনই উঠতে পারে না। তার কারণ, আমার কথায় নয়, সমারসেট মমের কথায় বলি: কোনও কোনও লোক একটা কাটলেট খেয়ে বলে দিতে পারে মাংসটা কেমন; গোটা পাঁঠা খাবার তার দরকার হয় না। একটা চাল টিপলে

ভাত সিদ্ধ হয়েছে কি না একথা বলতে যার বাধে সেও রাঁধে বটে কখনও, কিন্তু রাঁধুনে নয় সে কখনই।

কালীপদ গুহরায়ের সাধনার চাল সিদ্ধ হয়েছে কি না একথা বলবার মতো রাঁধুনে আমি নই। সেকথা আমি বলছিও না। কালীপদ গুহরায় মানুষটার কথা বলছি। যে মানুষটাকে একজন শক্তিমান উপাধিতে ভূষিত করতে তিনি বলেছিলেন : সে কি? স্নেহবান নই? [স্মৃতিচরণ · দিলীপকুমার রায় : পৃ ২৮১]। যার তূণীরে স্নেহ নামক সেই আশ্চর্য বাণটি নেই সে ভাগ্যবান নয়, ভালোবাসার বাণেই যিনি বিদ্ধ হন শুধু তিনিই ভগবান।

বাঙলাদেশকে, বাঙালীকে ভালোবাসেন কালীপদ গুহরায়। নজরুলকে, সুভাষচন্দ্রকে ভালোবাসেন শ্রদ্ধা করেন। নিজের দেশকে এবং দেশের মানুষকে যিনি ভালোবাসেন না, তিনি ঈশ্বরকে ভালোবাসেন একথা আমি বিশ্বাস করি না। নজরুল সম্পর্কে একটি নতুন সংবাদ তিনি এবার দিয়েছেন কাশীতে। নজরুলের অসুস্থতার উৎস, কোনও কোনও মহলে, সাধারণ মানুষের কখনও কখনও যে অসুখ হয়, তারই একটি বলে ধারণা করা হয়। কালীপদ গুহরায় বললেন, মানসিক রোগের আরোগ্যক হিসাবে বিশ্ববিখ্যাত ডেভিসের মতে— নজরুলের এ অসুখ সে অসুখ নয় যা অচিকিৎসিত অবস্থায় এক সময়ে মানুষের মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটায়। কারণ সে অসুখ মানুষের মাথাই খারাপ হয় যে তা নয়, একটা সময়ের পর সে মারা যায় : নজরুলের ক্ষেত্রে সে সময় অনেকদিন পার হয়ে গেছে। তাই, ডেভিসের মতে এ অসুখ প্রতিভাবান ব্যক্তির অসুখ, চিকিৎসাশাস্ত্র যার ব্যাখ্যার যোগ্য নয় এখনও।

নজরুলের অসংখ্য অনুরাগীদের একজন আমি। কালীপদ গুহরায়ের এই কথায় আমার মনে রবীন্দ্রনাথ গুঞ্জরন করে ওঠে :

এখনি অন্ধ বন্ধ কোর না পাখা।

গঙ্গার ওপার থেকে ঝড়ের মাতাল হাওয়া আসছে মাটি উড়িয়ে নিয়ে। তার গর্জনে কান পাতা যায় না। বারান্দার চেয়ারে বসে আছেন কালীপদ গুহরায়। সামনে ছোট টেবল। তার এ পাশে আমি। চায়ের পেয়ালা দিয়ে ধুঁয়ো উঠছে ওপরে : দু'জনের মুখেই সিগারেট। আর কোনও লোক নেই; বারান্দায় শেড নামানো। রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে গঙ্গার ধুলোখেলা।

ছাই মাখা দেখলেই যেমন মনে করি সাধু তেমনই সিগারেট চা খাওয়া ধুতি-পাঞ্জাবি পরা, চেয়ারে বসা লোক দেখলেই ধরে নিই, মেটেরিয়্যালিস্টিক মানুষ। কিন্তু যে জানে, সে জানে কোন ছাইয়ের নিচে কি আগুন চাপা আছে। যে জানে না, সে জানে শুধু, ভগবান আকাশে অথবা তারও ঊর্ধ্বে কোথাও বসে আছেন এবং তাঁকে পেতে হলে যেতে হয় বনে। তিনি যে মনে আছেন, এই সংসারের প্রতি কোণে জমে থাকা ধূলিকণায় ছড়িয়ে আছে তাঁর অসীম করুণা, এ কথা তাকে বোঝায় কে? বোঝানো যায় না তার কারণ এ বোঝবার নয়,

বাজবার। এদেরই উদ্দেশ্য করে শ' বলেছেন: 'Beware of that man whose God exists in the heaven.'

কালীপদ গুহরায় ধুতিচাদর পরে, চা সিগারেট খেতে খেতে যা পেয়েছেন তা নেংটি এঁটে জন্ম জন্ম ছাই মেখে বসে থাকলে কেউ পায় না। কি সেই বিশ্লেষণ অতীত অধিকার যা পেলে মানবজীবন ধন্য হয়ে যায়। কালীপদ গুহরায়ের চোখে জ্বলছে সেই পাবার দীপ্তি। সে দীপ্তি ভস্ম করে দেয় না। কাছে টানে। অতলস্পর্শ বড় দু'টো চোখে মানুষের প্রতি অকুণ্ঠ প্রেম অনাবিল উজ্জ্বল। জীবনে বড় কিছু না পেলে এ দৃষ্টি কোথায় পেলে তুমি কালীপদ গুহরায়,—এই আমার দুর্বিনীত প্রশ্ন। যতই দূরের বনের হোক কোকিল, বসন্ত যদি আসে তবে কেমন করে না ডেকে পারবে সেই গলা, যে গলায় জীবনের মণিহার নিজের হাতে পরাবে একদিন জীবনদেব।

আমাকে আরম্ভেই নিরস্ত করতে কালীপদবাবু বললেন: আমি কিন্তু সাধুটাধু কিছু নই।

—নিশ্চয়ই নন,—আমি বলি, আপনি সাধু বলে তো এ অসাধু আপনার কাছে আসেনি।

আশ্বস্ত হন কালীপদ গুহরায়। সহজ হন তৎক্ষণাৎ। জিজ্ঞেস করেন: চা খাবেন?

কালীপদ গুহরায়ের ঠিকানা পেয়েছিলাম গোপীনাথের কাছে: মেঘের ঠিকানা চাতকের কাছে। আমি বললাম: শ্রীঅরবিন্দের তিরোধান-মুহূর্ত আপনি আগে থেকে বলে দিয়েছিলেন এ-কথা সত্য?

সত্য। গুহরায় উত্তর দিলেন: ও-একটা ইনসপায়ার্ড মোমেন্টের উক্তি! ও-কিছু নয়।

বলতে পারলাম না তাঁকে মুখ ফুটে, কারণ তিনি জানেন, মানুষের মহত্তম সমস্ত ধ্বনিই ভগবানের ইন্‌সপায়ার্ড মোমেন্টের প্রতিধ্বনি মাত্র।

কালীপদবাবুর মনে নেই দিলীপকুমার রায়ের শিষ্যা ইন্দিরার ছবি দেখেই তিনি বলেন: 'বছর তিন-এর মধ্যে দারুণ ফাঁড়া আছে, কাটা শক্ত।' [স্মৃতিচারণ]। সে ফাঁড়া ইন্দিরার কেটেছে ঠিকই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও ঠিক যে, ১৯৫৪ সালে ইন্দিরা বেঁচে যায় নাভিশ্বাস ওঠবার পরে।

ইন্দিরার ছবি দেখে কালীপদ গুহরায় বলেছিলেন, 'A being of light I love' কালীপদ গুহরায়কে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল: A pair of eyes that tells of the supreme 'I'.

কালীপদবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি নাকি কলকাতায় কাকে চিঠি লিখেছেন যে, নেতাজী শৌলমারীতে আছেন! কালীপদ গুহরায় প্রতিবাদ করলেন তৎক্ষণাৎ: না। না। আমি কখনও কাউকে একথা বলিনি। আমি শুধু দিলীপ রায়কে বলেছি যে, সুভাষচন্দ্র তাঁর খুব অন্তরঙ্গ

বন্ধু, তিনি একবার শোলমারী গিয়ে সাধুকে দেখে আসুন। তাঁর দেখার দাম আছে।

তারপর অন্য একদিন একসময়ে হঠাৎ তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল : সুভাষ-চন্দ্রের জীবন বিপন্ন ; তাঁর জন্যে প্রার্থনা করুন।

তুমি যতই নিজেকে আড়াল কর গৃহীর বেশে হে চিরসন্ন্যাসী, তোমার দু'চোখই বলে দিচ্ছে, তুমি সব দেখো তোমার তৃতীয় চোখে,—যে চোখ মৃত্যুর মুখ দেখে জীবনের আলোয়।

হাওড়ার এক কলেজের অধ্যাপক গিয়েছিলেন কাশীতে। কালীপদ গুহরায় তাঁকে দেখে বলেন, চল্লিশ বছর আগে কলকাতার অমুক জায়গার অমুক ঘরে আপনি এই কথা বলেন—মনে আছে আপনার? অধ্যাপকের মনে নেই। মনে থাকার কথাও নয় তাঁর, কারণ সে কিছু অসাধারণ কথা নয়। কিন্তু কালীপদ গুহরায়ের তা মনে আছে। তার কারণ সাধারণ কথা অসাধারণ কথার মতোই গেঁথে যায় এমন একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে কালীপদ গুহরায় কথা বলেন। বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞানের ওপারে যেখানে স্মৃতির কথাই আছে কেবল। বিস্মৃতির কথা নেই।

অধ্যাপককে কালীপদবাবু বলে দিয়েছেন, কতদিন অধ্যাপক বাঁচবেন।

দিলীপকুমার রায় বলেছিলেন, কালীপদবাবুর জীবনে দু'টি বিদেহী আত্মা এসে দাঁড়িয়েছে। একথা সত্য কি না আমি জানি না। আমি জানি কেবল এই যে, মানুষ নিজেও জানে না, কখন কোন মুহূর্তে হাতের মুঠো ঠেকে যায় সেই পরশপাথরে, যে মুঠো তখন মণিকে জ্ঞান করে ধূলিমুঠি বলে। সেই পরশ-পাথর হাতে আছে কালীপদ গুহরায়ের, মূল্যহীনকে সোনা করবার রহস্য অবগত হয়েছেন বলেই ডক্টর গোপীনাথ যেমন তাঁর সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পান, তিনিও তেমনই আমার মতো অন্তঃসারশূন্য অহংকারের সঙ্গে কথা বলতেও বিরক্ত হন না। কেন? কারণ যে সিন্ধুগামী নদী সে যখন বয়ে চলে তখন মল এবং পরিমল,—দুইকেই সে সমান জ্ঞান করে, কৃপাসিন্ধুর অহৈতুকী কৃপায়!

দ্বিতীয় দিনে একবার, শেষ দিনে আরেকবার, মনে আছে, কালীপদবাবু বলেছিলেন যে, আপনার সঙ্গে অত কথা বলে ফেলি কেন? একথার উত্তর দিইনি তখন। এখন দিচ্ছি। যে আকাশ বৈশাখে বৈরাগী, সেই আকাশই আষাঢ়ে নববর্ষায় অকৃপণ। কেন? কারণ তাঁর মুখে কথার ফুল ফোটাতে পারার জন্যে বাইরে থেকে আঘাত নয়, অন্তর থেকে আহবান করতে হয়। উপদেশ শুনতে যাইনি তাঁর কাছে। গিয়েছিলাম অঞ্জলি ভরে জীবনগঙ্গার জল পান করতে। শিবের জটায় যার বেরুবার পথ বন্ধ তাকে ভগীরথ আহবান করলে তখন মুক্তধারা হতে তার বাধা কোথায়। কালীপদ গুহরায়ের কাছে নৈতিক প্রশ্ন করলে হেসে উড়িয়ে দেন তিনি। রাজনৈতিক কথা পাড়েন। রাজনৈতিক কথা পাড়তে হয় তাই। বেরিয়ে আসে আধ্যাত্মিক সেই আসল

মানুষটি। স্বদেশপ্রেমের তীব্রতা থেকে উৎসারিত যাঁর বিশ্বপ্রেমের বন্যা বিশ্বনাথের প্রেমে আত্মহারা। দেশের জন্যে যাঁর দুঃখ, দেশকালের অতীত যিনি তাঁর পায়ের চিহ্নরূপে এখনও বর্তমান। মানুষের জন্যে যাঁর অশ্রুজলে, মানুষের যিনি স্রষ্টা তাঁর ছবি ফুটে আছে আনন্দশতদল হয়ে! কালীপদ গুহরায়কে দেখে আমার এ কথাই মনে হয়েছে যে, কখনও কখনও মানুষের জীবনের স্বরলিপি হতে পারে, হয়ে উঠতে পারে, 'ঈশ্বর'লিপি। শুধু তা পড়বার মতো চোখ চাই। যে চোখ অন্তহীন আমায় দেখতে পায় কালীপদর দু'চোখে জেগে আছে জয়ন্ত করার আনন্দপূর্ণিমা

কালীপদ গুহরায়ের সঙ্গে কিছুক্ষণ সঙ্গ করলে সেই দৃষ্টি যার খোলে না সে নয় জিজ্ঞাসু। সূর্যমুখ যার মুদিত আলোর পাপড়ি খোলে না সে নয় যেমন, কিছুতেই নয় সূর্যমুখী।

বন্ধ করা খামে প্রশ্নের উত্তর খাম না খুলে বসিয়ে দেবার অলৌকিক ক্ষমতা ব্যাখ্যা করছিলেন শেষদিন কালীপদ গুহরায়। বলছিলেন, এটা কিছুই নয়। একটা স্পিরিটকে কনট্রোল করার ক্ষমতা মাত্র। এর সঙ্গে ঈশ্বর সাধনার সম্পর্ক নেই বিন্দুমাত্র। এমন কি এটা, হাতদেখা, ঠিকজি বিচারের জন্যে যেটুকু সৎ শ্রম করা দরকার, তা ছাড়াই করা যায়। কলকাতায় একজন লোককে বাড়িতে ডেকে এনেছিলেন তিনি। সে ঐ খাম বন্ধ করে উত্তর দেবার খেলাই দেখিয়েছিলো। গুহরায়মশাই তাকে ধমক দিয়েছিলেন। বলেছিলেন: যে স্পিরিটকে কনট্রোল করে এই জোচ্চুরির ব্যবসায় নেমেছ, সে স্পিরিট লিখতেও জানো না ভালো করে। এসব চালাকি ছেড়ে ঠিকুজি দেখে বা হাত দেখে বলবার পরিশ্রমটুকু করলেও তা বুঝি যে তবু পয়সা রোজগারের জন্যে কিছু মাথার ঘাম পায়ে ফেলছ। এসব করে নিজেকে কত নীচে নামাও তা একবারও খেয়াল কর না?

আমি প্রশ্ন করেছিলাম, যে টাকার জন্যে এই নিম্নশ্রেণীর আত্মাকে ডেকে আনা, সেই টাকা তো সে-ই এনে দিতে পারে যে কারুর সিন্দুক থেকে। পারে না?

পারে। কিন্তু সে টাকা আবার তাকে সিন্দুকে রেখে আসতে হবেই যে—

আচ্ছা, আবার প্রশ্ন করি আমি, আচ্ছা বলতে পারেন লোকে যে স্পিরিট দেখে সে পরিত্যক্ত বাড়িতে গভীর রাতে দেখে কেন? দিনের আলোয় ট্রাম রাস্তায় দেখে না কেন?

তার কারণ, দেখা দেবার জন্যে যে ক্ষমতার দরকার হয় তা কম স্পিরিটেরই আছে। যাঁদের আছে তাঁরা প্রয়োজন ছাড়া দেখা দেন না—

ঠিক কথা। আমরা মনে করি স্পিরিট বুঝি সর্বশক্তিমান। বুঝি না যে অনেক মানুষের চেয়েই তাদের ক্ষমতা কম। স্থূল দেয়াল ভেদ করে যেতে পারে সূক্ষ্ম দেহে সে। কিন্তু তার মানে এ নয় যে, সে যা ইচ্ছে করতে পারে

তাই। শুধু স্পিরিট নয়, যা ইচ্ছে তাই করতে পারে কেবল সেই এক; বাকী সবই অনেক ইচ্ছে করতে পারে পূরণ। কিন্তু পূর্ণ চৈতন্যের কৃপা ছাড়া পারে না এক কানাকড়িও নাড়তে চাড়তে।

কাশীতে এমন কয়েকটি স্পিরিটের দেখা পাওয়া গিয়েছিলো কয়েক বছর আগে একটি বাড়িতে। একটি বউ এবং দু'টি বা তিনটি মেয়েকে খুন করবার পর আত্মহত্যা করে একটি যুবক। এ ঘটনার দীর্ঘকাল পরে মধ্যরাত্রে সেই বাড়িতে তাদের আত্মার আবির্ভাব হয়। কাশীর বহু লোক এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে। যে-বাড়িতে আমি কাশীতে গিয়ে উঠি, সে-বাড়ির কর্তা-গিন্নী এবং আরেক ভদ্রলোক যান ব্যাপারটা দেখতে। রাত বারোটায় গোলমাল আরম্ভ হয়। দরজা খুলে পুলিশ দেখতে পায় না কিছু। ভয় পায় সবাই, ভয় পায় না কেবল বাড়ির বুড়ো দারোয়ান। সে বলে বাচ্চি লোক খেলছে, ওদের বিরক্ত করো না।

কাগজে এই খবর পড়ে পাকিস্তান থেকে একজন মুসলমান শক্তিধর লেখেন যে, কাশীর মতো জায়গায় এমন একজন লোক নেই যে বন্ধ করে দিতে পারে এই শব্দ। আমি,—পাকিস্তানে বসে ওই শব্দ বন্ধ করবার জন্যে কাজ করছি। যেদিন শব্দ অন্য দিনের চেয়ে অনেক অনেক বেশি হবে সেদিন বোঝা যাবে আমার কাজে কাজ হয়েছে। তারপর আর শব্দ হবে না একবারও।

পাকিস্তানের সেই শক্তিধরের কথা সত্য হয়েছিলো, যদিও তার পরেও কখনও কখনও এ শব্দ শোনা গেছে আবার।

॥ পনের ॥

পৃথিবীটা কার,—এই ছেলেমানুষী প্রশ্নের মধ্যে যে ছেলেমানুষতর উত্তর লুকিয়ে আছে, সে বলছে, পৃথিবী টাকার। বলে ভাবছে, মানবজীবনের শেষ কথা বলা হয়ে গেল বুঝি! টাকা ছাড়া বাঁচা যায় না যে কেবল এইমাত্র বক্তব্য নয় ওই প্রশ্নের আস্তিনের মধ্যে উত্তরের ট্রাম্পকার্ড গোঁজা এ যুগের সুবচনীতে। টাকা ছাড়া একটি মুহূর্তেরও মূল্য নেই এতটুকু অর্থ, টাকাই চলবার চাকা। টাকার ধ্যান। টাকার জ্ঞান, টাকার স্বপ্ন। টাকাই সব। নারায়ণ নয়, নগদনারায়ণই আরাধ্য। টাকাই সাকার ব্রহ্ম। শুনতে শুনতে মনে হয় সত্যই সবার উপরে মানুষ নয়, সবার ওপরে কাঞ্চনই কাম্য। এই বাস্তব সত্যের ওপর যারা উঠেছে, মণিকে যারা মণি বলে মানে নি, তাদের জীবন সাধারণ মানুষকে বিন্দুমাত্র প্রভাবিত করে নি। অসাধারণ সেই মানুষও যে সংসার করেছে, ভার নিয়েছে স্ত্রী-পুত্র পরিবারের, অর্থ রোজগার করেছে দু'হাতে কিন্তু খরচা করেছে চতুর্ভুজে সে-কথা বলতে গেলে শুনবেন, ও'রা নিয়মের ব্যতিক্রম। ও'রা কোটিকে গোটিক। ও'রা সংসারের বাইরে।

না। তারাকিশোর চৌধুরী,—যেদিন হাইকোর্ট থেকে হাজার হাজার টাকার ব্যবহারজীবন তুচ্ছ করে বেরিয়ে গেলেন বৃন্দাবনের পথে সেদিন তিনি আপনার আমার মতোই সংসারী লোক ছিলেন। অর্থের প্রয়োজন আপনার আমার চেয়ে কিছু কম ছিলো না তাঁর সেদিন এবং পয়সা রোজগার করতে না পেরে হতাশ ভগ্নোদ্যম বীতশ্রদ্ধ হয়ে বেরুন নি তারাকিশোর। সাফল্যের সুমেরু শিখরে দণ্ডায়মান তারাকিশোরকে আরও বড় সাফল্যের আলেয়া যখন আহ্বান জানাচ্ছে, তখন সে কোন আলো তাঁকে টেনে নিয়ে গেল নিশ্চিতের কূল থেকে অনিশ্চিতের অকূলে। সেই পরমার্থের আলো মিথ্যা? আর অর্থের আলেয়াই সব?

সাধারণবুদ্ধি মানুষের কথা বাদ দিচ্ছি। অসাধারণ বুদ্ধি অপরিমিত সাফল্যের সমার্থক ডক্টর রাসবিহারী ঘোষ পর্যন্ত তারাকিশোরকে বুঝতে পারেন নি। ভেবেছিলেন তারাকিশোর চলে যেতে চাইছেন বুঝি ডক্টর ঘোষ থাকতে ব্যবহারজীবিকার শীর্ষে উঠতে না পারার অভিমানে। তাই তারাকিশোরকে বলেছিলেন রাসবিহারী: আর কয়েকদিনের মধ্যে আমি প্র্যাকটিস ছেড়ে দিচ্ছি, তখন আপনার আয় হবে লাখ টাকার ওপর মাসে। তারাকিশোর কিছু বলেন নি, হেসেছিলেন। সেই হাসি,—যে হাসি অনিন্দ্যসুন্দর এক মানুষ নৌকার ওপর থেকে তাঁর কীর্তির পাণ্ডুলিপি ছুঁড়ে দিয়েছিলেন যখন জলে বন্ধুত্বের মহিমাকে অবিস্মরণীয় করে রাখতে তখন হেসেছিলেন।

সে হাসি যে অর্থ ও সামর্থ্যের প্রতি পরমাশ্চর্য এক উপহাসি, তা বুঝতে অসাধারণ ধী রাসবিহারীরও সময় লেগেছিলো। লাগবারই কথা। যে বুদ্ধিতে আইনের অদৃশ্য বন্ধন মুক্তি হয় এ হাসির ব্যাখ্যা সে বুদ্ধিতে করা অসম্ভব। গজ আর ইঞ্চির ফিতেয় হিমালয়ের বহিরঙ্গ মাপা যায়। হিমালয়ের নিরুপম নিভৃত অন্তরে অনুপ্রবেশ করতে হলে ধূর্জটির করুণা চাই। সে করুণা কোটিকে গোটিক যার আধারে নামে, সেই শুধু সেই ধনে ধনী হয়, যে ধনে ধনী হলে মানুষ মণিকে মণি বলে মানে না। তারাকিশোর ডাক শুনতে পেয়েছিলেন যাঁর তাঁর আহ্বান উপেক্ষা করার সাধ্য ছিলো না। এই জগতের যিনি রাজা তাঁর চিঠি তখন এসে পৌঁছেছে ভাগ্যবান তারাকিশোরের কাছে। বিনা আহ্বানের সেই আমন্ত্রণ লিপির স্পর্শ হৃদয়াকাশের আঁধারের গায়ে গায়ে প্রতিমুহূর্তে ফুটিয়ে চলেছে নব নব তারা। সে তারা যার গহনে একবার জ্বলে তাকে সাড়া না দিয়ে উপায় নেই শুরু ও সারাহীন এক অনাদি ধারার।

তারাকিশোরের জীবনে ঝড় উঠেছিলো—পরানসখা বন্ধুর অভিসার। ব্যবহারিকজীবনের অর্থ-সামর্থ্য অসার হয়ে গিয়েছিলো। রাসবিহারী ঘোষ তা বোঝেন নি। বুঝলেন সেইদিন, যেদিন তারাকিশোর সত্যি সত্যি বিদায় নিতে এলেন কর্মজীবন থেকে। বার-লাইব্রেরিতে এলেন সহজীবীদের বিদায়-সম্ভাষণ জানাতে। অদ্বিতীয় রাসবিহারী উঠে এলেন দ্বিতীয়ের কাছে। প্রণাম করতে

এলেন বয়সে ছোটো তারাকিশোরকে। তারাকিশোর বাধা দিতে গিয়ে পারলেন না ; বাধ্য হলেন বয়সে বড় রাসবিহারীকে পায়ের ধুলো নিতে দিতে। রাসবিহারী বললেন : বয়সে আমি বড়। কিন্তু আর সবেতেই যে বড় তাঁকে প্রণাম করতে না পারলে আমি যত ছোটো তার চেয়েও অনেক ছোটো হয়ে যাব আজ।

রাসবিহারী যা বললেন না, তা হচ্ছে, যে মানুষ তার বয়স, তার কীর্তি, তার বিদ্যার চেয়ে অনেক বড়, সে মানুষের দেখা মেলে মানব-জীবনের মহত্তম সৌভাগ্যে। যদি কোটিকে মেলে গোটিক এমন কীর্তির চেয়ে মহৎ মানুষের দেখা মেলে তবে তাকে প্রণাম করলে যা মেলে তা বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, সামর্থ্য, প্রতাপ, কৌশল,—মেলে না আর কিছুতেই।

কাশীতে এমনই একটি অবিস্মরণীয় পুরুষ তাঁর জীবন-শতদল মেলে ধরেছিলেন দীর্ঘ অর্ধশতাব্দী ধরে।

তাঁর পুণ্য, পবিত্র, প্রাতঃস্মরণীয় নাম, সতীশচন্দ্র। স্বাধীনতা সংগ্রামের ভোরের আকাশ যাঁরা ভরে দিয়েছিলেন গানে, চিন্তায়, উদ্দীপনায়, রঙে, কর্মে, সাধে, সাধনায়, আচার্য সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁদেরই একজন। তাঁর 'ডন' পত্রিকা সেই সংগ্রামী বঙ্গের স্মরণীয় শঙ্খ। এ শঙ্খের মুখে সেদিন যাঁরা ফুঁ দিয়েছিলেন তাঁরা জাতীয় ও আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্রের চেয়ে খ্যাতনামা লোক ছিলেন প্রায় সবাই। কিন্তু তাঁরা কেউ ওই পত্রিকার পতাকা উড্ডীন রাখতে পারতেন না, ডন সমিতি ও পত্রিকার প্রাণবায়ু মহাত্মা সতীশচন্দ্রকে না পেলে। তাঁকে ঘিরে রুদ্ধদ্বার রাত্রি অবসানে যে তরুণ যাত্রীদল বেরিয়েছিলো স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর হয়ে সতীশচন্দ্র এবং 'ডন' ছাড়া তার প্রকাশ হতো না এমন প্রোজ্জ্বল। সেই প্রলয়রাতের প্রদীপশিখা ছিলেন সতীশচন্দ্র। সে শিখাকে জ্বালিয়ে তুলেছিলেন যিনি, তিনি পবিত্র জীবনের সব চেয়ে প্রাণবন্ত প্রতীক প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী।

বঙ্গদেশ ও জীবনে বিজয়কৃষ্ণের দান বিবিধ ও বিশাল। কিন্তু বিজয়কৃষ্ণের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, তাঁর 'মাস্টারপিস' হচ্ছে,—আচার্য সতীশচন্দ্র।

এই সতীশচন্দ্রের কথা আমাকে বলছিলেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। বলছিলেন—গুরুর কথা শিরোধার্য করে, অর্ধশতাব্দী ধরে একটি মানুষ কাশীতে কাটিয়ে গেলেন দোতলাবাড়িতে কারুর কাছে কপর্দকশূন্যাবস্থাতেও কখনও একটি কানাকড়ি হাত পেতে না চেয়ে—তারই দীপ্ত দিব্য ইতিবৃত্ত। সতীশচন্দ্রের জীবনী আমাদের ছাত্রদের পাঠ্য নয়। তাঁর 'ডন' কাগজের নামও শোনে নি আজকের ছেলেমেয়েরা। তার বদলে তাদের গেলানো হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাস। দেশের কথা যারা জানলো না তারা বিদেশের কাহিনী মুখস্থ করে উগরে দিয়ে আসছে পরীক্ষার খাতায় তোতাপাখির মতো। আর তাই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় যারা প্রথম শ্রেণীর নম্বর পাচ্ছে, তারাই জীবনের পরীক্ষায় ডেকে আনছে দারুণ বিপর্যয়।

মহৎ মানুষের জীবনের চেয়ে মহত্তর ইতিহাস নেই। সে ইতিহাস বইয়ের পাতায় নয়, চোখের পাতায় পড়তে হয়,—জানি। কিন্তু যারা চোখের পাতায় তা পড়বার দুর্লভ ভাগ্য করে এল না,—সেই ধনী জীবনের প্রতিধ্বনি থেকে বঞ্চিত রাখব কেন তাদের?

কীর্তির চেয়ে যিনি মহৎ, ইতিহাসের চেয়ে যে তিনি বৃহৎ, এ শিক্ষাই তো জীবনের শিখায় অনির্বাণ জাগ্রত।

প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণকে অভিমান মাখা গলায় বলেছিলেন আচার্য সতীশচন্দ্র একদা যে, তিনি অযোগ্য তাই অধ্যাত্ম সাধনার পথ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেবেন বলে 'ডন' কাগজের ভার তাঁর ওপর চাপিয়েছেন গুরুদেব। ঈশ্বর অনুরাগের রঙে রাঙা বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন: 'না রে তোর সাধনা আমার দায়িত্ব। ও কাগজ তোকে আমিই করতে বলেছি, যেদিন বুঝব, সেদিন আমিই বলব, কাগজ বন্ধ করতে।'

এই মহাপ্রাণ গুরুর আদেশেই সম্পূর্ণ নিঃসম্বল সতীশচন্দ্র কাশীতে অর্ধ-শতাব্দী কাল কাটিয়ে গেছেন কখনও কারুর কাছে নিজেকে নীচু না করে। নিজে থেকে না চেয়ে একটি কপর্দকও। সে কাহিনী আরব্যোপন্যাসের এক হাজার রূপকথার একটি পাতার মতোও অলীক নয়, অথচ অলৌকিক, এমন গুরু-নির্ভরতার দিব্য দীপ্ত দিগ্বিজয়ের জ্যান্ত প্রমাণ তা, যে, তারপর বিশ্বাসে মিলিয়ে কৃষ্ণ 'তর্কে বহুদূর' অবিশ্বাস করা অবিমৃষ্যকারিতা ছাড়া আর কিছু নয়, বলেই বিশ্বাস হয়। চোখের ওপর সেই ঘটনা যিনি একের পর এক ঘটতে দেখেছেন, ডক্টর গোপীনাথ এমনই একজন। তিনি আমাকে কাশীতে, কাশীর চেয়েও মহত্তর তীর্থ সতীশচন্দ্রের আবাস-এর পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্র তাঁর বিশ্বাস-উজ্জ্বল বাণীতে এঁকে দেখান। সে কাহিনী শুনে আমার মনে হয়েছে যে কোনও মানুষ যদি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে 'পূর্ণ'-র ওপর তাহলে অন্নপূর্ণ যিনি, তিনি তাঁর দ্বারে দাঁড়িয়ে থাকেন স্বয়ং, না ডাকতেই সাড়া দেবার স্বেচ্ছার্পিত বাধ্যবাধকতায়। এই কলিতে সেই কাশীতেই যখন এ অঘটন আজও ঘটে, তখন কে বলে তিনি দাঁড়িয়ে নেই জ্ঞানবিজ্ঞানের ওপারে যাঁর পায় যতক্ষণ না পৌছয় মানুষ—ততক্ষণ সে একান্তই নিরুপায়।

বিজয়কৃষ্ণ বলেছিলেন সতীশচন্দ্রকে, 'সারা জীবন দোতলাবাড়িতে থাকবি। কারুর কাছে হাত পাতবি না। বুঝতে পর্যন্ত দিবি না তোর প্রয়োজন। তোর প্রয়োজন মিটোবার জন্যে যা আসবে তাকে ফেরাবি না।' দোতলাবাড়ির ওপর থাকা মানে রাজার হালে থাকা। অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন গুরুবাক্য সতীশচন্দ্র। অক্ষরে অক্ষরে প্রতিশ্রুতি রেখেছিলেন বিজয়কৃষ্ণ।

এমনও হয়েছে একবার যে বাড়ি ভাড়া বাকী পড়েছে কয়েক মাসের। বাড়িওয়ালা সভয়ে সেকথা জানিয়েছেন সতীশ-ভক্তদের। সতীশচন্দ্র বলেছেন, এসে যাবে টাকা। এসেছে টাকা। গুণে গুণে সেই কটি মুদ্রা, বাড়ি ভাড়া

মিটোবার জন্যে ঠিক যে কটির দরকার। এমনও হয়েছে আবার যে টাকা এসেছে টেলিগ্রাফিক মানি অর্ডারে, বিনা প্রয়োজনে। ফিরে গেছে টাকা গুরুর নির্দেশে। যে পাঠিয়েছিলো, সে নিজে এসেছে, অনুনয় বিনয় করেছে, টাকা কটা দয়া করে সতীশচন্দ্র যদি নেন। গুরু নির্দেশ অমান্য করা অসম্ভব। তাই অনুনয় বিনয়ে পাষাণ গলেনি। তারপর লোকটি ব্যর্থমনোরথ হয়ে চলে গেল, গুরুকে প্রশ্ন করেছেন শিষ্য ; লোকটাকে দুঃখ দিলে কেন ? নিলেই হতো তো টাকা কটা। গুরু দেখিয়ে দিয়েছেন টাকা কটা কোন্ উপায়ে আহৃত। সতীশচন্দ্র বুঝেছেন। ও অর্থ নিলে কি ভয়াবহ অনর্থ ঘটতো সাধনায় !

গুরুর নশ্বর দেহ ভস্মীভূত হবার পরেও, গুরুর কাছে না জিজ্ঞেস করে সতীশচন্দ্র এ ঘর থেকে ও ঘরে যাননি কখনও ! মরদেহে যতদিন বেঁচেছিলেন গুরুতনু আচার্য সতীশচন্দ্র।

মহাভারতের মহত্তমা, কুন্তী ঠিক এই কথাই বলেছিলেন শ্রীকৃষ্ণের পায়ে প্রার্থনা জানাতে গিয়ে। বলেছিলেন : হে পাণ্ডবসখা, আমার জীবন থেকে কখনও দুঃখের মেঘ সরিও না, কারণ, তা হলেই আমি তোমাকে ভুলে যাব। সর্বস্ব না দিলে সর্বস্বধন পায় না কেউ। পৃথিবীটা কার এই প্রশ্নের অবধারিত যে উত্তর ওই প্রশ্নেব মধ্যেই বিধৃত, পৃথিবী টাকার, সে কথা ঠিক। কিন্তু এই পৃথিবীর মধ্যেই আছে আরেক পৃথিবী, এ বিশ্বের মধ্যেই রয়েছে আরেক বিস্ময়, —বিশ্বনাথের বাসভূমি যেখানে অর্থের ওপরে জেগে আছে পরমার্থের পিপাসা ! অন্নচিন্তা যেখানে অন্যচিন্তার বাধা নয় আজও। সেই কাশীতে তোমায় যেতেই হবে। একাশিতে পা দেবার পর নয় ; যেতে হবে যৌবনে। দেহে শক্তি, মনে তৃষ্ণা, চোখে দৃষ্টি, বাহুতে বল, হৃদয়ে ভক্তি যখন অটুট, তখনই গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাঁর দরজায়। বলতে হবে, বিশ্বের শেষ অনাথ পর্যন্ত যতক্ষণ না খুঁজে পাচ্ছে বিশ্বদেবকে, ততক্ষণ মানুষেরই নয় কেবল, বিশ্বনাথেরও মুক্তি নেই, কাশীর মন্দির থেকে তাঁর বেরুবার নেই পথ। কাশী ছাড়া আর কোথায় আছে সকল মানুষের মৃত্যুযন্ত্রণার হাত থেকে চিরন্তন মুক্তি ! বিশ্বনাথ ছাড়া তিনি আর কে যিনি অন্নপূর্ণ হয়েও, বিশ্বের সমস্ত অনাথের মুখে যতক্ষণ না উঠেছে অন্ন, ততক্ষণ আছেন উপবাসী।

এই কাশীতেই, কাশীর দিদিমার বাড়ির সামনে অন্ধগলির অন্ধকারে লাল-কাপড় পরা সেই মহিলার কথা যখন আমার মনে পড়ে তখন আর সব কথা, আর সকলের কথা বিস্মৃত হই আমি। বিস্মিত হই কেবল সেই সতী শ্রেষ্ঠার আচরণে, যৌবনে স্বামী পরিত্যাগ করে এই মহিলাকে। দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করে সে। কাশীতে পড়ে থাকেন মহিলা। ছত্রের কাছে গিয়ে দাঁড়ান। যদি অন্ন মেলে তবে খান। না হলে খান না। তারপর সুদীর্ঘকাল বাদে দীক্ষা নেবার সময় মহিলাকে তাঁর গুরু বলেন, স্বামীর অনুমতি চাই। স্বামীর অনুমতি নিতে যান কাশী থেকে অনেক দূরে স্বামীর কর্মস্থলে। দ্বিতীয়

পক্ষের প্রথম পুত্র বলে : আজ জানলাম তুমি আমাদেরও মা। তা তুমি কেন পরের অন্নে পালিত হবে ? আমি তোমার অন্ন-বস্ত্রের ভার গ্রহণ করব আজ থেকে। উত্তরে উন্নতমাথা সেই দারিদ্র্যাভরণভূষিতা অপরূপা বলেন : তোমার বাবাই আমার ভার নিলে না। তোমার কাছ থেকে আমি কেন নেব করুণা ?

এই জগতের যিনি মালিক তাঁর নাম করুণাময়। এই মহিলার কথা কি একবারও মনে পড়বে না তাঁর !

এই কাশীতেই আবার অনেকে যায়, ভৃগু, আসল ভৃগুর সন্ধান মেলে কি না তাই জানতে। কাশীতে যারা বিশ্বনাথজীর মন্দিরে যায় তাদের বুঝি ; যারা ডালকামুণ্ডিতে যায় বাঈজীর ঘরে তাদেরও বুঝি। কিন্তু যারা হাত-পা দেখাতে যায়, ঠিকুজিকুষ্ঠী তৈরী করাতে যায় তাদের বুঝি। যাঁকে জানলে ভূত-ভবিষ্যতের অতীতকে জানা যায়। পৌঁছন যায় জন্মমৃত্যুর ওপারে। তাঁর কাছে না গিয়ে তাঁর থেকে অনেক দূরে যাই, কি জানতে ? না, আমার নাতি পাস করবে কি না পরীক্ষায় ? অংকে সে একটু খারাপ করেছে। আশ্চর্য ! সিন্ধুতে ডুব দেব শামুকের জন্যে ? কৃপাসিন্ধুর কাছে ভিক্ষা করব মেয়ের পাত্র, ছেলের চাকরি।

কাশীতে এখন আর কে আছেন জানি না, ছিলেন একজন। তিনি এখন আর বেঁচে নেই। স্কুলের মাস্টারমশাই ছিলেন নামে। আসলে নামকরা ভবিষ্যদ্বক্তা ছিলেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন সেবার নির্বাচনে হেরে যান। সেবার তাঁর কুষ্ঠী গণনার জন্যে ডাক পড়ে মাস্টারমশাইয়ের। তিনি বলেন, কোনও আশু পরিবর্তন তাঁর চোখে পড়ছে না। যাঁরা জানেন তাঁরা হেসে ফেলেন। পরাজিত প্রফুল্ল সেন যে মন্ত্রী থাকতে পারেনই না, এই বদ্ধমূল ধারণাই সেদিন তাদের উচ্চহাসির কারণ ছিলো। পরবর্তীকালে মাস্টার-মশাইয়ের কথাই ঠিক হয়। প্রফুল্ল সেনমশাই হেরে গিয়েও স্বপদেই বহাল থাকেন যে,—এ-তথ্য পরিবেশন করা এখন বাহুল্য মাত্র।

এই মাস্টারমশাইয়ের কথা আমাকে কাশীতে যাঁর বাড়িতে আমি উঠি সে-বাড়ির কর্ত্রীও বলেন। তাঁর এক বান্ধবীর স্বামী এক স্কুল-মিসট্রেসের পাল্লায় পড়ে স্ত্রীকে এতদূর অবহেলা করতে আরম্ভ করেন যে, তিনি আত্মহত্যায় উদ্যত হন। মাস্টারমশাইয়ের কাছে তাঁকে নিয়ে যান আমার আশ্রয়দাত্রী। মাস্টার-মশাই প্রত্যেকটি ঘটনা অবিকল বলে যান। তারপর বলেন এ গ্রহ কাটাবার জন্যে যা করা দরকার, তা করা সম্ভব হবে না প্রবঞ্চিত মহিলার পক্ষে। কারণ মাস্টারনী সম্পূর্ণ গ্রাস করে বসে আছে তাঁর স্বামীকে।

এই ভবিষ্যদ্বক্তা ভদ্রলোকের একটা বৈশিষ্ট্য ছিলো এই যে তিনি অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাস করতেন। এঁর ঘরে অনেক দুষ্প্রাপ্য জ্যোতিষ পুঁথি ছিলো বলে জানা গেছে। সেগুলি কি সরকারের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হচ্ছে কি না জানি না। কেবল কালীপদ গুহরায়ের কাছে শুনেছি যে ওঁর ধারণায়

মাষ্টারমশায় কোনও স্পিরিট কনট্রোল করতেন। তার প্রমাণ এক এই যে, অত কথা কেবল কোষ্ঠী বিচার করে, হাত বা মুখ দেখে বলা অসম্ভব। দ্বিতীয় প্রমাণ—ওই অপরিচ্ছন্নতা।

কিন্তু আমার প্রশ্ন সম্পূর্ণ অন্য। কাশী যাবে হাত দেখাতে? বুক খুলে দেখাতে যাব না বিশ্বকে, মানবহৃৎপিণ্ড ধকধক ধ্বনিত হচ্ছে যেখানে অনাদিকাল ধরে বিশ্বনাথ-বাণী : উত্তিষ্ঠত জাগ্রত প্রাপ্য বরান নিবোধত।

॥ ষোল ॥

সকল যুগের সব সাধকের ধারা যেমন অবলীলায় এসে মিলেছিলো শ্রীরামকৃষ্ণের চিরজাগ্রত চোখের তারায়, তেমনই সকল ধর্মের সব সাধনার স্রোত এসে পড়েছে যেখানে সেখানেই সকল বিশ্বের যিনি নাথ, বিশ্বনাথের বেশে এসে বসেছেন। যিনি শিবের ডমরুধ্বনিতে সৃষ্টির প্রতিধ্বনি শুনতে পান, আর যিনি শ্রীকৃষ্ণের মুরলীতে শুনতে পান সেই কথা ফুলের যে কথা চিরকাল শুনতে চায় অলিতে, এঁরা দু'জনেই জীবনের গঙ্গা-যমুনায় অবগাহন করতে আসেন কাশীতে। শাক্ত আর বৈষ্ণব এ-নিয়ে লেখা হবে কত কথা বইয়ের পাতায় জ্ঞানীর। ভক্তের চোখের পাতায় দেখা হবে শুধু কালী-কৃষ্ণে কোনও পার্থক্য নেই। যিনি এক, তিনিই আর এক। পণ্ডিতের মূঢ়তায় কাশী আর বৃন্দাবনে দুস্তর ব্যবধান। সাধকের ধেয়ানে সৃষ্টির একই বৃন্ত ওরা দু'টি ফুল। যেমন ভাবে দেখতে চাও, তেমনই ভাবে দেখো। যেমন ভাবে চাখতে চাও, তেমনই ভাবে চাখো। কাশীতে দেখতে চাও শ্যামের লীলা, দু'চোখ ভরে দেখো, যিনি শিব, তিনিই সুন্দর তিনিই বৃন্দাবনের লীলা অভিসারের সার, শ্রীকৃষ্ণ! বৃন্দাবনে বলো, তোমার বংশীধারী মূর্তির বদলে দেখাও ত্রিশূলধারী দিগম্বরকে,—দেখতে, যিনি মনোহর তিনিই মঙ্গল, যিনি পীতাম্বর, তিনিই দিগম্বর। রামপ্রসাদ হও, যেতে হবে না কাশী, হালিসহরেই পায়ে হেঁটে আসবেন তিনি, ভক্তের ডাকে যে ভগবানের না এসে উপায় নেই কোনও কালে। তখন গান করো, সেই 'এক'-এর জয়গান, কাজ নেই তোর কাশী গিয়ে। তারামায়ের নিষেধ অগ্রাহ্য করে তুমি বামাখ্যাপা যদি খেপে ওঠো কাশী যাবো বলে, তবে ফিরে আসতে হবে তোমাকে তারামায়ের তীরে, কারণ তারার কথায় যে আস্থা হারায়, কাশীর বিশ্বনাথ বারাণসীতে পা দেওয়া মাত্রই তাড়ায় তাকে। তখন জীবনের একতারায় উদগীত হয়, যে তারা সেই তারকেশ্বর। দুই-ই এক।

যদি বলো, মূর্তিতে তিনি নেই, তাহলে সেই আমি তখন 'নেই আমি' বলে ফুটে উঠবেন। ঈশ্বর কোনও বিভূতি নন; ঈশ্বর শুধু অনুভূতি। মলরূপে তিনিই পরিমলরূপে যিনি। ফুল হয়ে ফুটেছেন; হুল হয়েও ফুটে আছেন

তিনিই। যিনি আলো, অন্ধকারও তিনি ছাড়া আর কে। দেহের অতীত যে, দেহ-ও যে সেই-ই—এ বিশ্বাস সন্দেহের অতীত। তুমি কলসীর কানা ছুঁড়ে মারো রাগে অন্ধ হয়ে, অনুরাগের কানাই-ই জেনো তোমার মধ্যে দিয়ে রাগে কানা হয়ে ছুঁড়েছেন সে অস্ত্র নিজেরই উদ্দেশে। তুমি রোগে মুক্তি চাও, আরোগ্য হবে। রূপ-যশ-শত্রুবিনাশ চাও, তা-ই পাবে। সে চাও আর যে না চাও দু'জনকেই বিশ্বদেব তুমি নাচাও তোমার অরূপ নৃত্যের তালে সকালে সন্ধ্যাকালে।

সব পাখিকেই ফিরে যেতে হবে ঘরে। সব নদীকেই সিন্ধুতে। শুধু প্রহ্লাদ নয়। হিরণ্যকশিপুও দেখবে তাঁকেই। জীবনমরণ হরণ করে যিনি দাঁড়িয়েছেন নৃসিংহের বেশে। সব রত্নাকরকেই বাল্মীকি হতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণকে দেখে বিস্মিত হবার নেই। সকলের মধ্যেই সেই রাম আর কৃষ্ণকে একদিন রত্নাকর আর কংস নিধন করে দেখা দিতেই হবে। ঠাকুরের কথাও তাই। খেতে পাবে সবাই ; কেউ সকাল-সকাল, কেউ বেলায়। পথের ধারে পায়ের তলায় যে কৃমিকীট, আর দক্ষিণ মেরুর ঊর্ধ্বে যে অজ্ঞাত তারা মহা জনশূন্যতায় তার রাত্রি সাঙ্গ করছে। তারা দু'জনেই সেই তারার আলো, বামাখ্যাপা যে তারা-র আলোয় প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে ধরায় এসেছিলেন।

'*আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে।*' শুধু ভুলেছি যে আমরা রাজা। না ভুললে ফকিরের ভূমিকায়, সৈনিকের সজ্জায়, কেরানীর বেশে, পণ্ডিতের মূঢ়তার, ধনীর দৈন্যে, সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে মজে থাকবো কি করে ? আর মজে না থাকলে মজা কোথায় ? মনে পড়লেই তো ছুটোছুটি শেষ, অশেষ ছুটি শুরু হয়ে গেল সেই। শুধু বিবেকানন্দ কে বললে ? আমাদেরও যেই মনে পড়বে আমরা কে, তৎক্ষণাৎ আমাদেরও কর্ম-অকর্ম, বিদ্যা-অবিদ্যা পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন-মুক্তির পালা খতম্। তাই ভুলিয়ে রাখা। তাই মজিয়ে রাখা। অহংকারে, অলংকারে রাখা আচ্ছন্ন করে। স্বয়ং বিশ্বনাথ যিনি, তিনিও তো তাই ভোলানাথ।

'*আপনাকে এই জানা আমার ফুরাবে না।*'—ঠিক। ফুরোলেই তো লীলা অবসান। '*আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ*',—*এ তত্ত্ব যখন নিছক* কাব্য থেকে জীবনকাব্য হবে, তখন গীতাঞ্জলির কবি আর গীতার কবিতে তফাত নেই। তখন জানা হয়েছে তাই, সুখে বিগতস্পৃহ, দুঃখে নিরুদ্বিগ্ন, বীতরাগ *ভয় ক্রোধে হতে বাধা কোথায় ? তখন কে বলে, 'জড়ায়ে আছে বাধা ছাড়ায় যেতে চাই, ছাড়াতে গেলে ব্যথা বাজে।' সব বাধা তখন সবমুক্তি হয়ে দেখা* দিয়েছে।

এ হতেই হবে। আজ অথবা কাল, সন্ধ্যাকে হতেই হবে সকাল ! বিশ্বের *সকল অনাথকে হতেই হবে বিশ্বনাথ।*

যিনি জ্ঞানী, তিনি তর্ক করেন। যিনি বিজ্ঞানী, তিনি নস্যাৎ করেন। যিনি

সাধক তিনি বিভূতি দেখান। যিনি ভক্ত কেবল তিনিই ভগবানকে পান। বিচিত্র ছলনাজালে আকীর্ণ করে রেখেছ তোমার সৃষ্টির পথ। এ জাল ছিন্নভিন্ন হয় কেবল তারই হাতে যে, বিশ্বাসী অনায়াসে পেরেছে ছলনা সহ্য করতে এবং এই বিশ্বাসও তার কৃতিত্ব নয়। কারণ এও সে পেয়েছে বহু জন্ম-জন্মান্তরের সুখ-দুঃখে কর্মফল খোয়াতে খোয়াতে। জন্ম-মুহূর্তেই তাই এবারে 'ক' লিখতে —লিখে বসে আছে কৃষ্ণ। সে বালক নিজেও জানে না কেন কৃষ্ণনাম তাকে সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণ করে। কৃষ্ণকে পায় কেবল সে-ই জগতে এসেই যে বলে, দেখা দাও। জীবনের সকল কুরুক্ষেত্রেই একথা সত্য। যে না লিখে পারে না শুধু সে-ই যথার্থ লেখক। লেখা তার কাছে খেলা। খেলা তার কাছে একমাত্র লেখা। হংস যেমন জলে অনায়াসগতি, জন্ম থেকেই, পরমহংসও তেমনই কেবল সে-ই যে কখনও 'আমার' কথা বলে না। জিজ্ঞেস করলেই বলে, না করলেও বলে, করলেও বলে, 'মা'-র কথা বলছি।

ঠাকুরের গলায় ব্যথা। ভক্তরা বললো: মা-কে বলুন না, যাতে দু'টো খেতে পারেন। ঠাকুর বললেন: মা বলেছেন, এতগুলো ভক্তের মুখে যে খাচ্ছিস? একথা ঠাকুর না হলে বলবার সাধ্য আছে কার। বইয়ের পাতায় যদি একথা লেখা থাকতো তা'হলে চোখের পাতায় তাকে দেখবার জন্যে কেঁদে মরত না কোটিকে গোটিক কেউ। তা'হলে এই কাব্য, 'নয়ন তোমারে দেখিতে না পায় রয়েছ নয়নে নয়নে' এ কেবল কাব্যই হতো; জীবন-কাব্য হতো না রামপ্রসাদ থেকে রামকৃষ্ণের কান্নায়।

যিনি ঠাকুর শুধু তিনিই জানেন সব ঠাকুরের ইচ্ছেয়। যে রূপে মজেছে, আর অপরূপ মজিয়েছে যাকে দুই-ই তাঁর ইচ্ছেয়। আকার কিংবা নিরাকার তিনি কি নন, এ নিয়ে তর্ক,—এও তাঁরি খেলা। যাকে দেখতে দেবেন না, যাকে জানতে দেবেন না সে কে, সে দেখতে পাবে না কোনও শাস্ত্র মন্থন করে, কোনও সাধনায় ধরা পড়বে না সেই অধরা; আবার যাকে দেখতে দেবেন, জানতে দেবেন কে সে, কোনও শাস্ত্র না পড়েই চোখের পাতায় সে প্রত্যক্ষ পড়বে; সে নিজেই সে-ই। কেবল সেই বলবে, বলতে পারবে: মাকে বল্! আমাকে বলিস নি!

রথ ভাবে, পথও ভাবে, মূর্তি যে ভাবে সে-ই দেব, এবং তাতে যে অন্তর্যামী হাসে, একথা যিনি লিখেছেন, তিনি যদি আরেকটু লিখতে পারতেন যে, রথ এবং পথ এবং মূর্তি, এরাও সেই অন্তর্যামীরই মূর্তি তা'হলে দেখতেন, তা'হলে *একথাও লিখতেন যে, যিনি প্রণাম করেন এবং যিনি প্রণাম নেন,—এ দু'য়ের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এঁরা একই দুই হয়েছেন।*

পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ স্বর্গ-মর্ত্য-জন্মমৃত্যু,—কেবল ততক্ষণই যতক্ষণ না মনে পড়ছে যে তুমিই সে-ই। আসলে ওসব কথার কোনও অর্থ নেই। যারা *বলে, পাপীকে ক্ষমা কর, পাপকে নয়;—তারা যদি আরেকটু দেখতে পেত। তা'হলে বলতো,* পাপ ও পাপীকে, ক্ষমা করবার বা শাস্তি দেবার কেউ নও

তুমি। কারণ ওরাও সেই তাঁর মূর্তি, যাঁর মূর্তি আছে কি নেই এই নিয়ে তর্কের শেষ নেই আজও।

মাতাল, দুশ্চরিত্র, সাধু, অনাসক্ত, রাজা এবং প্রজা, পণ্ডিত ও মূঢ়, এ সবই চেতনার ভিন্ন ভিন্ন রং মাত্র। যিনি রাম, যিনি কৃষ্ণ, যিনি রামকৃষ্ণ, তিনিই জগাই-মাধাই, কংস, হিরণ্যকশিপু। তিনি দেবী চণ্ডী হয়ে মারছেন, মহিষাসুর হয়ে মার খাচ্ছেন। তিনিই বৃন্দাবন, যিনিই বারাণসী। লোক পৃথিবী জুড়ে ধনবৈষম্যের কথা বলে। তিনি ওই রকম বলান, তাই বলে। না হলে বলতো, যতক্ষণ তিনি চাইবেন একদল উপবাসে থাকবে আরেকদল বাস করবে সুখস্বর্গে ততক্ষণ কোনও ইসম্-এর ক্ষমতা নেই সে বিধানকে উল্টে দেয়।

ক্ষীর ভবানীর মন্দিরে স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দকে বলেছিলেন দেবীকণ্ঠ: আমার ইচ্ছেয় মুসলমানরা যদি আমার মন্দির নষ্ট করে থাকে, তোর কি তাতে। ইচ্ছে করলেই কি আমি এই মুহূর্তে সপ্ততল সুবর্ণমন্দির তৈরী করতে পারি না? পারি। কিন্তু তবুও ভগ্ন মন্দির হয়ে পড়ে আছি যে সে আমার লীলা!

জানি। আপনি বলবেন যে, সবই যদি তাঁর ইচ্ছেয় তবে তো চুপ করে বসে থাকলেই দিন চলে যেত। যারা বলে এই কথা তারা একবার চুপ করে বসে থেকে দেখুক না,—দিন চলে কি না। চুপ করে বসে থাকতে দেয় না যে সে। যাকে দেয় তাকে মরুভূমিতে মা ভগবতী আপন স্তন্যে অমৃত দান করে।

শুধু ব্যক্তি নয়, জাতির ক্ষেত্রেও তাই, যুগের ক্ষেত্রেও তাই। মানুষের মতোই যুগের এবং জাতির উত্থান পতন আগে থেকেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে। ভারতবর্ষের পরাধীনতাও তাই কবিচিত্তকে বিচলিত করলেও বিস্মৃত হতে দেয় নি এ বার্তা যে, 'হবে তা সহিতে মর্মে দহিতে আছে তা ভাগ্যে লিখা।' লোকহিত কথাটা আমরা বৃথাই বলি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি জানে, ওকথা ছেঁদো। কোনও লোক কোনও লোকের হিত করতে পারে না। তবুও তা বলতে হয় তার কারণ না হলে সমাজ রসাতলে যায়। আব্রহ্মস্তম্ব সবের যিনি মূলে সেই এক যিনি অনেক হয়েছেন তিনি লোকহিত অথবা অহিত নিয়ে বিন্দুমাত্র বিচলিত নন। পাপ-পুণ্য, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরকের সীমাহীন ঊর্ধ্বে তাঁর বাস। কর্মচক্রের দম দিয়ে তিনি ছেড়ে দিয়েছেন সবাইকে। এই দম যতক্ষণ না ফুরোচ্ছে, ততক্ষণই জন্ম-জন্মান্তর, জীবন-মৃত্যু, পাপ-পুণ্য স্বর্গ-নরক। পুরুষকার বনাম অন্ধ বিশ্বাসের অন্তর্দ্বন্দ্ব ততক্ষণই।

এ তত্ত্ব যারা জেনেছে তারা বিভ্রান্ত হয় না কখনও। তারা মানুষের শূন্যে হাত পা ছোঁড়ায় হাসে। যার কর্ম, যার সংস্কার, যাকে দিয়ে যা করাচ্ছে তার বিরুদ্ধে তার অথবা অন্য কারুর কিছু করবার নেই। একই বাড়িতে একজন টাকা ছাড়া কিছু বোঝে না, আরেকজন টাকা ছাড়া সব বোঝে। কেন? দুজনের সংস্কার দুরকম বলে। তাহলে কে পারে প্রারব্ধকে পরিবর্তিত করতে?

গুরু পারেন। এই গুরুও নির্দিষ্ট হয়ে আছে। সময় না হওয়া পর্যন্ত দুঃসময় ঘোচে না কারুর।

শুধু গুরু নয়, কে শাক্ত আর কে বৈষ্ণব, কে কাশীর আর কে বৃন্দাবনের, এও ঠিক হয়ে আছে জন্ম-মুহূর্তের অনেক আগে থেকেই। আমি জানি। আমি জানি, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে, কেন বিশ্বাস করা শক্ত। বিশ্বাস করার জন্যেও যে সংস্কার প্রয়োজন। চেতনায় তার ছাপ না থাকলে অবিশ্বাস করাই তার অপ্রতিরোধ্য অনিবার্য ধর্ম হবে। তাই বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী কাউকেই শ্রদ্ধা কিংবা অশ্রদ্ধা করবার কারণ নেই।

জগাই-মাধাই উদ্ধার হবে বলেই শ্রীচৈতন্যের অঙ্গে কলসীর কানার আঘাত, গিরিশ ঘোষ বেঁচে যাবে বলেই পরমহংসকে 'গ্রেট গুস' বলে পেছন থেকে বক দেখানো। শ্রীহরির দেখা পাবে বলেই স্ফটিক-স্তম্ভে হিরণ্যকশিপুর পদাঘাত। প্রহ্লাদের সঙ্গে হিরণ্যকশিপুর পার্থক্য রইলো কোথায়। যখন স্তম্ভ বিদীর্ণ করে নৃসিংহর বেশে এসে দাঁড়ালেন তিনি। বুক চিরে ফেললেন যখন হিরণ্যকশিপুর তখন কার হিরণ্যমূর্তি দেখলেন সেখানে? শ্রীহরি ছাড়া আর কার।

হৃদয়বান লোকে বলে অভাবে পড়ে একজন চোর হয়। ম্যান সেদিন সুপারম্যান হবে। সেদিন সে অনায়াসে বলবে, জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কারে একজন চোর হয় একদিন। আরেকদিন চোর থেকেই মনোচরের সাক্ষাৎ পায়। একদিন লোকের সম্পদ দেখলেই তার মন হরি হরি করতো; আরেকদিন তার মন শুধুই শ্রীহরি শ্রীহরি করে। হরণবিদ্যার জন্যেও যেমন সে দায়ী অথচ দায়ী নয়, তেমনই মনোহরণ-সাক্ষাতের জন্যেও তার গৌরব থেকেও নেই।

জ্ঞানবান লোকে বলে মৃত্যু বলে কিছু নিই। স্তন থেকে স্তনান্তরে যাবার পথে সন্তানের কান্নাকে কবি তুলনা করেন, মৃত্যুহাহাকার বলে। আসল কবীর মন অসীমের সঙ্গী হয় যখন তখন সে দেখে কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু কোথাও বিচ্ছেদ নাই। দার্শনিক বলে মৃত্যু হচ্ছে দেহের জীর্ণ বসন ত্যাগ করে নববস্ত্র পরিধান মাত্র। কিন্তু দেখতে পায় যে সে জানে,—শুধু সেই জানে সেই চরম সত্য। সে সত্য হচ্ছে মৃত্যুর মতো জন্ম বলেও কিছু নেই। আসলে জন্ম-মৃত্যু অসীম কালের পরিপ্রেক্ষিতে এ দুই অর্থহীন। ইটার্ন্যাল প্রেসেণ্ট অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন মুখ-ব্যাদন করে—তিনি মেরে রেখেছেন তাদের আগেই অর্জুনের হাতে বধ্য হবার অপেক্ষায় যারা। প্রয়োজন হলে শ্রীকৃষ্ণ এ তত্ত্বও প্রত্যক্ষ করাতে পারতেন সব্যসাচীকে, যে যারা মরে আছে বলে দেখলেন অর্জুন, তারা আবার বেঁচেও আছে সঙ্গে সঙ্গে।

শ্রীকৃষ্ণ তাই জানতেন, সুখে উচ্ছ্বসিত দুঃখে অভিভূত, রাগে অন্ধ, ভয়ে মৃতপ্রায় হবার কোনও কারণ নেই। যা হবার তা হয়ে আছে।

আমরা বলি, সূর্য পূর্বে ওঠে। কিন্তু আমরা জানি যে সূর্য উঠেই আছে। পৃথিবী প্রতি মুহূর্তে প্রদক্ষিণরত। যখন যেদিকটা সূর্যমুখ হয়

তখন সেদিকটায় সকাল হবার কথা বলি। জন্ম-মৃত্যু বলেও তেমনই কিছু নেই। দিনরাত্রের মতো ওকে আমরা সুবিধের জন্যে জন্মমৃত্যু বলে ভাগ করেছি। আসলে কর্ম পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরকের মতো জন্মমৃত্যু কেবল ততক্ষণই আছে যতক্ষণ আমি জানছি না, আমি কে!

॥ সতের ॥

হরি এবং হর, বৃন্দাবন এবং বারাণসী, বৈষ্ণব এবং শাক্ত, বাঁশি এবং ডমরু, পীতাম্বর ও দিগম্বর সে 'এক'-এরই আরেক, আরেক হ'য়ে দেখা দেওয়া কেবল তার প্রমাণ কাশী গেলেও পাওয়া যাবে, বৃন্দাবন গেলেও। এবং ও জায়গার একটিতেও না গেলে। ঘরে বসেই কেউ দেখা পেয়ে যেতে পারে তাঁর, নয়ন যাঁর ঠিকানা খুঁজে বেড়াচ্ছে কিন্তু পাচ্ছে না। প্রশ্ন করছে, 'হায় রে ওকে যায় না কি জানা'। যদি জানা যায় কি না জিজ্ঞেস করো তা'হলে বলব জানা যায় না। জানার ব্যাপার নয়। জানান দেন যদি তিনি—যাবে জানা। কাকে দেবেন, কেন দেবেন, কখন দেবেন তা নিয়ে কেঁদে লাভ নেই। কারণ লোকে জানে না তাই বলে ডাকার মতো ডাকলে তবে সাড়া দেন। না। নাও দিতে পারেন সহস্র ডাকে। না ডাকলেও দেখা দিতে পারেন সহস্রবার। আমরা মনে করি আমরাই বুঝি তাকে ডাকছি। তিনি যে আমাদের ডাক দিয়েছেন কোন্ সকালে তা আমরা জানি না, কারণ আমরা ঘুমিয়ে আছি অনেক বেলা পর্যন্ত। ভক্তই কেবল কাঁদে না; ভগবানের চোখেও অকারণ অবারণ জল ভক্তের জন্যে। অসীম বেদনার নামই ঈশ্বর।

কে বললে দেখা পাওয়াই একমাত্র কথা! দেখা না পাওয়াও তো সেই এক মাত্রেরই খেলা। দেখা পাওয়ায় আছেন, দেখা না পাওয়ায়ও আছেন তিনি। রূপে ও অরূপে, নীলে ও অনীলে, মলে ও পরিমলে, ডাকায় না-ডাকায়, থাকায় না থাকায় মিশে আছেন তিনি। ডাকলে তবেই যিনি সাড়া দেন, না ডাকলে দেন না, তিনি দিল্লীশ্বর হতে পারেন; তিনি জগদীশ্বর নন কখনই। এ তাঁর ইচ্ছা, এই লীলায় মাতা। কারুর কাছে তাঁর পাবার নেই কিছু, দেবার আছে। কেউ তাঁর দেখা পায় না; তিনি দেখা দেন। যাকে দেন তিনি কেবল তাঁরই নন; যাকে দেখা দেন না তিনি তাঁরও। কেবল স্তব করে যে তাঁর কাছেই তিনি বাস্তব এ ধারণা যার, সে জানে না সে কাকে খুঁজছে। যে তাঁকে চাইছে না, তিনি তাঁকেও চাইছেন। জীবনে যিনি বুক থেকে ফেলতে পারেন না, তিনিই শিব।

রামপ্রসাদ, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে ডেকেছিলো বলে পেয়েছিলো যদি তা'হলে কংস, প্রহলাদ, জগাই-মাধাই, গিরিশ ঘোষও তাঁকে পায় কেন? পায়, তার কারণ, শেষ

পর্যন্ত ও পায় না পৌঁছে সবাই নিরুপায়, তাই পায় ওঁকে ; যাকে চেয়ে পায় না কেউ ; কেউ পায় না চেয়েই। যিনি হলাদিনী শক্তি, তিনিই যে বিনোদিনীর অভিনয় শক্তি আবার তিনিই যে গীতার নিরাসক্তি। এ বোঝবার নয়, এ বুকে বাজবার। যার বাজে তাকেই সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে।

যে পারে সেই কেবল ফুল ফোটাতে পারে না। যে পারে না তাকে দিয়েও পারান তিনি। হুল ফোটাতে ফোটাতে কখন সেও ফুল ফোটায় যে, সে নিজেও জানে না এবং জানে না বলেই মনে করে বৃন্দাবন এবং বারাণসী বুঝি আলাদা। হরি ও হর বুঝি হরিহরাত্মা নয়। যিনি হরি, তিনিই যে হর একথা অহরহ ঘোষিত হচ্ছে বৃন্দাবনে বারাণসীতে, তবুও শৈব আর বৈষ্ণব আর শাক্ত এ নিয়ে তর্কের শুরু আছে কিন্তু শেষ নেই। শুধু কি তাই ? জ্ঞানী এবং মূঢ়ে, সাধু এবং পাপীতে, দ্বিজে ও চণ্ডালে, রাজা ও প্রজায়, ভক্তে ও ভগবানে ভেদ আছে মনে করে অনাদিকালের বিবাদ অনন্তকাল ধরে অব্যাহত রইবে। কেবল ফুল ফুটবে যার, সুগন্ধ পাবে শুধু সেই। ভালোবেসেই জেনে যাবে সে তাকে, জ্ঞান যাকে পায় না, বিজ্ঞান যাকে অস্বীকার আর শাস্ত্র যাকে নিয়ে তর্ক করতে চায়, সেই অনাদি অনন্তর অনুভূতি যখন ফুল হয়ে ফুটবে তখন, কেবল তখনই তাকে জানতে দেওয়া হবে বলে সে জানবে, মানবে যে সবই 'আমি'। তুমি বলে কেউ নেই।

আমিই সে-ই। আমারই চেতনার রঙে পান্না সবুজ হয়েছে যে খালি। পাপ ও পুণ্য, জ্ঞান ও অজ্ঞান, ধন ও দারিদ্র্য, বুদ্ধি ও নির্বুদ্ধিতা,—এ আমারই চেতনার চেহারা। মল ও পরিমল, চোর ও মনোচোর, রত্নাকর ও বাল্মীকি আমিই। আবার এই সবের যে অতীত, শবের অতীত যে উৎসব কোনও দেশে কোনও কালে পরিমাপ নেই যার। নাম নেই, সংজ্ঞা নেই, রূপ নেই, ধাম নেই,—এই আমিই তখন নেই-আমি। এই আমিই হরি। এই আমিই হর। এই আমিই বৃন্দাবন, এই আমিই বারাণসী। আমারই সঙ্গে আমার খেলা।

দিল্লীশ্বর জিজ্ঞেস করলে : ঈশ্বর এই মুহূর্তে কি করছেন ?

হিন্দু সন্ন্যাসী তার জবাব দিলে চোখের পলক পড়বার আগেই : এই মুহূর্তে তোমার চোখে গুরু আমার চোখে শিষ্যরূপে গুরুশিষ্য সংবাদ করছেন !

একথা বলতে পারে কে ? সেই 'আমি'-ই বলতে পারে, এসেই যে বলে, সোহং। বারাণসীতেই যে বৃন্দাবন এর জ্বলন্ত, জাগ্রত, জীবন্ত প্রমাণ এই মুহূর্তেই স্থূল শরীরে বর্তমান। কালীই কৃষ্ণ, শাক্তই বৈষ্ণব একই বারাণসীতে বাস করেন না কেবল, শিবালয়ে দু'জনেই সমান আদৃত,—একথা জানবার জন্যে তর্ক করার প্রয়োজন নেই, একবার যাবারও দরকার নেই কাশীতে, যে বৃত্তান্ত এখানে লিপিবদ্ধ করছি,—কুট তর্কে আবদ্ধ যে কেউ তার থেকে নীর ত্যাগ করে এই ক্ষীরটুকু নিতে পারেন যে মহামায়ায় ও শ্রীবিষ্ণুচ্ছায়ায় কোন বিরোধ নেই। ওঁদের রূপ নিয়েই তর্ক, যেখানে ওঁরা দু'জনেই অপরূপ সেখানে তর্কের অবকাশ নেই, কারণ সেখানে নয়ন সার্থক।

এই বিবরণ যিনি আমাকে সংগ্রহ করে দিয়েছেন তিনিও জীবিত। শুধু জীবিত নয়, হাজার হাজার ছাত্রকে যিনি আদর্শ অধ্যাপক হিসাবে সঞ্জীবিত করে যাচ্ছেন যাতে তারা পড়ার বই-এর বাধ্যতা থেকে বই পড়ার আনন্দে উত্তীর্ণ হবার পথ খুঁজে পায়। অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা বলছি। সুরেন্দ্রনাথ কলেজের এই বিখ্যাত অধ্যাপক তাঁর খ্যাতির চেয়ে অনেক বড় মানুষ। এখন শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে ইংরেজি পড়াচ্ছেন। মাঝে কাশী চলে গিয়েছিলেন, ওখানেই থাকবেন বলে। পারেন নি থাকতে। ছাত্রদের আহ্বানে ফিরে এসেছেন পীঠস্থানে। কলেজের সেক্রেটারী শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য একটি চিঠিতে কাশীবাসী বিনোদবিহারীকে লেখেন : সংশিক্ষা থেকে অসংখ্য ছাত্রকে উপবাসী রেখে কাশীবাসী বিনোদবিহারী কি পাবেন ?

সে কথার প্রতিধ্বনি করে বিনোদবাবুকে আমিও বলি, বিশ্বের যতেক অনাথ যদি তিনি দেখেন তবে বিশ্বনাথ কি তাঁকে দেখবেন না ? এ কখনও হতে পারে ? বুঝি, বই পড়ার পৃথিবী থেকে, বিশ্বদেবের পায়ে পড়ার পৃথিবী বহির্ভূত বারাণসী আজ তাঁর মন টানে। কিন্তু দেবী ভারতীর কাজ তাঁকে দিয়ে যে আজও 'অশেষ'। তাঁর মুখে তো আমরা কাশী যাবার কথা শুনব না। তাঁর মুখে আমরা শুনব নতুন করে সেই পুরানো কথা :

'পরপারে উত্তরিতে পা দিয়েছি ধরণীতে—
আবার আহ্বান ?'—

এবং সেই আহ্বানের উত্তরে কবির একথা তো তাঁর মুখেই মানায় :

'হবে, হবে, হবে জয়— হে দেবী, করি নে ভয়,
হব আমি জয়ী।
তোমার আহ্বান বাণী সফল করিব রাণী,
হে মহিমময়ী।
কাঁপিবে না ক্লান্ত কর, ভাঙিবে না কণ্ঠস্বর,
টুটিবে না বীণা—
নবীন প্রভাত লাগি দীর্ঘরাত্রি রব জাগি
দীপ নিবিবে না।
কর্মভার নবপ্রাতে নবসেবকের হাতে
করি যাব দান—
মোর শেষ কণ্ঠস্বরে যাইব ঘোষণা করে
তোমার আহ্বান।'

অধ্যাপক, ভক্ত, মহৎ মানুষ বিনোদবাবু এত জানেন, আর এটুকু জানেন না যে, দেবী ভারতীর সাধনায় নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন যখন, তখন তারই মধ্যে দিয়ে বিশ্বনাথের সন্ধ্যারতিও আপনিই হয়েছে সার্থক !

কাশীর যে দু'জনের কথা বলতে যাচ্ছি তাঁদের স্থূলদৃষ্টির বিচারে বিপুল

ব্যবধান। একজন পুরুষ আরেকজন স্ত্রীলোক। একজন সংসারী, আরেকজন সন্ন্যাসিনী! একজন বিবাহিত, আরেকজন বিধবা। একজন গৌরাঙ্গ, আরেকজন শ্যামাঙ্গী। একজন কালীমায়ের পূজা করেন। অন্যজনের পরমগুরু হচ্ছেন শ্রীকাঠিয়াবাবা। একজনের বাড়িতে শ্রীবিন্দুবাসিনী কালীমায়ের নিত্যপূজা; আরেকজনের আশ্রমে শ্রীসন্তদাস বাবাজী ও তাঁর স্ত্রী অন্নদা দেবীর প্রস্তরমূর্তি প্রত্যহ পূজিত। একজন শক্ত; আরেকজন বৈষ্ণব! কিন্তু দু'জনেই ভক্ত, সাধক। একজনের নাম—শ্রীপ্রণবনাথ মুখোপাধ্যায়; অন্যজনের নাম,—শ্রীগঙ্গামাতা। দু'জনকেই যুক্ত করে বারবার করে জানাই প্রণাম।

শিবালয়ে থাকেন দু'জনেই। একজনের গৃহস্থাশ্রমের থেকে আরেকজনের আশ্রম,—পাঁচ-ছ' মিনিটের পথ।

দেবী বিন্দুবাসিনীর পূজাই শ্রীপ্রণবনাথের প্রধান নিত্যকর্ম। পুরোহিত আছেন, দুবেলা পূজা করে যান। কিন্তু প্রণবনাথের পূজা যখন-তখন চলছে। দেবীমূর্তির সামনে ভক্তের মূর্তি মুখোমুখি। গঙ্গাজল আছে কখনও, কখনও নেই। প্রণবনাথের মাতৃপূজার সম্বল,—চোখের জল।

কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাচার্য থেকে শুরু করে, অধ্যাপক, সিভিল সার্জন, ছোট বড় অভূতপূর্ব লোকসমাগমে প্রণবনাথের কুটীর জাগ্রত তীর্থ। প্রণবনাথ বলেন, যিনি সত্যকে ধরে থাকেন, মিথ্যা তাঁকে কখনও ধরতে পারে না। তাঁর মুখ দিয়ে মিথ্যা বেরয় না। এ উক্তির উজ্জ্বলতম উদাহরণ প্রণবনাথ নিজে ছাড়া আর কে? সাক্ষী স্বয়ং অধ্যাপক বিনোদবাবু। বিনোদবাবু একদিন, বোধ হয় প্রণবনাথের সঙ্গে সাক্ষাতের প্রথম দিন, ঢুকেছেন সবে ঘরে। দেখেন প্রণবনাথের কন্যা মহামায়া বসে আছেন বাবার কাছে। কন্যাকে পিতা প্রণবনাথ বলেছেন বিনোদবাবুকে দেখিয়ে—এত বড় ইংরেজির অধ্যাপক এসেছেন বাড়িতে, এবারে তুমি ইংরেজিতে পাস করবেই।

কন্যা তবুও আবার জিজ্ঞেস করে: সব বিষয়ে পাস করব তো? পিতা প্রত্যুত্তর করেন পুনরায়: গত বছর ইংরেজিতে ফেল করেছিলে, এবারে ইংরেজিতে পাস করবে। মনঃপূত হয় না উত্তর মহামায়ার। আবার প্রশ্ন করে সে: অন্য সব বিষয়ে কি হবে? পিতা প্রণবনাথ এবার নিরুত্তর। পরীক্ষার ফল বেরুতে বোঝা গেলো কেন প্রণবনাথ নিরুত্তর ছিলেন। ইংরেজিতে পাস করেছে মহামায়া কিন্তু ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতিতে অকৃতকার্য হয়েছে।

মহামায়ার ভক্ত সেই বাস্তব সত্য দেখেও বলতে পারেন নি মহামায়ার মনে কষ্ট দেবার ভয়ে। মিথ্যা সান্ত্বনা দেওয়াও সত্যাশ্রয়ীর পক্ষে সম্ভব ছিলো না। তাই নিরুত্তর ছিলেন তিনি।

১৯৬৩ সালে, কয়েক মাস আগে, মে-জুনে কাশীতে এক নবাগত বৃদ্ধকে সবাই পরামর্শ দিলেন ওই দুই মাস অন্য জায়গায় কাটাতে। কারণ মে-জুনের 'লু'-তে কাশীর একবার পাঁচশোরও বেশি লোক মারা যায়। নতুন লোক সেই

গরম হাওয়া সহ্য করতে পারে না। ভদ্রলোক কাশী ত্যাগ করতে চান না কিছুতেই। প্রণবনাথ অভয় দিলেন : থাকুন কাশীতে কিছু হবে না। এবারে কাশীতে সবাই এলো, শুধু, 'লু' এলো না একবারও।

প্রণবনাথ মা-কালীর ভক্ত কিন্তু জীবহিংসার ভক্ত নন! তিনি নিরামিষাশী। জীবহিংসা পাপ, কিংবা তাতে সত্ত্বশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটে এই নৈয়ায়িকী বিচার নয়, জীবহিংসা থেকে বিরত থাকার কারণে প্রণবনাথের এই নৈসর্গিকী মতি। তাঁর গুরু সাধু তারাচরণের আবির্ভাব-তিরোভাব দিবস উপলক্ষে সভা-সমিতির আহ্বান এলে, সভারম্ভের সময় নির্দিষ্ট থাকে না। তিনি বলেন যে ভক্তসমাগমে বিলম্ব হলে, সভার সময় পিছিয়ে দিতে হয় এবং তার ফলে সত্যরক্ষা হয় না।

প্রণবনাথকে পল্লীর লোকেরা কেউ কেউ স্বামীজী সম্বোধন করলেও তিনি গেরুয়া পরেন না। বাইরে থেকে দেখলে একজন সাধারণ বাঙালী,—এই মনে হয়। বয়স ষাটের কাছাকাছি। প্রণবনাথের ছেলেরা বিদেশে কাজ করেন! সঙ্গে আছেন কুমারী কন্যা মহামায়া এবং সহধর্মিণী,—আর শ্রীবিন্দুবাসিনী কালীমূর্তি,—এই নিয়ে তাঁর সংসার।

প্রণবনাথ প্রায়ই বাড়ির বাইরে যান না। ক্বচিৎ হয়ত গঙ্গাস্নানে যান। সর্বদাই প্রায় আত্মসমাহিত। সহধর্মিণীর সঙ্গে কথাবার্তা কম; অবস্থিতি সম্পর্কেও সচেতন কি না বলা শক্ত। এই মহীয়সী মহিলার ওপরেই সংসার রক্ষার সমস্ত ভার। বিনোদবাবু বলছেন :

'গৃহীসন্ন্যাসী প্রণবনাথ তান্ত্রিক সাধক কি না বুঝা যায় না, কিন্তু আত্মজ্ঞানী প্রণবনাথের আধ্যাত্মিক জীবনে তাঁহার সহধর্মিণীই যে পরমা প্রকৃতি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।'

এবং অধ্যাপকের পরিশেষের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য :

'কাশীধাম প্রধানত সন্ন্যাসিগণের ধর্মক্ষেত্র। প্রণবনাথের মত গৃহীসাধুর কাশীতে অবস্থিতি বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার চিরন্তন লীলার এক অপূর্ব অভিব্যক্তি।'

সেই চিরন্তন লীলার সহচরী গঙ্গামাতাও। তাঁর কথা এরপর বলবো।

॥ আঠার ॥

'So this Benares !···So this is India's holiest city ! But Benares ! You may be the hub of Hindu culture, yet please learn something from the infidel whites and temper your holiness with a little hygiene !'

—A Search In Secret India
[Paul Brunton]

কাশীতে এসেছিলেন বিদেশী পর্যটক পল ব্রান্টন। সাত সমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে ভারতবর্ষে যাঁরা এসেছেন ভারতবর্ষ সম্পর্কে কুৎসা গাইতে অথবা এখনও যাঁরা আসছেন রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করে সস্তায় হাততালি কুড়োতে তাদের একজন নন ব্রান্টন। ব্রান্টন এসেছিলেন সেই ভারতবর্ষকে দেখতে যে ভারতবর্ষ মানুষের মহত্তম চিন্তার সাগরতীরে শতসহস্র বৎসর ধরে একটি কথাই বলছে। বলছে যে :

'We seek the condition of sacred trance, for in that condition man obtains perfact proof that he is a soul. Then it is that he frees his mind from his sorroundings; objects fade away and the outside world seems to disappear. He discovcrs the soul as a living, real being with n himself; its bliss, peace and power overwhelm him. All he needs is a single experience of this kind to obtain the proof that there is a divine and undying life in himself; never again can he forget it.'

ভারতবর্ষের, যে ভারতবর্ষ চিরকালের, জীবন ও বাণীই হচ্ছে এই : মৃত্যু বলে কিছু নেই। মানুষ মৃত্যুঞ্জয়। মৃত্যুর তমোর ওপারে আছেন মহত্তম জ্যোতির্ময় এক যাঁর ধ্রুবপদে পৌঁছনই মানুষের পথচলার একমাত্র লক্ষ্য। ধন নয়, মান নয়, শুধু ভালোবাসা। কারণ ভালো বাসাই ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালো বাসা। মণিকে মণি বলে না মানার, না-জানাকে জানার, অর্থ, সামর্থ্য খ্যাতির শরাহত হতে হতে একদিন সে নিরাময় হবার জন্যে ঈশ্বরাহত হবে,—এই হচ্ছে ভারতবর্ষের মন্ত্র, সাধনা ও সংকল্প।

খোলা চোখ নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন পল ব্রান্টন। ভারতের অপরিচ্ছন্নতা চোখে পড়েছে তাঁর যেমন, সেই পাঁকে শতদল ফুটে আছে এ-ও তাঁর দৃষ্টি এড়ায় নি। কে নেহাতই ভিখারী, কে জাদুকর, আর কে পেয়েছে তাঁর সন্ধান যাঁর খবরও পেলে মণিকে মণি বলে মানে না আর মন সেই অরুণাচলের ঋষি মহর্ষি রমণ,—সকলের কাছে গেছেন তিনি। বুঝেছেন বলে দম্ভ করেন নি। ভারতবর্ষের বাণী তাঁর বুকে বেজেছে।—A search in secret India,—প্রাণের আহ্বানই পল ব্রান্টনকে টেনে এনেছে এই সময়ের চেয়েও সনাতন ভারতবর্ষে। এত লক্ষ কোটি বিদেশীর মধ্যে একটি মানুষের লক্ষ্য কেন নিবদ্ধ হয় যা পাওয়া যায় না তাই পাবার জন্যে, এরও উত্তর তিনি আর কোথাও পান নি ভারতবর্ষে ছাড়া!

দক্ষিণ ভারতীয় এক যোগী ব্রান্টনকে বলেছেন :

'Last night my master appeared to me. He spoke to me about yourself. He said: 'your friend, the Sahib, is eager

for knowledge. In his last birth he was among us. He followed Yoga practices, but they were not of our school. To-day he has come again to Hindusthan, but in a white skin. What he knew then has now been forgotten; yet he can forget for a while only. Until a master bestows his grace upon him he cannot become aware of this former knowledge. The master's touch is needed to help him recover that knowledge in this body. Tell him that soon he shall meet a master. Thereafter, light will come to him of its own accord. This is certain. Bid him cease his anxiety. Our land shall not be left by him until this happens. It is the writing of fate that he may not leave us with empty hands'.

এই পল ব্রান্টন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তার রহস্যের তল্লাস নিতে। অনিবার্যভাবেই তাঁকে যেতে হয়েছে কাশীতে। কারণ কাশীকে না জানলে ভারতবর্ষকে জানা যায় না। আর কাশীকে জানতে হলে যেতে হবে সেই সব যোগীদের কাছে যাঁরা অনাদিকাল ধরে জেগে আছেন; রাত্রির তপস্যায় যাঁরা নিরত। সমস্ত মানুষের জন্যে সেই 'দিন-টিকে' 'এগিয়ে আনতে যেদিন সমস্ত মানুষ তার সন্ধান পাবে যার খবর পেলে মণিকে, কোটিকে গোটিক, মণি বলে মানে না; ফেলে দেয় জলে।

মণিকে জলে ফেলে দিয়ে, চোখের জলে নীলমণির পায়ে রাধার মতো কেঁদে পড়াই শিবের পায়ে সতীর মতো তপস্যাই মুক্তির উপায়। যিনি শব তিনিই শিব; তিনিই কেশব। এই ভারত,—মুক্তোর জন্যে নয়, মুক্তির জন্যে কেঁদেছে। কে শব কে শিব এ নিয়ে দ্বন্দ্বে তার ছন্দ কাটে নি। তাই বৃন্দাবন আর কাশীতে, পীতাম্বরে আর দিগম্বরে কোনও পার্থক্য নেই। সার্চ অথবা রিসার্চ করে মিস্টিরিয়াস ইন্ডিয়ার অন্তর্ভেদ অসম্ভব। অন্তর্যামীর অহৈতুকী কৃপা ছাড়া এক পা উপায় নেই এগুবার।

পল ব্রান্টনও একদিন সেই কৃপা পাবেন যে তার প্রমাণই এই সার্চ ইন মিস্টি-রিয়াস ইন্ডিয়া। সব সার্চ, সব রিসার্চ শেষ করে হাল ছেড়ে দেবেন যখন তখনই দেখবেন, পরশপাথরের স্পর্শে সব বাসনা সোনা হয়ে গেছে কখন টেরই পান নি। বাসনা মরে শবাসনা না জাগা পর্যন্ত একাশিবার কাশী গেলেও কিছু হবার নয়। কারুরই নয়।

কাশী তীর্থক্ষেত্র নয় কেবল। কাশী ভারতের কুরুক্ষেত্র। এখানেই, 'সম্ভবামি যুগে যুগে'—এই ঘোষণা, শঙ্খের মুখে অসংখ্যবার উচ্চারিত, বারবার রক্ষিত হবে। সমস্ত মানুষ যে এক পৃথিবীর স্বপ্ন দেখছে তা শক্তিতে সম্ভব

হবে না। সে অসম্ভব হয়ে সম্ভব হবে নিরাসক্তিতে। কাশীর শক্তি সেই নিরাসক্তি।

বিশুদ্ধানন্দর সঙ্গে কাশীতে পল ব্রান্টনের দেখা হয়। পল ব্রান্টন তাঁকে ম্যাজিসিয়ান বলেছেন।

বিশুদ্ধানন্দের বয়স তখন সত্তর পার হয়ে গেছে। তার বড় বড় দু'টো চোখ ব্রান্টনের চোখ এড়ায় নি। সাহেবকে নিরীক্ষণ করেন সন্ন্যাসী। সে দৃষ্টি কঠিন ; নিরুত্তাপ। সাহেব সে দৃষ্টিকে অণুবীক্ষণের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন, বুকের ভেতর তাঁর ধক করে উঠেছে। অজানা শক্তি সমস্ত ঘরে ধাক্কা দিচ্ছে। পল ব্রান্টন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। তার আগেই আগন্তুক তাঁর আসার উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন। তিনি এসেছেন প্রাচ্যজ্ঞানের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে। অবগাহন করতে ভারতীয় জীবনদর্শনের গঙ্গাযমুনায়। ঘট ভরে নিয়ে ফিরে যেতে এসেছেন মহামানবের সাগরতীরে।

বিশুদ্ধানন্দ সাহেবকে গ্রাহ্য করবেন সাধুর শিষ্যরা তা ভাবতে পারেন নি। তাঁদেরই একজনকে বিশুদ্ধানন্দ বললেন সাহেবকে বলবার জন্যে যে, গোপীনাথ কবিরাজকে ভাষ্যকার হিসেবে সঙ্গে না আনলে বিশুদ্ধানন্দ কিছু বলতে নারাজ।

পরের দিন বিকেল চারটের সময় ঠিক হলো সাক্ষাতের। সঙ্গে কবিরাজ-মশায়ের থাকা চাই। সাহেব রাজি করালেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজকে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ তখন গোপীনাথ। বিশুদ্ধানন্দের প্রবীণ ও পরম সার্থক শিষ্য!

বিশুদ্ধানন্দের কাছে সকবিরাজ ব্রান্টন পেঁছিলেন নির্দিষ্ট সময়ে, বিশুদ্ধানন্দ তাঁকে একটু কাছে আসতে বললেন। সাহেব মাটিতে বসলেন বিশুদ্ধানন্দের আসনের কাছে। বিশুদ্ধানন্দ আরম্ভেই জিজ্ঞেস করলেন: অলৌকিক কিছু দেখতে চাও?

যদি দেখান তো অনুগৃহীত হব,—সাহেবের উত্তর।

তোমার রুমালখানা দাও—বিশুদ্ধানন্দের কথা সাহেবের ভাষায় বুঝিয়ে বললেন ডক্টর গোপীনাথ ; এই রুমালে যে কোনও মনোমত সুগন্ধি সৃষ্টি করা হবে শুধু সূর্যরশ্মি ও একখানা লেন্স সম্বল করে। সিল্কের রুমাল হলে ভালো হয়।

সিল্কের রুমালই সাহেবের সঙ্গে ছিলো। জেসমিনের গন্ধ সাহেব পছন্দ করলেন। রুমালখানা বাঁ হাতে নিয়ে তার ওপর লেন্সটাকে ধরলেন বিশুদ্ধানন্দ। দু' সেকেণ্ড ধরে সূর্যস্নাত হলো সাহেবের রুমাল। তারপর সাহেবের হাতে রুমাল ফিরে আসতে শুঁকে দেখলেন জেসমিনের গন্ধে রুমাল ভুরভুর করছে। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে আরও দু'বার পরীক্ষা করলেন ব্রান্টন। রোজ ও ভায়োলেট-এর গন্ধ বার করলেন সাহেবের ইচ্ছা মতো। তারপর নিজের ইচ্ছে মতো সৃষ্টি করলেন সাহেবের অজানা তিব্বতি ফুলের সুরভি।

সাহেবের মনে সন্দেহের দোলা লাগে। বিশুদ্ধানন্দের আচ্ছাদনের অন্তরালে কোন সুগন্ধি লুকানো আছে। কিন্তু সাহেব নিজেই সন্দেহ ভঞ্জন করলেন। তা কি করে হবে? কারণ তাহলে বহু সুগন্ধি থাকা চাই সঙ্গে। সাহেব কোন্ গন্ধ শুঁকতে চাইবেন তা জানবেন কি করে সাধু? লেন্স পরীক্ষা করে ব্রান্টন সন্দেহজনক কিছু পেলেন না। হিপ্নোটিজমের প্রভাবও ধোপে টিকলো না; সাহেব ঘরে ফিরে গিয়ে যাদের হাতে রুমাল দিলেন তারাও ঐ গন্ধ পেল। তাহলে?

বিশুদ্ধানন্দ আরও বিস্ময়কর একটি অভিজ্ঞতা উপহার দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তবে তার জন্যে অনেক দীপ্ত সূর্যালোক চাই, তাই অন্য একদিন দ্বিপ্রহরে আসতে বললেন সাহেবকে। সেদিন সূর্যের আলো নরম হয়ে এসেছে তখন। আর একদিন এলে, সম্পূর্ণ মৃতদেহে সাময়িক প্রাণ সঞ্চার করে তিনি দেখাতে পারেন বলে প্রতিশ্রুত হলেন।

সাহেব কাজে কাজেই আবার গেলেন বিশুদ্ধানন্দের কাছে। সাধু বললেন, তিনি ছোটো প্রাণীর ওপরেই এই সাময়িক পুনর্জীবন ক্রিয়া দেখাতে সমর্থ। সাধারণত পাখির মৃতদেহেই কিছুক্ষণের জন্যে আবার প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন। অতএব একটি চড়ুই পাখি মারা হলো। মারার পর একঘণ্টা ফেলে রাখা হলো, যাতে পাখির মৃত্যু সম্পর্কে সাহেবের মনে সন্দেহের অবকাশ না থাকে। চোখ-এর ঘূর্ণন থেমে গেল, শরীর শক্ত হয়ে গেলো।

তখন বিশুদ্ধানন্দ তাঁর সূর্যরশ্মিতে আতস কাচকে ধরলেন পাখিটার একটা চোখের ওপর। বিশুদ্ধানন্দের পলকহীন দৃষ্টি পাখির ওপর নিবন্ধ। সূর্যরশ্মি বিদ্ধ করছে পাখির চোখ। সাহেবের অজ্ঞাতভাষায় কি মন্ত্র যেন পড়লেন সাধু। একটু বাদেই পাখির শরীর ছটফট করতে লাগলো। পল ব্রান্টন বললেন যে মৃত্যু-আসন্ন একটি কুকুরকে তিনি এরকমই কুঁকড়ে যেতে দেখেছেন। এরপর দেখা গেল পাখিটা তার দু'পায়ে দাঁড়িয়ে উঠেছে। ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছে।

একসময়ে সেই পাখি উড়তে শুরু করলো। সাহেব শরীর ও মনের সমস্ত শক্তি সজাগ করে অধুধাবন করার চেষ্টা করলেন ব্যাপারটা। স্বপ্ন, না, সত্য? কিন্তু তখনো বিস্ময়ের বুঝি কিছু বাকী ছিলো। পাখিটা পরবর্তী পর্যায়—আধঘণ্টা পর, সাহেবের পায়ের কাছে এসে পড়লো। পরীক্ষায় দেখা গেল পাখিটা আবার মরে পড়ে আছে।

পল ব্রান্টন, বিস্মিত বললে যাকে কিছুই বলা হয় না, শুধু প্রশ্ন করলেন; এই পাখিটার বেঁচে থাকার মেয়াদ কি আপনি আরও বাড়িয়ে দিতে পারতেন?

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন: এখন এইটুকুই তোমাকে দেখাতে পারি,—এর বেশি পারি না। গোপীনাথ কবিরাজ ব্যাখ্যা করলেন বিশুদ্ধ

বক্তব্য : ভবিষ্যতে আরও চমকপ্রদতর ফল বেরুবে নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে। এও বললেন যে তাঁর গুরুর বিস্ময়কর কাজ আরও আছে কিন্তু তাঁকে অত্যধিক পীড়ন করা উচিত নয়। শূন্য থেকে ফল-মিষ্টি, মরা গোলাপের জরা দূর করে তাকে আবার তাজা করার ক্ষমতা বিশুদ্ধানন্দের আয়ত্তে। সাহেব নিরস্ত হলেন। রহস্যাতুর হয়ে উঠেছে আবার সেই ঘর। হাওয়া হয়ে উঠেছে ভারি। পল ব্রান্টন তখনকার মতো নিষ্ক্রান্ত হলেন।

বাইরে জন্ম-মৃত্যুর অমোঘ শাসনে লৌকিক পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে আসছে দীপ্ত দিবাকরকে যথারীতি। বিশুদ্ধানন্দ সাহেবকে তাঁর জন্মবৃত্তান্ত জানিয়েছেন। তিনি বাঙালী। তের বছর বয়সে তাঁকে বিষাক্ত কোনও জানোয়ার কামড়ায়। মৃত্যু সুনিশ্চিত জ্ঞানে তাঁকে গঙ্গায় স্নান করাবার জন্যে নিয়ে গেলে একটি অলৌকিক কাণ্ড ঘটে। যতবার তাঁর দেহ জলে নামানো হয় ততবার জল নেমে যায়। দেহ ওঠাবার সঙ্গে সঙ্গে জল উঠে আসে। বারবার একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়। গঙ্গা বিশুদ্ধানন্দের অমর দেহকে মরদেহ বলে গ্রহণ করতে অস্বীকার করে।

তীরে বসেছিলেন এক যোগী। তিনি প্রত্যক্ষ করেন সমস্ত ঘটনা। বলেন যে তের বছরের বালক একদিন সার্থক যোগী হবে। একটি শিকড় ঘায়ের মুখে ঘযে দিয়ে চলে যান তিনি। সাতদিন বাদে বালকের বাপ-মাকে বলেন যে বিষ সম্পূর্ণ চলে গেছে। এই সাতদিনের মধ্যে তের বছরের ওই ছেলের মধ্যে জীবনযোগীর লক্ষণ দেখা দেয়। সংসার ত্যাগ করে সার খুঁজতে বেরিয়ে যান তিনি এর কয়েক বছর পর।

তিব্বতের পথ ধরেন বালক। একজন যোগীর কাছে যোগশিক্ষা না করলে যোগী হওয়া যায় না। ভারতবর্ষের বিশ্বাস হচ্ছে এই। দক্ষিণ তিব্বতে দেখা পান তাঁর গুরুর যাঁর বয়স বারোশো বছর। তাঁর কাছে মানবদেহর ওপর নিঃসংশয় কর্তৃত্বের যোগশিক্ষা করেন তিনি। পল ব্রান্টন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে ওই যে কোনও গন্ধ সৃষ্টি করা, মরাকে জীবন দেওয়া, কি উপায়ে সম্ভব করেন তিনি?

বিশুদ্ধানন্দ উত্তর দেন এইরকম : তোমাকে যা দেখিয়েছি তা 'যোগ'ফল নয়, সূর্য-বিজ্ঞান। যোগ মানে ইচ্ছাশক্তির উদ্বোধন ; মনঃসংযোগ শক্তি। সূর্য-বিজ্ঞান সাধনায় তার কোনও প্রয়োজন হয় না। কয়েকটা সূত্র জানলেই চলে ; বিশেষ সাধনাও কিছু নেই। পশ্চিমের জড়বিজ্ঞান যেভাবে চর্চিত হয়, এর চর্চা সেভাবেই করা যায়।

ডক্টর গোপীনাথ বলেন যে সূর্যবিজ্ঞানের মিল বিদ্যুৎ ও চুম্বক-বিজ্ঞানের সঙ্গেই বেশি।

বিশুদ্ধানন্দ অবশ্য আরও বিশ্লেষণ করেন তাঁর নিজেরই বক্তব্য : তিব্বত থেকে আগত এই সূর্যবিজ্ঞান প্রাচীন ভারতে নতুন কিছু ছিলো না। এখন এদেশে দু'চারজন ছাড়া ব্যাপারটা প্রায় অজানা। সূর্যের রশ্মিতে প্রাণদায়িনী শক্তি। সেগুলিকে আলাদা করে বেছে নিতে পারলে যে কেউ মরাকে বাঁচাতে পারে।

এছাড়া সূর্যের 'ইথেরিক' শক্তি নিয়ন্ত্রিত করতে পারলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

আপনি এ বিজ্ঞান আপনার শিষ্যদের শেখাচ্ছেন ?—ব্রান্টনের প্রশ্ন অতঃপর।

না। এখনও নয়। বিশুদ্ধানন্দের উত্তর : তবে কোনও কোনও নির্বাচিত শিষ্যকে শেখানো হবে। এর জন্যে পরীক্ষাগার তৈরি করেছি। সেখানে হাতে কলমে কাজ চলছে—

ল্যাবরেটরি দেখলেন পল ব্রান্টন। জানলায় কাচ নেই। বিরাট আকারের রঙীন কাচ চাই, যার মধ্যে দিয়ে সূর্যস্রোত বইতে পারে। পল ব্রান্টন পরে জানতে পারেন যে সারা য়ুরোপে এমন একজনও কাচের কারবারী নেই যে ওই কাচের যোগান দিতে পারে। বিশুদ্ধানন্দের প্রয়োজন 'এয়ার বাবল'-হীন রঙীন কাচ, দৈর্ঘ্যে বারো, চওড়ায় আট এবং গভীরত্বে এক ইঞ্চি। কাচ রঙীন হওয়া চাই, আবার একই সঙ্গে তার মধ্যে দিয়ে সূর্যরশ্মি চলা চাই। ব্রান্টনকে য়ুরোপের বড় বড় কাচওয়ালারা জানিয়েছে যে এয়ারবাবল-শূন্য এত বড় এত গভীর কাচ বিশুদ্ধানন্দের ফরমাস মতো নিখুঁত সাপ্লাই সম্ভব নয়। রঙীন কাচ সূর্যরশ্মি ভেদ করতে পারে না বলেও তারা বলেছে।

এরই মধ্যে হঠাৎ একবার বিশুদ্ধানন্দ পল ব্রান্টনকে অযাচিত বলে বসেন : তিব্বতী গুরুর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত আমি তোমাকে শিষ্য হিসেবে স্বীকার করতে পারব না,—

কিন্তু আপনার তিব্বতী গুরু তো অনেকদূরে—

প্রতি মুহূর্তে অন্তরসেতু পথে তাঁর সঙ্গে আমার আদানপ্রদান চলছে,—ব্রান্টের ব্রান্ট প্রশ্নের জবাবে সন্ন্যাসীর নির্দ্বিধ জবাব।

পল ব্রান্টনের শেষ প্রশ্নটি সিম্পল : জীবনের কোনও উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য আছে ?

অন্য শিষ্যরা হাস্য গোপন করেন। গোপীনাথ জবাব দেন : নিশ্চয় আছে। ঈশ্বরসমীপে পৌঁছবার জন্যে প্রস্তুত হওয়াই জীবনের উদ্দেশ্য।

বারাণসীতে দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার ব্রান্টনের সঙ্গে ঘটে বিখ্যাত জ্যোতিষী সুধীরবাবুর। ব্রান্টন তাঁর বইতে সুধীরবাবুকে ভুল করে সুধেইবাবু লিখেছেন।

॥ উনিশ ॥

'A man who is not a good philosopher will make a poor astrologer.'

কাশীর গঙ্গায় নৌকো করে জলবিহারে বেরিয়েছিলেন পল ব্রান্টন। জলসঙ্গী হয়েছিলেন বোম্বায়ের এক বণিক। ভদ্রলোক যেমন সাধু তেমনই

সচ্ছল। অর্থাৎ পরলোকের কথা চিন্তা করতে গিয়ে ইহলোকের কথা বিস্মৃত হন নি। তিনি নানাপ্রসঙ্গ করতে করতে ব্রান্টনকে বললেন একসময়ে যে তার পরের বছরই বাণিজ্য গুটিয়ে ফেলবেন তিনি এবং সুধীরবাবুর কথা আরেকবার অকাট্য ফলবে। সুধীরবাবু তাঁকে বলে দিয়েছিলেন ঠিক এই বয়সে তিনি ব্যবসা থেকে সরে আসবেন।

সুধীরবাবু কে? ব্রান্টনের প্রশ্ন।

কাশীর সবচেয়ে ক্লেভার এস্ট্রলজার, নাম শোনেন নি?

ও? জ্যোতিষী? তাই বলুন—

ব্রান্টনের কাছে জ্যোতিষী মানেই হচ্ছে যে নিজে দুর্ভাগ্যের জ্যান্ত প্রতিমূর্তি অথচ অপরের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের দুঃসাহস করে।

না। আশ্বস্ত করেন ব্রান্টনের ভারতীয় বণিকবন্ধু তৎক্ষণাৎ: না। সুধীরবাবু জাস্ট একজন এস্ট্রলজার নন। He is something more. একজন দুর্ধর্ষ বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ নিয়ে পড়ে আছেন দীর্ঘকাল। এই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। তাঁকে আপনি ধাপ্পাবাজ তথাকথিত ভবিষ্যদ্বক্তাদের একজন বলে ধরে নিলেন কেন?

পল ব্রান্টন সংযত হন। তাঁর স্মরণ হয় যে সুধীরবাবুর কথা এইমাত্র যিনি বললেন তাঁর সেই ভারতীয় বণিকবন্ধু বহু ব্যাপারেই ব্রান্টনের চেয়েও পাশ্চাত্যপন্থী। অথচ লোকটি জ্যোতিষে বিশ্বাস করে। ব্যাপারটা কি,— বোঝা দরকার।

জেরা শুরু করেন ব্রান্টন: আপনি কি বলতে চান যে ওই লক্ষকোটি মাইল দূরের গ্রহরা প্রত্যেকটি মানুষের এবং পৃথিবীর যাবতীয় ঘটন-অঘটনের নিয়ন্তা?

হ্যাঁ। আমি তাই বিশ্বাস করি। কিন্তু ভদ্রলোক বলেন: আপনাকে তা বিশ্বাস করতে বলি না। তার চেয়ে চলুন না সুধীরবাবুর কাছে। আপনার সম্পর্কে তিনি কতখানি বলতে পারেন বাজিয়ে নিন না একবার। আপনার দেশই তো কথায় কথায় বলে: 'The proof of the pudding lies in the eating'।

পল ব্রান্টন পরের দিন সুধীরবাবুর কাছে যেতে স্বীকার করলেন। সুধীরবাবুকে অসংকোচে ব্রান্টন বললেন যে, জ্যোতিষে তিনি বিশ্বাস করেন না; বন্ধুর কাছে শুনে তিনি জ্যোতিষীকে যাচাই করতে এসেছেন।

তথাস্তু জানালেন মাথা নেড়ে সুধীরবাবু।

ব্রান্টন এবারে বললেন যে তাঁর অতীত আগে সুধীরবাবু বলতে পারেন কি না তারই পরীক্ষা হোক। ভবিষ্যদ্বাণী ভবিষ্যতেই হবে।

আবার তথাস্তু জ্ঞাপন করলেন ইঙ্গিতে সেই জ্যোতিষী। ব্রান্টনের জন্মতারিখ নিয়ে পড়লেন মিনিট দশেক। তারপর একটা কাগজের ওপর ছক

কেটে সাহেবকে বললেন: আপনার জন্মের সময়ে গ্রহ সন্নিবেশ হয়েছিলো মহাকাশে এই রকম। এখন শুনুন তারা কি বলছে আপনার সম্পর্কে।

আপনি পাশ্চাত্যের একজন লেখক ?

হ্যাঁ।

তারপর সুধীরবাবু সাহেবের যৌবনের এবং কৈশোরের কিছু ঘটনা বলে গেলেন দ্রুত। মোট, সাতটি বিশিষ্ট অতীত ঘটনা সাহেবের জীবনের বললেন জ্যোতিষী। পাঁচটি মোটামুটি মিললেও দু'টি একেবারেই মিললো না, সাহেবের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য:

'The honesty of the man is transparent. I am already convinced that he is incapable of deleberate deception. A 75 percent success in an initial test is startling enough to show that Hiddu astrology calls for investigation, but it also indicates that the latter is no precise, infallible science'. [A Search In Secret India. P. 209]

ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুধীরবাবুর একটি উক্তি সাহেব হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলেন সেটি সাহেবের নিজের কথায়। 'has now received ample confirmation.'। দ্বিতীয় একটি ভবিষ্যদ্বাণীর যে সময় দেওয়া হয়েছিলো সে সময়ে সেটি ঘটেনি। এবং 'The others still wait for times comment.'

তারপরও সাহেবের সন্দেহ যায় নি কিন্তু। তিনি জিজ্ঞেস করেছেন সুধীরবাবুকে যে মঙ্গল কি বৃহস্পতির কি এসে যায় আমার ভরাডুবি হলে অথবা না হলে।

সুধীরবাবু এর যা উত্তর দেন ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র তারই ওপর দাঁড়িয়ে আছে।

ভারতীয় জ্যোতিষ বলে, মঙ্গল, বৃহস্পতি, বুধ, শুক্র, শনি, রবি, চন্দ্র, রাহু, কেতু এরা আমাদের পূর্বজন্মের কর্মফলের প্রতীক মাত্র। অর্থাৎ এরা আমাদের ভরাডুবি অথবা সাফল্যের নিয়ন্ত্রক নয়। আমরাই আমাদের পূর্বজন্মের কর্মকীর্তি দিয়ে এ জন্মের সুখদুঃখের ইতিবৃত্ত রচনা করি। গ্রহরা তারই সূচীপত্র মাত্র। কর্মচক্রের ফলে অনিবার্য জন্ম-মৃত্যুর চক্রান্ত থেকে মুক্তিই ভারতবর্ষের সাধনা। এমন কেউ নেই, মুক্তপুরুষ ছাড়া যে এই পূর্বজন্মের কৃতকর্মের পাপ-পুণ্যের বোঝা নামিয়ে পথ চলতে পারে। এজন্মে যদি কেউ পূর্বজন্মকৃত পাপের শাস্তি অথবা পুণ্যকর্মের পুরস্কার না পায়, তাহলে আগামী কোনও জন্মের জন্যে তোলা আছে; কিংবা সঞ্চয় রইলো জীবনের ব্যাংকে সেই মূলধন। যদি জাহাজডুবিতে কারুর সলিলসমাধির কথা নির্দেশ করে কোনও জন্মচক্র তাহলে তা অমুক গ্রহের যোগাযোগের জন্যে বটে, কিন্তু সেই যোগাযোগ যে করায় সে হচ্ছে ডুবন্ত মানুষের পূর্ব বা পূর্বের

জন্মের কোনও অন্যায় কর্ম। গ্রহ কেবল মানুষের সেই ন্যায়-অন্যায়ের দলিল মাত্র।

সুধীরবাবুর মতে: 'The planets and their positions only act as a record of this destiny ; why they should do so I cannot say.' [Page 211]

সুধীরবাবুর বাড়িতে চোদ্দখানা ঘর পুঁথিতে ঠাসা। ব্রান্টন জিজ্ঞেস করলেন বইগুলির নানা ধরণ দেখে যে, আপনি কি দার্শনিকও ?

এর উত্তরে সুধীরবাবু ভারতীয় জ্যোতিষের মহিমা অনবদ্য ব্যক্ত করেছেন এই বলে যে, যে দার্শনিক নয়, সে হাতুড়ে জ্যোতিষী।

এই হচ্ছে ভারতের কথা। তার সব সাধনাই শব সাধনা যদি না তা শেষ পর্যন্ত অশেষের আভাস দেয়। সব বাসনা মুক্তির জন্যে শেষ পর্যন্ত তার শবাসনার পায়ে পড়া ছাড়া আর উপায় নেই। যে জ্যোতিষী জন্মচক্র দেখেই তৃপ্ত সে ব্যবসাদার। জন্মচক্রান্ত থেকে মুক্তির পথনির্দেশ যে না করতে পারে সে নয় ভগবান ভৃগু। গ্রহরা হচ্ছে ভৃত্য। ভগবান হচ্ছে প্রভু। ভৃত্যের সঙ্গে আলাপ করে যে খুশি সে ভাগ্যবান। ভগবানের সঙ্গে দেখা না হওয়া পর্যন্ত যার সুখ নেই সেই ভক্ত। ভাগ্যবান হচ্ছে, পেতে উন্মুখ। ভক্ত সেই, যে মূক। উন্মুখ যে সে পাবে ধনরত্নমুক্তা। মূক যে সে পাবে জ্ঞান-বৈরাগ্য-মুক্তি।

সত্য ভারত, শাশ্বত ভারত, মনুষ্যত্বে বিশ্বাসী ভারত মুক্তোর সাধনা করে নি ; মুক্তির সাধনা করেছে।

সুধীরবাবুকে সবিনয়ে পল ব্রান্টন বলেন: অতিরিক্ত পড়াশুনোয় আপনার চেহারা কি রকম খারাপ দেখাচ্ছে জানেন ?

আমি আজ ছ'দিন খাই নি,—সুধীরবাবু জানান।

কেন ?

আমার রান্না করে দেয় যে সে আসে নি আজ ছ'দিন—

অন্য কাউকে রাঁধবার জন্যে রাখলেই পারতেন এ ক'দিন—

তা হয় না, যে কোনও লোকের হাতে খাব কি করে ?

এ কুসংস্কার থেকে আপনার স্বাস্থ্য কি বড় কথা নয় ?

এ কুসংস্কার নয়। প্রত্যেকটি মানুষের মনের প্রভাব তার কাজের ওপর পড়ে। নোংরা চরিত্রের মানুষের মনের প্রভাব তার অজান্তে তার রান্না খাবারের ওপর পড়বে ; আমার ক্ষতি হবে।

পল ব্রান্টনের কাছে এ তত্ত্ব অবিশ্বাস্য। তিনি অন্য প্রশ্ন তোলেন এবার: আপনি কতদিন জ্যোতিষচর্চা করছেন ?

উনিশ বছর। বিয়ের আটদিন পর আমার স্ত্রী আমার গাড়ি চালাত যে তার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সে আমাকে বলেছিলো, আমার সঙ্গে মানুষের ছদ্মবেশে বইয়ের বিয়ে হয়েছে। প্রথমে দারুণ দুঃখে অভিভূত হয়েছিলাম।

সেই সময়েই জ্যোতিষ ও দর্শনচচার অতলে ডুব দিই এবং আমার জীবনের পবিত্রতম জ্ঞানচর্চা শুরু হয় যে পুঁথির মধ্যে দিয়ে, তার নাম ব্রহ্মচিন্তা। বহু হাজার পাতা ধরে লেখা এই বইয়ের রচয়িতা ভগবান ভৃগু। মূল বিষয় হচ্ছে, দর্শন, জ্যোতিষ, যোগ, মৃত্যুর পর জীবন এবং অন্যান্য গুরুতর আরও বক্তব্যাদি; তিব্বতে এই পুঁথি ছিলো। সেখানে খুব নির্বাচিত ক'জনই এ বই পড়তে পেয়েছেন। হাজার হাজার বছর আগে রচিত এই বইতে একটি যোগ শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এ যোগ ভারতে যতরকম যোগচর্চা আছে তার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা। এ পর্যন্ত বলবার পর সুধীরবাবু জিজ্ঞেস করেন ব্রান্টনকে: আপনি যোগ ত' জানেন?

কি করে বুঝলেন?

আপনার জন্মচক্র দেখে। য়ুরোপীয়ানের পক্ষে ত' বটেই খুব কম ভারতীয়রও পক্ষে এমন জন্মচক্র সুলভ নয়। এ জন্মচক্র বলছে আপনি যোগসাধনায় বহু সাধুর সাহায্য পাবেন। অন্যান্য অপ্রাকৃতিক রহস্যাতুরও হবে আপনার মন।

একটু থেমে আবার জ্যোতিষাচার্য বলেন: দু'ধরনের যোগী আছেন। একদল তাঁদের জ্ঞান কাউকে দেন না। আরেকদল নিজের সাধনার ফল অন্যকে দিতে দ্বিধা করেন না। আপনি জানবার জন্য উন্মুখ হয়েছেন। আমি আপনাকে ব্রহ্মচিন্তার বক্তব্য বলব। এ চিন্তায় যে যোগের কথা বলা হয়েছে তা শেখবার জন্যে গুরুর দরকার হয় না। আপনার অন্তর্নিহিত শক্তিই আপনাকে পথ দেখাবে।

ব্রহ্মচিন্তার যোগ কেবল ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। এ যোগে অন্য কোনও গুরুর দরকার হয় না। মানুষের ভেতর যে আরেক মানুষ আছে, রূপের মধ্যে রয়েছে যে আরেক অপরূপ, দেহের মধ্যে যে দেহাতীতর সন্দেহাতীত বাস, তিনিই তমো থেকে মহত্তমে নিয়ে চলেন। দিনে দিনে ঘোমটা খুলে দেন মানস সরোবরের কূলে কূলে বাসনার তরীকে সোনার তরী করে দেবেন যিনি তাঁর মুখের। সম্মুখের অথবা পেছনের চিন্তা তখন ব্রহ্মচিন্তায় বিলীন হয়ে যায়। সুধীরবাবুর কথা শেষ না হতেই সাহেব প্রশ্ন করেন: তাহলে আপনি সেই অন্তরের পরমের চরম নির্দেশের বদলে, জ্যোতিষের আজ্ঞা শিরোধার্য করেন কেন?

সধীরবাবুর অবিচলিত কণ্ঠ বলে গেল অনায়াসে: আমার নিজের জন্মচক্র আমি অনেক দিন ছিঁড়ে ফেলেছি। আত্মার আলোকিত পথনির্দেশ আমি পেয়েছি। যাদের এখনও অন্ধকার দূর হয় নি জ্যোতিষ তাদেরই জন্যে। ঈশ্বরে পায়ে আমি নিজেকে নিবেদন করেছি তেমনই পূর্ণ করে, ফুল যেমন করে নিজের সুবাস সম্পূর্ণ নিবেদন করে দেয় পথিক হাওয়ার হাতে। ভবিষ্যতের অথবা অতীতের ভাবনা আমার চলে গেছে। ঈশ্বর যা দেন তাই আমার শুধু

প্রাপ্য। আমার শরীর, আমার মন, আমার কাজ, আমার বোধ, আমার সত্তা আমি বিলিয়ে দিয়েছি সর্বশক্তিমানের উদ্দেশে।

পল ব্রান্টন তখনও জেরা করেন। যদি কেউ মারতে উদ্যত হয় আপনাকে এই মুহূর্তে,—ভয় পাবেন না।

না। প্রার্থনা করব। প্রত্যেকবার সম্পদে-বিপদে প্রার্থনার উত্তরে তাঁর সাড়া আমি পেয়েছি। একদিন আপনিও পাবেন—

একথা এত জোর দিয়ে আপনি কি করে বলছেন?

আপনার জন্মচক্রই সে কথা বলছে এবং সে কখনও মিথ্যে বলে না। আজকে যা বিশ্বাস করতে আপনার মন চাইছে না একদিন তাই হবে আপনার একমাত্র সম্বল, আপনার নিশ্বাস-প্রশ্বাস; একদিন তাঁকে আঁকড়েই আপনি চলতে পারবেন, নাহলে এক পা-ও এগুতে পারবেন না এবং আবার বলছি ব্রহ্মচিন্তার রহস্য আমি আপনাকে পরিজ্ঞাত করাতে পারি—

—আমি প্রস্তুত,—পল ব্রান্টন প্রত্যুত্তর করেন।

দিনের পর দিন গুরু-শিষ্যের মতো নয় দুই সহমর্মীর মতো সুধীরবাবু এবং ব্রান্টন বসেন তিব্বতী যোগক্রিয়ার মর্মেদ্ধারে। একদিন সন্ধ্যায় ব্রান্টন জিজ্ঞেস করেন; এই ব্রহ্মচিন্তার চরম তত্ত্ব কি? কোথায় পেঁাছে দেয় এই চিন্তা?

সুধীরবাবু তার উত্তরে বলেন: এই চিন্তায় আমাদের অন্বেষণ হচ্ছে চৈতন্যযুক্ত সমাধি। এই অবস্থাতেই একমাত্র মানুষ উপলব্ধি করে সে চৈতন্য বই কিছু নয়। মানুষের মন মুহূর্তে বন্ধনমুক্ত হয়। পারিপার্শ্বিক মুছে যায়, বস্তুশূন্য হয় জগৎ, বাহ্যজগৎ শূন্য হয় মন। আত্মচৈতন্য যে কল্পনা নয়, আত্মা আছে এ অনুভূতির কি আনন্দ, কি পরমাশ্চর্য প্রশান্তি এর তা ব্যক্ত করা ব্যক্তির ক্ষমতার অনেক ঊর্ধ্বে। এইরকম একটি অভিজ্ঞতাই তাঁর অনুভূতির জন্যে প্রয়োজন। মৃত্যুহীন দীপ্ত দিব্য এক মানুষের নাগাল পায় তখন মৃত্যুভীত জড় মানুষ। এ অনুভূতি অবিস্মরণীয়; অফুরান।

সমস্ত ব্যাপারটা আত্মসম্মোহন নয়—এ সম্পর্কে কি আপনি সুনিশ্চিত?—বিদেশী সুপারস্কেপটিক মাথা তোলে তবুও। ব্রান্টনের সন্দেহের ফণা কিছুতেই মাথা সম্পূর্ণ নোয়ায় না।

হাসেন সধীরবাবু। সন্দেহের উত্তরে নিঃসন্দেহের উত্তরীয় উড্ডীন হয়: মা যখন সন্তান জন্ম দেয় তখন কি একবারের জন্যেও তার ব্যাপারটাকে অসম্ভব বলে মনে হয়? এবং সেই তীব্র আনন্দ-বেদনার কথা যখন তার মনে পড়ে তখন তার কাছে তা কি আত্মসম্মোহনের অলীক উপাখ্যান বলে একবারও মনে হতে পারে। ঠিক ওই রকমই, ব্রহ্মচিন্তার পথে, মানুষের চেতনায় রূপান্তর ঘটে যখন, তখন সেই বিপ্লবের সঙ্গে জাগতিক কোনও পরিবর্তনের কোনও তুলনাই হয় না। এই দিব্য রূপান্তরের আনন্দ-বেদনাও অলীক নয়; অনির্বচনীয়। এই

সচেতন সমাধির মধ্যে যখন প্রবেশ করে কেউ, তখন তার বাহ্য অনুভূতিশূন্য মনের সিংহাসনে এসে বসেন স্বয়ং ঈশ্বর। সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ উদ্বেল হয় সে ; আচ্ছন্ন হয় অমৃতে। পৃথিবীর সকলের প্রতি ভালোবাসায় ভরে যায় তার সত্তা। তখন কেউ তার দেহ পরীক্ষা করলে সে বলবে, লোকটি মৃত। কারণ এই সমাধির সবচেয়ে গভীরে প্রবেশ করে যখন বাহ্য চিন্তাশূন্য অন্তর, তখন নিশ্বাস-প্রশ্বাস তার কাজ বন্ধ করে দেয়।

তাহলে তো সাংঘাতিক কথা!—ব্রান্টন ভয় দেখান।

না। আশ্বস্ত করেন সুধীরবাবু: আমি এই সমাধি প্রাঙ্গণে যখন খুশি প্রবেশ ও প্রস্থান করি। দু' তিন ঘণ্টার জন্য ঢুকি এবং সমাধিভঙ্গের সময় আগে থেকেই ঠিক করে রাখি। এই বাইরের যে বিশ্বকে চর্মচক্ষে দেখে আপনি বিস্মিত, তাকেই নিজের মধ্যে দেখতে পেয়ে আমি বিহ্বল। তাই ব্রহ্মচিন্তা যোগের জন্যে কোনও বাইরের গুরু দরকার হয় না। আত্মাই পথ দেখায়—

আপনার কোনওদিন কোন গুরু ছিলো না?

না। ব্রহ্মচিন্তার রহস্য অবগত হবার পর থেকে কোনও গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হই নি, প্রয়োজনও বোধ করি নি। যদিও মহাত্মারা এই সমাধির সময় কেউ কেউ আমার কাছে এসেছেন। আমার অন্তরচৈতন্য তখন পূর্ণ জাগ্রত! সূক্ষ্ম জ্যোতির্ময় শরীরে তাঁরা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন। তাই আপনাকে আবার বলছি আত্মার নির্দেশ মেনে চলুন, মহাত্মা দিব্যাত্মা পুরুষরা আসবেন বিনা আহ্বানে অন্তরলোক আলোয় আলোকময় করে।

কিছুক্ষণের নীরবতা। চিন্তার মেঘে আচ্ছন্ন ব্রহ্মচিন্তজ্ঞ পুরুষ। তারপর স্তব্ধতার পাহাড় থেকে উচ্ছ্বসিত হয় আনন্দের নির্ঝরিণী। সুধীরবাবু বলেন: একবার যীশু এসেছিলেন সমাধির সময়ে—

আবার একটু থেমে সুধীরবাবু বলেন: এই সমাধিতে মানুষের মৃত্যু হয় না। তিব্বতে এমন কয়েকজন যোগী আছেন যাঁরা এই ব্রহ্ম চিন্তার যোগে পূর্ণ পুণ্যাসিদ্ধ পুরুষ। পর্বত গুহায় সমাধিমগ্ন এই মহাত্মাদের নাড়ি পাওয়া যায় না, হৃৎপিণ্ড নিস্তব্ধ হয়ে যায়, রক্তচলাচল ব্যাহত হয়। যে কেউ বলবে যে, এঁরা সম্পূর্ণ মৃত। মনে করবেন না যে এঁরা তখন নিদ্রিতাবস্থায় থাকেন। তখনও এঁরা আপনার-আমার মতোই সব কিছু সম্পর্কেই সচেতন থাকেন। আসলে তাঁরা উচ্চতর স্তরে ওঠেন যেখানে তাঁরা নিভৃত মহত্তর জীবনের অধীশ্বর হন। সীমার বাধা অতিক্রম করে অসীমলোকে উধাও হয় তাঁদের মন। সমস্ত বহির্বিশ্বকেই তাঁরা অন্তরের মধ্যে দেখতে পান। একদিন এই সমাধি ভঙ্গ হবে তাঁদের—এও ঠিক। কিন্তু সে কবে,—কে তা বলবে, তাঁদের দেহের বয়স তখন কয়েকশত শরৎ পার হয়ে যাবে নিঃসন্দেহে!

সুধীরবাবুকে সঙ্গে নিয়ে পল ব্রান্টন বেরুলেন কাশীর রাস্তায়। গঙ্গার তীরে পৌছন তাঁরা। জ্যোতিষী গঙ্গাতীরের একটি ছায়ায় বসে বলেন

ব্রান্টনকে : এই দরিদ্র ভারতকে নৈষ্কর্মে ধরেছে। একদিন কর্মের উদ্দীপনায়, নবতর উত্তেজনায় উঠে বসবে সে। আর ইয়োরোপ এখন বল্গা-ছেঁড়া অশ্বের পিঠে বাসনার মূর্তিমতী সওয়ার। এই অশ্বক্ষুরধ্বনি থেমে যাবে, বাসনার সওয়ার তার তৃপ্তিহীন তৃষার মরীচিকা থেকে পিছু ফিরবে। তৃষ্ণার শান্তি বাইরে নেই ;—যেই বুঝবে সেই জ্বলবে আলো-অন্ধকারে। ম্যারিকারও একদিন এই একই অবস্থা হবে।

ভারতের বহু সাধকের ধারা প্লাবিত করবে পাশ্চাত্যকে। নেপাল আর তিব্বতে রক্ষিত জীবন-মৃত্যুর রহস্যমোচনের সূত্র অবারিত হবে পশ্চিমের কাছে। আসল ভারতের অধ্যাত্ম-চিন্তার সঙ্গে পশ্চিমের বিজ্ঞানের মাল্যবদল হবে। পৃথিবীতে জ্বলে উঠবে স্বর্গের সঙ্গে মর্ত্যের মাল্যবদলের মিলনরাত্রে জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনির্বাণ শিখা !

ব্যক্তি মানুষের মতো প্রত্যেক জাতিরও কর্মফল আছে এবং তা এড়ানো অসম্ভব। বিপদ থেকে রক্ষা পেতে হলে ব্যক্তি মানুষের মতোই সমগ্র জাতিকেও প্রার্থনা করতে হয়। সেই প্রার্থনার উত্তরে যুগে যুগে আসেন ভগবানের দূতেরা। তাঁরা বলেন,—

'ভালোবাসো ; অন্তর থেকে বিদ্বেষ বিষ নাশো।'

ঈশ্বর তাহলে পৃথিবীতেই আছেন ?

নিশ্চয়। ফুল ফোটে মানে যিনি সুন্দর তিনি আবির্ভূত হন। নদী বয় মানে তাঁর করুণাধারা অবতরণ করে। এরা ঈশ্বরের প্রতীক। মানুষ তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রতীক। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে ভালোবাসাই,—ঈশ্বরে সবচেয়ে ভালো বাসা।

॥ কুড়ি ॥

'অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে সর্বত্রই কাশী—ইহা সত্য,' ...

—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ।

বিদ্যার যিনি অধিষ্ঠাত্রী, জ্ঞানের যিনি মূল, তিনি সরস্বতী। তিনিই সকল স্বরের ঈশ্বর তিনি সকল সৎ-এরও মূল ; তিনি সতী। তাঁর বর তিনিই স্বয়ং। তাই অন্য সকলের ক্ষেত্রে শুধু পুত্র। কিন্তু সরস্বতীর সন্তান মাত্রই বরপুত্র। সরস্বতীর বরপুত্র বিশ্বনাথের বারাণসীতে ভারতের শেষ অশেষ বিস্ময় ডক্টর গোপীনাথ পদ্মবিভূষণ উপাধিত হয়েছেন। ভাবি, ওই উপাধি তাঁর ভূষণ, না তিনিই পদ্মের ভূষণ। পদ্মর আরেক নাম শতদল। গোপীনাথ ভারতের মানসসরোবরের শ্রেষ্ঠ শতদল। তর্ক-বিতর্ক, সম্প্রদায়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোলায়িত এক শতদল এই দেশে ; তার মধ্যে এক শতদল ওই পাণ্ডিত্যের অহংকারশূন্য ভক্তির অলংকারপূর্ণ কুম্ভ।

ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের লেখা, সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গের দ্বিতীয় খণ্ড বেরিয়েছে সবে। এ অদ্বিতীয় গ্রন্থ গোপীনাথ ছাড়া দ্বিতীয় কোনও কলমে উচ্চারিত হবার কথা নয়। প্রকাশক তাঁর নিবেদনে বলেছেন, ডক্টর গোপীনাথের বুদ্ধি বেদোজ্জ্বলা। আমি বলি, ডক্টর গোপীনাথের কথা বেদনোজ্জ্বলা। পরমের জন্য চরম আকুতি ব্যতীত, শত শত সাধনার ধারা যে আধারে আনন্দাশ্রু ধারা বইয়ে দিয়েছে, সেই সারস্বত সাধনা গোপীনাথের গভীর আনন্দের সুগভীর বেদনার অপার্থিব সংগম, সাধুদর্শন ও সৎ প্রসঙ্গ রচনা অসম্ভব হতো। গোপীনাথের এই সৎ প্রসঙ্গর চেয়ে সৎ অবশ্যই গোপীনাথের সঙ্গ, গোপীনাথের চেয়ে বড় সাধুও আর ভারতবর্ষে আছেন কেউ বলে জানি না। কালীপদ গুহরায় বলতে পারেন ; আমি পারি নে।

সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ-ও মূলত কাশীর কথাই। কাশী মানেই ভারত। মহাভারতের কথা যেমন কাশীরামের, কাশীর কথাও তেমনই গোপীনাথের কাছে যে শোনে সে ভাগ্যবান !

এই গ্রন্থে, গোপীনাথ এবারে এমন একটি আশ্চর্য কাশীবাসীর কথা বলছেন যাঁর বৃত্তান্ত আমাকে আশ্বাসে আনন্দে বিহ্বল করেছে। সম্পূর্ণ বিশ্বাসের এমন বিচিত্র উজ্জ্বল চিত্র বিরল। যাঁর কথা তিনি বলেছেন সেই সর্বত্যাগী গৃহস্থের নাম, স্বর্গত শশিভূষণ সান্যাল। এই সান্যাল মহাশয়ের বাড়িতে তাঁর নিজের লোক ছাড়াও ছাত্র এবং আর্তরা থাকতেন। অবশ্য, এরকম মানুষের কাছে কে নিজের আর কে বাইরের লোক তা বলা একটু অর্বাচীনতা বটে। সে যাই হোক, সান্যাল মশায়ের সংসারযাত্রা নির্বাহ হতো কি করে, তার উত্তর দেওয়া আরও শক্ত। সাত্ত্বিক অন্তঃকরণে, গোপীনাথ বলছেন, তাঁকে যে যা দিত তাই নিয়েই কোনও রকমে গড়িয়ে চলত সংসারের চাকা। সে চাকা হঠাৎ একদিন থেমে আসার উপক্রম হলো।

একদিন এমন হল যে কোথাও থেকে কিছুই এসে জুটল না। বিল্বপত্রের রস মাত্র খেয়ে গোটা দিন কাটল সকলের। পরের দিনও তাই। তৃতীয় দিন বেলা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত অন্নপূর্ণার কাশীতে অন্ন জোটে নি সান্যালমশায় এবং তাঁর বাড়ির কারুর। ক্ষুধায় কাতর সকলে ; শুধু সুধা অকাতর বিলিয়েও অক্লান্ত সান্যালমশায় কাজ করে চলেছেন ঘড়ির কাঁটার মতো। আর্তকে চিকিৎসা, জিজ্ঞাসুকে উপদেশ,—কোথাও 'না' নেই সেই নাভুক্ত মহৎ মানুষটির।

দিবাকরদীপ্ত দ্বিপ্রহর পায়ে পায়ে গড়িয়ে এল অপরাহ্নের আলয়ে ; অপরাহ্নের নরম আলোয়। সান্যালমশায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। গোপীনাথ বলছেন, ঐ আলোচনা সভায় সম্ভবত স্বামী অভেদানন্দ উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল কালী মহারাজ। তিন দিন ধরে যে খাওয়া জোটে নি যে কারুর, সান্যালমশায়ের মুখে তার আভাস নেই কোথাও ; তার বদলে ছড়িয়ে পড়েছে দর্শনালোকের আভা। কাউকে জানানও

নি অন্নাভাবের কথা, কারণ,—'তাঁহার বিশ্বাস ছিল, যিনি জানিবার তিনি সবই জানেন, অন্যকে জানাইবার প্রয়োজন কি? দিবার মালিকও তিনি, দিতে হইলে কোনও না কোন সূত্র অবলম্বন করিয়া তিনিই দিবেন। তাহার জন্য বৃথা অভিযোগ করিবার কি আছে?'

অন্নর জন্য না কেঁদে অন্নপূর্ণার জন্যে কাঁদো। অন্ন-মনা না হয়ে হও অনন্যমনা। যিনি ক্ষুধার কারণ, তিনিই অবারণ সুধার উৎস। তিনি যদি দুঃখ দিতে চান তাহলে তাঁর হাত থেকে রেহাই আছে কার? আবার, দুঃখের সমস্ত কারণ বজায় থাকতেও যদি তিনি ইচ্ছা করেন তাহলে দুঃখ মুহূর্তে সুখ হয়ে দেখা দিতে পারে। শত দুঃখের মধ্যে তিনি কাউকে সুখে রাখেন; আবার সুখের মধ্যে সতত দুঃখে ম্রিয়মাণ রাখেন কারুর চিত্ত। দুগ্ধফেননিভ শয্যায় বিবেকদংশনে কেউ ছটফট করছে,—আর কেউ, তৃণশয্যায় শুয়ে আনন্দ-রোমাঞ্চিত হয়ে আছে অকারণেই।

সান্যালমশায়ের বেলাতেও তার ব্যতিক্রম হলো না।

একটি রেজিস্টার্ড পার্শেল এলো সান্যালমশায়ের নামে। একটু বাদে,—দেখা গেলো সান্যালমশায়ের চোখে জল। নিজের শিশুসন্তানকে মৃত্যুর পর নিজের হাতে শ্মশানে নিয়ে গিয়ে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করতে যাঁর চোখ দিয়ে জল বেরোয় নি একফোঁটা আজ তিনিও কি দুঃখে অভিভূত হলেন। ভীষ্মের চোখে জল দেখে অর্জুনের মনে প্রশ্ন জেগেছিল। আজ সান্যালমশায়কে কাঁদতে দেখে কালী মহারাজ নাকি প্রশ্ন করেন: বাবা, ব্যাপারটা কি?

সান্যালমশায় অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করলেন: শোকে অভিভূত হই নি; ঈশ্বর-করুণায় অভিভূত হয়েছি।

পত্রটি প্রেরণ করেছিলেন চৌখাম্বার বিশিষ্ট ভদ্রলোক একজন। চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁকে স্বপ্নে আদেশ দিয়েছেন যে অবিলম্বে সান্যালমশায়কে টাকা পাঠাতে। সান্যালমশায়ের সঙ্গে স্বয়ং বিশ্বনাথ উপবাসী আছেন। অন্নজল কিছুই গ্রহণ করেন নি। স্বপ্নেশ্রুত ঠিকানায় তাই তিনি ৫০০ টাকা পাঠাচ্ছেন এই অবিচল উজ্জ্বল বিশ্বাসে যে এ টাকা ঠিক ঠিকানাতেই পোঁছবে।

বিশ্বাসে যে বিশ্বনাথকে পাওয়া যায়, এটি তার উজ্জ্বল উদাহরণ।

যাঁরা বলেন, হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ভগবানের ওপর নির্ভর করলেই কি খাওয়া-দাওয়া চলবে। না। সকলের চলা একরকম নয়। কারুর চলা নিজের পায়ে; কারুর উপায়, নিজেকে নিঃশেষে নিবেদন করে দেওয়া অচলার দু'পায়ে। দ্রৌপদী যতক্ষণ নিজের হাতে কাপড়ের খুঁট চেপে ধরে আছে ততক্ষণ চুপ করে আছেন চতুর্ভুজ। যে মুহূর্তে দ্রৌপদী নিজের দু'হাত সরিয়ে নিয়ে সমর্পণ করেছেন শ্রীকৃষ্ণের হাতে, তখনই চারহাতে কাপড় যুগিয়ে চলেছেন পীতাম্বর। কিন্তু দ্রৌপদীকে যা সাজে, সকল মানুষকে তা সাজে না।

ভক্তকে যিনি পরীক্ষা করেন ভক্তকে উত্তীর্ণ করেনও তিনি। তিনিই ভগবান। তাঁর পতাকা যাঁকে দেন তিনি বহন করবার ক্ষমতাও তাঁকে দেন।

হরিশ্চন্দ্রকে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যান, কারণ হরিশ্চন্দ্র কোটিকে গোটিক।

অর্থের ব্যাপারেও যেমন পরমার্থের ব্যাপারেও তেমনই সান্যালমশায় জীবনে বারংবার অহৈতুকী কৃপার সাক্ষাৎ পেয়েছেন। প্রথম বয়সে একবার পতঞ্জলিকৃত পাণিনির মহাভাষ্য পড়বার জন্যে ব্যাকুল হয়েছিলেন তিনি। বাংলাদেশে পাণিনি-ব্যাকরণের মর্মোদ্ধারী পণ্ডিত তারানাথ বাচস্পতি ছাড়া আর বিশেষ কেউ ছিলেন না সেকালে। কলকাতার সংস্কৃত কলেজে কাশীর লোক একজন পাণিনি পড়াতেন। তাঁর কাছে গেলেন সান্যালমশায়।

শাস্ত্রীমশায় বিদ্যালয়-সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থী ছাড়া আর কারুকে পড়াবার সময় নেই বলে জানালেন তবুও সান্যালমশাই অনুরোধ করায় বিরক্ত অধ্যাপক কটু ভাষায় তাঁকে বিদায় দেন। সান্যালমশায় বাড়ি ফিরে প্রতিজ্ঞা করেন, অর্থ বা পরমার্থের জন্যে জীবনে কারুর দরজায় হাত পেতে তিনি আর কখনও দাঁড়াবেন না। অহোরাত্রের মধ্যে মনোভঙ্গ সান্যাল মশায় অন্নজল স্পর্শ করেন নি।

সেই রাত্রে পতঞ্জলি স্বয়ং সান্যালমশায়ের সামনে আবির্ভূত হয়ে বলেন :

'বৎস এত ক্ষুব্ধ হইয়াছ কেন ? জান না কি শরীরকে কষ্ট দেওয়া পাপ। তুমি সমস্ত দিন অন্নজল গ্রহণ কর নাই কেন ? কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি তোমার জ্ঞান-পিপাসা নিবৃত্ত করিতে সম্মত হয় নাই, তাই কি তোমার এই অভিমান ? তুমি কি জান না, সুকৃতিমান জিজ্ঞাসু ভক্ত একমাত্র ভগবৎ সান্নিধ্য হইতেই তাহার সকল প্রকার জ্ঞানের অভাব মোচন করিতে পারে ? আজ আমি তোমাকে ব্যাকরণ ভাষ্যের রহস্য শিক্ষা দিব। আমি গ্রন্থ রচনা করিয়াছি, আমি কি শিক্ষা দিতে জানি না ?…'। [সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ ! ২য় খণ্ড, পৃ ৬৭]

মহানপুরুষ তাঁর মহান বিশাল রচনার জটিল জটা থেকে ভাবগঙ্গাকে মুক্ত করে মেটালেন ভক্তের অভাব। তারপর অন্তর্হিত হলেন তিনি। আবির্ভাব ও তিরোভাবের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অসামান্য নয়। তাহলে এত বিপুল ব্যাখ্যা কি করে এত অল্পসময়ে সম্ভব হলো ?

সান্যালমশায় বলেছেন ব্যাপারটা মোটেই অসম্ভব নয়। তাঁর মতে, স্থূল দেহাভিমানী অহং কোন জ্ঞানকে ধারণ করিতে বেগ ও বাধা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সূক্ষ্মাভিমানী অহং তাহা অতি সহজেই গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

তারপর তাঁর গতরাত্রির ঘটনা সত্য কি না বোঝবার জন্যে তিনি ভাষ্যগ্রন্থ খুলে ধরামাত্র তার ব্যাখ্যা 'প্রাক্তন জন্মবিদ্যা'র মতো পূর্বস্মৃতিরূপে অপরূপ ফুটে উঠতে লাগল। ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে :

'আমি বাবাজীর মুখ হইতে ভগবান পতঞ্জলির ব্যাখ্যার কোন কোন অংশ শ্রবণ করিবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলাম। 'স্থানে অন্তরতম্' এবং 'স্থিরম্ প্রভৃতি সূত্রের আর্য ব্যাখ্যা এখনও আমার স্মৃতিফলকে যথাশ্রুতভাবে অঙ্কিত রহিয়াছে।'

গোপীনাথের স্মৃতিতে যা উজ্জ্বল হয়েছে তা যে বিস্মৃতির অযোগ্য একথা গোপীনাথ না হয়েও বোঝা যায় সহজেই।

সান্যালমশায়ের কথা ছিলো সোজা, স্পষ্ট, নিঃশঙ্ক। তিনি বলতেন:

'যাহাকে দেখিয়াই আমার সহানুভূতি হয়, তাহাকে আমি ভাল করিতে পারিব এইরূপ বিশ্বাস জন্মে। কিন্তু অনেক সময়ে কোন লোককে দেখিয়া একটা বিরুদ্ধ ভাবের উদয় হয়। অবশ্য বিনা কারণেই ইহা হয়। তখন বুঝিতে পারি, আমার দ্বারা ইহার কোন উপকার হইবে না। কেন যে কাহাকেও ভাল লাগে না তাহা বাহির হইতে কোন লক্ষণের দ্বারা বুঝান সহজ নহে। অনেক সময় মনের অবস্থা এমন থাকে যে, যে-লোককে অন্য সময় দেখিলে ভাল লাগিত না, তখন তাহাকে খুবই ভাল লাগে। একজনের লেখা দেখিলেই যেন কোন কারণে মনে হয়, লোকটি বড় ভাল। শক্তির খেলা অনির্বচনীয়। যাহাকে খুব ভালবাসা যায়, তাহাকেও কোন কোন সময় ভাল লাগে না। ভাল না লাগিবার লৌকিক কোন কারণই থাকে না। তবু এইরূপ হয়। সময়ের অভাবে চিত্তবৃত্তির এইরূপ পরিবর্তন ঘটে, মূলে কিন্তু একটি অচিন্ত্য শক্তির ব্যাপার রহিয়াছে। সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে চাহিলেও পারা যায় না। অবশ্য এ-কথা আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতেছি। আমি লোকের নিকট হইতে দীনতা চাই না, আমাকে কেহ খুব প্রণতি দেখাইলেই যে আমি খুব সন্তুষ্ট থাকি তাহাও নহে। আমি চাই লোকটি বেশ হাসিয়া কথা বলুক, বেশ সদানন্দ ও প্রফুল্ল থাকুক। তাহা হইলেই আমার ভাল লাগে। তবে দীনতা যে একেবারে ভালবাসি না তাহাও নহে। যে আমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে ও ভক্তি করে তাহাকে আমারও ভাল লাগে। এইরূপ কেন হয় তাহা জানি না, তবে সময় সময় মনে হয়—ভগবান তো ইহাই চান। দীনতা বা প্রপত্তি ভাল জিনিষ—ইহা না হইলে সত্যের সঙ্গে যোগ স্থাপনই হয় না।'

[সাধুদর্শন ও সৎপ্রসঙ্গ : ২য় খণ্ড : পৃঃ ৮৩—৮৪]

এই হচ্ছে আর্যশাস্ত্র প্রদীপ-কার শশিভূষণ সান্যালের প্রতিকৃতি এঁর কাছেই একবার এক ভদ্রলোকের হৃদ্‌রোগে কাতর বৃদ্ধা জননী কেঁদে পড়েন। মৃত্যুর পূর্বে কয়েকটি তীর্থস্থান দর্শনের প্রার্থনা জানিয়েই। তাঁর শরীরের ওই অবস্থাতেই সান্যালমশায় কথা দেন: বেশ, আপনাকে তীর্থদর্শন করাব। কিন্তু যে যে তীর্থস্থানে যা-যা দেখতে বলব, কেবল তাই-তাই দেখবেন। তার বেশি কিছু দেখতে গেলেই বিপদে পড়বেন।

তীর্থদর্শনে বহির্গতা বৃদ্ধা গিরনার পাহাড়ে ওঠবার ইচ্ছায় সান্যাল-

মশায়ের নির্দেশ মানলেন না। হৃৎস্পন্দন আরম্ভ হল। এমন অবস্থা হল যে না পারেন আর উঠতে, না নামতে। মৃত্যু অনিবার্য অবস্থায় সান্যালমশায়কে স্মরণ করলেন বৃদ্ধা। সান্যালমশায় কথা দিয়েছিলেন তিনি বৃদ্ধাকে কাশীতেই যাতে তাঁর মৃত্যু হয় তা দেখবেন। কিন্তু এখন মনে হল তাঁর সে সম্ভাবনাও নেই। সান্যালমশায়কে স্মরণ করতে করতেই, সেখানে একজন লোক হঠাৎ উপস্থিত হয়।

সে লোকটিকে দেখতে সান্যালমশায়েরই অনুরূপ। তিনি কোলে তুলে নেন বুড়িকে এবং সব দেখান। বুকের কাঁপুনি কমে যায় এবং বুড়ি নীচে নেমে আসেন নিরাপদে।

তারপর বৃদ্ধা তৎক্ষণাৎ কাশী আসতে চান। ডাক্তাররা বলেন, উপর তলা থেকে নীচের তলায় নামলেই বুড়ির মৃত্যু হবে। সান্যালমশায়ের কাছে অনুমতি চাইলে, তিনি লেখেন, 'যে যাহা বলুক, কোন ভয় নাই, চলিয়া আইস।' বৃদ্ধা অন্নজল স্পর্শ না করে কাশীতে এসে সান্যালমশায়ের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে নৌকাযোগে কেদারঘাটের দিকে যেতে গঙ্গাতেই বরুণা সঙ্গমে স্নানে বহির্গত সান্যাল মশায়ের দেখা পান।

সান্যাল মশায়ের কথায় এর মধ্যে রহস্য কিছু নেই। 'গুরুকে ঈশ্বরজ্ঞান করাই শাস্ত্রের উপদেশ। বৃদ্ধা তাহাই করিয়াছিলেন। আমি তো পাষাণ; কিন্তু পাষাণেও ভক্তির প্রভাবে শ্রীভগবানের অভিব্যক্তি হয়।'

যার বিশ্বাস আছে সে কলকাতায় থেকে কাশীবাসী। যার বিশ্বাস নেই, সে কাশীতে মরলেও, আসলে মরে সর্দিকাশিতে। তার মুক্তি নেই। গঙ্গায় ডুব দিলে সর্ব পাপ থেকে মুক্তি হয়। একথা সত্য। কিন্তু সে কার হয়? যার বিশ্বাস আছে তারই হয় কেবল। তার একার। যে ভক্ত বিশ্বাসে ভগবানের সঙ্গে একাকার।

॥ একুশ ॥

'এখনো গেল না আঁধার, এখনো রহিল বাধা।'

বার্ধক্যে বারাণসী লিখতে লিখতে গত কয়েকদিনের মধ্যে এমন একটি অভাবিত অভূতপূর্ব অভিজ্ঞতা অযাচিত ঘটে গেছে যার কথা না লিখে বারাণসীর পরবর্তী অধ্যায়ে পা দেওয়া অসম্ভব। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীন চব্বিশ পরগনার প্রায় সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত এক অসাধারণ মানুষের কাছ থেকে এই অমূল্য উপহার আমি পেয়েছি। হাত বাড়ালেই এমন উপহার সহসা উপস্থিত হয় না। মানবজীবনের গভীর বেদনার সুগভীর 'আনন্দের এমন আশ্চর্য ঘটন অঘটনের আস্বাদ বহু ভাগ্যে মেলে। এ অভিজ্ঞতা অলৌকিক;

কিন্তু অলীক নয়। এটি এমন একটি ঘটনা যা যে কোনও মানুষের জীবনের মোড় দিতে পারে ঘুরিয়ে। যাঁরা যুক্তি আর তর্কের রাস্তায় অতি প্রাকৃতকে অস্বীকার করেন তাঁদের চোখ খুলে দেবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম আমি জানি। কিন্তু সেই সঙ্গে এও জানি যে বইয়ের পাতা ওল্টাতে-ওল্টাতে চোখের পাতা খোলবার সময় পান নি তাঁরা। পেলে তাঁরাও কেউ কেউ কখনও কখনও এমন পরমাশ্চর্য পবিত্র পূর্ণিমার মুখোমুখি হতে পারেন হঠাৎ, হোরেসিও যার নাগাল পায়নি দর্শনের সুদূরতম কল্পনাতেও। সে অভিজ্ঞতার জন্যে কাশী যাবার দরকার হয় না ['অবশ্য জ্ঞানীর পক্ষে সর্বত্রই কাশী—ইহা সত্য।' ডক্টর গোপীনাথ]। কলকাতায় অবিশ্বাসের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে নিতেও, কখনও কখনও তার দেখা মেলে, চোখের পাতায় পড়া যায় তার বাণী, দর্শনের পাতায় মেলে না যার দিশা।

যে ভদ্রলোকের কথা বলতে বসেছি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের ব্রিলিয়ান্ট ছাত্রদের তিনি একজন। জলপাইগুড়িতে অধ্যাপনা করেছেন আই-পি-এস হবার আগে। তাঁর বাবাও প্রথম শ্রেণীর কৃতিছাত্র: এখন অবসর জীবন যাপন করছেন। পুলিশ অফিসার হিসেবেও কর্মদক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর নাম বললে চিনবে না এমন লোক কলকাতায় কম। তবুও তাঁর নাম আমি এখানে দিলাম না; তার কারণ, আমি তাঁর নামপ্রকাশের অনুমতি নিই নি।

এই ভদ্রলোকের দশ বছরের একটি প্রিয়দর্শন পুত্রের মৃত্যু হয়; কয়েক বছর আগে পাগলা কুকুরের কামড়ে। হাওড়ায় ছিলেন তখন ভদ্রলোক। চিকিৎসা-বিভ্রাটই তাঁর ছেলের মৃত্যুর আরও একটি গুরুতর কারণ। ছেলেটি এত আশ্চর্য অসাধারণ ছিল যে, যে তার দিকে তাকাত, বিশেষ করে তার একজোড়া আশ্চর্যতর চোখের দিকে, সেই-ই চোখ ফেরাতে পারত না। সে চোখের অমর আলোকে কি বাণী গোপন ছিল কে জানে। মরলোকের দশটি বছর সে উজ্জ্বল করে দিয়েছিল অমরলোকের আলোকে; সুধায় ভরে দিয়েছিল,—বসুধায় সকলকে।

বালক বীরের বেশে বিশ্বজয় করতে এসেছিলো যে, তার নাম ছিল ভাস্কর। গোপাল বলেও তাকে ডাকতেন বাড়ির লোকে। ছেলেটির মৃত্যুতে দুর্বহ বেদনায় বিস্ফারিত পিতৃহৃদয় শুখিয়ে যাওয়া জীবনে করুণাধারার সন্ধানে খ্যাপার মত খুঁজে ফিরছিলেন পরশপাথর। মৃতপুত্রের অমৃত সত্তার সঙ্গে কোনও অলৌকিক উপায়ে যোগাযোগ করা যায় কি না এই কাতর প্রশ্ন বুকে বয়ে বয়ে হাতড়ে ফিরছিলেন সেই বন্ধদরজা। ব্যাকুল করাঘাতে একসময়ে খুলে গেল সেই দরজা। একজন লোক কথা দিলেন, তিনি ক্রিয়া করে এনে দেবেন মৃত-পুত্রের সূক্ষ্মাত্মাকে।

ক্রিয়ায় বসে, পরলোকবিদ বললেন: আপনার ছেলে এসেছে,—

ছেলেটির বাবা, নাম জিজ্ঞেস করলেন তাঁর মৃতপুত্রের। অদৃশ্য হস্তে লেখা হল : ভাস্কর। রোমাঞ্চিত হলেন তিনি। তারপর অন্যের সাহায্য না নিয়ে নিজেই বসলেন ক্রিয়ায়। সাড়া পাওয়া গেল ভাস্করের। না। সাড়ার চেয়ে বেশি পাওয়া গেল কিছু। মৃতপুত্র জীবিত পিতাকে বিচলিত বিহ্বল করে বলল : আমি আবার আসব তোমার সন্তান হয়ে। 'I will come as a son.'—ইংরেজিতে জানিয়েছিল লামার্টিনেয়ার-এর ছাত্র ভাস্কর চক্রবর্তী।

আরেকদিন ক্রিয়ায় বসে ভাস্করের পিতা আরও স্পষ্টতর আভাস পেলেন। প্রশ্ন করলেন আশান্বিতহৃদয় পিতা : তুমি কবে আসবে বাবা আবার?

১৯৬২ সালে।

কত তারিখ?

২২শে ডিসেম্বর—

কি বার?

শনিবার—

যে ঘরে বসে ছেলেটির বাবা মৃতপুত্রকে আহ্বান করছিলেন সে ঘরে কোনও ক্যালেন্ডার ছিল না। ভদ্রলোক পাশের ঘরে গিয়ে ক্যালেন্ডারের পাতা উল্টে বার করেন, '৬২-র ডিসেম্বর মাস ২২শ তারিখের মাথায় সেখানে জ্বলজ্বল করছে : শনিবার। তখনও পর্যন্ত তাঁর স্ত্রীর কোনও সন্তান সম্ভাবনা দেখা দেয় নি। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই আমাকে বলেছেন যদি মৃতপুত্রের এই ভবিষ্যদ্বাণীর আগেই তাঁদের সন্তান সম্ভাবনা থাকত তাহলেও তাঁরা ভাবতে পারতেন এ সবই অবচেতন মনের খেলা। অর্থাৎ যেহেতু মনে মনে প্রিয়পুত্রের মৃত্যুর পর নবজাতক সম্ভাবনায় বাপ-মা মনে করতেই পারেন যে, সেই মৃতপুত্রই আবার তাঁদের ঘরে আসছে, সেইহেতু এই পারলৌকিক বার্তা অলীক অলৌকিক বলে উড়িয়ে দিতে তাঁদের আটকাত না। কিন্তু মৃতপুত্র ভাস্কর অথবা গোপাল জীবনমৃত্যুর ওপার থেকে যখন দীপ্ত সুনিশ্চিত উজ্জ্বল প্রত্যয়ে জানিয়েছে যে, সে আসছে ১৯৬২-র ২২শে ডিসেম্বর, শনিবার, তখন ত' তাঁর স্ত্রীর সন্তান সম্ভাবনাই দেখা দেয় নি। তবে?

'৬২-র এপ্রিল মাসে সে সম্ভাবনা প্রথম সোচ্চার হল। ডাক্তার নবজাতকাবির্ভাবের সম্ভাব্য তারিখ ঘোষণা করলেন, ১৮-১৯ কিংবা ২৫-২৬ ডিসেম্বর। বিশ্লেষণ অতীত বিস্ময়ের শতদল সবে চোখ মেলছে তখন। একবার মনে হচ্ছে ভাস্করের বা গোপালের লেখা মিলবে; আরেকবার মনে হচ্ছে, সবটাই মনের ভুল। অসহ্য মন্থর মুহূর্তের মিছিল যেন দীপ্ত দ্বিপ্রহরে শ্লথ পদ ভারন্যুব্জ গোশকটের মত। সমস্ত দিনের দুঃখ-ধন্দার রিক্তপ্রান্তে কখন পৌঁছবে লক্ষ্য তারই চিন্তায় চালকের মত ছটফট করছেন ভাস্করের পিতা। শ্লথ কিন্তু সুনিশ্চিত পায়ে পায়ে এগিয়ে এসে ভবিষ্যদ্বাণী প্রথম হোঁচট খেল ৮ই ডিসেম্বর।

যন্ত্রণায় অস্থির হলেন ভদ্রলোকের স্ত্রী। মহিলা ডাক্তার দেখে বলল : রক্তক্ষরণ হচ্ছে ভেতরে, বাচ্চার হার্টবিট পাওয়া যাচ্ছে না। সিজারিয়ান অপারেশান করে বাচ্চাকে বার করতে হবে এখুনি। মন খারাপ হয়ে গেল বাপের নিমেষে। দুর্যোগের কালো মেঘে ঢেকে গেল উজ্জ্বল সম্ভাবনার সোনালি তারা। কিন্তু তখন আর মন খারাপ করার মতও অবস্থা ছিল না মনের। নার্সিংহোমে নিয়ে যেতে জিনোকোলজিস্ট বললেন : না। হার্ট কোনদিকে বাচ্চার তাই ধরতে পারেন নি মহিলা ডাক্তার। কিছুই হয় নি। কোনও ভয় নেই, সন্তান অথবা জননীর।

মেঘ ফেটে আবার বেরিয়ে পড়ল অনন্ত আশার তিমিরবিদার চন্দ্রালোক। ভাস্করের কথাই ঠিক হবে। '৬২-র ২২শে ডিসেম্বর সে-ই ফিরবে তার 'মা'-টির ঘরে। স্বর্গ থেকে বিদায় নেবে সে। মনে পড়বে তার, মায়ের করুণ মুখ। সে মুখ আবার নবারুণ উজ্জ্বল করবে সে; মায়ের বুক উচ্ছল করবে ভালোবাসার আলো-আশার কাঁদা-হাসার অমৃতে আবার! বাপের বসুধায় ভরে দেবে নবতর উদ্দীপনার অফুরন্ত সুধায় সে-ই। এসেই যে বলবে, মা, এই যে আমি তোমার গোপাল।

আমি যখন সেই ভদ্রলোকের কাছে গিয়েছিলাম তখন ভরা দুপুর। দক্ষিণ কলকাতার অতিব্যস্ত সরকারী বিচিত্র ধরনের বহু কর্মস্থলের সংগমক্ষেত্র তখন গমগম করছে নানা পায়ের আসা-যাওয়া আওয়াজে; নানান কণ্ঠের কাকলীতে। কিন্তু ভদ্রলোকের মুখ থেকে তখন জীবিকার মুখোশ খুলে পড়ে গেছে। ক্ষণকালের পুলিশ অফিসার তখন চিরকালের পিতা। কান্নায় ভেজা তাঁর গলা। পুত্রের মৃত্যুর গভীর বেদনা এবং নবজাতকের বেশে তার প্রত্যাবর্তনের প্রত্যয়ের সুগভীর আনন্দ সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ পুলিশ অফিসারকে নয়, অখণ্ডসত্তা পিতৃহৃদয়কে দুঃখসুখের এপারে-ওপারে দোলা দিচ্ছে বারে বারে। কাশীর অন্ধকার শিবতলে কাশীর দিদিমার কাছে অর্ধকালীর উপাখ্যান শুনতে শুনতে যেমন মনে হয়েছিল এ রূপকথা নয়, এ কোন্ অপরূপ কথা শুনছি,—আজও পুলিশ অফিসের রূঢ় বাস্তব পরিবেশে একটি বিস্ফারিত বিস্ময়ের মুখোমুখি বসে আমার মনে হল জন্ম ও মৃত্যু এই দুই-ই কেবল সত্য নয়; জন্মান্তরও সত্য। নবনব জীবনের চারণক্ষেত্রে মৃত্যু-রাখাল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, আব্রহ্মস্তম্ব রব উঠছে তাই অনন্তকাল ধরে, চরৈবেতি, চরৈবেতি... চলো, চলো, এগিয়ে চল।

ক্ষণকালের এই খেলাঘরে বাপ-মা ভাই-বোন এরাই আমাদের চিরকালের ধন। এদের নতুন করে পাব বলেই বুঝি হারাই ক্ষণেক্ষণ। এই মরলোকে যেসব বাসনা-কামনা জড়িয়ে থাকে জাতকের কর্মে, মর্মে; তার স্বপ্নে, রক্তে, মজ্জায় মিশে থাকে যে অচরিতার্থ আনন্দ-বেদনা, মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তার ওপর যবনিকা পড়ে না। তারা আবার আসে, মর্ত্যধূলির ঘাসে ঘাসে পা ফেলে

ফেলে, তারা জানার মাঝে অজানাকে সন্ধানের নেশায় মাতাল হয় বারে বারে। স্বর্গের সুধার চেয়ে 'মা'-টির বসুধার টানে অনেক বেশি। তাই ফিরে আসে তারা। পাপে-পুণ্যে পতনে-উত্থানে, মানুষ অকূল অন্ধকার থেকে অতল আলোর অভিসারে চলেছে নিত্যকাল। আলো হাতে তারা আঁধারের যাত্রী। জীবনের ধন মৃত্যুতেও যাবে না ফেলা। কারণ পুণ্যের, কারণ পূর্ণের পদপরশ তারও 'পরে। তমো থেকে মহত্তমে মানুষের যাত্রা থেমে যাবার নয় কোনওকালে। নটরাজের নৃত্যের তালে তালে সাঁঝসকালে মহাকালের মন্দিরা বাজছে ডাইনে-বাঁয়ে দুই হাতে। সুখে দুঃখে আনন্দে-শঙ্কাতে জন্ম-মৃত্যুর উত্থান-পতনে মুহূর্তের তালভঙ্গের উপায় নেই। সবাইকে আসতে হবে বারবার, যতক্ষণ না জন্মমৃত্যুর চক্র ভেদ করে কেউ পৌঁছুচ্ছে সে-ই স্তরে যেখানে এসেই সে জানছে, সে-ই সব। তারই চেতনার রঙে যে পান্না সবুজ এ উপলব্ধি যতক্ষণ চোখের পাতায় দর্শন না দিচ্ছে ততক্ষণ সব দর্শন সব সন্দর্শন মিথ্যা! সংস্কারের শেকলে বাঁধা সবাই। তাকে ছিন্ন করাই মানব-জীবনের লক্ষ্য। লক্ষে একজন তা পারে। বাকী সবাই ঘুরে মরে গোলকধাঁধায়। তারপর একদিন সবার অলক্ষ্যে লক্ষ্যভেদ করে সেও। সব রত্নাকরই শেষ পর্যন্ত রামায়ণকার হয়। এরই নাম লীলা। ইহলীলা সেই লীলারই স্থূলরূপ মাত্র। এই দেহেই নিঃসন্দেহে তাঁর বাসা। মানবদেহর চেয়ে ভালো বাসা ভগবানের আর দ্বিতীয় নেই। এ জ্ঞান হওয়া মাত্র, এ গান দেহের বীণায় বাজামাত্রই বিনা তর্কশাস্ত্র, জ্ঞান বিদ্যা, বুদ্ধি, পাণ্ডিত্যেই—যিনি রাজার রাজা তিনি হাজির। মানবদেহর চেয়ে বড় মন্দির নেই। দেহাতীত যিনি, নিঃসংশয়, নিরুপম, নিরাকার যিনি সন্দেহাতীত, তিনি এই দেহেই আছেন। এই দেহ ধরেই তিনি নিজেকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। যতক্ষণ না পাওয়া ততক্ষণ চাওয়া নিজেকেই। জন্মে জন্মে স্তরে স্তরে মানসসরোবরের ঘোমটা তুলে তুলে নিজেকেই নিজে দেখবার চেষ্টা। যতক্ষণ এক স্তরের সব বাসনা-কামনা না নিঃশেষে মেটা ততক্ষণ সেই স্তরেই ঘুরে মরা। এই হচ্ছে একই ঘরে মৃতপুত্রের অমৃত আবির্ভাবের ব্যাখ্যা!

পুলিশের মস্ত বড় সেই অফিসার তাঁর সন্তানমৃত্যুর কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন তিনি হতভাগ্য। আর আমার মনে হয়েছে এত সৌভাগ্য আর কার। দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামে, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামে, একথা যে নিছক কবিতা নয়, জীবনসত্য এ তো তাঁর অজানা থাকত যদি না ঘটত প্রিয়মৃত্যুর অঘটন। দর্শনের ছাত্র, দর্শনের অধ্যাপক পুঁথির পাতায় কি পেতেন তার উত্তর, পুলিশ ফাইলের পাতায় চোখ নষ্ট করে কেটে যেত কাল, চোখের পাতায় এ সত্য প্রতিভাত হত কি, যে জন্ম-জন্মান্তর আছে। জাতিস্মর কথাটা অলীক নয়, অলৌকিক হলেও!

বনে গুহায় আশ্রমে সাধুর আস্তানায় ঘুরে কত মানুষ একটা প্রমাণ পায় না জন্মান্তর-তত্ত্বের। আর ঘরে বসে একজন নিজের ছেলের মৃত্যুতে জেনে

যায় প্রত্যেক ছেলে অমৃতের পুত্র। সেই একজনও যখন বলেন; তিনি ভাগ্যনিহত, তখন আমার মনে প্রশ্ন জাগে, যে কোন্ মুহূর্তে মানুষ পরশপাথর পেয়ে গেছে কোনও কোনও মানুষ তা জানে না। প্রথম জীবন কাটে পরশ-পাথরের অন্বেষণে; তারপর পরশপাথরের স্পর্শে বাসনা যখন সোনা হয়ে যায়, তার অনেক পরে যখন তা খেয়াল হয়, তখন বাকী জীবন কাটে সেই সোনার মুহূর্তটির ব্যর্থ সন্ধানে। এই হচ্ছে তাঁর খেলা, ধরা দিয়েও যিনি ধরা দেবেন না কিছুতেই।

২১শে ডিসেম্বর সকালে পুলিশ অফিসার তাঁর স্ত্রীকে বলেন যে, এবার শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুসদনে যাবার জন্যে তাঁকে তৈরি হতে হয়। কিন্তু তখনও পর্যন্ত প্রসববেদনারম্ভের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনা পর্যন্ত অনুপস্থিত। তাঁর স্ত্রী বলেন, কোথায় যাব এখন। ভদ্রলোকের এক আত্মীয় পরামর্শ দেন, আজই সন্ধ্যায় সন্তানসম্ভবাকে হাসপাতালে রেখে আসতে। যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ না হয় তাহলে বড় জোর দু'চারদিন দেরি হবে। কিছু বেশি অর্থদণ্ড লাগবে। কিন্তু মৃতপুত্রের ভবিষ্যদ্বাণী যখন এখনও মিথ্যে হয় নি, তখন শেষটুকুও তার কথা মতো ২২শে ডিসেম্বরের জন্য তৈরি হওয়াই মঙ্গল।

হাসপাতালে সবাই হাসে। বলে, নিয়ে যান; এখন দু'তিনদিনের মধ্যে কোনও কিছুর সম্ভাবনা নেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুলিশ অফিসার স্ত্রীকে শ্রীরামকৃষ্ণ শিশুসদনে রেখে আসেন ২১শে ডিসেম্বর। রাত তিনটের পর ব্যথা ওঠে। ২২শে ডিসেম্বর, সকাল ৯টা বেজে কত মিনিট আমার মনে নেই, সন্তান ভূমিষ্ঠ হল মাতৃগর্ভ থেকে।

ভাস্কর তার সব কথা রাখলেও, একটি কথা রাখতে পারে নি। কি সেই কথা?

॥ বাইশ ॥

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের মস্ত বড় সেই অফিসারের মৃতপুত্র ভাস্কর বলেছিল ইহলোকের সীমানার ওপার থেকে অসীম কালের কণ্ঠস্বরে যে, সে আসবে ২২শে ডিসেম্বর, '৬২, শনিবার, 'ছেলে' হয়ে। ১৯৪৩-র ২২শে ডিসেম্বর, শনিবার সকাল ৯টা ১৭ মিনিটে যে এল শুকিয়ে যাওয়া সংসারের রৌদ্ররুক্ষতায় মৃত্যু জাহ্নবীর জটামুক্ত যে করুণাধারা, সে সন্তান এল 'মেয়ে' হয়ে। এই রহস্য। এই জিজ্ঞাসা আকুল করেছে পিতৃহৃদয়কে। সব মিলে এই শেষটুকু কেন মিলল না। জাতিস্মরের যত গল্প, জন্মমৃত্যুর যত তত্ত্ব তারা প্রায় সবাই বলে যে মৃতপুত্র পুত্র হয়েই জন্মায়: মৃতকন্যা পুনরাবির্ভূত হয় কন্যারূপেই। একটি ব্যতিক্রমের কথাই পুলিশ অফিসার এখনও পর্যন্ত পুঁথিতে পেয়েছেন। ভাস্কর

কি ব্যতিক্রম ; না, সে ভুল করেছে ? একজন অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিময়ী নারী বলেছেন তাঁকে যে এ কন্যা ভাস্কর নয়, তবে এ ও অসাধারণ কন্যা হবে এবং ভাস্করও আবার আসবে তার বাপ-মায়ের কাছেই। আসবে, 'ছেলে' হয়েই।

যত শুনেছি ভদ্রলোকের কথা তত মনে মনে বলেছি ফেলে দাও পুঁথি ; দূরে যাও অধ্যাত্মশক্তিতে শক্তিময়ী নারী। কে জানতে চায় কি এর ব্যাখ্যা ! মৃত্যুতে জীবনের শেষ নয়, এই অশেষ বিশ্বাসের একমুঠো উজ্জ্বল আলো যদি এসে থাকে অমরলোক থেকে এই মরলোকে তবে আঁকড়ে ধর তাকে, তবে বল—

'তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে যতদূর আমি ধাই,
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

বিদ্যা আর বুদ্ধির বড়াই আজ আর করিনে। ওসব ছেলেমানুষি ছেড়ে গেছে অনেক কাল। চলে যাবার আগে, জ্বলে যাবার আগে চিতায়, ব'লে যেতে দাও আমাকে, জ্ঞানের ওপারে যে দাঁড়িয়ে আছে তাকে বিজ্ঞানের ঠুলি পরে দেখতে যেও না। অন্ধ বিশ্বাসে আঁকড়ে ধর তাকে। লোভে অন্ধ হয়েছি, বিদ্যায় হয়েছি মূঢ়, সঙ্গতের রূপের বিদ্রূপে সং সেজেছি সারাজীবন, রাগে অন্ধ হয়েছি কতবার, অনুরাগে অন্ধ কর আমাকে একবার। তুমি বিদ্যা দিয়েছ, তুমি বুদ্ধি দিয়েছ, এজন্যে তোমার আরাধনা করি না ; তোমাকে না মানলে তুমি লখিন্দরকে ছোপলাবে সাপ হয়ে, এই ভয়ে নয়, —তুমি 'তুমি' বলেই তোমাকে চাই। হও তুমি সুখ, হও তুমি দুঃখ সাফল্যরূপে এসো, এসো ব্যর্থতায় অপরূপ হয়ে, পাপ হয়ে এসো, পুণ্য হয়ে নষ্ট কর পাপকে, যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু, মহামারী, বিপ্লবের বেশে এসো, ক্রুশবিদ্ধ অসীম করুণার পারে বরফ হয়ে গলবে বলে হৃদয়হীনতার হে পাষাণ তুমি, দেখতে দাও তোমাকে, আর রেখো না আঁধারে।

মৃত্যুদীপদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময়ী শিখা জ্বলছে অনির্বাণ সেই আলোয় দেখতে দাও তোমাকে। ভাস্কর হয়ে আসবে বলে, শেষ মুহূর্তে কেন আস তুমি ভাস্বতী হয়ে, [পুলিশ অফিসার তাঁর মেয়ের নাম রেখেছেন ভাস্বতী] তা বুঝতে চাই না। তা নিয়ে তুলতে চাই না কোনও প্রশ্ন। শুধু বুকে বাজুক এই আনন্দ-বেদনার বীণা, যে তুমিই এসেছিলে ভাস্কর হয়ে ; তুমিই ভাস্বতী হয়ে এসেছ আবার। তরুণ বালক-বিস্ময়ের বেশে এসে কেঁদে হেসে চলে গেছ তুমি। ভাসিয়ে দিয়ে গেছ চোখের জলে ; শূন্য করে দিয়ে মায়ের বুক, আবার এসেছ তুমি নূতন রূপে হে অপরূপ। তুমি জন্ম, তুমি মৃত্যু, তুমিই আনন্দ, তুমিই বেদ, তুমিই বেদনা, তুমিই বুঝতে দাও, আবার তুমিই বুঝতে দাও না, কে তুমি ? আমার প্রার্থনা কেবল এই :

'আর রেখো না আঁধারে, আমায় দেখতে দাও।'

যে মেয়ে হয়ে এল পুলিশ অফিসারের নিরানন্দ গৃহে আনন্দের বান ডাকিয়ে তার সঙ্গে মৃতপুত্রের মিল মুহূর্তে মুহূর্তে, নিজের বিকাশের দল মেলে মেলে বিস্ময়ের পূর্ণ শতদল হয়ে দেখা দিল দিনে দিনে। ভাস্কর নামের সঙ্গে নাম

মিলিয়ে নাম রাখা হল মেয়ের ভাস্বতী। কিন্তু কেবল নামের মিল নয়। ভাস্বতী যে ভাস্করই প্রত্যাবৃত, সন্দেহ রইল না তাতে। কথা বলতে শুরু করার পরই মেয়েকে জিজ্ঞেস করে যদি কেউ ভাস্করের ডাকনাম গোপাল, ভাস্বতীর মনে পড়ে কি না তাই পরীক্ষা করতে, গোপাল কই ? সঙ্গে সঙ্গে নিজের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে ভাস্বতী · এই যে! গোপালের ছবি কোথায় ? প্রশ্ন করার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের যেখানে মৃত গোপালের ছবি, সেখানে অঙ্গুলি সংকেত করে একটুকুন মেয়ে : ওই যে !

কবির কথাই ঠিক। কে বলেছে তুমি কেবল ছবি ? এই গ্রহ, তারা, রবি, এদেরই মতো সত্য তুমি। তুমি থেমে গেছ, কে বলেছে ? তুমিও চলেছ 'আলো হাতে আঁধারের যাত্রী'! শুধু অপরূপের বেশে নয়, রূপ ধরে এসেছ তুমি, তোমার সেই ফেলে যাওয়া খেলাঘরের ধুলোয় পড়ে থাকা বাঁশী আবার বাজাবার জন্যে। সেবার যদি বাঁশী বাজিয়েছিলে পূরবীর সুরে, আসন্ন বিদায়ের বেদনায় বিষণ্ণ সেই আকাশ এবার ভৈরবীতে ভরে দাও। আলোর আনন্দে উদ্ভাসিত হও তুমি। এই মাটির 'মা'-টিকে জড়িয়ে ধর তোমার কচি হাতের মুঠো দিয়ে যে মুঠোয় গোপন আছে বসুধার সবটুকু সুধার সঞ্জীবনী।

সবে কথা বলতে শুরু করেছে তখন ভাস্বতী। একা একা ফুল দেখে স্বগতোক্তি করছে : লাল কি সুন্দর ! রং-র সঙ্গে সুন্দরের এই চেতনাই তো বিশ্বচৈতন্য। এই ত' বলে :

'আমার চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ।'

ওইটুকু মেয়ের মুখে, 'কি সুন্দর,' শুনে. আমরা অবাক হই। কারণ ও বয়সে ও কথা বলার নয়। বলি কারণ, আমরা আমাদের কাল দিয়ে মহাকালের মাপ করি। ফিতে দিয়ে হিমালয়ের করি পরিমাপ। তাই হিমালয় আমাদের কাছে ২৯ হাজার ২ ফিট উচ্চতার প্রতীকমাত্র। আর চোখ খুলে গেছে যার সে বলছে হিমালয়ের দিকে তাকিয়ে :

'পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ।'

আমাদের কালের বয়স আছে। মহাকালের কোনও বয়স নেই। আমরাই বলি, ভূত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ। মহাকালে,—এ সব কিছুই নেই। ইটার্ন্যাল প্রেসেন্ট। যে ভাস্কর ছিলো সে-ই ভাস্বতী হয়ে এসেছে, - একথা কালের। মহাকালের কথা হচ্ছে ভাস্করই ভাস্বতী হয়ে আছে। ভাস্বতী অথবা ভাস্কর, এই খণ্ড খণ্ড করা অখণ্ড চৈতন্যকে, এ আমরা কে। সেকথা আমরা ভুলেছি বলেই, এই ভুল ফুল হয়ে ফুটবে একদিন যেদিন আমরা অনায়াসে দেখতে পাব :

'ফুরায় না তো ফুরাবার এই ভান।'

স্কুলে যাবার সময় ভাস্কর প্রণাম করে যেত মাকে। পনের মাসের মেয়ে ভাস্বতী, স্কুলে যাবার তার বয়স হয় নি। দিদির কোল থেকে নেমে সে মাকে প্রণাম করে, অবিকল বড়দের মতো করে। কে তাকে শেখালে যে এমন করে

মায়ের পায়ে মাথা নীচু করতে হয়। ভাস্কর না ফিরে এলে ভাস্বতী হয়ে, ঐটুকু, একরত্তি মেয়ে পায় কোথায় সেই প্রেরণা। যদিও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাস্বতীর পূর্বজন্মের স্মৃতি প্রভাবিত আচরণের পাণ্ডুলিপি ধূসর হয়ে আসছে বিস্মৃতির ধূলি লেগে লেগে, তবু ভাস্বতীর মা-বাবা একথাও আমাকে বলেছেন, ভাস্বতী যদি মেয়ে না হত তা হলে আকৃতি ও আচার অনুযায়ী অবিকল ভাস্করই আবার এসেছে বলা যেত।

ভাস্করের মৃত্যুর আগে আরও একটি ঘটনার পটভূমিকা রয়েছে যেটি এখানে তুলে ধরা দরকার। ভয়ংকর রঙে আঁকা সেই পটভূমিতে রয়েছে কিরীটীনগর থেকে নিয়ে আসা একটি শিবলিঙ্গের মূর্তি। কিরীটীনগর হচ্ছে সতীর কর্তিত দেহাংশের পতনে উত্থিত তীর্থক্ষেত্র। সেই শিবলিঙ্গটি আনার পর থেকেই পুলিশ অফিসারের বাড়িতে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটে। লালবাজারে যে দারোয়ান পূজা করত সেই লিঙ্গের, যে দুর্ঘটনায় পড়ে। যে গাড়োয়ালী পরে এই শিবের পূজার ভার নেয় সে মারা যায়। মারা যাবার আগে সে আসন্ন-মৃত্যুর পদধ্বনি শোনে। চিঠিতে জানায় তার প্রভু পুলিশ অফিসারকে যে সে মারা যাবে সুনিশ্চিত। তার টাকাকড়ি কোথায় কত আছে তা উদ্ধার করার এবং ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্যে অনুরোধ করে প্রভুকে। পুলিশ অফিসারের প্রিয় সন্তান ভাস্করের মৃত্যু ভেঙে দেয় প্রায় পুলিশ অফিসার-পত্নীর মনোবল।

ভদ্রলোককে আমি বলেছিলাম, শিবলিঙ্গটিকে ত্যাগ করতে। শেষমুহূর্তে তাঁর স্ত্রী বহুদিন পুজোর পর, শিবলিঙ্গকে বিদায় দেবার আসন্ন বেদনায় কাঁদেন। তারপর মুহূর্তে মনস্থির করেন, না। শিবলিঙ্গকে তিনি ত্যাগ করবেন না কিছুতেই। আসুক যত দুর্যোগ সংসার ঘিরে। আমার অভিমান হয়েছিল, —অহংকার। মনে করেছিলাম, শিবলিঙ্গকে ত্যাগ করতে বলে ঠিক কাজ করেছি। এখন বুঝি, ওর চেয়ে বেঠিক আর কিছু হতে পারত না।

যিনি বিপদে শিবকে ভাসিয়ে দেননি জলে, সন্তান-মৃত্যুতে চোখের জলে ভেসেও, সেই সতীকে ভয় দেখানো স্বয়ং শিবেরও অসাধ্য। তাঁর জয় হোক। তাঁর সাধনাকে নমস্কার।

এই প্রসঙ্গে আরেকজনের কথা বলেছেন পুলিশ অফিসার এবং তাঁর স্ত্রী। দার্জিলিং-এর উচ্চপদস্থ এক কর্মচারীর। এঁর পদবীই কেবল মিত্র নয়; বিপন্ন মানুষের সত্যিকারের মিত্র ইনি। এঁর নাম আমি শুনেছি; দেখিনি অনেক দিন। এঁর অলৌকিক ভবিষ্যদ্বাণীর কথা অনেকেরই জানা। জ্যোতিষী নন। জ্যোতিষীর চেয়ে ইনি বড়। দার্জিলিং থেকে কলকাতায় আসার আগের দিন, এই মিত্র ভদ্রলোক পুলিশ অফিসারকে বলেন, পায়ে আঘাতের চিহ্ন দেখছি আপনার ছেলের। ভাস্করের পায়েই কামড়ায় পাগলা কুকুর। তারপর যত চিঠি লেখেন ভাস্করের বাবা-মা, তার একটিরও উত্তর আসে না এই পরিবারের

সেই পরম মিত্রের কাছ থেকে। তারপর পুলিশ অফিসার যান তাঁর কাছে। তিনি বলেন, মঙ্গলময়ীর ইচ্ছাই পূর্ণ হবে !

আর একটি কথা। ভাস্কর যে বাঁচবে না, ভাস্কর তা জানত না। ভাস্করের দাদু টাকা দিয়েছিলেন বই কিনতে। ভাস্কর বলেছিল মা-কে, ও আমার কাজে লাগবে না। কি খেতে দিতে চেয়েছিলেন তার মা, ভাস্কর বলেছিল, গুরুর নিষেধ। তখন মনে হয়েছিল যাকে নিছক প্রলাপ, আজ তাকে মনে হয় মৃত্যুর সুনিশ্চিত পূর্বাভাষ ধরা দিয়েছিল সেই জীবনদীপ্ত দুই চোখে। মৃত্যুর পূর্বে, কেবল মা-কালীর নাম করেছিল ভাস্কর।

'কালী নামে দাও রে বেড়া তাঁর কাছে ত' যম ঘেঁষে না,'

যদি যম বেড়া টপকে নিয়েও যায় ভাস্করকে, তবু তাকে ফিরিয়ে দিয়ে যেতে হয় সতীর কোলজোড়া ভাস্বতীরূপে !

পুলিশ অফিসারের পরিবারের এই ঘটন-অঘটনের একটি মৌখিক চিত্র আমি উপহার দিয়েছিলাম আমার বন্ধু শ্রীরামপরায়ণ রায়কে। রামপরায়ণ বন্ধু হলেও বয়সে আমার চেয়ে সামান্য বড়। মানুষ হিসেবে কেবল আমার চেয়ে নয়, এত মানুষের চেয়ে এত বড় যে তাকে অসামান্য মানুষ বললেও যথেষ্ট বলা হয় না! অসাধারণ মানুষ বলে আমার সমকালে যাঁরা খ্যাত, তাঁদের অনেকের সঙ্গেই আমার পরিচয় আলাপের স্তর পেরিয়ে সখ্যতার গণ্ডীতে পৌঁছেছে। তাঁদের কেউ ভালো লেখেন কিংবা গান অথবা ছবি আঁকেন। কেউ বড় বাগ্মী, কেউ খ্যাতনামা অভিনেতা, কেউ বা আন্তর্জাতিক কীর্তিমান চলচ্চিত্রকার। এঁদের, এই সব অসাধারণ মানুষদের মধ্যে পরশ্রীকাতরতা, খ্যাতির লালসা, আদর্শকে বলি দেবার এমন প্রবণতা আমি প্রত্যক্ষ করেছি যা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিরল। সাধারণ মানুষের মধ্যেই বরং অসাধারণ মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছি। রামপরায়ণ রায় এমনই একজন লোক যাঁর মধ্যে একটি গোটা নির্ভেজাল নিরহংকার পুরুষের পরিচয় প্রদীপ্ত।

যাকে খ্যাতি-কীর্তি-প্রতিপত্তিওলা নাম বলে রামপরায়ণের নাম তার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু এমন একজন বিপদে সহায়, সংকটে বুদ্ধিদাতা, সাধ্যের অতিরিক্ত সাহায্যে কদাচ পরাঙ্মুখ ব্যক্তিত্ব আমার দেখার জগতে প্রায় ব্যতিক্রম। রামপরায়ণের কাছে যারা ঋণী তাদের অনেকেই গর্ব করে তাঁর আড়ালে বলে: 'রামপরায়ণের ঘাড় ভাঙলাম আজ।' তারা জানে না যে রামপরায়ণের ঘাড় বড় শক্ত। সে ইচ্ছে করে ভাঙতে না দিলে তার ঘাড় ভাঙে এত বড় কৃতবিদ্য করিতকর্মা এখনও জন্মায় নি। রামপরায়ণ বোকা বনে, বোকা বানাবার জন্যে। কার প্রয়োজন জেনুইন আর কারটা ধাপ্পা, রামপরায়ণের নখদর্পণে তা প্রতিফলিত। তবুও সে 'না' বলে না। বলে না এই জন্যে যে রামপরায়ণ মানুষ চেনে। কোন অবস্থায় পড়ে মানুষ ধারের নাম করে ঠকায়, তা রামপরায়ণের জানা। জানা বলেই প্রতারকের প্রতি তার রাগ হয় না। রাগ

হয় এই সমাজের ওপর যে সমাজে সৎ থাকার উপায় নেই অসৎ উপায়ে রোজগারের রাস্তায় পা না বাড়ালে।

এই রামপরায়ণকে ভাস্কর-ভাস্বতী বলার কারণ হচ্ছে রামপরায়ণ ঈশ্বর, জন্মান্তর, এসবে বিশ্বাস করে না। মানুষে বিশ্বাস করে। সমাজের জন্মান্তর তার কাছে, ব্যক্তি মানুষের জন্মান্তরের চেয়ে অনেক জরুরী। তবুও তাকে এই ঘটনা বলেছি,—কোনও অলৌকিক অভিজ্ঞতা তার আছে কি না জানবার জন্যে। রামপরায়ণ বলেছে: বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করতে পারি না, এমন দু'টি ঘটনা আমার জীবনে ঘটেছে। তাতে আমি ঈশ্বর অথবা অলৌকিকে বিশ্বাসী হই নি, কিন্তু বুদ্ধির অগম্য ঘটনা যে দু'টিই এ বিষয়েও আমি এখনও পর্যন্ত স্থির আছি।

প্রথম ঘটনা, রামপরায়ণের ছাত্রাবস্থায় ঘটে। বাড়িতে তার বাবার একটি এ্যাটাশে পাঁচশো টাকা সুদ্ধু চুরি যায়। পরের দিন ব্যাগটা বাগানে পাওয়া যায় বাড়ির। কিন্তু টাকাটা উধাও হয়ে যায়। রামপরায়ণের পিতৃদেব বিপুল বিত্তবান। তার বাবা-মা কেউই তাই এ-নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান না। কিন্তু তাঁদের বাড়িতে আসা যাওয়া করে এমন একজন বিধবা এই চুরিতে বিমর্ষ হন। তাঁরও প্রচুর অর্থ কিন্তু তাঁর ছেলেটি বিগড়ে যাওয়ায়, তাঁর ধারণা হয় যে, হয়ত তাঁর ছেলেই এই টাকা চুরি করে থাকবে। ব্রাহ্মণের অর্থ আত্মসাৎ করায় তিনি মহাপাপের ভাগী হবেন এই ভয়ে তিনি একজন লোকের সন্ধান দেন যাঁর কাছে গেলে তিনি ক্রিয়া করে একজনের হাত দিয়ে চোরের নামটা লিখিয়ে দিতে পারেন। রামের মা তাতে রাজী হন না। বলেন, প্রয়োজন নেই। যা গেছে তা যেতে দাও। রামপরায়ণ শুনেই বদ্ধপরিকর হয় বুজরুকি ভেঙে দেবার জন্যে।

সেখানে আসনে বসবার আগে 'ক্রিয়া'-কারী লোকটি বলে মায়ের অথবা প্রিয়জন কারুর চেহারা মনে মনে ভাবতে এবং যখন নামটা লেখা হবে তখন যেন 'লিখব না' এ রকম মনোভাব না হয়। রামপরায়ণ মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে কোনওটাই সে মানবে না। মায়ের কথা যত না ভাববার চেষ্টা করে, তত মা সামনে বসে আছেন, দেখতে পায়। একটু বাদে খুব ঠাণ্ডা, খুব সুগন্ধমাখা একখানা করস্পর্শ অনুভব করে মাথায়। সে যত লেখাবার চেষ্টা করে রামপরায়ণ তত না লেখবার জন্যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। শেষ পর্যন্ত মাথায় রাখা সেই হাত রামের হাত দিয়ে লিখিয়ে দেয় তস্করের নাম।

না। বিধবার পুত্র চোর নয়। এ চোর,—রামপরায়ণের আরেক আত্মীয় যাকে চোর বলে স্বপ্নেও কেউ ভাবতে পারে না। পরে জানা যায় চোর সেই আত্মীয়।

রামপরায়ণ স্বীকার করেছে আমার কাছে যে এই ঘটনার বুদ্ধি দিয়ে কোনও ব্যাখ্যা সে আজও করতে পারে নি।

দ্বিতীয় যে ঘটনা রাম আমাকে বলেছেন, সেটি চমৎকারিত্বে অদ্বিতীয়।

রামপরায়ণের নিজের বিবেচনা, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ওবজারভেসানের ক্ষমতার পরিচয় যেমন এই দ্বিতীয় ঘটনায় প্রকট হয়েছে দিবালোকের মতো, তেমনই এর মধ্যে অলৌকিকের একটুকরো আলোও কি রকম করে না জানি এসে পড়েছে, যার সাহায্য ছাড়া রামের সব বুদ্ধি-বিচার ওবজারভেসান ব্যর্থ হতো।

॥ তেইশ ॥

'ঈশ্বরই যোগী, যোগীই ঈশ্বর'

শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ :
লীলা কথা [পূর্বার্ধ]

আমার বন্ধু রামপরায়ণ রায় তখন ব্যাংকের ম্যানেজার। সেই সময় এক লোক তাকে ঠকায়। শেষ পর্যন্ত রামপরায়ণ তাকে ধরতে পারে। রামপরায়ণের বুদ্ধি, পরিশ্রম, জেদ, লেগে থাকা, লক্ষ্যশক্তি অনেক কিছুই তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এর মধ্যে একটি বুদ্ধির অতীত কৃপা ছাড়া রামপরায়ণের এই সব গুণ কত কাজে লাগত বলা সহজ নয়। কারণ, লোকটিকে যেদিন কলকাতায় আবিষ্কার করে রামপরায়ণ সেদিনই সে দার্জিলিং থেকে এসেছে এবং সেদিনই আবার কলকাতা ত্যাগ করবে। কয়েকঘণ্টা মাত্র সে কলকাতায় ছিল। ধরা পড়ার পর সে রামপরায়ণকে প্রশ্ন করে : আপনি আজই আমাকে খুঁজতে এখানে এলেন কেন ? রামপরায়ণ বলে যে এর জন্যে দায়ী একটি কালীভক্ত ডোম। মধ্য কলকাতার এই অবাঙালী ডোমটির নাম ছিলো বাঙালী। সে রামপরায়ণকে বলে, যাকে খুঁজছিস সে এখন কলকাতায় আছে, মা বলেছে তোর বাড়ির উত্তর দিকে সে আছে, তুই তার দেখা পাবি।

রামপরায়ণ আজও ঈশ্বরবিশ্বাসী নয়। কিন্তু এ দু'টি অলৌকিক ঘটনার ব্যাখ্যা বুদ্ধি দিয়ে সে করতে পারে নি আজও। এই সততা, এই স্বীকৃতি, এই সত্যভাষণের জন্যে আমি মনে করি তার চেয়ে বড় ঈশ্বরভক্ত কেউ নয়। সত্যকে যে অস্বীকার করে না, ঈশ্বর তাকেই শিকার করেন সর্বাগ্রে।

রামপরায়ণের প্রথম ও দ্বিতীয় অলৌকিক বৃত্তান্ত উপস্থিত করবার মাঝখানে আমি একবার কাশী ঘুরে এসেছি। আরেকবার। যাঁর উদ্দেশে এবার বেরিয়েছিলাম তাঁর নাম বীতরাগানন্দ। কাশীতে তিনি কারুর কাছে কত্তাবাবা, কারুর কাছে বানপুরিয়া বাবা। আমার পেঁছবার আগেই তিনি মরদেহ ত্যাগ করেন। সুদীর্ঘজীবী বীতরাগানন্দের বিচিত্র জীবন ও বাণী বার্ধক্যে বারাণসীর পাতায় আমি প্রকাশ করব পরে। এখন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের গুরু শ্রীবিশুদ্ধানন্দের কথা বলি। বিশুদ্ধানন্দের কাছেই গোপীনাথ দীক্ষা নেন। অনেকের ভুল ধারণা আছে যে, গোপীনাথ আনন্দময়ী মায়ের শিষ্য। তিনি

আনন্দময়ী মা-কে ভক্তি করেন। তাঁর সঙ্গে কলকাতায় অথবা অন্যত্র যান কখনও কখনও, কিন্তু তাঁর গুরু ওই বিশুদ্ধানন্দ।

একদিন ডক্টর গোপীনাথের বাড়ির দোতলায় যেখানে তাঁর সঙ্গে সকলে দেখা করেন, গিয়ে দেখি, দরজা বন্ধ। গোপীনাথ তখনও পুজো থেকে ওঠেন নি। সেদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম, পুজো করতে কতক্ষণ লাগে?

পুজো তো এক মিনিটেই হয়ে যায়,—আনুষঙ্গিক প্রস্তুতি ইত্যাদিতেই সময় যায়।

আপনার মরদেহত্যাগী গুরুদেবের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ আছে?—

না হলে তো বাঁচাই যেত না—

পল ব্রান্টনের বইতে বিশুদ্ধানন্দকে 'ম্যাজিসিয়ান' বলায় আমি আপত্তি করি। গোপীনাথ বলেন: না। ম্যাজি বলতে এক সময়ে সিদ্ধপুরুষকেই বোঝাতো।

পল ব্রান্টন,—বিশুদ্ধানন্দের যে অলৌকিক বিভূতির কথা তাঁর ইংরেজি বইতে বলেছেন, গোপীনাথ আমায় এবার কাশীতে বলেছেন যে, তা তাঁর গুরুদেবের ক্ষমতার আংশিক পরিচয়ও নয়। সূর্যকে দেশলায়ের আলোয় দেখার তুল্য। কুড়ি বৎসর প্রায় মরদেহী গুরুদেব-সঙ্গ করেন গোপীনাথ। এত অজস্র অলৌকিক ঘটনা তাঁর এবং অন্যান্য গুরুভাই ও ভক্ত-আগন্তুকের সামনে ঘটেছে যে, তাঁর গুরুদেবের যে পাঁচ খণ্ডে জীবন-বৃত্তান্ত তিনি প্রকাশ করেছেন তাও অকিঞ্চিৎকর। গোপীনাথ আরও বলেছেন যে, মহাপুরুষের জীবনী রচনা করা যায় না। বিশুদ্ধানন্দ তাঁর জীবন যেভাবে রচনা করেছেন, মনুষ্য-কলমের সাধ্য নেই সে জীবনী-রচনার। কৃষ্ণের জীবনী লিখতে গিয়ে বঙ্কিম সাফল্য লাভ করেন নি,—এ কথা নির্দ্বিধায় বলেছেন ডক্টর গোপীনাথ।

এরপর যেকথা তিনি শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ-প্রসঙ্গে লিখেছেন সেকথাই মুখে বললেন আমাকে। তখনও তিনি দীক্ষা নেন নি শ্রীগুরুচরণে, নেব-নেব করছেন। একদিন যোগীকে এ জিজ্ঞাসার উত্তরে গোপীনাথ গুরু গন্ধবাবা—বিশুদ্ধানন্দ বললেন: যে যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন তিনিই যোগী।

গোপীনাথ বললেন: এ কি বলছেন? যা ইচ্ছে করতে পারেন যিনি তিনি তো ঈশ্বর।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন: ঈশ্বরই সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী।

'যোগী পার্ এক্সেলেন্স' কথাটা আমাকে বলবার সময় ব্যবহার করেছিলেন ডক্টর গোপীনাথ, ঈশ্বর সম্পর্কে বিশুদ্ধানন্দর বক্তব্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। ঈশ্বরকে যোগী বলায় গোপীনাথ আবার বলেন: যোগী তো উপাস্য নয়, যোগী তো উপাসক—

ঈশ্বরও উপাসক?

কার?

তোমরা যাঁকে মা বলো,—তাঁর !

নাভিপদ্মের যে কথা শাস্ত্রে লেখা আছে তা প্রতীক না, সত্যি সত্যিই মনুষ্যদেহের মধ্যে স্থূলপদ্ম, দল মেলবার জন্যে প্রস্তুত রয়েছে, এই শিষ্য-জিজ্ঞাসার জবাবে বিশুদ্ধানন্দ বলেন : কুণ্ডলিনী জাগলেই নাভিপদ্ম ফোটে। এ পদ্ম সকলের শরীরেই আছে—কিন্তু মুদ্রিত হয়ে আছে। কুণ্ডলিনীর জাগরণ আর অন্ত সূর্যের উদয় একই কথা। এই জ্ঞানসূর্যের উদয়ে পদ্ম আপনিই ফোটে। একটু থেমে গোপীনাথ-গুরুদেব বলেন আবার : আমরা প্রত্যক্ষবাদী। প্রত্যক্ষ ভিন্ন আমরা কিছু মানি না।

বলতে বলতেই নাভিগ্রন্থ উন্মোচিত হয়,—বেরিয়ে আসে রক্তকমল।

গোপীনাথ বলেছেন যে, সেই পদ্মর দল তিনি গুণবার চেষ্টা করেন। কয়েকটি গুণেও ছিলেন। খানিকটা উঠে পদ্ম আবার অন্তঃপ্রবেশ করে। গোপীনাথ জিজ্ঞেস করেন তাঁর গুরুদেবকে : যদি হাত দিয়ে পদ্মটি চেপে ধরতাম তা হলে কী হতো ?

হাতসুদ্ধু সেঁধিয়ে যেত পেটের মধ্যে—এনাজীর্তে পরিণত হতো হাত।

প্রত্যক্ষ-দর্শনের পর বিশুদ্ধানন্দ-বাণী মন্দ্রিত হয় :

'বিষ্ণুর নাভিকমল থেকে ব্রহ্মার উৎপত্তি—এসব পৌরাণিক বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। কুণ্ডলিনী না জাগিলে এই কমল ফুটে না। নাভিতে গ্রন্থিবন্ধন আছে, ইহার উন্মোচন ভিন্ন সিদ্ধিলাভের আশা দুরাশা মাত্র।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ : লীলা-কথা : পূর্বার্ধ]।

একটি ফুলকে আরেকটি ফুলে, পদ্মকে জবা, জবাকে পদ্ম করা বিশুদ্ধানন্দর খেলা ছিলো। এই খেলার কথায় ডক্টর গোপীনাথ পতঞ্জলির লেখার কথায় এসে পড়েন একদিন। গোপীনাথের মতে—পাতঞ্জল দর্শন ও তাঁহার যোগভাষ্যের মতো গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় বিরল।

বিশুদ্ধানন্দ বললেন : গ্রন্থ থেকে জ্ঞান জন্মায় না। শুধু জ্ঞানের কোনই মূল্য নেই।

গোপীনাথ থামলেন না। এক পদার্থের অন্য পদার্থে রূপান্তরকে জাত্যন্তর-পরিণাম বলে। পাতঞ্জল দর্শন ও ব্যাসভাষ্যে তার কারণ রহস্যের উপাদান আছে।

বিশুদ্ধানন্দ হাসেন : তুমি কি বলতে চাও, পাতঞ্জল দর্শন পড়ে কেউ যোগী হতে পারবে ?

১৯১৮ সালে গোপীনাথ দীক্ষিত হন। গন্ধে ভুবন ভরে যখন-তখন যেখানে-সেখানে আবির্ভূত হতেন তাঁর গুরুদেব।

গোপীনাথ লিখেছেন, ১৯২২ সালে সিঁড়ি থেকে পড়ে ছত্রিশ ঘণ্টা যখন জীবন-মরণ সমস্যার মধ্যে তাঁর গুরুকে পুরীতে তার করেন তিনি। দেড়ঘণ্টার মধ্যে রোগিণীর ঘর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হয়। বোঝা যায় গুরুদেব এসেছেন। রোগিণী ঘুমিয়ে পড়লো। রোগমুক্ত হলেন গোপীনাথ-পত্নী।

কেন সারান গুরু এভাবে রোগ, তার উত্তর হচ্ছে বিশুদ্ধানন্দ-বাণীতে :

'বৎস, গুরু যে কি বস্তু তোমরা এখনও চিনিতে পার নাই। যোগী ভিন্ন কেহ গুরুপদবাচ্য হইতে পারেন না। শিষ্যের ঐহিক ও পারত্রিক সকল প্রকার কল্যাণের ভার গুরু স্বহস্তে গ্রহণ করেন। আমি সর্বদাই তোমাদের প্রত্যেকের নিকটে রহিয়াছি। তোমরা ক্রিয়াতে উন্নত হইলে তাহা প্রত্যক্ষ বুঝিতে পারিবে।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ ; লীলা কথা : পূর্বার্ধ]

ডঃ গোপীনাথের উপস্থিতিতে একজন অধ্যাপক বিশুদ্ধানন্দকে বলেন, বিশুদ্ধানন্দের শরীর ও অধ্যাপকের শরীরে কোনও তফাত নেই অর্থাৎ সাধারণ মানুষের মতোই যোগীর শরীরেও ক্ষুধাতৃষ্ণা সমান। যোগীকেও বাহ্যে-পেচ্ছাব করতে হয়।

বিশুদ্ধানন্দ হেসে তাঁর একখানা হাত দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে ওপারে চালিয়ে দিলেন। তাঁর হাতে একটি পান ছিলো। অধ্যাপককে বললেন, পানটি নিয়ে আসতে। অধ্যাপক বাইরে গিয়ে পানটি নিয়ে এলেন। অর্থাৎ দেওয়ালের মধ্যে দিয়ে হাত ঢুকিয়ে দেবার ব্যাপারটা যে সম্মোহন নয়, বাস্তব সত্য তাই দেখানোই পানটি নিয়ে আসতে বলার মধ্যে নিহিত ছিলো। তারপর অধ্যাপককে জিজ্ঞেস করলেন বিশুদ্ধানন্দ : তুমি পার এ রকম করতে। পার না। তা হলে বল না, যোগীর শরীর আর সাধারণ শরীরে কোনও পার্থক্য নেই। আছে। যোগীর এই শরীরই অঘটন-ঘটন পটীয়সী।

গোপীনাথ বলেছেন, তাঁর গুরুদেবের শরীর তীব্র সাধনায় পরিবর্তিত হয়ে যায়। যা হতে পারত শব তাই হয়ে উঠেছে নিত্য-নব উৎসব। শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্যে বাহ্য বায়ুর প্রয়োজন হয় নি। নাক দিয়ে শ্বাস ফেলা অথবা টানা কোনও কিছুরই তিনি তোয়াক্কা করতেন না। আভ্যন্তর সূক্ষ্ম ও বিশুদ্ধ বায়ুই তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করত। সে বায়ুর পদ্মগন্ধে সুবাসিত হতো চতুর্দিক। তাঁর গায়ের ঘামেও সেই একই সুবাস,—যে কোনও গন্ধ জল যার তুলনায় তুচ্ছ। তাঁর শরীরে এত তড়িৎশক্তি ক্রিয়া করে যে গায়ে বোলতা বসলে পুড়ে মরে যায়। তাঁর চোখ দিয়ে যে তেজ বেরোয় তাতে হিংস্র পশু মুখ ঢাকে; জ্যোতির্ময় কঠিন শিবলিঙ্গ ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। একবেলা অতি অল্প আহার এবং প্রায় নিদ্রাহীন থাকা তাঁর বৈশিষ্ট্য। তাঁর সিদ্ধিসংখ্যা অগণ্য। গোপীনাথকে মহাসিদ্ধির মর্মোদ্ঘাটনে বিশুদ্ধানন্দ তাঁর তর্জনীকে এত বড় এবং স্ফীত করেছিলেন যা বিস্ময়েরও বিস্ময়।

এর একটি কথাও আমার নয়। স্বয়ং গোপীনাথ তাঁর গুরুদেবের চরিত-কথায় প্রকাশ করেছেন।

গোপীনাথ-গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ, লোকে যাকে অলৌকিক বলে তাকে অলৌকিক বলেন নি। বলেছেন, সূর্য-বিজ্ঞান। মানুষ মাত্রই সাধনায় শবকে সব করতে পারে। তবে শুধু বই পড়ে তা সম্ভব নয়। যোগক্রিয়ায় তা

সম্ভব। যোগকেই তিনি শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেন। এই পুরুষকারে প্রারব্ধকেও পরিবর্তিত করা যায়, একথা তিনি বলেছেন।

পুরীতে বিশুদ্ধানন্দের কাছে বসে আছেন ডক্টর গোপীনাথ। দুএকজন ভক্ত আহ্নিক-সদ্যসমাপ্ত গুরুদেবকে বাতাস করছেন। গোপীনাথের মনে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ-গন্ধের কথা ভেসে আসছে ('মৃগমদ নীলোৎপল')। সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবকে জিজ্ঞেস করছেন গোপীনাথ: গোবিন্দলীলামৃতে কৃষ্ণের গায়ের যে গন্ধের কথা রয়েছে সে গন্ধ কেমন ?

গুরুদেব বললেন : বলে যাও কি কি উপাদানের সংযোগে ঐ গন্ধের আভাস পাওয়া যায় বলে লেখা আছে ? গোপীনাথ একেকটি-উপাদানের নাম করেন, বিশুদ্ধানন্দ শূন্যে হস্ত সঞ্চালন করেন। নীলপদ্ম, কস্তুরী ইত্যাদি সব উপ্যাদান উল্লেখ করা হলে, গুরুদেব হস্তমুঠি গোপীনাথকে আঘ্রাণ করতে বলেন। দিব্যগন্ধে ঘর ভরে গেছে তখন। বাতাস মাতাল হয়েছে, আকাশ আকুল।

গোপীনাথের প্রশ্ন অতঃপর : নাম শোনামাত্র এত বিভিন্ন পদার্থ কি করে আকর্ষণ করলেন ?

গুরুদেবের উত্তর : এতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যতদূর পর্যন্ত সূর্যরশ্মির বিস্তার আছে, ততদূরে যা কিছু থাক তাকেই টেনে আনা যায়। সমস্ত জগৎ বিধাতার যে কৌশলে চলে তা যেদিন ধরতে পারবে, সেদিন বুঝবে, একটি ব্রহ্মাণ্ড রচনাও অসম্ভব ব্যাপার নয়।

গোপীনাথ বলেছেন : তাঁকে সূর্যরশ্মি থেকে সচেতন জীব পর্যন্ত সৃষ্টি করতে দেখেছি। মাছি, শতপদী ও চামচিকে আমার চোখের সামনে তৈরি হয়ে উড়ে যেতে দেখেছি। মনুষ্য-সৃষ্টি এখনও সম্ভব হয় নি বটে, তবে চেষ্টা করলে কালে তাও অসম্ভব হবে না।

তাঁর গুরুদেব এর অপরূপ ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে—বাস্তবিক পক্ষে কোনও বস্তুরই বিনাশ হয় না। একখানা বই অগ্নিতে ভস্মসাৎ করে ফেলে দেশান্তরে ও কালান্তরে যদি ঠিক সেই পুস্তকই পুনরায় উৎপন্ন করা যায় এবং যদি তা দৃষ্টিভ্রম না হয়ে স্থায়ী বস্তু বলে প্রমাণিত হয়, তা হলে কোনও বস্তুরই যে ঐকান্তিক বিনাশ হয় না, একথা না মেনে উপায় কি ? যদি গঙ্গার ঘাটে একঘটি দুধ নিক্ষেপ করা যায় এবং অন্য ঘাট থেকে বিশ্লেষণপূর্বক ঠিক সেই দুধই বার করে দেখানো যায় তা হলে স্বীকার করতেই হবে যে স্বরূপ-নিবৃত্তি কখনই হয় না কোনও জিনিসের। এইজন্যেই জীব লোক-লোকান্তরে, এমনকি ব্রহ্মলোকে গেলেও ক্ষমতাশালী বিজ্ঞানবিৎ তাকে আকর্ষণ করে আনতে পারেন।

একথা কি অন্ধবিশ্বাসের না বাস্তব বিজ্ঞানের ?

বিশুদ্ধানন্দর কথাই তো কবিরও কথা :

শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ? ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজের গুরুদেব বিশুদ্ধানন্দ কাশীতে যাঁর প্রিয় নাম ছিলো গন্ধবাবা, তিনি ওখানেই থামেন নি।

তিনি আরও এগিয়ে এসে বলছেন : চিত্তের বিভিন্ন বৃত্তি, কামাদি রিপু, জ্বরাদি রোগ, গ্রীষ্মাদি ঋতু, প্রেমভক্তি প্রভৃতি ভাব পর্যন্ত—বিজ্ঞানের আলোকে স্পষ্ট দেখা যায়।

একটি কথা বিশুদ্ধানন্দ তবুও বলেন নি। সেকথাও সত্য। সেকথা হচ্ছে, সূর্যবিজ্ঞানে সব করা যায়, কিন্তু বিশুদ্ধানন্দ কী এবং কে, তা ধরা যায় না। সূর্যবিজ্ঞান তাঁর খেলা। কবি বলেছেন যে, দাঁড়িয়ে আছ তুমি আমার গানের ওপারে। ধ্যানী বলেছেন যে, তুমি কেবল গানের ওপারে নও, জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুয়েরই ওপারে তুমি দাঁড়িয়ে। বিশুদ্ধানন্দ কেবল উদ্‌যোগী নন ; তিনি যোগী। তিনি যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন।

বিশুদ্ধানন্দ তাঁর জীবনে তাঁর বাণীকে মূর্ত করেছেন। বহু আশ্চর্য ঘটনার উৎপাদক তিনি। বহু আশ্চর্যতর ক্ষমতার তিনি অধীশ্বর। বস্তুত, তিনি যত সাধারণ পরিভাষায় যাকে অলৌকিক ঘটনা বলে তার নায়ক। এমন আর বোধ হয় কেউ নন। তার দ্বারা আমি একথা বলতে চাইছি না যে, অন্যান্য যোগীরা তাঁর মতো শক্তিমান ছিলেন না। না। তা আমার বক্তব্য নয়। তাঁরা ছিলেন, আছেন এবং থাকবেন। তবে বিশুদ্ধানন্দের মতো এত ক্ষমতার অবাধ প্রদর্শন আর প্রায় দেখা যায় না। কেন ?

কেউ কেউ মনে করেন বিভূতি দেখানো উচিত নয়। কারুর ধারণা,—বিভূতি তুচ্ছ জিনিস। তার প্রতি শ্রদ্ধা করবার কারণ নেই। বর্তমান ভারতের পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ এ বিষয়ে যা বলেন সেইটেই শেষ কথা :

যোগবিভূতি সম্বন্ধে এই সকল ধারণাই অস্পষ্ট বলে মনে হয়। লোকোত্তর ব্যাপার মাত্রই বিভূতির নিদর্শন বটে, কিন্তু তা যোগবিভূতি নয়। পরম পদার্থের সঙ্গে সংযোগ হলে জীবভাব অভিভূত হয়ে যে ঐশ্বর্যভাব জাগে তা-ই যোগবিভূতি।

অন্যত্র গোপীনাথ বলছেন : কেউ প্রশ্ন করতে পারেন, অধ্যাত্মপথে সিদ্ধির কোনও সার্থকতা আছে কি না ? অন্যকে প্রত্যক্ষ দেখিয়ে বিশ্বাস স্থাপনের উপযোগিতা ছাড়াও সিদ্ধিলাভে নিজের কোনও কল্যাণ হয় কি ? এর উত্তর হচ্ছে,—নিশ্চয়ই হয়। ভোগ না করে ত্যাগ যেমন কপটাচার মাত্র, তেমনই ঐশ্বর্য লাভ না করে আত্মসমর্পণ। অসম্ভব।

আবার : 'তবে ইহা নিঃসন্দেহ যে, প্রকৃত ঐশ্বর্যের উদয় মায়ার অতীত না হওয়া পর্যন্ত হয় না। যোগিগণ পরমপদার্থে যুক্ত হইয়া জগতের কল্যাণার্থ এবং স্বেচ্ছাক্রমে ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন।'

[শ্রীশ্রীবিশুদ্ধানন্দ প্রসঙ্গ : তৃতীয় ভাগ : লীলাকথা ; পূর্বার্ধ]

বিশুদ্ধানন্দ সূর্যবিজ্ঞান প্রত্যক্ষশিক্ষা দেবার জন্যে লেবরেটরি পর্যন্ত

প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে ছিলেন। লোকে বলে বিজ্ঞান সকলের সামনে তার বক্তব্য প্রমাণ করতে পারে। যোগীরাও যে তা পারেন, মহত্তম মানবতীর্থ ভারতবর্ষে তার প্রমাণ আজও আছে। টেলিভিসন তা দেখায় না। তার জন্যে চাই ভিসান।

॥ চব্বিশ ॥

একটি আশ্চর্য অপরাহ্ণ কখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাত্রির অন্ধকারে উত্তীর্ণ হলো টের পেলাম না, আশ্চর্যতর একটি যুগলের স্মরণীয় সান্নিধ্যে। নামের প্রয়োজন নেই। ভারতজোড়া নাম আইনজ্ঞ হিসেবে। পাণ্ডিত্য প্রচুর, সাফল্যের প্রায় শিখরদেশে উপস্থিত একজন অন্যজন সুপরিচিতা সমাজসেবিকা। দু'জনেরই এই পরিচয়ের চেয়ে অনেক আকর্ষণীয় একটি ব্যক্তিত্বভূষিত সান্নিধ্যের সৌরভে সেই অধ্যায় আচ্ছন্ন হয়েছে অনেক বেশি। প্রসঙ্গ করেছি সেদিন কাশীর। আমার প্রিয় নয়, শ্রেয় প্রসঙ্গ। মরলোকে ওই একটি পরিবেশ, কাশী, আলোচনা-রম্ভমাত্রই অমরলোক থেকে এসে পড়ে একমুঠো আলো। কী আছে ওই কটি অক্ষরে, কাশী,—সকল যুগের সকল 'নেশন'-এর আব্রহ্মস্তম্ব সব অন্বেষণের শেষ—অশেষ ওই কাশী। বিশ্বের যতেক অনাথের যতক্ষণ না মুক্তি হচ্ছে ততক্ষণ জেগে আছে যেখানে স্বয়ং বিশ্বনাথ। দেহের ক্ষুধা দূর করবে যে কেবল সে নয় জীবের মুক্তিদাতা। Not by bread alone! সন্দেহের অতীত যে ওই সঙ্গে বসুধার যত জীব তাকে সুধায় ভরে দেবে, অন্তরে দেবে অমৃতের আস্বাদ, মনে করিয়ে দেবে জীব যে, সেই শিব। খেলতে এসেই সে ইচ্ছে করে ভুলেছে যে সে-ই শিব। কাশী ছাড়া আর কোথায় শিব খুঁজে বেড়াচ্ছেন জীবকে। বরুণা আর অসি। বরুণা আর রশি, মুক্তি আর বন্ধনের সঙ্গমক্ষেত্র আর কোথায়? শিব ও জীব আর কোথায় হরিহরাত্মা?

যতক্ষণ কাশী না পেঁছচ্ছ ততক্ষণ এ জীবনের তীর্থভ্রমণ অসমাপ্ত! ততক্ষণই কেবল হাহাকার:

হেথা নয় হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।

কাশীতে পেঁছনমাত্র নাম আর প্রণাম:

'প্রাণে যদি পেয়ে থাকো চরমের পরম নির্দেশ,
এবারের মতো করে শেষ!'

কাশী যাবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন ভারতবিখ্যাত সেই আইনজ্ঞ। একবার নয়। দু'বার। তারপর ভ্রমর এসে গুনগুন নিয়ে গেল কানে। কাশীর গঙ্গার ওপারে মাচার ওপর বাসা বেঁধে আছেন একজন ঈশ্বরকে ভালোবাসার যিনি জীবন্ত বিগ্রহ। কী করে যান কাশী? মনে আপসোসের মেঘ জমতে না

জমতেই আবার আমন্ত্রণ আসে কাশী থেকে। এবারে আর ভুল হয় না। হ্যাঁ, যাব, কাশী। ২৩শে ডিসেম্বর '৬৩। মোগলসরাইয়ের কাছেই থাকেন এক বন্ধু। তাঁর কাছে গিয়েই উঠবেন। একখানা গাড়ি আছে তাঁর। একটি ড্রাইভারের ব্যবস্থা করতে জানালেন বন্ধুকে।

২৩শে ডিসেম্বর সকালে যথারীতি মোগলসরাই থেকে সটান বন্ধুর গাড়িতে দশাশ্বমেধ ঘাটে। সেখান থেকে নৌকায় গঙ্গার ওপরে যেখানে সাধু বসে আছেন একটা উঁচু মাচার ওপর। বুকের খানিকটা পর্যন্ত দেখা যায়। ভারত-বিখ্যাত আইনজ্ঞ বসলেন মাটিতে। গরমে নেয়ে উঠলেন। সাধুর দিকে তাকালেই সূর্যের আলো লাগে চোখে, তা গনো যায় না।

সাধু জিজ্ঞেস করলেন, কী বাচ্চা কষ্ট হচ্ছে? বলার একটু বাদে ছুঁড়ে দিলেন কাগজের মোড়ক। তার মধ্যে খুব ছোটো দু'টো পাতা। বললেন : খেয়ে ফেল। আইনজ্ঞ ব্যক্তি দ্বিধা করছেন দেখে বললেন : খেয়ে ফেল, ভয় নেই।

খেয়ে ফেললেন দু'টো পাতাই ভদ্রলোক। সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে গেল সর্বাঙ্গ। মনে হলো একটা চাদর সঙ্গে থাকলে ভালো হতো।

কী করতে এসেছিস কাশীতে?—সাধু-জিজ্ঞাসা।

মিটিং করতে,—ভদ্র-উত্তর।

মিটিং-এ গিয়েই অবাক হয়ে যাবি। এখন যা, কাল আসবি।

মিটিং-এ গিয়ে হতবাক হয়ে যান আমার সঙ্গে সদ্য-পরিচিত সেই ভদ্রলোক। কেনেডি নিহত হবার খবর পান সকালে কাগজ পড়তে না পাওয়া ভদ্রলোক সেই প্রথম।

পরের দিন সাধু তাঁর এক অনুগত ব্রহ্মচারীকে বলেন ভদ্রলোককে কতগুলো ক্রিয়া দেখিয়ে দিতে। ভদ্রলোক যে যে ক্রিয়া করতেন ঠিক সেই সেই ক্রিয়াই দেখান ব্রহ্মচারী। ভদ্রলোককেও তারপর সাধুর কথায় সেই উন্মুক্ত গঙ্গাতীরে দেখাতে হয় একটি ক্রিয়া করে।

আগের দিনের গাছের পাতায় অনেক বড় একটা মোড়ক ছুঁড়ে দেন সাধু যাবার আগে। বলেন, তাঁর বাড়ির কোন অসুখ হলে, এটা খাইয়ে দিলে সেরে যাবে।

প্রণাম করতে এগিয়ে আসেন ভদ্রলোক সাধুকে। মাচার নীচে গিয়ে দাঁড়াতেই নেমে আসে একটা পা। কিন্তু ভদ্রলোকের নাগালের অনেক বাইরে। হঠাৎ দেখেন পা নেবে যাচ্ছে একটু একটু করে। ঠিক বুড়ো আঙুলে হাত ছোঁয়াতে পারেন ভদ্রলোক, তখনই যেন স্প্রিং-এর মতো পা আবার ফিরে যায় স্বস্থানে।

কাশীর গঙ্গার তীরে এই সাধু চিরন্তন ভারতের জাগ্রত বিগ্রহ। এঁর নাম দেউঁড়িয়া বাবা। যতবার নাম নিই, প্রণাম করি ততবার এঁকে। লোকে বলে এঁর বয়স দেড়শো, বয়স আরও বেশি। কাশীতে থাকেন আবার অন্যত্রও চলে

যান। এঁকে দেখলে পুণ্য হয়। এঁর নাম করলে শূন্য দূর হয়; এঁকে প্রণাম করতে পারলে পূর্ণকে প্রণাম করা হয়।

এরমধ্যে আরও এক জায়গায় ঘুরে এসেছেন আমার সদ্য-পরিচিত এই ভদ্রলোক। যাঁর কাছে গেছিলেন তাঁর কাছে না গেলে কাশী যাবার কোনও মানে হয় না। কিন্তু এ ভদ্রলোকেরও নাম করা যাবে না, কারণ এঁর কাছে আমি প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে ছাপার অক্ষরে এঁর নাম প্রকাশ করব না। যাই হোক, কলকাতার আইনজ্ঞর সঙ্গে কাশীতে বর্তমানে বাস যাঁর সেই যোগী না ভোগী বলতে পারব না, বর্তমান কাশীতে সবচেয়ে বড় আকর্ষণ যিনি আমার, পাঁচ বছর আগে ফোনে যোগাযোগ হয়, কিন্তু সাক্ষাৎ এই প্রথম। প্রসঙ্গত বলি আইনজ্ঞ এই ব্যক্তির সঙ্গে আমারও সাক্ষাৎ হবার কথা পাঁচ বছর আগে। কিন্তু তা সত্যি সত্যি হলো এই সবেমাত্র।

কাশীর মহৎ মানুষটির কাছে পেঁছবার জন্যে কলকাতার বিখ্যাত লোকটি কাছেই অবস্থিত এক পানের দোকানের বৃদ্ধকে পেঁছে দিতে বলেন। বৃদ্ধ সেখানে পেঁছে দিয়ে ছুটি চায়। কাশীর বাঙালী সাধু বলে যাঁর পরিচয় তিনি তাকে কিছুতেই যেতে দেন না। কেন, তা করেন লোকটি তখন বোঝেন না। একথা সেকথার পর কাশীবাসী বলেন: রাস্তায় অনেক সময় দেখা যায় একটা ফুল অথবা ফুলের মালা রয়েছে, সেগুলি মাড়ানো বা ছোঁয়া উচিত নয়। ওগুলি অনেক সময় কারুর ক্ষতি করবার জন্যে থাকে, যে কারুরই ক্ষতি হতে পারে ছুঁলে।

রাত দেড়টায় সেখান থেকে বুড়ো পানওলাকে নিয়ে কলকাতাবাসী গাড়ির দিকে আসতে দেখেন, রাস্তায় ফুলের মালা অবিকল যেমন বর্ণনা তেমনইভাবে রয়েছে। সন্তর্পণে এড়িয়ে গেলেন দুজন। বুড়ো পানওলাকে একা ছেড়ে দিলে সে ছুঁয়ে ফেলত। কাশীর মুখে সতর্কবাণী উচ্চারিত না হলে কলকাতার ভদ্রলোক এক লাথিতে একে উড়িয়ে দিতে গিয়ে নিজে গুঁড়ো হতেন এখন বুঝলেন।

আমরা উড়িয়ে দিই যা কুসংস্কার বলে সব সময়ই তা কুসংস্কার নয় যে একথা আমরা বুঝি না, কারণ, গোঁফদাড়ি পেকে গেলেও আমরা আসলে সবাই অপ্রাপ্তবয়স্ক। দুপাতা ইংরিজি পড়া অথবা বলা দুপঙ্‌ক্তি কি দুছত্র গদ্য কিংবা পদ্য লেখা, একটু জটিল অঙ্ক একটু কম সময়ে করতে পারা, মানবজীবনের পূর্ণ চরিতার্থতা এ নয়। এহ বাহ্য। যদি চোখ খুলে যায় দৈবাৎ তবে দেখব আমরা, আমাদের হাতে কিছু নেই।

'হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

তরী পার হতে গিয়ে ভরাডুবি হই আমরা, কারণ আমরা ভীরু। রামকৃষ্ণের কথায় আমরা মূর্ছা যাই। কিন্তু তাঁর একটা কথাও আমরা বিশ্বাস করি না। করলে জানতাম, আমরা সবাই একদিন রত্নাকর থেকে বাল্মীকি হব। সবাই খেতে

পাবে, কেউ সকাল সকাল, কেউ বেলায়। পৃথিবী নামক বিশ্বনাথভূমিতে কেউ অভুক্ত রইবে না। যে কোনও জাত, যে কোনও ধর্ম, যে কোনও জন্ম হোক তার, মুক্তি তাকে পেতেই হবে কেন? কারণ জীবের মুক্তি না হলে শিবের মুক্তি কই।

শিব কে? না, যিনি জীবকে নিজের বুক থেকে ফেলে দিতে পারেন না। আর কাশী কি? না, কাশী হচ্ছে সেই জায়গা, যেখানে পৌঁছলে জীব জানতে পারে যে সেই শিব! এ কাশীতে পৌঁছয় কোটিকে গোটিক। আমরা সবাই যাই বেনারস ক্যান্টনমেন্টে, তাই কন্টেন্‌মেন্ট মেলে না কিছুতেই।

সেই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁর বালিগঞ্জের বাড়িতে বসে আরও একটি অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা আমাকে শোনান। সে ঘটনা কাশীতে ঘটে নি; ঘটেছে কলকাতায়। তবু তা বার্ধক্যে বারাণসীরই কথা, কারণ তা অপার্থিব কথা। ভারতীয় সাহিত্যের যা চিরন্তন কীর্তি তা সবই যেমন তার উৎসে হয় রামায়ণ-মহাভারত, নয় উপনিষদের, তেমনই ভারতীয় যোগসাধনায় আদিতে ও অন্তে রয়েছে অনাদি ও অনন্ত কাশী। আইনজ্ঞ, সাহিত্যপ্রিয়, প্রিয়দর্শন মানুষটি বলছিলেন গয়ায় এক সাধুর দেখা না পাবার পর কলকাতায় খবর পান যে সাধু এসেছেন। সাধুর সঙ্গে কলকাতায় সাক্ষাৎ করেন সস্ত্রীক। সাধুকে বিরক্ত করেন যাচাই করবার উদ্দেশ্যে। বলেন: রাশ্যার বৈজ্ঞানিকরা স্পুটনিক বলে একটি বস্তু শূন্যে ছেড়েছে যার পরবর্তী পদক্ষেপে মানুষ পৌঁছে যাবে চাঁদে। সাধু কিছু বলেন না। মনে হয় বৈজ্ঞানিক এই ব্যাপার সাধুর আওতায় নয়। আইনজ্ঞ ভদ্রলোক এর আগের বছর তাঁর আমেরিকা সফরের কথাও বলেন সাধুকে।

আমেরিকা কি তোমায় মৃত্যুভয় দূর করতে সাহায্য করেছে?—আচমকা প্রশ্ন সাধুর।

না—

তা হলে আমেরিকা কি করেছে?

কলকাতার সেই সর্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব ব্যাখ্যা করলেন সফরের উদ্দেশ্যে। বললেন: সকল মানুষের প্রসপারিটি, প্রোগ্রেস ইত্যাদি; অনেক কথা।

সাধু ধরে রইলেন তাঁর এক জিজ্ঞাসা সব অসুখ সারাবার মন্ত্রটি কি পেলে সেখানে?

সব অসুখ নয়, কোন কোনও অসুখ তারা সারাচ্ছে বটে —

না। আমি জানতে চাইছি সব অসুখ সারাতে পারে কি না, মৃত্যুঞ্জয় হবার মন্ত্র জানে তোমার আমেরিকা?

না—

তা হলে গত বছর গেছিলে আমেরিকায়, হয়ত আসছে বছর ছুটিতে যাবে চাঁদে, সেখানে গিয়েই বা কি হবে, যদি প্রতিবার মৃত্যুর ফাঁদে পড়ার হাত থেকে বাঁচার রহস্য না জানো—

ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করেন সাধু ভদ্রলোকের ওঠবার সময়ে : কোথায় থাকো ?

বালিগঞ্জে—

কতদূরে জানতে চাইছি, এখানকার কোনও জায়গাই চিনি না—

এখান থেকে পাঁচ-ছ মাইল হবে—

সাধুর কাছ থেকে বেরিয়ে যে লোকটি আমার সদ্য-পরিচিত সেই ভদ্রলোককে সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি ঈষৎ রাগ করেন : সাধু-মহাত্মাদের সঙ্গে কি কেউ এত তর্ক করে। তাঁদের কাছে যাই শোনবার জন্যে। শোনাবার জন্যে নয় ? কলকাতার খ্যাতনামা মানুষটি ভাবছিলেন সম্পূর্ণ অন্য কথা। সাধু হঠাৎ তার বাড়ি কতদূর এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন ?

এই 'কেন-'র উত্তর পেলেন কলকাতার বাড়ির নিস্তব্ধ শয়নগৃহে নিশীথ রাত্রে। পথের আলো এসে পড়েছে ঘরের মধ্যে। সেই আলোয় ঘুম ভেঙে যাওয়ায় ভদ্রলোক দেখলেন, সাধু দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে। তখন একটি অ্যালসেসিয়্যান ছিলো সেই ভদ্রলোকের। টিকটিকি নড়লে সে চেঁচাত। সে-ও নিঃসাড়ে ঘুমোচ্ছে। ভদ্রলোক তাঁর স্ত্রীকেও ধাক্কা দিয়ে তুললেন। সাধু শুধু বললেন : ডরো মাৎ।

তারপর হঠাৎ নির্বাপিত দীপগৃহ অন্ধকার। যেন ফিউস হয়ে গেছে। কোথাও সাধু নেই।

পরের দিন সাধুর ওখানে যেতে, কয়েকজনের সঙ্গে কথোপকথনরত সাধু যেন ইচ্ছে করেই ভদ্রলোকের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না।

অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ভদ্রলোক বলেন : আজ উঠি। আমার একটা প্রশ্ন ছিলো—

কাল তোমার ঘরে রাতে আমার যাওয়ার ব্যাপারে প্রশ্নের অবকাশ নেই। তোমার আমেরিকাকে বলো, যে যন্ত্রের চেয়েও দ্রুত, যন্ত্রের চেয়েও দূরে যেতে পারা যায়,—যদি কেবল এইটেকে বড়ো করতে পারো,—এই বুকের ভেতরটা—

ভারতের সত্যদ্রষ্টা কবির কথাও তাই :

> 'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূরে আমি যাই,
> কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই—'

অন্ধকার থেকে আলোয়, অসৎ থেকে সতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রাই চিরন্তন ভারতের স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম। এরই আদি ও অন্তে রয়েছে অনাদি কাশী। কাশী কেবল তীর্থ নয় ; ভারতীয় স্বপ্নসাধনা ও সংগ্রামের সতীর্থ ; স্বয়ং বিশ্বনাথের 'স্ব'-তীর্থ !

সাধু ওই বিখ্যাত সাকসেসফুল মানুষটিকে বলেছিলেন বুকের ভেতরটাকে বড় করতে। 'তোর মন' সব,—এই মন্তর জপতে জপতেই তো জীবের শিব হওয়া। পেঁৗছে যাওয়া মনের অতীত এমন রাজ্যে যেখানে 'কে তুমি' তার উত্তর মেলে। যেখানে এসেই সে জানে 'সে'-ই আমি ; আমিই সে'-ই !

ভোলেবাবার কথাও এই শ্রদ্ধেয় যুগল আমাকে প্রথম বলেন। কাশীতে যাঁর পরিচয় বাঙালী সাধু বলে, অথচ যাঁর সাধুত্বের অভিমান কদাচ প্রকাশিত, তাঁর বাড়িতে এক বৃদ্ধ ডাক্তারের যাতায়াত আছে। সেই ডাক্তার আবার এই আইনজ্ঞ খ্যাতনামা লোকটির বাড়িতেও আসেন যান। তিনি একবার ভোলেবাবা'র সঙ্গে সন্ন্যাসী হবেন বলে ট্রেনে উঠে পড়েন। ভোলেবাবা গর্জন করে ওঠেন : যা, যা, নেমে যা এখ্‌খুনি। তোর বউ-ছেলেমেয়ে আছে, তাদের দেখবে কে ? যদি না নামিস তো আমি ঠেলে ফেলে দেব তোকে—

দরজা খুলে ধরেন মেল ট্রেনের ভোলেবাবা। হাতে দেন একটা আপেল। খেতে বলে দেন সেটা। উপায়ান্তর না দেখে দুর্ধর্ষ বেগে ধাবমান মেল ট্রেন থেকে লাফ দেন ভদ্রলোক। মাটিতে পড়েন যেন থামা-ট্রেন থেকে নামলেন। ততক্ষণে বাড়ি থেকে বিশ-পঁচিশ মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে তাঁকে মেল্ ট্রেন। কী করে বাড়ি ফেরেন। ভাবতে ভাবতে হাতের আপেলের দিকে চোখ পড়ে। মনে পড়ে ভোলেবাবার কথা। খেয়ে ফেলতে বলেছিলেন। কামড় দিতেই ফলে, ভদ্রলোক দেখেন নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে তিনি।

ভোলেবাবার বেশ একটা ; ছদ্মবেশ অনন্ত।

এই মুণ্ডিত মস্তক। এই,—অভিজাততম রেস্তোরাঁয় আধুনিকতম-পোশাকে বলড্যান্সরত। পরিচিত একজন ওই অবস্থায় ভোলেবাবাকে দেখে অপ্রস্তুত। পাশের ঘরে ডেকে নিয়ে ভোলেবাবা বলেন : এত আশ্চর্য হবার কী আছে ?

এই পোশাকে ?—বিব্রত প্রশ্ন ভোলেবাবাকে বিব্রত করে না এতটুকু। বলেন পোশাকটা দেখিয়ে ভোলেবাবা : এই পোশাকটা কি আমি ?

চিরন্তন ভারত বলেছে তাই, দেহের ওপর ওই বসনটুকুই নয়, দেহও আসলে বসনমাত্র। মৃত্যু মানে জীর্ণবসন ত্যাগ ; জন্ম মানে,—নববস্ত্র পরিধান !

ভারতবর্ষ ছাড়া একথা কে বলেছে আর ? হিন্দুর একার ছাড়া এ কার দর্শন আর।

কাশীতে একটি অপরূপ সূর্যাস্ত হয়ে গেলো নীরবে ক'দিন আগে। প্রায় আড়াই-তিনশো বছরের এই মরদেহ নন্দনের সৌরভ এনেছিল বহন করে। দণ্ডে দণ্ডে পলে পলে নিজেকে দহন করে করে নিঃশেষ হলো একটি জীবন্ত ধূপ। নিভে গেলো একটি দীপের কাঠি। তার আলো কোনও কোনও ভাগ্যবানের অন্ধকার করে গেল দূর। কোনও উৎসবযাত্রা হলো না শবকে ঘিরে। খবরকাগজে ছাপা হলো না ছবি। শোকপক্ষ হলো না পালন করা। ছাই নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করার সুযোগ গেলো না পাওয়া। বক্তৃতা দেওয়া সম্পাদকীয় লেখা কিংবা ছুটি ঘোষণা কোনটাই দরকার পড়লো না। কারণ মরদেহে অমরাবতী রচনা করেছিলেন যিনি বহু শতাব্দী ধরে তিনি কোনও রাজনৈতিক নেতা ছিলেন না। রাজনৈতিক নেতাদের বাণীই হচ্ছে জীবন। এখানে যাঁর কথা বলা হচ্ছে তাঁর

জীবনই ছিলো তাঁর বাণী। সন্ন্যাস নাম তাঁর –বীতরাগানন্দ। কাশীর অসংখ্য সাধারণ নর-নারীর কাছে তিনি ছিলেন কুত্তাবাবা। বহু প্রভুভক্ত জীবের মধ্যে জগতের যিনি প্রভু তাঁর এক ভক্ত জীবনের শেষ অশেষ ক'টা বছর কাটিয়ে গেলেন কাশীর বানপুরিয়ায়। কেউ কেউ জায়গাটার সঠিক উচ্চারণ করেন,—বনপুরাওয়া বলে। কাশী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়িয়ে কিছুদূর এই অঞ্চল,—ফার ফ্রম দ্য ম্যাডিং ক্রাউড। নিরুপম নিস্তব্ধতায় মহাসন পাতা। সমস্ত শব্দর উৎস যেখানে, সেখানেও বুঝি এমনই পরমাশ্চর্য নিঃশব্দতা ; নিস্তব্ধতা।

জয়পুরে ১৮৬৭তে বীতরাগানন্দের জন্ম। এ কথা বীতরাগানন্দের মুখেই শুনে একজন লিখেছেন, কথাটা তবুও ঠিক নয়। তাঁর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশি। বীতরাগানন্দ এ কথাও বলেছেন আত্মপ্রশংসা এবং বয়স গোপন করায় কোনও অন্যায় হয় না। তা ছাড়াও মহৎ মানুষের চেয়ে যাঁরা কিছু অতিরিক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে কালের বিচার হাস্যকর। তৈলঙ্গ স্বামী একালের আর শংকরাচার্য সেকালের,—এ যারা বলে তারা জানেই না যে ওঁরা সবাই সেই একই উৎস থেকে উৎসারিত, যেখান থেকে উৎসারিত, সেখান থেকে অনাদিকাল ধরে—

'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।'

আমরা জানিই না যে যাজ্ঞবল্ক্য, বশিষ্ঠ, বাল্মীকি, বিশ্বামিত্র, চার্বাক, শুকদেব, ব্যাস, এঁরা আজও মানবদেহ পরিগ্রহ করে পৃথিবীতে আসেন 'সম্ভবামি যুগে যুগে' বিচ্ছেদহীন সূত্রে। তাঁদের তৃতীয় দৃষ্টিতে দেখে চিনতে ভুল হয় না। নরেনকে দেখে ঠাকুর বিস্মৃত হন নি বলতে: এত দেরি করতে হয় ? আমি যে তোরই জন্যে বসে আছি।

বীতরাগানন্দ তো তাঁরই দূত, কিংবা স্বয়ং তিনি, দুঃখে যিনি নিরুদ্বিগ্ন, সুখে যিনি বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ। না হলে কেন কাশীতে গেলেই যাঁর কাছে যাই,—তিনি বলবেন, যাও বানপুরাওয়ায় যাও, দেখে এসো, বীতরাগবাবাকে। ঈশ্বরের সবচেয়ে প্রিয় সতীর্থ মানুষের চেয়ে মহত্তর তীর্থ নেই। তাই কাশী মানেই কেবল দশাশ্বমেধ-মণিকর্ণিকা-হরিশ্চন্দ্রের ঘাট নয়, বিশ্বনাথের গলি কিংবা গঙ্গাস্নান নয়, নয় শুধু তিলেভাণ্ডেশ্বর কিংবা সংকটমোচন দর্শন। কাশীর পরিচয় কাশীতে বসে আছেন যাঁরা তাঁদের কালাতীত অবস্থান দিয়ে বলবার জন্যে যে,—

'ওরে ভীরু তোমার হাতে নাই ভুবনের ভার,
হালের কাছে মাঝি আছে করবে তরী পার।'

[বিশুদ্ধানন্দ, ভাস্করানন্দ, বীতরাগানন্দ এঁরা সবাই সেই এক 'আনন্দ'। একজনের নাম করলেই প্রণাম করা হয়ে যায় আরেকজনকে। গতকালকার, আজকের, আগামীকালের সূর্য বলবার, সূর্যকে 'সান' কিংবা Soleil কথাটি বলবার মানে হয় অথবা হয় না কারণ একই সূর্যস্নাত আমরা সবাই। সাধকের ক্ষেত্রেও এই এক সত্য। সব সাধকের সব সাধনার ধারা, শবসাধনার অশ্রুধারাও,

ধেয়ানে যাঁর মিলিত হয়েছে তিনি এবং আর সব এক ও অভিন্ন। কারণ এক ও অভিন্নর সাধনাই এঁদের সকলের সাধনা। এঁদের আর কোনও সাধ নাই।

কেবল কাশীতে আছেন এঁরা? না। কোথায় নেই? কলকাতাতে এমন লোক আছেন, এমন 'আলোক' যুগান্তের অন্ধকারে যাঁরা জ্বালিয়ে রেখেছেন বিশ্বাসের আলোকবর্তিকা। এঁরা নীরবে নিভৃতে, 'মানুষের ভালো হোক,' এই মন্ত্র অবিরত উচ্চারণে নিরত। বহু শতাব্দীর ওপর প্রাচীন এঁদের দেহ। লোকালয়ের মধ্যে দিয়েও যান। লোকে এঁদের জানে না কারণ এঁরা ভারতরত্ন নন। তবু এঁরাই ভারতের সেই রত্ন যা হাতে পেলে বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থ অর্থহীন মনে হয়।

যে বিখ্যাত আইনজ্ঞ ব্যক্তির কথা এর আগে বলেছি, তিনি আমাকে তাঁর অভিজ্ঞতার অনিঃশেষ ঝাঁপি উন্মুক্ত করবার কালে শান্তিনিকেতনের অদূরে ছিন্নকন্থায় শায়িত এক রমণীর মুখে এমন কথা শুনেছেন যা আজকের জগৎ-অশান্তিনিকেতনকে মুহূর্তে পূণ্য করে, পূর্ণ করে, পবিত্র করে যথার্থ 'শান্তি'-নিকেতন করে চোখের পলক পড়বার মুহূর্তে পরিণত পরিপূর্ণ করে সে; সম্পূর্ণ করে। মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া সেই একফালি শরীর সাধিকার। আইনজ্ঞ বিনয় করে নয়, সত্য করেই বলেছেন যে, তাঁর মতো সামান্য মানুষকে সেই অসামান্য সাধিকা যেন কিছু উপদেশ দেন দয়া করে। দপ করে জ্বলে উঠেছে দু'টো চোখ অন্ধকার কোটরে। সাধিকা, আইনজ্ঞের পকেটের দিকে অঙ্গুলি সংকেতে জিজ্ঞেস করেছেন: ওটা কি? দেশলাই?

ভয় পেয়েছেন আইনজ্ঞ ব্যক্তি। এই বুঝি ধূমপানের কুফল সম্পর্কে আরম্ভ হয় অনর্গল বক্তৃতা। না। চিনতে পারেন নি তখন মাটির সঙ্গে মিশে যাওয়া শরীর সেই 'মা'-টিকে।

সাধিকা বলছেন সঙ্গে সঙ্গে: ওই বস্তুটি কি যে জানে না সে ওকে বলবে সামান্য। যে জানে সে বলবে একটু অসতর্ক হলে আমরা এই কুঁড়ে থেকে শুরু করে এই অঞ্চল, এমন কি বহুদূর পর্যন্ত ভস্মীভূত করবার অদ্ভুত শক্তি পাই ওই সামান্য দেশলায়ের কাছে।

কে বলবে, কে সামান্য আর কে অসামান্য। সাধিকা তারপর আবৃত্তি করতে থাকেন মাণ্ডুক্যপণিষদ থেকে। মাটির বুক বিদীর্ণ করে 'মা'টির মুখে উচ্ছ্বসিত হয় করুণার ধারা।

আইনজ্ঞ ব্যক্তির শুধু মনে হয়, অনাদিকালের এই ভারতবর্ষ যেন তাঁর কণ্ঠে কথা বলছে সেই মুহূর্তে। অথচ কে খবর রাখে, খবরকাগজে নাম না-ছাপা এই সাধিকার। শান্তিনিকেতনে আসে না এমন বিশ্বনাগরিক আজ কে আছে। তবু তারা কে জানে শান্তিনিকেতনের অদূরে আছে এক এমন বিস্ময় নাগরিক।

কলকাতায় এখনও লোকহিতে নিরত এক ফকিরের কথা আমি শুনেছি অসম্ভবকে সম্ভব করা, সম্ভবকে অসম্ভব করার খেলায় যিনি শিশুর মতো

আনন্দ পান কখনও কখনও। পঙ্গুকে দিয়ে গিরিলঙ্ঘন করানো, বাচালকে মূক করা—এ দুয়েতেই তাঁর ইচ্ছা সমান কার্যকরী। এঁর একজন অনুগত এক সময়ে ফকিরকে ফিকির মনে করতেন। ফকির একে দিয়েই এর একজন লোকের দুরারোগ্য যন্ত্রণার উপশম করান। কাতর ব্যক্তির বাড়ির লোক ছুটে আসে অবিশ্বাসী ব্যক্তির কাছে, বলে, বাবাকে আপনি একবার ছুঁয়ে দিলেই তিনি ভালো হয়ে যাবেন। এ অনুনয় প্রথমে উপেক্ষা করলেও শেষ পর্যন্ত যেতে হয় একদা অবিশ্বাসীকে ; অঘটন ঘটবার পর তিনি বোঝেন সবাই ফিকির করে না ; কেউ কেউ ফকিরিই করে। বিশ্বের সকল আবরণের অধীশ্বর যেমন স্বেচ্ছায় দিগম্বর, তেমন সকল রত্নের মালিক নিজের খেয়ালেই যে ফকির,—এ খেয়াল ততদিনে একদা অবিশ্বাসী ব্যক্তির আয়ত্ত হয়েছে।

সাধু এবং ফকিরের বেলায় হিন্দু না মুসলমান,—এ প্রশ্ন নিরর্থক। বয়সের বেলাতেও যেমন, জন্মের ক্ষেত্রেও তেমনই। যতক্ষণ জন্ম-মৃত্যুর অতীত অজানা ততক্ষণই নিজেকে হিন্দু বা মুসলমান বলে জানা কিংবা জানানো। সেই সাধনায় আনন্দময়ীকে জানা সেই ভুল ভাঙা। আমরা সবাই সেই এক-এরই যে অনন্ত চেহারা মনে পড়া সেই। মান আর হুঁশ, মানুষের ধর্ম হচ্ছে এই, কারণ মান আর হুঁশ,—এই দুইকে দিয়ে ধারণ করেই মানুষ,—মানুষ, কিন্তু মান হুঁশের চেয়েও মানুষ বড়। কোনও কোন মানুষ। তাঁরা কাউকে ধারণ করেন না ধর্ম স্বয়ং তাঁদের ধরে আছেন। দেশ-কাল-ধর্মের চেয়েও তাঁরা বড় এবং পরমাশ্চর্য খেলা সেই একমাত্র 'খেলোয়াড়'-এর হচ্ছে এই যে এই সব মহাত্মাদেরও পতন হয়।

পতন অভ্যুদয়ে তাই বন্ধুর বড় পথ, যে পথে দুঃখের বরষার চক্ষের জল নামলে বক্ষের দরজায় এসে দাঁড়ায় 'বন্ধু'র রথ।

তবু এখনও গেল না আঁধার। এখনও রহিল বাধা। এখনও সংশয়। এখনও সন্দেহ। এখনও জিজ্ঞাসা। একবার মনে হয় আছে, আরেকবার মনে হয় নেই। একবার মনে হয়, মৃত্যুতে সব শেষ। আরেকবার মনে হয় জীবন অশেষ। একবার মনে হয় ভস্মীভূত দেহ যে আর 'পুনরাগমন' করে না, একথা নিঃসন্দেহ। আরেকবার মনে হয় বর্ষশেষ মানে নববর্ষারম্ভ ; মৃত্যু মানে নবজন্মর সূচনা। একবার চার্বাককে মানি, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ। আরেক-বার মনে পড়ে চির বাক : দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু চ বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ।

অবিশ্বাসী দেওয়ালে লেখে : God is nowhere। বিশ্বাসী বালক পড়ে সেই একই লেখা আরেক চোখে : God is now here !

সন্দেহ থেকে নিঃসন্দেহে, অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে অমৃতে পৌঁছনই ভারতবর্ষের স্বপ্ন, সাধনা ও সংগ্রাম। জন্ম থেকে জন্মান্তরে, মৃত্যু রাখাল আমাদের তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে নব নব সৃষ্টির প্রাঙ্গণে। বলছে

চরৈবেতি চরৈবেতি। চলো, চলো, বলছে না শুধু ; বলছে, জ্বলো, জ্বলো। সেই পুণ্যপাবক স্পর্শ করুক যার ছোঁয়ায় আঁধারের গায়ে ফুটে ওঠে নব নব তারা। যতক্ষণ পর্যন্ত আপনাকে জানা ফুরোচ্ছে না ততক্ষণ মুক্তি নেই জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে। কর্মচক্রান্তে এ চক্র আমাদেরই তৈরি। এর থেকে মুক্তি সেও আমাদেরই অনায়াস।

ধ্রুবকে নিয়ে শ্রীহরি বেরিয়েছেন জলবিহারে। পাহাড়ের গায়ে এসে ঠেকেছে নৌকো। ওটা কি পাহাড়? প্রশ্ন করেছে শ্রীহরির প্রাণ বালক। ধ্রুবভক্ত শ্রীহরি বলেছেন: পাহাড় নয়, ও তোমারই অসংখ্য বিগতজন্মের দেহের হাড়। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনায় সামান্য একটু বাকি ছিলো অংক মিলতে, হরির সঙ্গে তাঁর অংকে মিলতে, সেটুকুর জন্যেই এবার আসা। তাই ধ্রুব শেষ জন্মে, জন্মেই নাম করে শ্রীহরির, প্রণাম করে শ্রীহরিকে। লোকে অবাক হয়। ধন্য ধন্য করে ভক্ত ধ্রুবকে। সে জানে না তাই এমন করে। ধ্রুব যে শ্রীহরির নাম নেয় জন্মেই, সে নাম না নিয়ে পারে না বলেই নেয়। যেমন পারে না প্রজাপতি পাখা না সঞ্চালন করে। সংখ্যাতীত জন্মে যাঁকে খুঁজে পায় নি ধ্রুব, শেষ জন্মে সেই নিখোঁজ নিজে এসে দেখা দিয়েছে ভক্তকে।

এবং আমরা সবাই. তুমি-আমি যে যেখানে আছি সে সেখানে থাকব না, সবাই পেঁছিব তার পায়। কারণ আমরা না পেঁছিন পর্যন্ত, কেবল ভক্ত নয়, স্বয়ং ভগবানও নিরুপায়। এই কথাই ঠাকুরের মুখেও শুনি, ঈশ্বরের দূত দক্ষিণেশ্বরের ঠাকুরের মুখেও শুনি যখন তিনি বলেন: সবাই খেতে পাবে, কেউ সকাল-সকাল কেউ বেলায়।

বিশ্বনাথের বিশ্বে সবাই খেতে পাবে, বিশ্বের যত অনাথ। সকলের অন্ন না জোটা পর্যন্ত অন্নপূর্ণা নাম সম্পূর্ণ হবে কেমন করে? সকলের বস্ত্র অঙ্গে না ওঠা পর্যন্ত তিনি দিগম্বর হন কি করে? মৃত্যুঞ্জয় না হওয়া পর্যন্ত ভক্ত, শ্মশানে শবের ওপর দিগম্বরীর নিত্য কালের উৎসবলোকে বিশ্বের দীপালিকায় আমি মাটির প্রদীপ তাহলে কি করে বলি, 'জ্বালাও আমার শিখা?'

এই আমি কে?—মাটি। ওই আমি কে—মা-টি! এই মাটি আর ওই 'মা'-টি এক না হওয়া পর্যন্ত, একাকার না হলে এ মাটির মুক্তি নেই; ও 'মা'-টিরও বন্ধন অব্যাহত।

এই কেবল ধ্রুব সত্য। আর সবই অধ্রুব। হয় অলৌকিক, নয় অলীক।

তবে? যদি সবই শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত থাকে, শেষ পর্যন্ত উৎসব হয় আমরা যারা আজ শব আছি সবাই হব উৎসব-এর আলো তবে কেন সাধনা করা, তবে কেন পাপ-পুণ্য ভেদাভেদ। তবে কেন বলা: এই কর, ওই কর। আর কিছুরই জন্যে নয়, কিছুক্ষণের খেলা জমাবার জন্যে শুধু। নিজেরই সঙ্গে নিজের খেলা? খেলা করবার জন্যেই, ইচ্ছে করেই ভোলা যে আমিই জগৎস্বামী; আমিই স্বয়ং ভোলানাথ। খেলতে নেমে ভোলা না গেলে যে আমিই রাজা।

তাহলে যে ভিক্ষে-ভিক্ষে খেলা জমে কি করে। ভুলতে ভুলতে কর্মকে কুড়িয়ে পাওয়া পথে, তারপর জড়াতে জড়াতে, খুলতে খুলতে কর্মচক্র ভিখিরির আবার রাজা হওয়া। রাজার ভিখারি তখন আবার ভিখিরির রাজা।

[আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে]

হাসিকান্নার হীরা পান্না আমারই চেতনার রং। এখন অচেতন হয়ে আছি, না চিনবার খুশিটুকু পাব বলে। আবার খুশি হলেই চিনব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, তমো-রজো-সত্ত্ব, এ সবই 'আমি'।

তবু বিশ্বাস হয় না কারণ এখন আমার চেতনার চেহারা অবিশ্বাস। এখন সেই আমি ধরায় এসেই বলছি, শ্রাদ্ধ করার কোনও অর্থ হয় না, কারণ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই যে দেহ ভস্মীভূত তাকে জল দেবার অর্থ হয় না। যুক্তি দিচ্ছি, বেঁচে থাকতে তাহলে একতলার ঘরে খেতে দিলে তিন তলায় বসে কেউ স্বচ্ছন্দে তা খেতে পারত, যদি মর্ত্যলোকে খেতে দিলে অমর্তলোকে তা কেউ গ্রহণ করতে পারে।

তখন আমার যুক্তি খণ্ডন করবার জন্যে আমিই অঘটন ঘটাই। যেমন ঘটিয়েছি অসংখ্যবার। এই সেদিনও তো কলকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যেই সেই অঘটন ঘটালাম আবার।

॥ পঁচিশ ॥

কলকাতা থেকে কয়েক মাইলের মধ্যে বেশ কয়েক বছর আগে এই অঘটন ঘটে। এক ভদ্রলোকের বাড়িতে একটি কুকুর সতৃষ্ণনয়নে বাড়ির মালিকের দিকে তাকিয়ে কি যেন বলবার চেষ্টা করে। প্রথমে ব্যাপারটা এমন ব্যতিক্রম কিছু মনে হয় নি ! যেমন আর পাঁচটা কুকুর কখনও কখনও খাবার বা আদরের লোভে কিংবা অকারণ পুলকে করে থাকে, তেমনই মনে হয়েছিলো। তারপর দেখা গেলো তা নয়। কুকুরটি একটু বেশি রকমের কাঙাল। খাওয়া কিংবা আদর বা অকারণ পুলক নয়। সে যা বলতে চায়, সে যা বলতে পরছে না তা কোনও গভীর গুরুতর ব্যাপার। মনে হলেও একথা বাড়ির কারুর, বাড়ির কর্তা তার তেমন কোনও গুরুত্ব দিলেন না। বরং বিরক্ত হলেন বেশ। দূর দূর করে তাড়াতে চাইলেন কুকুরটিকে। কুকুরটি অবশ্য গেল না। ভদ্রলোকের মন থেকেও না ; সেই স্থান থেকেও না।

স্বপ্ন দেখলেন রাতে তাঁর কাছে এসে বলছেন একজন : আমি তোর গত-জন্মের পিতা। গর্হিত কোনও অপকর্মের জন্যে কুকুর হয়ে জন্মেছি। তুই আমার মুক্তির জন্যে গয়ায় যাবি। সেখানে কি করতে হবে তাঁকে সে কথা স্বপ্নে বলে দেন তাঁর পূর্বজন্মের পিতৃত্বের দাবীদার। স্বপ্নভঙ্গ হলে ভদ্রলোক

অস্বীকার করেন স্বপ্নাদেশকে। সারাদিন ঐ কুকুরটির চিন্তা তাঁর পক্ষে গুরু-পাক্ হয়েছে বলেই এই আজগুবি স্বপ্ন,—এই তাঁর ধারণা হয়। ধারণার বশবর্তী হয়ে কুকুরটির ধার-কাছ মাড়ান না তিনি।

পরের দিন রাতে দ্বিতীয়বার স্বপ্নদর্শন হয়, এবারেও সেই একই মূর্তি আবির্ভূত হয়ে বলেন: আমার কথা তোর বিশ্বাস হচ্ছে না? বেশ প্রমাণ দিচ্ছি মিলিয়ে নে।

এই কথার পর তিনি একটি জায়গার কথা বলে দেন। যেখানে মাটির নীচে বেশ কিছু টাকা পোঁতা আছে বলে তিনি জানান।

অর্থবহ বাস্তবের গন্ধ পাওয়া মাত্র এবারে স্বপ্নকে অস্বীকার করা গেল না আর। মাটি খুঁড়বার জন্যে কুলি-কামীন যোগে নির্দিষ্ট জায়গায় গেলেন বাড়ির মালিক এবং বেশ কিছু টাকা পেলেন মাটির নীচ থেকে। সে টাকা এবং গত জন্মের পিতাকে তাঁর পাপ থেকে যথারীতি উদ্ধার করলেন এবার। তারপর বাড়ি করলেন একখানা সেই টাকায়। ঘটনার নিষ্পত্তি হলো না এখানে।

ভদ্রলোকের এ জন্মের ভাই দাবী করলেন বাড়ির অংশ। তাই নিয়ে মামলা হলো। মামলায় প্রমাণিত হলো এ জন্মের পিতার অর্থে সে বাড়ি হয় নি, অতএব ভাইয়ের কোনও দাবী থাকতে পারে না ওই বাড়িতে।

এ ঘটনা যিনি আমাকে বলেছেন তিনি এসব অঘটনে বিশ্বাস করেন না এবং মিথ্যাকথা বলেন না।

আমি জানি। এ অঘটনকে অবিশ্বাস্য বলে উড়িয়ে দেবার লোক আছে। কিন্তু তাতে এসে যাবে না কিছু। কারণ বিশ্বাসের আলোক আমার কাছে যুক্তির রঞ্জনরশ্মির চেয়ে ছোটো নয়। লজিক্যাল এবং এস্ট্রোলজিক্যাল,—দুয়েরই মূল্য আছে আমার কাছে। গণনায় কোনও কথা মিলে গেলে যদি একটা কথাও হয়, যেহেতু তা লজিকে পাচ্ছি না সেইহেতু তা গণনায় ধরব না, বা কাকতালীয় বলে উড়িয়ে দেব, এ আমার ধর্ম নয়। যুক্তি মানি বলে, মুক্তির চেয়ে বড় কিছু মানি না,—এ আমি মানি না। এ অমান্য, করাকে আমি ধর্ম বলি না, আমি অধর্ম বলি। যা শুনব, বা দেখব, তাই বিশ্বাস করব কিংবা অবিশ্বাস করব— এ মানুষের ধর্ম নয়।

আমার 'বার্ধক্যে বারাণসী'-র দ্বিতীয় পর্বের জীবন-নদীর রথ এবার সিন্ধুতে প্রবেশ করবার মুহূর্তে যাঁকে স্মরণ করছে তাঁর নাম,—শক্তিপদ বসু-রায়। কাশীর এবং আমার জীবনে অবিস্মরণীয় এই মানুষটিকে প্রণাম। এই একটি লোকের জন্যেই,—এই একটি পরমাশ্চর্য আলোকের জন্যেই মানুষের মহত্তম তীর্থ মহাকালের সতীর্থ কাশীদর্শন সার্থক। একজন লোক,—স্ত্রী-লোকের চেয়েও কত আকর্ষণের চুম্বক হতে পারে, রমণীর চেয়ে কত রমণীয় হতে পারে একজন মানুষের সঙ্গ, নশ্বর পৃথিবীতে কি অবিনশ্বর বাণীর প্রতি-মূর্তি হতে পারে একজন, এই 'একজন' সেই আর 'একজন'-এর প্রতিচ্ছায়ায়

জ্বালাতে পারে। মরলোকে অমরলোকের আলো,—শক্তিপদ বসুরায়কে যে চোখে দেখে নি তার ধারণা করা শক্ত। চোখে দেখলেও সকলের পক্ষে তা সহজ নয়। কারণ আমরা সবাই প্রায় অন্ধ। কেউ অর্থে, কেউ কামে, কেউ খ্যাতিতে কেউ রূপে। পরমার্থে কিম্বা অপরূপে কদাচ। তবু কেউ কেউ, কোনও কোনও ধ্যানী, নিঃসঙ্গ কোনও কোনও বিহঙ্গ কেঁদে বেড়ায়, অর্থ নয়, খ্যাতি নয়, সচ্ছলতা নয় · আরো এক বিপন্ন বিস্ময়।

না। বিপন্ন বিস্ময় নয়, সম্পন্ন আশ্বাসের জন্যে যদি কেউ আকুল হয় দৈবকৃপায় তা হলে তার কূল মিলবে কাশীতে, ঘাটের ওপর সাধারণ গৃহস্থ বাড়িতে অসাধারণ গৃহস্থ শক্তিপদ বসুরায়কে যদি সে দেখতে পায়। চর্মচক্ষে নয়। মর্মচক্ষে সে দেখবে,—মানবজীবন 'নিরুদ্দেশযাত্রা' নয়। তার একমাত্র উদ্দেশ্য, – নিজেকে জানা। কোটি জন্মের সুকৃতির ফলে একটি মানুষ তার জীবনের উদ্দেশ্য খুঁজে পায়। তখন থেকে আর কোনও জন্ম তার বিফলে যায় না।

শক্তিপদ বসুরায়,—শক্তিদা বা শক্তিবাবু, বাঙালী সাধু, যে নামেই ডাকো তাঁকে একই আলো বিচ্ছুরিত দু'চোখে সারাক্ষণ। ভালোবাসার আলো, আলো আর আশার করুণাধারায় বিগলিত দু'টি চোখ। মর্ত্যের কিংবা অমর্তলোকের কোনও স্ত্রীলোকের চোখে এ জাদু নেই। এ চোখ আসক্ত করে না; নিরাসক্ত করে। রূপের উজান বয়না এ চোখে; অপরূপের উৎস খুলে দেয় দু' চোখে। ক্ষণকালের দৃষ্টিতে চিরকালের আভাস।

শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে কাশীর দিগ্বিজয়ী সাধক-পণ্ডিত আসেন, রাজনীতির ধুরন্ধর ব্যক্তি আসেন, সুরসাধক, লেখক, ডাক্তার, অধ্যাপক, খ্যাত-অখ্যাত নরনারী আসেন। কথা শুনতে আসেন, কথা বলতে আসেন। লৌকিক ও অলৌকিক প্রার্থনা নিয়ে আসেন। কিন্তু শক্তিপদ বসুরায় আমার চোখে লৌকিক সাচ্ছল্য ও অলৌকিক দীনতার চেয়ে অনেক বড়ো। তাঁর ওপর বিদেহী আত্মার ভর হয়েছে, এমন কথা শুনে আমার বিস্ময় উদ্রিক্ত হয় না। হিমালয়ের মানব পদক্ষেপযুক্ত ক্ষেত্রে মুক্তপুরুষের পদক্ষেপ পড়ে, এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই। শক্তিপদ সাধু,—একদা রাজনীতিকরা, কাজী নজরুল ও সুভাষের অনুরাগী, শক্তিপদ অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী,—এহ বাহ্য। শক্তিপদ বসুরায়ের ঘরে কলকাতার নামকরা ডাক্তারকে দেখেছি, সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীকেও; কলকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতির যাওয়া আসা আছে শুনেছি। অতি সাধারণ [আমাদের পরিভাষায়] নর-নারীকে প্রণাম করতে দেখেছি। চিঠি পড়ে থাকতে দেখেছি, দূরের ও কাছের। কিন্তু এও তুচ্ছ।

শক্তিপদ বসুরায় থাকেন মোটামুটি স্বাচ্ছন্দ্যে। গঙ্গার ওপর দুরন্ত হাওয়ার মধ্যে তাঁর থাকা-খাওয়া। সিগারেট প্রায় অনর্গল চলে। চা-ও চলে ঘন ঘন। খাওয়াতে ভালোবাসেন খুব। খেয়ে খুশি হন। কেউ, শক্তিপদ সাধু মনে

করে গেলে, বলে দেন স্পষ্ট, 'আমি সাধু নই সাধারণ গৃহস্থ।' আমাকেও আরম্ভে তাই বলেছিলেন যে, 'আমি কিন্তু সাধু-টাধু কিছু নই।'

অবিনয়ে বলেছিলাম তৎক্ষণাৎ: আমি অত্যন্ত অসাধু পুরুষ, কাজেই সাধুর সন্ধানে আমি আসি নি; আমি এসেছি আপনাকে দেখতে কেবল।

সত্যিই তাই। লোকে পূর্ণিমার রাতে তাজমহল দেখতে যায়; সূর্যোদয়ে যায় টাইগার হিলে উঠতে; তীর্থে যায় পুণ্যসঞ্চয় করতে; জীবন দেখতে যায় বারে এবং বারবনিতার গৃহে। আমি কাশী যাই, তীর্থ করতেও নয়, পুণ্য করতেও নয়। কাশীর দিদিমার কাছে যাই আর দেখতে যাই শক্তিপদ বসুরায়কে।

মানুষের মধ্যে আর একজন কতবড় মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে, শক্তিপদ বসুরায় তার দ্বিতীয় রহিত দৃষ্টান্ত। 'মানুষের ভালো হোক,' শক্তিপদ বসুরায় যেন তার জীবন্ত মন্ত্র। জাতিধর্মনির্বিশেষে মানুষকে দেখলেই মনে মনে বলো: ভালো হোক। শুধু এই মন্তোর-জপ জপতে জপতে মন তোর উধাও হোক সীমার গণ্ডী পেরিয়ে অসীমে।

অন্ধকার আলো হোক মুহূর্তে; মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রা হোক আরম্ভ। মানুষের ভালো হোক,—এর চেয়ে বড় কথা, মানুষের মুখে আমি শুনি নি। মানবজীবনে সবই মন্ত্রণা; মন্ত্র কেবল ওই,—মানুষের ভালো হোক। এ মন্ত্র নিরন্তর বলতে বলতে মানুষের রোমকূপ অমৃতনিস্যন্দী হয়; চলার ছন্দ হয় পরিবর্তিত। মানুষের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে বইতে থাকে অন্য বাতাস। মানুষের চোখে উদ্ভাসিত হয় অন্য এক আকাশ। চোখে দেখা যায় যে আকাশ তার চেয়ে অনেক নিরুপম। নিবিড়তর নীল; তার চেয়ে অসীমতর। এ আকাশে ওড়বার পাখা ওই মন্ত্রে পায় মানুষ:

ক্ষমা কর সবে, ভালোবাসো।
অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো!

এ মন্ত্র উচ্চারণমাত্র রণ শেষ! মরণ পরাস্ত! মল,—পরিমল। শক্তিপদ বসুরায়ের চোখের তারায় আর এই মন্ত্রময়ী তারায় কোনও তফাত নেই। চেয়ে দেখো ওই চিরন্তন ভারতের চোখের দিকে। সে বলছে মৃত্যুদীপদীপ্ত জীবনের জ্যোতির্ময়ী তপস্যায় যাঁরা জেনেছেন মানুষ অমৃতের সন্তান, তাঁরা জেনেছেন অন্ধকার থেকে আলোয় মৃত্যু থেকে অমৃতে, বন্ধন থেকে মুক্তিতে যাত্রাই জীবনের উদ্দেশ্য। চেয়ে দেখো তাঁদের চোখে, শ্যামলাবিপুলা এ ধরার দিকে চেয়ে আছে অনন্তকাল ধরে এক অধরা। নক্ষত্রখচিত নীলাম্বরা সে বিরহবিধুরা। পূর্ণিমার পাত্রে আনন্দের অমৃত বহন করবে সে আর কতকাল। অন্তহীন আমার অবিশ্বাস ছিন্নভিন্ন করে কবে দেখা দেবে, মানুষের কণ্ঠে তার নিরুপম নীরব বীণাখানি: ভালো হোক!

ভালো হোক সকল মানুষের। বিশ্বাসের আলো হোক যত অবিশ্বাসের কালো। টেলিভিসান থেকে ভিসানে, কামফর্ট থেকে কনটেনমেন্টে, কম্পিটিশান

থেকে আত্মসমাহিত, সংগ্রাম থেকে শান্তিতে। মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে চলো। জয়ধ্বনি করে 'নির্বোধ' নবজাতকের। বলো, মানুষের জয় হোক। সে জয়, দেশের স্বাধীনতা হরণের নয়। দেশ ও কালের কাছে মানুষের অধীনতা মুক্তির বিস্ময়। দেশ জয় নয়, হৃদয় জয় কর মানুষের। বলো,—এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি।

সেই মধু,—মধু ও কৈটভের মুক্তিকে করুক মধুর।

শক্তিপদ বসুরায়-এর জীবন উপন্যাসের মতো অলীক নয়; কিন্তু উপন্যাসের চেয়ে অলৌকিক। যে কোনও উপন্যাসের চেয়ে যে মানুষের জীবন অনেক বৃহৎ, একথা কে জানতো শক্তিপদকে না দেখলে।

শক্তিপদ বসুরায়ও একদিন অবিশ্বাসী ছিলেন। একদিন তিনি জীবনের দেওয়াল জুড়ে লিখেছিলেন, লিখে চলেছিলেন—God is no where ! আরেকদিন তাঁর নিজের হাতে সেকথা মুছে দেবার জন্যেই লিখেছিলেন—এখন সে কথা মুছে নিজের জীবন দিয়ে যে কথা লিখছেন, God is now here !

যতবার মানুষ যুদ্ধ করেছে মানুষের সঙ্গে, ততবার লেখা হয়েছে এই অসত্য উক্তি। God is no where ? যতবার মানুষ মানুষকে দেখে বলেছে, ভালো হোক। ততবার লেখা হয়েছে এই সত্য ভাষণ : God is now here !

শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে যাবার সময় সংকল্প করে যাই, God is nowhere ! কাছে গিয়ে মনে হয়, God is now here !

God মানে আকাশে কোনও চতুর্ভুজ অবস্থানকারী নয় [Beware of the man whose God exists in the heaven] God হচ্ছে Good-এর সামটোটাল। মানুষের Good যে চেয়েছে সেই God-এর দেখা পেয়েছে। যখনই বলেছে তখনই। 'God is now here,'—সম্ভব হয়েছে।

মানুষের Good-ই হচ্ছে মানুষের God ! শক্তিপদ বসুরায়ের কাছে গেলে এই Good-এর, সেই God-এর স্পর্শ পাই। এই স্পর্শ সেই স্পর্শাতীতের ছাড়া আর কার !

॥ ছাব্বিশ ॥

আলিপুর চিড়িয়াখানায় বাঘ বসেছিলো ঘরের মধ্যে যে ছোট ঘুপচি, সেখানে ঘাপটি মেরে। যারা এসেছিলো বাঘ দেখতে তারা মনঃক্ষুণ্ণ। বাঘের ফুল পোর্ট্রেইট্ না দেখা গেলে আর কি দেখতে আসা গেল চিড়িয়াখানায়। এমন সময় ভিড়ের মধ্যে শোনা গেল আশ্বাসবাণী। কে যেন কাকে জিজ্ঞেস করছে : বাঘ দেখবি ? যেন দেখতে ইচ্ছে করলেই বাঘকে তুড়ি দিয়ে টেনে এনে হাজির করবে, গরাদের ওপারে, তার পূর্ণ ম্যাজেস্টিতে খাড়া বাঘকে এনে দাঁড় করাবে

মুখোমুখি। যাকে জিজ্ঞেস করা তার সানন্দ সম্মতির আগেই, আশ্বাসদাতার চোখ বাঘের চোখের ওপর গিয়ে পড়েছে। মনুষ্য ও ব্যাঘ্রের শুভ ও অশুভ দৃষ্টি বিনিময়। হুংকার দিয়ে বাঘ এসে লাফ দিয়ে পড়েছে লোহার গরাদের ওপর। মাঝখানে লোহার গরাদ, তবু ভরসা হয় না যেন। আরেকবার চোখে চোখ পড়ে গেলে, এ গরাদের বাঁধা বাঘ আর মানবে বলে মনে হয় না। যে ব্যক্তি বাঘ দেখাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, সে ব্যক্তি ভিড়ের মধ্যে সকলের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সরে গেছেন অন্যত্র।

সে লোক কে? সে লোক শক্তিপদ বসুরায়, যার দু'চোখের দীপে নিরন্তর জ্বলছে একটি আলোক: মানুষের ভালো হোক!

অ্যাটম-হাইড্রোজেন-নিউট্রন, মনার্কি-ডিক্টেটারশিপ-সোস্যালিসম-কম্যুনিসম, —এসবই মন্ত্রণা; মন্ত্র কেবল ওই একটিই,—মানুষের ভালো হোক! অন্তর থেকে নিরন্তর উত্থিত এই একটি মন্ত্রধ্বনি, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অন্ধকার থেকে আলোয়, অসৎ থেকে সৎ-এ নিয়ে যেতে পারে কোটি কোটি মানুষকে। এই বিশ্বাস মূর্ত করে তোলাই হচ্ছে মূর্তি-পূজা! মূর্তি-পূজাই মুক্তি দিতে পারে লোককে, সীমার বন্ধন মোচন করে দিতে পারে মুহূর্তে, মানুষের চেয়ে অনেক বড় করে দিতে পারে মানুষকে।

দস্তয়েভস্কি যখন বলেন, একটি মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত যতক্ষণ না সমস্ত মানুষ মিলে করছে, ততক্ষণ দেখা নেই তাঁর যে নবজাতকের উদ্দেশে এই জয়ধ্বনি অমরাবতীর দিকে উঠে গেছে: জয় হোক মানুষের, জয় হোক চিরজীবিতের, তখন এই মন্ত্রই উচ্চারিত: মানুষের ভালো হোক!

রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন: 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ',—তখন যে মন্ত্রে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত তা ওই অমোঘ অব্যর্থ বাণী: 'মানুষের ভালো হোক—।' জিসাস ক্রাইস্ট যখন সমস্ত মানুষের পাপের প্রায়শ্চিত্ত একা করবার জন্যে ক্রসবিদ্ধ, তখনও যখন বলেন: ওরা জানে না ওরা কি করছে তুমি ওদের ক্ষমা কর,—তখন এই মৃত্যুঞ্জয় মন্ত্রর কাছে দানবের মন্ত্রণা হার মানে।

যে কোনও লোক যদি তার জীবন দিয়ে জ্বালতে পারে এই আলোক: মানুষের ভালো হোক, তা হলে তার ওপর আক্রমণ আসবে দেবলোক থেকে। ইন্দ্রের আসন ঈর্ষায় চঞ্চল হবে। ভয় নয়, নয় লোভে, শক্তি কামনা করে নয়, রূপ-জয়-যশ প্রার্থনার কারণে নয়, শত্রুর নিধন চাই,—এই রক্তিম বাসনাতেও নয়, একটি মানুষের প্রতি নিশ্বাসে যদি এই মন্ত্র নির্গত হয়, যে, মানুষের ভালো হোক, তা হলে, 'মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে জাগে রোমাঞ্চ, ওই মহামানব আসে।'

ম্যান থেকে সুপারম্যান জন্মায় মন্ত্রণা করে নয়; মন্ত্র থেকে,—মানবজীবনের সে একমাত্র মন্ত্র আজও উচ্চারিত হবার অপেক্ষায়: মানুষের ভালো হোক!

ভারতবর্ষের তপোবনে তাই এ বাণী একদিন প্রাণ পেয়েছিলো কয়েকটি মহৎ মানুষের জীবনে: এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি। শ্রদ্ধের

মন্ত্রেও তার প্রতিধ্বনি। যদি এমন কেউ কোথাও থাকে, অপুত্রক কোনও হতভাগ্য, তা হলে তাঁর অতৃপ্তি মোচনের উদ্দেশে এই অঞ্জলি উৎসর্গ করি। কোনও মানুষের মুখে এর চেয়ে মহত্তর কথা কোনও দেশে কোনও কালে কেউ উচ্চারণ করেছেন বলে আমি জানি না। তমো থেকে মহত্তমে পৌঁছনর পথ একটিই। ভালোবাসা। কোনও জাতি, কোনও দেশের প্রতি বিদ্বেষের মধ্যে দিয়ে মানুষ আজও পর্যন্ত কোথাও পৌঁছয় নি। কোনও যোগ, কোনও যজ্ঞ, তন্ত্র-মন্ত্রণা, কোনও সিদ্ধাই, সাধনা, জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-শিল্প, এই একটি জীবন-মন্ত্রের কাছে কিছু না। মানুষের ভালো হোক। সকল দেশের সকল মানুষের ভালো হোক,—এই সার ; আর সবই অসার!

ঋষিরা জানতেন এ সত্য। তাই তাঁরা বলেছেন: মধুবাতা ঋতায়তে। ঋষিদের চেয়ে নতুন কথা কেউ কোনও কালে বলে নি। কারণ নতুন কথা কিছু নেই। চিরপুরাতনই, চিরনবীন।

কার্ল মার্ক্স কোনও দর্শন নয় ; অর্থনৈতিক তত্ত্বমাত্র। ওপরের লোককে নীচে নামিয়ে আনলে, নীচের লোক ওপরে উঠবে। তাতে সমস্যার সমাধান হবে না কখনও। কম্যুনিসমের পর আসবে নতুন ইসম। মানুষ যে অরণ্যে ছিলো একদিন, সেই অন্ধকারেই বাস করবে। অর্থনৈতিক সাম্য রাজনৈতিক অধিকার, এর চেয়েও বড় স্বপ্ন হচ্ছে মানুষের ভালো হোক, এই মন্ত্রে প্রাণপ্রতিষ্ঠা। রুটির সমস্যা সবচেয়ে বড় সমস্যা, একথা ঠিক। সে সমস্যা মিটে গেলে মানুষের সব সমস্যা যদি মিটে যেত, তা হলে শবের সঙ্গে মানুষের কোনও তফাত থাকত না। কারণ, শবের সব আছে, ক্ষুধা নেই।

দেশের বিরুদ্ধে, ধর্মের বিরুদ্ধে, মানুষের বিরুদ্ধে, মানুষের রাগের বদলে অনুরাগের জন্মের মধ্যেই রয়েছে সেই 'নবজাতক,' যার উদ্দেশে সকল দেশে উঠছে জয়ধ্বনি: জয় হোক মানুষের, চিরজীবিতের।

শক্তিপদ বসুরায়ের সমস্ত শক্তির উৎস ওই এক মন্ত্র: মানুষের ভালো হোক!

ঋষিদের অলৌকিক জীবন ও বাণীতে ঘোরতর অবিশ্বাসী এক মানুষকে গড়ের মাঠে নিয়ে গিয়ে শক্তিপদ বুদ্ধির অতীত এমন ব্যাপার প্রত্যক্ষ করান, যার ফলে আমূল রূপান্তর ঘটে তার,—এমন ঘটনা আমার জানা। কেবল বুদ্ধ-চৈতন্য-রামকৃষ্ণরাই যে রূপান্তর ঘটান তা নয়, আমাদের অজানা এমন মহৎ-প্রাণ ব্যক্তি আছেন, দানবকে যাঁরা দেবতা করবার মন্ত্র জানেন। সে মন্ত্র কাগজে বিজ্ঞাপিত নয়। স্বপ্নে তাকে পাওয়া যায় না। সে আরোগ্য কোটিতে গোটিক। তবুও তা যে সম্ভব তার প্রমাণ কেবল শক্তিপদ বসুরায় নন ; আরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই আছেন।

কিন্তু আমার কাছে আরোগ্যকারের চেয়ে আরোগ্যমন্ত্রের আকর্ষণই বেশি। সে মন্ত্র ওই, —মানুষের ভালো হোক। সমস্ত শক্তির চেয়ে, নিরাসক্তির আধার এই উজ্জীবন-মন্ত্র—মানুষের মনের আঁধার দূর করে অনেক দ্রুত।

একজন লোক শক্তিপদ বসুরায়কে এসে ধরে, তার মরা মা'কে দেখাতে হবে। শক্তিপদর পরিচিত এক ব্যক্তি ছিলেন, যিনি পরলোকগতকে এনে হাজির করাতে পারতেন সশরীরে। তিনি প্রথমে আপত্তি করলেও পরে রাজী হন! যখন ঘরের মধ্যে পরলোকগতা মহিলা তাঁর পুত্র এবং সেই যোগীর সাক্ষাৎকার ঘটেছে, তখন শক্তিপদ সেখানে ছিলেন না। সিগারেট কেনবার জন্যে বাড়ির বাইরে গেছিলেন। ফিরে এসে শোনেন, লোকটির মৃতা মা সশরীরে উপস্থিত হয়ে বলে গেছেন, যে ঐ লোক তার ভাইকে ঠকিয়েছে সম্পত্তির ব্যাপারে। যিনি পরলোকগতাকে নামিয়ে এনেছিলেন তিনি শক্তিপদকে বলেন, এ-ধরনের লোকের জন্যে কোনও কাজ তিনি কেন করতে নারাজ ছিলেন, এখন তা শক্তিপদরও নিশ্চয়ই মর্মগত হয়েছে। শক্তিপদ লোকটিকে ছাড়েন না; বরং তাকে দিয়ে স্বীকার করিয়ে ছাড়েন যে তার ভাইকে সে তার ন্যায্য প্রাপ্য ফিরিয়ে দেবে।

লোকটি কথা দিলেও তার কথা রাখে না, গড়িমসি করে। আসল কারণ তার অনিচ্ছা নয়; স্ত্রীর ভয়। জমির ব্যাপারে সে ভাইকে ফাঁকি দিয়েছিলো। সে দলিল ছিলো শ্বশুরবাড়িতে স্ত্রীর কবলে। সে প্রস্তাব করে যে, জমির বদলে ভাইকে দাম ধরে দেবে তার, শক্তিপদ তাতে রাজী হন না। বলেন মা-কে কথা দিয়েছ, যা নিয়েছ তাই-ই ফেরত দেবে। যদি না দাও তাহলে জেনো আমি সাধু-পুরুষ নই, এক সময়ে বাঙলাদেশের বিপ্লবীদের সঙ্গে কাজ করেছি। এমন শাস্তি তুমি পাবে যার চেয়ে জমির দাম অথবা স্ত্রীর ভয়, দুটোই তুচ্ছ। শেষ পর্যন্ত এই কথাতেই কাজ হয়।

শক্তিপদ কেবল নামে নয়, কাজেও শক্তিমান পুরুষ।

এ ঘটনা পড়তে পড়তেই কোনও কোনও ধূর্তবুদ্ধি পাঠকের ঠোঁটে বিদ্যুতের মতো হাসির রেখা দেখা দিয়েই মিলিয়ে যাবে। মানুষের ভালো হোক, যার মন্ত্র, সে কেন মানুষকে এমন ভয় দেখাবে?—এই হচ্ছে সেই বুদ্ধির বিদ্যুত-ঝিলিক জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার উত্তর হচ্ছে এই যে, ওতেই ওই মানুষের ভালো হবে জানেন বলেই শক্তিপদ,—শক্তিপদ এবং আমরা তিন-চতুর্থাংশ মানুষ দ্বিপদ হয়েও আসলে চতুষ্পদ। লোকে মনে করে, এই ব্যবহার এবং ওই মন্ত্র বুঝি শক্তিপদর চরিত্রে একটি আপত্তিযোগ্য কন্ট্রাডিকসান। না। কন্ট্রাডিকসান নয়। মহৎ মানুষের চরিত্রের এই হচ্ছে প্রপার ডিকসান; হার্মনি। কী রকম, জানতে চাইছেন। জবাব দিচ্ছি।

যে লোকটি তার ভাইকে ঠকিয়েছি মনে করছে, আসলে ঠকেছে সেই। শক্তিপদ জানেন যে লোকটিকে এই সামান্য প্রতারণার জন্যে কি অসামান্য শাস্তি পেতে হবে। তাই ভয় দেখিয়েই তিনি আসলে অভয় দেন। পাপ ও শাস্তির হাত থেকে লোকটিকে বাঁচানোর জন্যেই অভয়ংকর শক্তিপদ ভয়ংকর হয়ে ওঠেন। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাকে শাসন করেন। সে লোকটি কোনওদিন জানবে না যে, কি 'লোক' সে পাবে মৃত্যুর পর। সেই অন্ধকার-লোক থেকে

ঈষৎ আলোকে তাকে ফিরিয়ে দেবার জন্যেই, জমি ফিরিয়ে দেবার আদেশ দিয়েছিলেন শক্তিপদ। না দিলে, মৃত্যুভয় দেখিয়েছিলেন। না দেখালে স্ত্রীর ভয় থেকে মুক্ত হতো না সে লোক। এর পরেও কি বলা যাবে, মানুষকে ভালোবাসার সঙ্গে এই ভয় দেখানোর কোনও বিরোধ আছে?

আরও এক জায়গায় লোকের সাংঘাতিক গুলিয়ে যায়। হিন্দুশাস্ত্র বলে সব, যা কিছু ঘটবে, সব ঠিক হয়ে আছে আগে থেকে। সব—প্রিডিস্‌টিন্‌ড্‌। আবার সেই শাস্ত্রই বারণ করে অন্যায় করতে। উপদেশ দেয়,—সৎকর্ম করবার। একমুখে এমন উল্টো-পাল্টা কথায়, কোথায় না লোক বিভ্রান্ত বোধ করবে। যদি সব ঠিকই হয়ে থাকে আগে থেকে, তাহলে আবার অন্যায়ের জন্যে শাস্তি এবং সৎকাজের জন্যে পুরস্কার কেন? যে অন্যায় করছে সে তো অন্যায় করবে বলেই ঠিক হয়ে আছে। তাহলে তার অপরাধই বা কি এবং সে দায়ীই বা হবে কেন?

এ প্রশ্নের উত্তর কেবল হিন্দুরাই দিয়েছে; দিতে পেরেছে। কারণ হিন্দু আচার্যদের মতো জীবনের এমন গভীরে আর কোন্‌ দেশে কোন্‌ কালে আর কেউ প্রবেশ করেছে? মানব-জীবনে অতল রহস্যের তল তাঁরা খুঁজেছেন। তাঁরা কন্‌ট্রাডিক্‌সান থেকে হার্মনিতে, বিরোধ থেকে মিলনে, অসৎ থেকে সতে, মৃত্যু থেকে অমৃতে যাত্রার পাথেয় যুগিয়েছেন চিরকাল। তাঁরা কখনও এমন কথা বলতে পারেন যার মধ্যে মিল নেই?

'এ দুয়ের মাঝখানে আছে কোন মিল, নহিলে নিখিল, এত বড় প্রবঞ্চনা, কখনও সহিত না.'—

প্রিডিস্‌টিন্‌ড একথাও ঠিক, আবার, 'অন্যায় কোরো না, একথাও বেঠিক নয়! কি রকম? না, ততক্ষণ পাপ-পুণ্য, অন্যায়-ন্যায় ভেদবুদ্ধি থাকছে, যতক্ষণ তোমার এ বোধ না জাগ্রত হচ্ছে যে শুভ-অশুভ, ভালো মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সবই 'সে' যে 'এক' বহু হয়েছেন! যার এ জ্ঞান হয়েছে, তার জন্যে কোনও বারণ নেই। ত্রৈলঙ্গ স্বামীর—মূত্র আর গঙ্গাজলে কোনও পার্থক্য নেই। মল ও পরিমল তুল্যমূল্য। তাই মূত্র ছিটিয়ে মায়ের গায়ে ত্রৈলঙ্গ বলতে পারেন, 'গংগোদকং।

ত্রৈলঙ্গর যা সাজে তা সকলের সাজে না। এমন কি অর্জুনেরও,—না।

॥ সাতাশ ॥

অর্জুনকে তাই অর্জুনসখা শঙ্খচক্রগদাপদ্মপাণি শ্রীকৃষ্ণ দেখিয়েছিলেন মুখব্যাদন করে যে, তিনিই মেরে রেখেছেন সকলকে। সব্যসাচী নিমিত্তমাত্র। শুধু মহাভারতের কাহিনী নয়, সৃষ্টির পরম ও চরম বাণীই এই। যা কিছু

ঘটছে কিংবা ঘটবে তা সবই ঘটে আছে। ইটার্নাল প্রেসেন্ট। অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ বলে কিছু নেই। আমাদের ছোটো ছোটো সীমার খেলাঘরের সুবিধের জন্য আমরা তাকে ভাগ করেছি। ঘড়িতে দাগ কেটে যেমন দিন-রাত্রিকে ভাগ করা চব্বিশ ঘণ্টার মাপে। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত, এ আমাদের পরিভাষা, না হলে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত বলার সত্যি সত্যি কোনও মানে হয়? বৈজ্ঞানিকরাও ক্রমশ এই সত্যের সম্মুখীন হচ্ছেন যে, অদ্য, কল্য, পরশু বলে কিছু নেই; সব,—ইটার্নাল প্রেসেন্ট।

ঋষিরা এ সত্য জানতেন। তাই ওঁদের ঋষি বলা হয়েছে। কবি যখন এ সত্য অবগত হন তখন তিনিও ঋষি। 'কবয় বদন্তি,' উপনিষদের এ-কবিতে আর ঋষিতে এক; একাকার। নতুন কোনও সত্য নেই, তাই নেই নতুন কোনও ঋষি। যা চিরন্তন তাকেই নতুন করে স্মরণ করা মাত্র। কেউ যদি দাবী করেন তিনি নতুনতর কোনও সাধনায় সিদ্ধ অভূতপূর্ব কোনও ঋষি, তিনি হয় ভ্রান্ত নয় উদ্‌ভ্রান্ত।

শক্তিপদ বসুরায় সেই চিরন্তন, ভারতের মৃত্যুহীন বাণীর নবীন প্রতিধ্বনি, কারণ—

'সব লেখা লুপ্ত হয় বারংবার লিখিবার তরে।'

শক্তিপদর শক্তি আজকের অথবা আগামীকালের নয়; চিরকালের। ক্ষণকালের আভাস থেকে চিরকালের তরে সে সত্য আবির্ভূত আজ কাশীর সত্যবাক্ শক্তিপদর মধ্যে। তাঁর অন্তরঙ্গতমেরা বলেন, পুজো করে যখন উঠে আসেন শক্তিপদ, তখন তাঁর সমস্ত শরীর আলো হয়ে যায়। এ আলো ম্যাজিকের আলো নয়। ওই চিরন্তন সত্যের আভা। যে এর যতটুকু কণা পেয়েছে ততটুকু তমো মহত্তম হয়ে গেছে তার। শক্তিপদ যখন তাঁর নিজের পুজো করার কথা বলেন, তখন ব্যাপারটাকে বলেন 'বুজরুকি'। যারা বুজরুকি করে সত্যি সত্যি, তারা মিথ্যে মিথ্যে বলে, 'পুজো করছি; আর সত্যি সত্যি যে পুজো করে সে বলে মিথ্যে মিথ্যে: 'বুজরুকি করছি।'

তুমি রূপের পুজো কর, রূপবান হবে; খ্যাতির সাধনা কর, খ্যাতিমান হবে; জয় চাও,—জয়ী হবে। কিন্তু তার বেশি কিছু হবে না। খ্যাতিমান হবে, কিন্তু man হবে না। সম্পূর্ণ মানুষ হবে না; অসম্পূর্ণ রইবে। জীবন অন্তে তুমি 'শব' হবে। আর কিছুই চেও না, দেখবে,—তুমি আস্তে আস্তে সব হবে। তাই আসক্তির পদে নয়, শক্তিপদে নিজেকে লুটোও, নিরাসক্তির পদে, 'শব' থেকে তুমিই সব হবে।

'দক্ষিণেশ্বর' বলেছিলেন: 'লোকসান চাই না'; 'লোকসান' কোনও লোকের এত হয় নি; দক্ষিণেশ্বর বলেছিলেন: 'সিদ্ধাই চাই না মা'; অষ্টসিদ্ধাই করতলগত হয়েছিলো শ্রীরামকৃষ্ণের। চাইলে যাকে পাওয়া যায় তার নাম, রূপ, জয়, যশ, শত্রুবিনাশ। না চাইলে যাকে পাওয়া যায় তিনিই 'সব'। তার দিকে

একবার চাইলে তখন আর রূপ-জয়-যশ-শত্রুবিনাশের কথা মনে পড়ে না ; মুখ দিয়ে তখন যে-কথা বেরোয় তা বিবেক-বাণী : জ্ঞান দে, বৈরাগ্য দে, শুদ্ধাভক্তি দে ।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত জ্ঞান-বিজ্ঞান কিছুই কিছু নয় । জ্ঞানে হয় না, বিজ্ঞানেও হয় না কারুর ; আবার কারুর কেবল গানেই হয়ে যায় বাজি-জেতা । রামপ্রসাদের হয়েছিলো । কেন হয়েছিলো ? কারণ গায়ক হিসাবে নন্দিত হবেন বলে গান নয় ; রামপ্রসাদের গান তো,—মায়ের জয়গান । রামপ্রসাদের গান ও সাধন, এক ও অভিন্ন । সাধনা করতে করতে গাওয়া ; গাইতে গাইতে সাধনা করা । গানের টানে, প্রাণের টানে বেড়া বেঁধে দিতে এসেছিলেন তাই মায়ের বেশে নয়, মেয়ের বেশে স্বয়ং মা, গানের আবেশে যখন বুঁদ হয়ে গেছেন রামপ্রসাদ । গানের ওপারে যিনি দাঁড়িয়ে আছেন, জ্ঞানের ওপারেও, তাঁকে রামপ্রসাদ টেনে এনেছিলেন, বেড়া-বাঁধার ছলে বাঁধা পড়েছিলেন তিনি ।

মা দেখতে কেমন, এ-প্রশ্নও রামপ্রসাদের মনে ওঠে নি কখনও

লোকে বলে কালী কালী
কে জানে মা কালী কেমন ?
লোকে হাসে মা প্রসাদ ভাসে মা
সন্তরণে সিন্ধুতরণ !

রামপ্রসাদ সাঁতার কেটে সিন্ধুপার হয়েছিলেন ; চোখের জলে সাঁতার দিয়েছিলেন তিনি । বাসনার সিন্ধুতে বই তরণী করে নয়, সোনার তরীতে বৈতরণী অতিক্রম করেছিলেন কারণ সেই কৃপাসিন্ধু রামপ্রসাদের এই অশ্রুবিন্দু দিয়ে তৈরি ।

শক্তিপদ বসুরায়কে কেউ বলে তান্ত্রিক, কেউ বলে তাঁর ওপর বিদেহী আত্মা অর্থাৎ ভূতে ভর করেছে । ভূতে নয়, শক্তিপদকে ধরেছে সেই 'অদ্ভুতে' যে স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে এ-ধরায় তাকে খুঁজে পায় এমন সাধ্য কার । সেই 'অদ্ভুত'-এর সবচেয়ে ভালো বাসা-ই হচ্ছে ভালোবাসা । কাশীতে শক্তিপদর বাস যেখানে তা দেখে চর্মচক্ষে তাকে অত্যন্ত ভালো বাসা ছাড়া আর কীই-বা বলা যাবে ? কিন্তু মর্মচক্ষে শক্তিপদর শক্তির উৎস মানুষের প্রতি তার অকারণ, অবারণ ভালোবাসা । তন্ত্র নয়, মন্ত্র নয়, মন্ত্রণাও নয়,—কেবল একটি ধ্বনি, —মানুষের ভালো হোক,—এরই প্রতিধ্বনিতে পৃথিবী কাঁপাও । 'মানুষের ভালো হোক' বলতে বলতে আলো হোক মুহূর্তে যা আছে অন্ধকার । তমে থেকে মহত্তমে যাত্রার পাথেয় একাধিক,—কিন্তু সর্বাধিক হচ্ছে নিরন্তর অন্তর থেকে উত্থিত তিনি : 'মানুষের ভালো হোক' ।

যত মত তত পথ, ঠিক । কিন্তু সব পথ যেখানে এক, সেখানে ভালোবাসা ছাড়া আর পথ নেই । নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায় । ভালোবাসাই তাঁর সবচেয়ে ভালো বাসা,—এর চেয়ে বড় সত্য আর নেই ।

শক্তিপদ বসুরায়ের দু'চোখ,—ভালো হোক বলতে বলতেই এমন আলোক পেয়েছে। কোনও স্ত্রীলোকের এক অঙ্গে এত রূপ নেই এই অপরূপের সঙ্গে যার তুলনা চলে। রূপের জৌলুস আছে ; অপরূপের আছে আলো। শক্তিপদর কাছে গিয়ে বসলে সবচেয়ে বড় যে শক্তি, যার নাম নিরাসক্তি যা মানুষকে অনির্বচনীয় শান্তি দেয় তা পাওয়া যায়। শক্তিপদর কাছে যায় কেউ অসুখের আরোগ্য পেতে, বিপদে ত্রাণ লাভ করতে, জ্ঞান লাভ করতে কেউ, ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান সন্ধানেও যায়। লোকে চাইলে এবং শক্তিপদ ইচ্ছা করলে এ সবই পাওয়া যায়। কিন্তু না চাইলেও যা পাওয়া যায়, ইচ্ছে না করলেও, তার নাম—শান্তি।

শক্তিপদ বসুরায়ের অলৌকিক শক্তির পরিচয় কাশী থেকে কলকাতা অবিরল অব্যাহত। অন্তরঙ্গ বন্ধুর স্ত্রীকে একলা ঘরে পেয়ে স্বামীর একজন আত্মীয় আঘাত করতে উদ্যত, শক্তিপদ যেন শূন্য থেকে সহসা আবির্ভূত ত্রাণকর্তার বেশে। অন্তরঙ্গ বন্ধু নতুন বড় চাকরি সুনিশ্চিত হওয়ায় শক্তিপদকে ভরসা দিচ্ছেন একাধিক টেলিফোন ও গাড়ির। শক্তিপদ হেসে একটা চিরকুট গুঁজে দিয়েছেন বন্ধুর হাতে। তাতে লেখা 13. W. I. তখন বোঝা যায় নি মানে। বোঝা গেছে তখন, যখন জেল হয়েছে সেই বন্ধুর। থার্টিন উইক্‌স্‌ ইম্‌প্রিসন-মেন্টের পর বেরিয়েছে সেই বন্ধুটি। জেলে শক্তিপদর অন্তরঙ্গতম আরেকজনও আসছে,—এ বার্তাও আগে থেকে জানিয়েছিলেন শক্তিপদ। 13. W. I. এই চিরকুটে শক্তিপদ যা বলেছেন, বন্ধুর তের হপ্তা জেল হবার পরেও, এখনও তা ফলতে বাকি আছে বলে জানিয়েছেন শক্তিপদ।

গুরু খুঁজতে বেরিয়েছেন কাশীতে, দমদমের এক বাঙালী ব্যবসাদার। শক্তিপদ বলেছেন, বাড়ি বয়ে তাঁর নির্দিষ্ট গুরু এসে দীক্ষা দেবেন। অভ্রান্ত মিলেছে সে-কথা। অন্তরঙ্গতম এক বন্ধুর মৃত্যু সন্নিকট, এ-কথা জানিয়ে দিয়েছেন আগে থেকে। কোনও লোক তার যে ক্ষমতা হয় নি তার বড়াই করলে ধরে ফেলেছেন মিথ্যা। জিজ্ঞেস করলে, যে, কী করে ধরলেন যে তার সে ক্ষমতা হয় নি, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর করেছেন শক্তিপদ : তা' হলে নিশ্বাসে টের পেতাম। নিশ্বাসের ধারা পালটায় নি।

কিন্তু শক্তিপদর চেয়েও শক্তিমান লোক কাশীতে আছেন ; কলকাতায় আছেন ; কোথায় নেই ? তবু শক্তিপদর সঙ্গে কোনও শক্তিমানের তুলনা হয় না। শক্তিপদর মতো ভালো বাসা কাশী, কলকাতা, পৃথিবীর কোথাও এমন ভালোবাসা আর নেই। কে পরলোকগত আত্মা এসে দেখাতে পারে, কে পারে সুনিশ্চিত মৃত্যুকে মার্জনা করতে, মামলায়-রেসে-ফাটকায় জিতিয়ে দিতে পারে কে, কে পারে চাকরি পাইয়ে দিতে, সন্ধান দিতে গুপ্তধনের, জানি নে। কিন্তু এটুকু জানি, শক্তিপদর মতো ভালোবাসতে পারে না কেউ।

শক্তি মূল্যবান : নিরাসক্তি অমূল্য।

শক্তিপদর সঙ্গে তর্কও করেছি। বলেছি, রবীন্দ্রনাথ অপরূপ কবিতা লিখেছেন, কাব্য হিসেবে তার তুলনা কোথায়, কোন্ দেশে কোন্ কালে আর কে লিখেছে এমন !—তবু,—তবুও, তা, মনোরমতম মিথ্যা ছাড়া আর কী ?

শক্তিপদ বলেছেন : মনোরমতম মিথ্যা নয় ; রবীন্দ্রনাথের কবিতা, অন্তরতম সত্য।

শক্তিপদ বসুরায় একসময় কিছুই মানতেন না ; এখন সবই মানেন। এমন কি রাস্তায় ফুলের মালা, ডাব ইত্যাদি পড়ে থাকলে ছুঁতে বারণ করেন। বলেন, ওগুলি কারুর মন্দ করবার কারণে রাখা ; যার উদ্দেশে রক্ষিত সে না হয়ে যদি আর কেউও না জেনে স্পর্শ করে তা হলে তারও ক্ষতি হবে।

শক্তিপদকেও উত্তেজিত হতে আমি দেখেছি। বলেছি : যে, আপনি এ সব বই-পড়া-কথা বলছেন।

ঠাণ্ডা মানুষ শক্তিপদ হেলে বসে সুখটান দিচ্ছিলেন সিগারেটে, উঠে বসলেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে যেন, বললেন গলার স্বরে জোর দিয়ে : একটাও শোনা কথা বলছি না। পাপ-পুণ্য, স্বর্গ-নরক ধ্রুবলোক, সত্যলোক, লক্ষ্মী-সরস্বতী-লোক আছে ; মৃতলোক দেখা দিতে পারে, দেখা দেয়, জন্মজন্মান্তর আছে। তারপর নেমে এলো কণ্ঠস্বর, নরম গলায় শান্ত শক্তিপদ বললেন : সাধারণত মর্ত্যহিসেবে পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার বছর সময় লাগে একজনের আবার জন্মাতে। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনি দ্বাপরের লোক,—

আমি বললাম : আমাকে বলে লাভ নেই, এসব আমি বিশ্বাস করি না—

তা হলে বার্ধক্যে বারাণসী লিখছেন কেন ?—শক্তিপদর শক্ত প্রশ্ন।

বিক্রি বেশি হবে বলে ; দুঃখকষ্ট যত বাড়ে, অলৌকিকে ভারতীয়দের আস্থা বাড়ে তত.—আমার সহজ উত্তর।

শক্তিপদ অস্বীকার করে বার্ধক্যে বারাণসী সম্পর্কে যা বললেন তা ছাপা যাবে না কারণ তা নিন্দাসূচক নয়।

অতঃপর শক্তিপদ বসুরায় তাঁর বক্তব্যের বিশদ ব্যাখ্যা করেন অনর্গল। বলেন : স্পিরিট এখানেও, যেখানে আমরা দুজনে বসে কথা বলছি, এখানেও আছে। সূক্ষ্মদেহধারী এরা দেওয়াল ভেদ করে যেতে-আসতে পারে ; টাকা বার করে নিয়ে আসতে পারে আপনার তালাবন্ধ সিন্দুক থেকে, কিন্তু টাকা আবার তাকে রেখে আসতে হবে বন্ধ সিন্দুকের মধ্যেই। নিয়ে যাবার উপায় নেই। সাদা কাগজে প্রশ্ন করে খাম বন্ধ করবার পর তার মধ্যে উত্তর লেখা হয়ে যায়,—এ রকম ঘটনা, অনেকেই জানেন। সেটা সম্ভব হয় এই রকম কোনও স্পিরিটকে কন্ট্রোল করে। অনেক সময় এই সব উত্তর দারুণ ভুলে নিদারুণ হাস্যকরতায় ভরা হয় যে তার কারণ এই স্পিরিটের যা কাজ নয় তা করতে গিয়ে লাঠি বাজে। অনেক সময় স্থূল শরীরে যে রকম জামা-কাপড় পরা অবস্থায় কাউকে দেখা যেত মৃত্যুর পরেও তেমনই বেশে তাকে দেখে লোকে

সন্দেহ করে। আসলে তন্মাত্র শরীর সব সংস্কারই ধারণ করতে পারে ; এতে নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

ধ্রুবলোক মানে শক্তিপদর অন্তর্ভেদী উক্তিতে, হচ্ছে সেই জায়গা যেখানটার বার্তা ধ্রুব, যেমন, আমার দিকে তাকিয়ে বললেন : আপনার বাড়িটাকে যদি আপনার লোক বলা যায় তা' হলে ধ্রুবর যেখানে আধিপত্য সে-জায়গাকে বলতেই হয়, ধ্রুবলোক। দেব-দেবীরা ভক্তের প্রার্থনার উত্তর দেন যখন, তখন তাঁরা কী ভাষায় কথা বলেন, এ নিয়ে লোকের মতদ্বন্দ আছে। অর্থাৎ সন্দিগ্ধ মনের প্রশ্ন হচ্ছে গ্রীক দেবী গ্রীক ভাষায়, দেবী সরস্বতী সংস্কৃতে অথবা বাংলায় বলেন, এ-কি সম্ভব ? অতএব এগুলি ভক্তের মনগড়া প্রশ্নোত্তর নিছক। শক্তিপদ বলেন : ব্যাপারটা তা নয়। সমস্ত ভাষার সমস্ত শব্দের উৎস যে ধ্বনি তাই প্রতিধ্বনিত হয় মর্ত্যলোকের বাসিন্দাদের যার যার যে যে বোধগম্য ভাষা আছে, তাতে। অর্থাৎ দেব-দেবীর উত্তরের উৎস এক অনাদি ধ্বনি ; তার প্রতিধ্বনি একেকজনের কানে একেক রকম।

শক্তিপদ বসুরায়ের ঘরে, ঘরে-বাইবের দিগ্বিজয়ী মানুষেরা আসেন।

তাঁরা কেউ জাঁদরেল পণ্ডিত, কেউ ধুরন্ধর রাজনীতিবাজ, কেউ গায়ক, কেউ লেখক, কেউ কবি, কেউ কর্মী। একটা কথাই চালু আছে, যে, শক্তিপদর যাঁরা অন্তরঙ্গ তাঁরা সবাই প্রায় বিশিষ্ট পুরুষ। এমন একজন লোককে আমি জানি, বর্তমান ভারতের শেষ অশেষ বিস্ময় বলে যাঁকে আমি জানি এবং মানি, তিনিও আসেন শক্তিপদর কাছে। কেন আসেন ? পাণ্ডিত্য ফলাতে ? না। আলোচনার জন্যে ? না। আলোর জন্যে। আশা করে নয় ; ভালোবাসার টানে।

এঁরা সবাই দর্শন পড়েন ; শক্তিপদর সঙ্গে এঁদের তফাত হচ্ছে, এঁরা দর্শন পড়েন,—শক্তিপদ দর্শন করেন।

শক্তিপদর কাছে একবার গেলে আর একবার যেতেই হয়, আরও একবার। বারবার যেতে হয়, শক্তিপদ তাড়িয়ে দিলেও না গিয়ে উপায় থাকে না। শক্তি-তাড়িত আমরা সবাই। শক্তিপদর চেয়ে বড় তীর্থ, আমার জানা নেই। শক্তিপদকে আমার মনে হয়, শক্তিপদ বুঝি কোনও মুহূর্তে স্বয়ং মহাশক্তির সতীর্থ !

॥ আঠাশ ॥

'প্রসাদ পেতে হয়, —খেতে হয় না।'

কয়েকদিন আগের কথা। যাদবপুর অঞ্চলে মরলোকত্যাগী অমরলোকের এক মহৎ মানুষের সমালোচনা হচ্ছিলো গৃহস্থদের সরস মন্তব্যের মুখে। নিন্দার ঝাঁজে বাতাস হয়েছিলো ভারী। 'আলোচনার মধ্যে আলো কোথাও ছিলো

না, ছিলো পরনিন্দার চোনা।' এই সমালোচনার কয়েকদিনের মধ্যে সেই দিব্যধামবাসী ইহলোক গৃহীত কাচ দিয়ে বাঁধানো আলোকচিত্রের মধ্যে পায়ের ওপর দেখা গেলো ফুটে উঠেছে সাদা ফুল। একজনের বাড়িতে নয়; ওই অঞ্চলের একাধিক ভক্তের গৃহে তাঁর ছবিতে ঠিক একই রকম ভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে পুষ্প। অবিশ্বাসীর উদ্ধত রাগের উত্তরে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অসীম ঊর্ধ্বে যাঁর বাস এ তাঁরই অনুরাগ। হুল ফুটোনোর পালা শেষে ফুল ফুটোনোর খেলা। সব দেশে সব কালে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ক্রুশবিদ্ধ হয়েও তিনি আক্রোশে বিদ্ধ করেন না কাউকে। শিক্ষা দিবার প্রয়োজনে কপট-রোষস্থ হন যদি বা ক্ষণেকের জন্যে অকপট রসস্থ তাঁরা চিরক্ষণের! কলসীর কাণা ছুঁড়ে মারলে রাগে অন্ধ হন না; অনুরাগের চোখ ফোটান।

মহাভারতের কালে যদুপুরেও যা, এ-কালের যাদবপুরেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবর্তন। এখন যাঁর কথা বলতে যাচ্ছি, যাদবপুরে সেই অঘটন-ঘটনপটীয়সের পুণ্য পবিত্র পরমাশ্চর্য পুরুষের নাম,—শ্রীশ্রীরামঠাকুর।

কাশীতে প্রায়ই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের নাম করেন যিনি, তিনি কাশীর অন্যতম দ্রষ্টব্য ও শ্রোতব্য,—ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ। হিমালয়ের মনুষ্য অনধিগম্য অঞ্চলে প্রস্তরবৎ দেবপুরুষের সান্নিধ্যে রামঠাকুরের কথা তিনি আমায় বলেছেন। দীর্ঘকায়, দীপ্ত, দিব্য একাধিক পুরুষ। মনে হয় পাথরের মূর্তি। রামঠাকুর এবং তাঁর আর এক গুরুভ্রাতা তাঁদের প্রণাম করতে তাঁরা হাত তুলে আশীর্বাদের ভঙ্গী করতে জানা গেল যে তাঁরা পাথরের মূর্তি নন; ধ্যানাবিষ্টতার মূর্ত-প্রতীক। ঠাকুর এবং গুরুভ্রাতা প্রত্যহ তাঁদের ভোগ দেন এবং তাঁরা তা গ্রহণ করেন।

পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত এই পৃথিবীতে পরমাশ্চর্য মানব বিরল; কিন্তু এখনও কোথাও কোথাও কেউ কেউ লোকহিতব্রতে লোকালয়েও আসা-যাওয়া করেন। সাধুরা কেবল বিনাশ্রমে আশ্রমে বসে আকাশকুসুম চয়নে সময় কাটান একথা বলাই এখন ফ্যাসান। যারা জানে তারা মানে যে ব্যক্তিগত বিপদ থেকে শুরু করে সমগ্র মানবের মঙ্গলের জন্যে এঁরা যাপন করেন বিনিদ্র রজনী; জেগে থাকেন অতন্দ্র প্রহরীর মতো। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ যে আজও বাধে নি তার জন্যে বিশ্বের দুই শক্তি,—ম্যারিকা ও রাশ্যার সচেষ্টতাই সব নয়; তৃতীয় আর এক শক্তিও ঠেকিয়ে রেখেছে যে তাকে, তৃতীয় চোখ ছাড়া তা দেখবে কে?

সে শক্তি,—নিরাসক্তি। শক্তর চেয়ে বড় সে, যে নিরাসক্ত এবং যুদ্ধ বাধলেও এ-বিশ্বকে ধ্বংসের হাত থেকে শেষ পর্যন্ত যে বাঁচাবে, সে ওই পারমাণবিক মুগুর নয়; পরমাশ্চর্য 'ঠাকুর'। বিশ্ব ধ্বংস হবে না; বিস্ময়ও না। যুদ্ধে রক্তাক্ত হবে রঙ্গভূমি, বিশ্বজুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে অসভ্যতার চূড়ো গুঁড়ো হবে; শুরু হবে আবার সভ্যতার জয়যাত্রা; Man থেকে জন্ম নেবে ইভলুসানের

পরবর্তী অধ্যায়ে, Superman সংখ্যাতত্ত্ববিদ্‌রা নয়, এ তথ্য জানেন কবি, তিনি মানেন!

'ফুরায়নি তো ফুরাবার এই ভান।'

শ্রীশ্রীরামঠাকুর আলোকের অধিকার নিয়ে এসেছিলেন এই অন্ধকার লোকে। তিনি ভগবানের দূত। মুক্তির মন্ত্রে এসেছিলেন জীবনের বন্ধদ্বার খুলে দিতে। সে মন্ত্রে মৃত্যুভয় দূর হয়; মৃত্যুঞ্জয় হয় মানুষ।

রামঠাকুরের লৌকিক জীবন অলৌকিক ঘটনায় উজ্জ্বল। তাঁর একমাত্র উপদেশ হচ্ছে, নাম কর। নাম করতে করতেই প্রণাম করার অধিকার পাবে। কেবল পায়ে হাত দিলেই প্রণাম করা হয় না। নাম কানে দেবার নয়; প্রাণে দেবার। নাম করতে খারাপ লাগলেও নাম করো। এক সময়ে শুষ্কতার পাথর ভেদ করে নামেতেই ঝরনা ঝরানো।

নাম-এর পরেও কথা আছে; প্রণামের পরেও আছে পথ। সে পথ দুর্গম, ক্ষুরের ওপর দিয়ে হেঁটে যাওয়ার চেয়েও তা শক্ত। বহুজন্মের সুকৃতি, সাধনা এবং অহৈতুকী কৃপার পরে কোনও কোনও ভাগ্যবান তার সন্ধান পায়। যে পায় না তার উপায়? তার উপায়,—নামের দু'পায় লুটিয়ে পড়া। রামঠাকুর নাম করতে বলেছেন। তার চেয়ে গূঢ় কথা নিগূঢ় ক্রিয়া দেন নি এমন নয়। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় কৃপা যা সাধারণের কানে নয়, প্রাণে বাজিয়ে গেছেন তা ওই 'নাম'।

একজন ভক্ত, তাঁর লেখা, 'শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে' পুস্তকে 'নাম'-এর মহিমা কি বিপুল তার একটি প্রমাণ দিয়েছেন। এই প্রমাণের মধ্যেই সেই মাহাত্ম্যের পরিচয় পদ্মরাগমণির মতো প্রদীপ্ত।

ভদ্রলোকের নাম, রোহিণীকুমার মজুমদার। রামঠাকুরকে তিনি জিজ্ঞেস করেন: 'আচ্ছা, নামের শক্তিতে চোখ বন্ধ করে রাস্তা দিয়ে চলতে পারা যায়?'

রামঠাকুর বললেন: 'তা তো পারাই যায়।'

'বেশ আমি তা হলে এখুনি পরীক্ষা করে দেখতে চাই,'—বলে রোহিণীবাবু রামঠাকুরের কাছে নাম নিয়ে, রাস্তায় বেরিয়ে চোখ বন্ধ করে চলতে শুরু করলেন, মনে মনে নাম নিতে নিতে। তারপরের বর্ণনা শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে গ্রন্থের লেখক রবীন্দ্রনাথ রায়ের ভাষায়:

'ডিক্সন লেন থেকে রোহিণীকুমারের তৎকালীন বাসস্থান অক্রুর দত্ত লেনের দূরত্ব বেশী না হলেও পরিক্রমা বেশ জটিল। পার্ক, ছোট-বড় রাস্তার সংযোগ-স্থল, সংকীর্ণ গলি, গাড়ি-ঘোড়াসঙ্কুল ও অগণিত পথচারী অধ্যুষিত অঞ্চলটি অন্ধের অনুকরণে অতিক্রম করতে চাওয়া একমাত্র উন্মাদ ছাড়া আর কেউ আশা করে না জেনেও সদ্যনামপ্রাপ্ত রোহিণীকুমার নামের শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে অধ্যবসায়ী ছাত্রের মত একেবারে চোখ বুজে চলেছেন তো চলেইছেন। মানুষের মৃদুস্পর্শ এমন কি তাদের তপ্ত নিশ্বাসটুকু পর্যন্ত অনুভব করছেন। গতি

স্বাভাবিকের চাইতে কিছুটা মন্থর হলেও একটিবারও তাতে ছেদ পড়ল না। কতক্ষণ যে এইভাবে কেটে গেল সেদিকে কোনই খেয়াল নেই। অবিরাম নামোচ্চারণের সঙ্গে গতির ছন্দ আপনা হতে কখন মিলে গেছে। লক্ষ্যস্থলে পৌঁছবার ইচ্ছা তাঁকে একান্তভাবে বিধৃত করে রেখেছে বলে অন্য কোন চিন্তাই নেই। হঠাৎ একটি ধাক্কা খেয়ে টাল সামলাতে না পেরে তিনি পড়ে গেলেন। চোখ মেলতে যা দেখলেন তাতে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। নিজ বাসস্থানের একেবার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছে একখানি সীমানানির্দেশক উঁচু পাথরের সঙ্গে তাঁর সংঘাত হয়েছে।'

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ রায় : পৃ ১৬-১৭]

এই নামের বিজ্ঞানে আমাদের আস্থা নেই, কিন্তু বিজ্ঞানের নামে যে কোনও ভ্রান্ত কিংবা উদ্‌ভ্রান্ত তত্ত্ব স্বীকার করতে নেই এতটুকু অনীহা। এর কারণ নাম-বিজ্ঞান ব্যক্তির অভিজ্ঞতা। যেদিন বিজ্ঞান এর নাগাল পাবে, সেদিন লোকে এতে বিস্ময়ের অবকাশ পাবে অল্প। ওয়ারলেসে খবর পাঠানো আজ বিস্ময়ের উদ্রেক করে না বিন্দুমাত্র। কিন্তু কোনও মহাত্মা সূক্ষ্ম কিংবা স্থূল শরীরেই দূর দূরান্তরের কোনও বিপন্নকে দেখা দিতে পারেন উন্মোচন করতে ভয়ের বন্ধন, একথা শুনলে সেই একই লোক অবিশ্বাসের হাসি হাসে। আগামী কোনও কালে যখন বিজ্ঞান এমন অবস্থাকে সম্ভব করবে তখন কেউ তাতে অবাক মানলে আমরা বলব : এতে অবাক হবার কি আছে ?

অধ্যাত্মবিদ্যাকে ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষা করা যায় না, বিজ্ঞানের তত্ত্বকে দেখানো যায় চর্মচক্ষুতে চিরে চিরে। ওষুধে কাজ না হলে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের দায় নেই ; দায়ী,—হয় ডাক্তার, নয় ওষুধ। নাম নিয়ে একজন চোখ বুজে পার হয় পথ, আরেকজন পারে না, তাতে দায়ী হয় সেই লোক নয়, নাম-বিজ্ঞানই প্রমাণিত হয় প্রতারক বলে। জ্যোতিষী যখন কারুর অতীত অথবা ভবিষ্যৎ মেলায়, তখন তা কাকতালীয়। কেন ? না, কখনও মেলে, কখনও মেলে না। ওষুধেও যে কখনও অসুখ সারে, কখনও অসুখ সারে না, সেকথা তুললে উত্তর হচ্ছে, সেটা শাস্ত্রের দোষ নয়, ওষুধের কিংবা ডাক্তারের ভুল। জ্যোতিষী যে ভুল করতে পারে—জন্মকোষ্ঠী যে ভুল হতে পারে, এ তর্ক তুলে লাভ নেই, কারণ আমরা প্রত্যেকেই মস্ত মস্ত বৈজ্ঞানিক।

বিজ্ঞান ও অধ্যাত্ম,—যে বাহিরে থেকে ভেতরে এবং ভেতরে থেকে বাহিরে আসার রহস্যলোকের দু'টি চাবি একথা যেদিন জানব, সেদিন শুধু মানব যে বিজ্ঞানকে বেশি বিশ্বাস এবং অধ্যাত্মকে পুরো অবিশ্বাস করে আমরা যা বলি, তা নিছক—

'a tale told by an idiot !'

পরলোক এবং ইহলোক যে 'দেখা না-দেখায় মেশা বিদ্যুল্লতা,'—সত্যি সত্যি জন্ম এবং মৃত্যু যে ভিন্ন নয়, গত এবং আগামীকাল ভেদ যে অনর্থক,

বিজ্ঞান যেদিন একথা বলবে তার অনেক অনেক আগে, স্মণাতীত এককালে অধ্যাত্ম যে নির্ভুল উক্তি করেছে, তা আমরা জানি না বলেই মানি না।

সত্যি কথা বলতে এগুলি কোনও অলৌকিক তত্ত্বও নয়, অলীকও নয়। সম্পূর্ণ লৌকিক ব্যাপার। যে কেউ ব্যক্তিগত সাধনায় এর সন্ধান পেতে পারেন। সোমেশ বসু যে বিশালকায় গুণ মুখে মুখে করতেন তা যাঁরা দেশে-বিদেশে দেখেছেন তাঁরা তা অবিশ্বাস করতে পারেন নি কিন্তু 'ফ্রিক অভ নেচার' বলে রায় দিয়েছেন। ব্যাপারটা যে তা নয় এবং সোমেশ বসু ছাড়াও কোনও কোনও যোগী এ রহস্য জানেন তার একাধিক প্রমাণ আছে।

একটি প্রমাণ আমি এখানে উপস্থিত করছি, 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে' নামে উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ থেকে। এ বই-এর ৫১-৫২ পৃষ্ঠায় একটি উদাহরণ উপস্থিত করেছেন লেখক রবীন্দ্রনাথ রায়।

'বিদেশে সোমেশচন্দ্রের মানসিক গণিতে এই অসাধারণ কীর্তির কথা শোনা অবধি রাজেন্দ্রলাল নিরলসভাবে মানসাঙ্কের সাধনা করে চলছিলেন। এতে করে তাঁর সময়ের যে প্রচুর অপব্যবহার হচ্ছিল তাতে কোনই সন্দেহ নেই। একদিন রাজেনবাবু মনে মনে একটি অতিকায় গুণ করছেন, এমন সময় ঠাকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন: 'কি করছেন?'

'মনে-মনে গুণ করে দেখছি হয় কি-না?'—রাজেনবাবু জবাব দিলেন।

'—ওকে গুণ বলে না, পূরণ বলে—ঠাকুর একটু হেসে কথাটি বলেই রাজেনবাবুকে কয়েকটি পূরণ অংক দিতে অনুরোধ করলেন।

…'রাজেনবাবু তখন বড় বড় সংখ্যায় কয়েকটি অংক লিখে কাগজখানি ঠাকুরের সামনে ধরতেই তিনি গুণফলগুলি পরের পর বলে দিয়ে রাজেনবাবুকে লিখে নিতে বললেন। লেখা শেষ হ'লে রাজেন্দ্রলাল বেশ কিছুক্ষণ ধরে কাগজ পেন্সিলের সাহায্যে যখন কষলেন তখন দেখা গেল ঠাকুরের সব উত্তরগুলিই নির্ভুল। পরম আশ্চর্যভরে মুখের দিকে চাইতে ঠাকুর নির্বিকারকণ্ঠে তাঁকে বললেন—'এ আর এমন শক্ত কি? সব অংকেরই একটি ফল আছে জানেন ত'। কাউকে সেটা কষে বার করতে হয়, কেউ না কষেই তাকে বলতে পারে। এই নিয়ে সময় নষ্ট করে লাভ কি আছে?

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে: রবীন্দ্রনাথ রায়: পৃ: ৫১-৫২]

দু'টো অংক কষার, চারটে পদ্য লেখার ক্ষমতা কিংবা খ্যাতিকে যাঁরা শূকরী-বিষ্ঠাজ্ঞানে অনায়াসত্যাগের দুর্লভ দীপ্তিতে দীপ্তিমান তাঁরাই বলতে পারেন কেবল: যা আমায় অমৃত দেবে না, তা নিয়ে আমি কি করব?

কোটি কোটি লোকের মধ্যে একটি কি দু'টি এমন 'আলোক'-এর যে দেখা পাওয়া যায় তার মূলে কি আছে? জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার। রূপ থেকে অপরূপের আকাঙ্ক্ষায় মানুষ পেঁছিবে, সব মানুষই, যখন তার সময় হবে। সবাই খেতে পাবে, কেউ বেলায় কেউ সকাল-সকাল। এর মধ্যে

অলৌকিকও নেই; অলীকও কিছু না। একমাত্র হিন্দুরাই এ সত্যের সন্ধান পেয়েছে। তাই তারা কাউকে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করে নি, কারুর ধর্মে আঘাত দিয়ে কথা বলে নি কখনও।

হিন্দুরা জীবনের চরম ও পরম বাণী শুনিয়েছে। মানুষকে অমৃতের পুত্র এক তারাই বলেছে।

একজন মানুষ যে দুঃখ পায় এবং আর একজন সুখ, এর মূলে জন্ম-জন্মান্তরের কর্ম ও অকর্ম ছাড়া আর কিছু নেই। জীবনরহস্যের সবচেয়ে সঙ্গত ব্যাখ্যা,—হিন্দুরাই করেছে। এ ব্যাখ্যায় কারুর ভয় পাবার নেই। সকলেই শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় পৌঁছবে। তার নিজের ইচ্ছায় নয়, তাঁর ইচ্ছায়। যে পঙ্গু সে-ও একদিন গিরি লঙ্ঘন করবে; মূক হবে বাচাল, এ বাণী সত্য এবং মনুষ্যত্বের মর্মবাণী। পুরুষকার এবং প্রিডিস্টিনড্ এ দুই-ই সত্য। অনেকের কাছে এটা পরস্পরবিরোধী মনে হয়। যে হিন্দু দর্শন, শাস্ত্র পাঠ করেছে, যে দর্শন করেছে সত্য, সে জানে এ দুই-ই সত্য। ভালো-মন্দ জ্ঞান যতক্ষণ আছে ততক্ষণ আছে পাপপুণ্য। যাঁর এ জ্ঞান গেছে যেমন ত্রৈলঙ্গ, তাঁর কাছে মল ও পরিমলে, কোনও তফাত নেই। সেই জন্যেই মানুষের মহত্তম অবস্থার বর্ণনা গীতায়:

দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা,
সুখেষু চ বিগতস্পৃহ, বীতরাগভয়ক্রোধ;

আরেকজনকে ভুল বুঝেছে একাল। তার নাম চার্বাক। বার্হস্পত্য দর্শন, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ বলতে ইট ড্রিংক এন্ড বি-মেরির FOOL-অসফি আওড়ায় নি। সে বলেছে, এই দেহেই নিঃসন্দেহে তাঁকে পাওয়া যায়, যাঁকে পেলে পুনরাবর্তনের প্রয়োজন হয় না এবং যথার্থ হিন্দুর কাছে উপনিষদ এবং চার্বাকের বক্তব্যের মধ্যে পারম্পর্য আছে, পরস্পরবিরোধিতা নেই।

কিন্তু বই পড়ে এ অনুভূতি হওয়া প্রায় অসম্ভব। এরই জন্যে প্রয়োজন হয় ভগবানের দূতদের। তাঁরা আসেন সমস্ত জীবন দিয়ে এই বাণীকে প্রাণ দিতে। সেই জন্যে সাধকের জীবনের চেয়ে মহত্তর গ্রন্থ নেই। কবিও এ সত্য ধ্যানে অবগত, যখন তিনি বলেন:

'অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে,
সে পায় তোমার হাতে, শান্তির অক্ষয় অধিকার।'

॥ উনত্রিশ ॥

আমিষ না নিরামিষ এই নিয়েই আমাদের লড়াই; মুক্তি আমাদের কদাচ লক্ষ্য। তাই সমস্ত জীবন গঙ্গাস্নান, পুজাপাঠ, শুচি-অশুচি বিচার নিয়েই

দিন গেল। কেউ বলতে পারলাম না, কিংবা আমাদের দেখে কেউ বলতে পারলো না যে, আমরা কিছু পেয়েছি। যাঁরা কিছু পেয়েছেন তাঁদের কাছে গিয়েও, তাঁদের পায়ে পড়েও তাই আমাদের উপায় হলো না। মামলা থেকে, ঝামেলা থেকে, রোগ-ভোগ, আর্থিক দারিদ্র্য, অপুত্রক হবার দুঃখ থেকে মুক্ত হবার রাস্তাই জানতে গেলাম ; মুক্ত হবার মন্ত্র জানবার জন্যে গেলাম না কারুর কাছে। মানবজীবনে যেসব দুঃখ অনিত্য তারও জ্বালা কম নয় জানি এবং গুরুর কাছে তা অজানা থাকে না, তাও জানি। কিন্তু জন্ম-জন্মান্তরে যে দুঃখ নিত্য, তার হাত থেকে রেহাই পাবার সাধনে যে উদ্দীপিত হলাম কৈ? সন্ধান করলাম কৈ এমন মানুষের যে দেখিয়ে দিতে পারে, এই সেই পথ—

নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।

আমরা কাশী যাই, তীর্থ করি, গুরু করি, কেন? না। পরকালে যাতে কষ্ট না হয়। আমরা জানি না, যে এর কোনোওটাই আকুল হয়ে করলে, কারুর জন্যে সত্যি সত্যি ব্যাকুল হয়ে পড়লে, ইহজন্মেই জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনমোচন ঘটে। প্রারব্ধ অর্থাৎ নিয়তি যে নিয়ত সত্য, তার ওপরেও সত্যতর হচ্ছেন গুরু। ইচ্ছে করলে তিনি পারেন যা প্রারব্ধ নয় তা প্রাপ্ত করাতে, যা প্রারব্ধ তাকে করতে খণ্ডন। আমরা বলি, সৎ গুরু। আমরা জানিই না যে সৎ এবং অসৎ গুরু বলে কিছু নেই। গুরু যেই হোক তাতে কিছু এসে যায় না। গুরুবরণ সত্য হলে জীবনে, অ-গুরুও গুরু হয়। অগুরু গন্ধে জীবনের দূষিত বাতাস হয় দূর।

শ্রীশ্রীরামঠাকুরকে একবার এক ভক্ত বলেছিলেন যে, তাঁর বংশ শাক্ত অথচ ঠাকুর তাঁকে বৈষ্ণব-নামে দীক্ষা দিয়ে নিরামিষাশী করতে বাধ্য করছেন।

নিরামিষ কাকে বলে? প্রশ্ন করলেন ঠাকুর।

চাল-গম-শাক-তরকারি, উত্তর দিলেন ভক্ত।

ঠাকুর হেসে বললেন: জগদীশ বোস তো অনেকদিন প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, গাছেরও প্রাণ আছে ; তাহলে?

তাহলে তো এক জল ও বাতাস ছাড়া নিরামিষাশী নিরুপায়,—ভক্ত হতাশ্বাস হয়।

ঠাকুরের মুখে আবার হাসি, এবার আরও হাসি ; অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখুন। জলে আর বাতাসে কত প্রাণীর বিচরণ!

তাহলে উপায়? আমিষ ও নিরামিষ সব তাঁর দু'পায়ে নিবেদন করে দিয়ে গ্রহণ করো। 'গেরণ' দোষ কেটে যাবে তাহলেই।

'শ্রীশ্রীরামঠাকুরের প্রসঙ্গে' এই উপদেশটি লিপিবদ্ধ করেছেন স্বর্গত লেখক, রবীন্দ্রনাথ রায়।

সব মহাপুরুষের মতোই শ্রীশ্রীরামঠাকুরের আসল জীবন-ই অজানা ; তাঁর জীবনী থেকে জানা যায় যে কিশোরকালেই যোগাভ্যাসে রত হন রামঠাকুর।

একদিন তাঁর বৌদি প্রসন্নকুমারী খাবার নিয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে দেখেন, তাঁর দেওর নিরালম্ব অবস্থায় শূন্যে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। রামঠাকুরের মাথা প্রায় ঘরের ছাদে ঠেকে-ঠেকে। শ্রীশ্রীরামঠাকুরের সাধন-জীবনের চল্লিশটি বছর এখনও প্রায় অনাবিষ্কৃত। কথায় কথায় কখনও কখনও তিনি তাঁর গুরুর নাম বলতেন, অনঙ্গদেব। ভূমিকায় [শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে] বলা হয়েছে যে অনঙ্গ অর্থে ঠাকুর বোঝাতে চেয়েছেন যে যাঁর দেহী কিংবা বিদেহী সত্তাও নেই এমন কোনও ব্রহ্মস্বরূপের কাছেই তাঁর দীক্ষা হয়।

স্বপ্নে কিশোর রামচন্দ্র মন্ত্র পান। এই মন্ত্রের পরে তাঁর গুরু অনঙ্গদেব তাঁকে পরিভ্রমণরত অবস্থায় অজানা অরণ্যের মধ্যে দুর্গম নির্জন এক মন্দিরে দীক্ষা দেন। দীক্ষার পর গুরু শিষ্য দুজনের, কখনও রামঠাকুরের একার, কখনও গুরুভ্রাতার সঙ্গে কামাখ্যা থেকে কৈলাস, তন্ত্র সাধনার প্রাণভূমি তিব্বত, কত ঝড়-ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ চির-তুষারলোকে চলে সাধন-প্রব্রজ্যা। এই পথপরিক্রমায় কোটি কোটি জন্মের কোন্ সুকৃতির ফলে কে বলবে দেখা হয়ে যায় ধ্যাননিবিড় নীলিমার কেন্দ্রে চিরজাগ্রত ধ্রুবতারার মত জ্যোতিদীপ্ত যোগীদের সঙ্গে। পুরাণের চেয়েও পুরানো তাঁদের দেহ ; সন্দেহর ঊর্ধ্বে তাঁদের বাস। শরীর পাথরের মত নিশ্চল নিষ্কম্প ; ভুরু থেকে চামড়া ঝুলে চোখ দুটি ঢেকে গেছে। কলেবর এত দীর্ঘ যে সাধারণ লোক দুপায়ে দাঁড়িয়ে যোগাসনে আসীন এঁদের কপোল স্পর্শ করতে পারেন না। বোঝা যায় না যে চিন্ময় না মৃন্ময়মূর্তি।

রামঠাকুর ও তাঁর সঙ্গীর প্রণামের উত্তরে যখন তাঁদের হাত ঈষৎ উত্তোলিত হয় তখনই কেবল বোঝা যায় যে তাঁরা কেবল জীবন্ত নন উজ্জীবন্ত পুরুষ। বহুদূরে বন থেকে অজানা ফল নিয়ে আসেন শিষ্যরা। কিছুক্ষণ বাদে দেখা যায় শূন্যপাত্র পড়ে আছে ; ভোগ গ্রহণ করেছেন তাঁরা।

গুরু অনঙ্গদেবের সঙ্গে এবার শ্রীশ্রীরামঠাকুর পথে বেরোন একা। নিষ্পাদপ তুষারে-ঢাকা মরুদেশে গুরু অনঙ্গদেবের জন্যে ফল খুঁজতে বেরিয়ে রামঠাকুর দেখা পেয়ে যান এক যুগল দিব্যমূর্তির। ঠাকুর প্রণাম করতে নিখিল বিশ্বের যিনি মা তিনি তুলে দিলেন একটি ফল রামঠাকুরের হাতে। গুরুকে সেই ফল খেতে দিলে গুরু অনঙ্গদেব বললেন যে, এ ফল স্বয়ং পার্বতী রামচন্দ্রকে খেতে দিয়েছেন ; তাই এ ফল গুরুর নয় শিষ্যের প্রাপ্য।

[শ্রীশ্রীরামঠাকুর প্রসঙ্গে : রবীন্দ্রনাথ রায় : পৃ ১০৭—১০৮]

সাধন-অন্তে লোকালয়ে ফিরে এলেন শ্রীশ্রীরামঠাকুর কণ্ঠে নারায়ণ-শিলা ধারণ করে। এই নারায়ণ-শিলাকে সুন্দরপুর বলে একটি জায়গায় প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন তিনি। পরবর্তীকালে চিতোরের রাজা-রাণী যখন কাশীতে জীবনদীপ নির্বাপিত হবার অপেক্ষায় তখন শ্রীশ্রীরামঠাকুর কলকাতা থেকে কাশী গিয়ে তাঁদের শেষ দর্শন দেন। ৪০ বছর তিনি লোকালয়ে কাটিয়ে গেছেন। গৃহস্থের

কল্যাণে মানুষকে তিনি বলেছেন কেবল নাম নিতে। নাম করতে ভাল না লাগলেও বলেছেন নাম করতে। বলেছেন, নামেই ভালো হবে নামেই আলো হবে সব।

লৌকিক পৃথিবীতে অলৌকিকের আলো আজও আসে। কেবল কাশীতে নয়, কেবল তীর্থে নয়, ঘোর কলির কুরুক্ষেত্র কলিকাতাতেও অঘটন আজও ঘটে। ভগবানের দূতেরা ছদ্মবেশে আসেন এখানে-ওখানে-সেখানে। আমরা তাঁদের কাছে যাই তুচ্ছ বাসনা নিয়ে। অমুককে বাঁচিয়ে দাও,—এই কথা বলতে বলতে সেই কথা বলা হয় না যার জন্যে মরলোকে আসা। বাসনাকে সোনা করে দিতে আসেন এঁরা। আমরা সোনাকে বাসনায় পরিণত করি। কোটিকে গোটিক কোন খ্যাপা খুঁজতে বেরোয় কোনও পরশপাথর। তার সব বাসনা কখন সোনা হয়ে গেছে টের পায় না সে নিজেও।

এর আগে কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে এক মহাপুরুষের নিজে থেকে দীক্ষা দিয়ে যাবার ভবিষ্যৎ বাণী করেছিলেন কাশীর শক্তিপদ বসুরায়,—এ-কথা বলেছিলাম। এই মহাপুরুষকে দেখে বুঝবে এমন পুরুষ কে? তিনি ম্যাক্‌রোপোলো সিগারেট খান ঘন-ঘন। থাকেন একটি বাড়িতে আরামে। চর্মচক্ষুতে দেখলে মনে হবে সবটাই অলীক কিন্তু মর্মচক্ষে দেখলে বলা শক্ত হবে যে, এ জগতে কোন্‌টা লৌকিক আর কি কি অলৌকিক। এই অবিরত ধূমপানরত মানুষটি কলকাতার যে, ব্যবসায়ীকে নিজে থেকে এসে দীক্ষা দিয়েছেন, সেই ব্যবসায়ীর এক বন্ধু হচ্ছে কলকাতা পুলিশের বড়কর্তা। এঁর স্ত্রীর মাসীমা দুরারোগ্য রোগে যখন আক্রান্ত তখন ইনি স্বপ্নে দেখেন যে ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের দীক্ষাদাতা স্বপ্নে স্বয়ং দেখা দিয়ে বলছেন যে মাসীমা বাঁচবেন না; দশ কি বারো দিনের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাবে। স্বপ্ন দেখবার কয়েকদিন পর যখন মাসীমার চিকিৎসা চলছে কলকাতায়, তখন পুলিশ অফিসারটি একবার তাঁর বন্ধুর দীক্ষাদাতার কাছে যান। স্বপ্নের কথা না বলে স্ত্রীর মাসীমার অসুখের কথা বলেন দীক্ষাদাতাকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন মাসীমার কি হয়েছে। অসুখের নাম শুনে মন্তব্য করেন যে এ অসুখে তো কেউ বাঁচে না, মাসীমাও মারা যাবেন।

পুলিশ অফিসার তখনকার মত চুপ করে যান। তারপর এ-কথা সে-কথার পর আবার বলেন সেই দীক্ষাদাতাকে যে তিনি যদি মাসীমাকে একটু আশীর্বাদ করতেন! তখন স্বপ্নে দেখা দেওয়া সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ বলেন: 'তুমি তো স্বপ্নটি বোঝ নি বাবা।' শোনামাত্র, পুলিশ অফিসারের সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়।

এই অফিসার ভদ্রলোকের এবং তাঁর স্ত্রীর খুব ইচ্ছে হয় এই ঘটনার পর ওই অলৌকিক শক্তিধর পুরুষটিকে নিজের বাড়িতে একবার আনবার। এরপর মাঝে মাঝেই তাঁদের বাড়ি ম্যাক্‌রোপোলো সিগারেটের গন্ধে ভরে যায়। কোথা থেকে এই গন্ধ আসে কেউ বুঝতে পারে না। যাই হোক, বন্ধুর দীক্ষাদাতাকে বাড়িতে আনবেন বলে একটি বিছানার চাদর, কিছু খাবার পাত্র কিনে এনে ঘরে

রাখেন। তারপর একদিন বন্ধুর দীক্ষাদাতার কাছে যান। এবারেও পুলিশ অফিসার কিছু বলবার আগেই সেই শক্তিমান পুরুষ পুলিশ অফিসারকে বলেন : 'তুমি আমার জন্যে বিছানার চাদর, খাবার প্লেট কিনে রেখেছ, আমি জানি; সময় হলেই আমি তোমার ওখানে যাব।'

এই স্বেচ্ছায় দীক্ষাদাতার নাম আমি জানি কিন্তু এখানে সে-নাম আমি বলব না, কারণ তাতে বহু লোক এঁদের তুচ্ছ কারণে বিরক্ত করবে। যেকথা কাউকে বোঝানো যায় না সে-কথা হচ্ছে এই যে, এঁরা যখন কাউকে কৃপা করেন তখন তা স্বেচ্ছায় করেন ; জোর করে কর আদায় করা যায়, কিন্তু করজোড় করেও আদায় করা যায় না কৃপা।

॥ তিরিশ ॥

পরলোকগতদের সম্পর্কে ইহলোকবাসীদের কৌতূহল কখনও মরে না। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ফুরিয়ে যায় কিংবা তার চলা অফুরান, এ নিয়ে অন্তহীন প্রশ্নের সমুদ্রজিজ্ঞাসার উত্তরে মহাকাল নিরুত্তর হিমাদ্রি। শাস্ত্র বলছে, মৃত্যু বলে কিছু নেই। আজ দেহের জীর্ণবাস পরিত্যাগ করে নবীন দেহবাস পরিধান করা।

'ফুরায় নি তো ; ফুরাবার এই ভান।'

কিন্তু দর্শনের পাতা সে তো কথার কথা, যতক্ষণ না চোখের পাতায় দর্শন করা যাচ্ছে যে মৃত্যুর পরের মানুষ অ-মৃত। এ কি কেবল সান্ত্বনা? শুধু স্তোকবাক্য? যদি তা না হয় তা হলে এমন লোক থাকা চাই, কোটিকে গোটিক হোক সে, ক্ষতি নেই, এমন মহান পুরুষের পাওয়া চাই সাক্ষাৎ, যিনি তাঁর দৃষ্টির আলোকে দেখাতে পারেন যে :

'তোমার অসীমে প্রাণমন লয়ে যতদূর আমি যাই,
কোথাও দুঃখ কোথাও মৃত্যু, কোথা বিচ্ছেদ নাই।'

কবির বাণী যদি জীবনেরও বাণী না হয়ে উঠলো কারুর কারুর জীবনে তা হলে সে বাণীর মূল্য কি? ত্রৈলঙ্গ স্বামী যদি শীত-গ্রীষ্ম, গঙ্গাজল-মূত্র, মল ও পরিমল, স্থল ও জল, জীবন-মৃত্যুর আলোক-অন্ধকারকে সমজ্ঞান করে দেখাতে না পারলেন তাহলে অবিশ্বাসীর ভিত্ নড়বে কি করে? পর্বতের কঠিন বুক বিদীর্ণ করে তোমার করুণাধারা যদি না নামে, তাহলে, এতবড় প্রবঞ্চনা এতদিন ধরে নিখিল সইত না।

অহিংসার কথায় চিঁড়ে ভেজে না ; জগাই-মাধাই-এর কলসীর কাণায় রক্তাক্ত হয়েও যখন কেউ দেয় প্রেম, তখনই অন্ধকার-আচ্ছন্নের হয় চৈতন্য! কবির কথা তাই :

শুধু তোমার বাণী নয় গো হে বন্ধু হে প্রিয়, মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশখানি দিও !

শুধু বাণীতে মানুষের মন মানে না। মানুষের যিনি সবচেয়ে প্রিয় তাঁর স্পর্শ মানুষ পেতে চায়। ঈশ্বর-দর্শন যাঁরা করেছেন তাঁদের দর্শন করা তাই মানুষের এত প্রিয়। মহৎ মানুষ যাঁরা, তাঁরা সেই ঈশ্বরের দূত। দক্ষিণেশ্বরে তাই বয় ঈশ্বরের হাওয়া ; সেই হাওয়ায় নিশ্বাস নিতে পারাই সবচেয়ে বড় পুণ্য। ভাগ্য না করলে সে সৌভাগ্যের অধিকারী হয় না। ভাগ্য কি ? না, অ-দৃষ্ট। অ-দৃষ্ট কি ? না, যা তুমি করে এসেছ আগের আগের জীবনে তারই না-দেখা যোগফল। এই যোগের ফল যতক্ষণ না মিলে যাচ্ছে ততক্ষণ কোন যোগের ফলই তোমাকে জন্ম-মৃত্যু চক্রের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না ! অংক না মেলা পর্যন্ত কারুরই রেহাই নেই। ঠাকুরেরও না ; আতুরেরও না।

মহৎ কবি, গীতকার, চিত্রকর, শিল্পী কিংবা মহৎ মানুষ যে তার সকল কীর্তির চেয়ে বড় জীবনশিল্পী, জেনে কিংবা না জেনে, তাঁকে পেতেই হবে সেই স্পর্শ, যে স্পর্শ ছাড়া লেখা হয় না সাহিত্য, ছবি হয় না শিল্প, শব্দ হয় না সংগীত, জীবন হয় না কীর্তির চেয়ে মহৎ।

কাশীতে তার স্পর্শ যাঁদের মধ্যে পাওয়া যায়, মানুষের মধ্যে তাঁরাই নাম করার যোগ্য ; নাম এবং প্রণাম করার। বাকি আমরা সবাই, 'also ran'-এর দলে। আমাদের জন্যই ওঁদের আসা। সেই আশাকে তামাশা না করাই মানব জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য :

দারিদ্র্য-দুঃখ, বিচ্ছেদ-বেদনা, অশান্তির দহনে দগ্ধ মানুষ মহাপুরুষের সন্ধানে ছোটে যদি কোনও অলৌকিক উপায়ে এই লৌকিক যন্ত্রণার হাত থেকে মেলে নিস্তার। কখনও কখনও কারুর যে মেলে না তার হদিশ এমন নয়। ঠাকুর রামকৃষ্ণ তাঁর ভক্তকে বলেছিলেন : যা ; তোর বড় দরজা হবে। কিন্তু বিবেকানন্দকে বলেছিলেন : মা'র কাছে তুই যা চাইবি তাই পাবি। একথা আর কাউকে বলেন নি, কারণ, আর কেউ ছিলো না এমন আশীর্বাদের যোগ্য। বিবেকানন্দ, জানতেন তাঁর গুরু, যা চাইবে তা' ধনরত্ন নয় ; তা সেই মণি, যা পেলে ধন ও নির্ধনে কোনও ভেদবুদ্ধি থাকে না। তাই বিবেকানন্দের মোটা ভাত-কাপড়ের কখনও অভাব হবে না, এমন কথা স্বেচ্ছায় শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়েছিলেন নরেন্দ্রকে।

ব্যাপারটা বিস্তৃত ব্যাখ্যার অভাব রাখে।

নরেন্দ্র সেদিনকার কলকাতায় নামকরা ঘরের ছেলে ; গ্র্যাজুয়েট। কিছুতেই এমন একজন লোক আজ থেকে আশি বছর আগে পেট চালাবার মতো একটা চাকরি জোগাড় করতে পারলো না। এটা কি ভাগ্যের চক্রান্ত নয় ? একেবারে নিরুপায় করে ঠাকুরের পায়ে এনে ফেলবে বলেই না, নরেনের মায়ের মতো মায়ের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন : 'চুপ কর ছোঁড়া, তোর ঈশ্বর তো সব করলেন—' !

মায়ের কথা যে ব্যর্থ হয়নি নরেন্দ্র থেকে বিবেকানন্দের জন্ম তো তারই অব্যর্থ প্রমাণ। শেষ পর্যন্ত, ঈশ্বরই তো সব করলেন। যিনি ঈশ্বর তিনিই দক্ষিণেশ্বরে এসে,—নরেন্দ্রকে বীরেন্দ্র করলেন। তাঁর উদ্দেশ্য পূর্ণ করলেন একজন সাধারণ নরকে এক অসাধারণ নরেন্দ্র,—বিবেকানন্দ যাঁর নাম।

কিন্তু আমরা যারা অতি সাধারণ নর, অসাধারণ নরেন্দ্র নই, আমরা কি করব? আমরা কি সন্তান-মৃত্যুতে কাঁদব না? দুঃসহ দারিদ্র্যে নিরুদ্বিগ্নমন এবং সুখে বিগতস্পৃহ হব? হব বীতরাগভয়ক্রোধ? না। চাইলেই তো হওয়া যায় না! সন্ন্যাসী গুরুভায়ের মৃত্যুতে কেঁদে বুক ভাসিয়ে দিয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ, জন্ম-মৃত্যুর রহস্য যিনি জানতেন। কাঁদার জন্যে নিন্দিত হলে তিনি বলেছিলেন: সন্ন্যাসী হয়েছি বলেই কি মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়েছি? নরেন্দ্র যদি প্রিয়জনবিয়োগে ব্যথিত হতে পারেন তাহলে আমরা সাধারণ নর, আমাদের আপনজনের মৃত্যুতে দু'চোখ ভরে উঠলে জলে, আমাদের মনুষ্যত্ব জ্বলে ওঠে; তার পতন হয় না। জীবনকে এত ভালোবাসি বলেই তো জানি ভালোবাসাই ঈশ্বরের সবচেয়ে ভালো বাসা। ঈশ্বরের জন্যে যখন এমনই কাঁদব তখনই সেই অশ্রুবিন্দুতে জীবনসিন্ধু মন্থন করা অমৃত ক্ষরিত হবে; ঈশ্বরের চেয়ে আপন আর কেউ নেই একথা চোখের জলে যে বলতে পারে, সেই তো দক্ষিণেশ্বর!

মৃত্যুদুঃখ দহন আছে; তবু আনন্দ অনন্ত, জাগে। দেহের মৃৎপাত্রে অমৃত যে পেতে চায় তাকে দুঃখ পেতেই হবে! কারণ অমৃতের অধিকার,—'সে তো নহে সুখ ওরে, সে নহে আরাম।' স্মরণাতীতকালের এক সকালে সন্তান-মৃত্যুতে কাতরা এক রমণী বুদ্ধদেবের কাছে গিয়েছিলো,—মৃতদেহে প্রাণসঞ্চারের প্রার্থনা নিয়ে। বুদ্ধদেব সে প্রার্থনার উত্তরে, অন্ধজনে দিয়েছিলেন আলো। বলেছিলেন, খুঁজে বার কর একটি অমৃত্যুস্পর্শ ঘর। এই সান্ত্বনায়, শান্ত না হয়ে উপায় ছিলো না মৃত্যুদুঃখকাতরার। তার উত্তর সে খুঁজে পেয়েছিলো।

দুঃখ হচ্ছে মানব-জীবনের মহৎ অধিকার। এই অধিকারে দেবতারা বঞ্চিত। দুঃখ হচ্ছে মুক্তির যৌতুক। এ যৌতুক মানুষ ছাড়া আর কারুর দেবার ক্ষমতা নেই। স্বর্গ-মর্ত্য পাতালে কখনও দানব কর্তৃক দেবতা, আবার দেবতা কর্তৃক দানব পরাভূত হয়। সৃষ্টির ইতিহাস তাই প্যারাডাইস লস্ট এবং প্যারাডাইস রিগেইনড-এর ইতিহাস। এই ইতিহাসে অপরাজিত কেবল মনুষ্যত্ব। দুঃখই সেই মনুষ্যত্বের দীপ্তি। দুঃখই মানুষের মহত্তম অহঙ্কার; তার একমাত্র অলঙ্কার। তাই দুঃখ পেয়েছিলেন শ্রীরামচন্দ্র। এই দুঃখের মূল খুঁজতে বেরিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এই দুঃখকেই মাথার মুকুট করেছেন যুগে যুগে ভগবানের দূত। তাই সেই অদ্ভুত কথা শুনি কবিকণ্ঠে:

'এই করেছ ভালো নিঠুর এই করেছ ভালো,
এমনি করে হৃদয়ে মোর তীব্র দহন জ্বালো।'

দুঃখের আগুনে না পুড়লে তুচ্ছ বাসনা কখনও খাঁটি সোনা হয় না।

দুঃখ যে পাচ্ছে সেই এগুচ্ছে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, অসৎ থেকে সৎ-এর দিকে। ঠাকুরের কাছে যে অর্থ চাইছে সে পাচ্ছে বড় দরজা। কিন্তু সে যা হারাচ্ছে কোন মণি হাতে পেয়েই এমন ধনে সে কখনই ধনী হবে না যাতে তুচ্ছ মণিকে ফেলে দিতে পারে জলে; চোখের জলে পেতে পারে তাঁকে যিনি নীলমণি।

যত দুঃখ জীবনে আমরা পাই আসলে তাই যে সুখ এবং সুখ বলে যাকে মনে করি তা যে মনের অসুখ বিশ্বাস যখন কারুর হয় তখন কুন্তীর মত সে বর চায়: আমার জীবন থেকে দুখের মেঘ সরিয়ে নিও না, হে কৃষ্ণ, কারণ তাহলেই তোমাকে আমি ভুলে যাব। কিন্তু যে কুন্তী নয়, দুঃখ সহ্য করার শক্তি সে কোথা থেকে পাবে? কোন সান্ত্বনাই তো তাকে শান্ত করবে না। তাকে জানতে হবে, তাকে মানতে হবে যে যাকে সে দুঃখ বলছে তা তার নিজেরই তৈরি। পূর্ব-পূর্বজন্মের কৃতকর্মের ফলভোগ করতে আমাদের আসা এই লোকে, লোকান্তরে। আমাদের যিনি স্রষ্টা তিনি তাকিয়ে আছেন আমাদের দিকে, অনিমেষদৃষ্টিতে। কবে খেলা শেষ করে আমরা ঘরে ফিরব। তাঁর পতাকা তিনি তাকে দেন না, যাকে দেন না তা বইবার ক্ষমতা। বাহান্ন কোটি যোনি পার হয়ে তবে যে ঘর থেকে আসা সেই ঘরে ফিরে যাওয়ার আশা পূর্ণ। এর থেকে কারুর রেহাই নেই। কেবল সৎগুরু পারেন এক জন্মেই কোটি জন্মের প্রারব্ধ খণ্ডন করতে বা মোচন করতে। কিন্তু সেই সৎগুরু পাওয়াও আবার বহু পূর্বজন্মের মিলিত সুকৃতির ফল।

আলোচনাতেই আলো অনুপস্থিত। এই আলোকে যিনি দেখাতে পারেন নিজের প্রজ্ঞার অতীত কোন আলোকে তিনিই গুরু। তিনি দেখিয়ে দিতে পারেন মৃত্যুর পরেও আমরা বেঁচে থাকি। সূর্যাস্তের মত মৃত্যুও অলীক। কেউ মরে না; কিছুই মরে না। কাশীতে শক্তিপদ বসুরায় এরকম একজন লোকের কথা, এরকম একটি আলোকের বার্তা আমাকে শুনিয়েছিলেন। যার কথা বলেছিলেন তিনি কাশীতে মাঝে মাঝে আসতেন যেতেন। পরলোকগতকে দেখাবার ক্ষমতা ছিল তাঁর। মর্মচক্ষে নয়; চর্মচক্ষে। অতি সম্প্রতি তিনি মরলোক ত্যাগ করে অমরলোকে প্রস্থান করেছেন। তাঁর পুণ্য-পবিত্র নাম—জগন্নাথ আশ্রম।

কলকাতার পুলিশের একজন বড়কর্তাকে, মহত্তম একজন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতাকে অকস্মাৎ অপঘাতমৃত্যুর পর আমি অদৃশ্য হয়ে গেছি তোমার চোখের সামনে। বলতে বলতে দেখা গেল তাঁর সামনের আসন খালি; মহাপুরুষ নেই। স্যার রমেশ মনে মনে ভাবছেন, ব্যাপারটা ভোজবাজি, না সম্মোহন-ক্রিয়া? মনে হওয়ামাত্র অদৃশ্য গুরু বলে উঠলেন: রমেশ, তুমি যা ভাবছ তার একটাও ঠিক নয়; এ ম্যাজিকও নয় হিপ্নোটিসম্‌ও নয়। তারপর

আবার উদয় হলেন স্থূলদেহ নিয়ে, এসে বসলেন সেই আসনে। ইনি স্যার রমেশের পরলোকগত পরমাত্মীয়াকে চাক্ষুষ করান।

বিখ্যাত মানসাংকপারদর্শী সোমেশ বসুকেও তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর সঙ্গে, একই সঙ্গে দীক্ষা দেন তাঁর গুরু। এইজন্যে সোমেশচন্দ্রের গলায় একটির বদলে দুটি রুদ্রাক্ষ ছিল। তাঁর ঘরদোরও তাঁর স্ত্রী মৃত্যুর পরও এসে গুছিয়ে দিতেন বলে শোনা যায়। এই মানসাংকপারদর্শিতা সোমেশচন্দ্রের মধ্যে খুব অল্প-বয়সে দেখা গিয়েছিল। জন্মান্তরের তত্ত্ব যাঁরা জানেন এ ব্যাপারটা অলৌকিক নয়; সম্পূর্ণ-ই লৌকিক। বিগতজন্মে সোমেশচন্দ্র অংক কষার এমন একটা স্তরে পেঁাছেছিলেন যার পর এবারে জন্মমাত্রই মনে মনে যে কোন দুরূহ গুণ মুহূর্তের মধ্যে নির্ভুল করতে পারতেন। শিবপুর দীনবন্ধু কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ ননীগোপাল চৌধুরী নিজে এবং তাঁর এক আত্মীয় সোমেশচন্দ্রকে পরীক্ষা করেন। এতবড় গুণ তাঁকে করতে দেন ডঃ চৌধুরী এবং তাঁর আত্মীয়, যে, একটা কাগজের সঙ্গে আরেকটা কাগজ জোড়বার পর তবে সে অংকের জায়গা হয়। সোমেশচন্দ্র অংকটা একবার শুনে তার উত্তর বলে গেলে, দেখা যায় এক জায়গায় মিলছে না। পরে দেখা যায় যে অংক যাঁরা করতে দিয়েছিলেন তাঁদেরই ভুল হয়েছে।

প্রহলাদ যে জন্মেই ক-এ কৃষ্ণ বলেছিল তাও অলৌকিক বা অলীক নয়। —আগের জন্মে তার কৃষ্ণ সাধনা সামান্য অসম্পূর্ণ ছিল তাই হিরণ্যকশিপুর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে সে চলে গিয়েছিল জন্ম-মৃত্যুর চক্রভেদ করে চিরকালের মত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে তাঁর অনেক কবিতা যেন তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছে। তাঁর সৃষ্টির প্রাচুর্য পরিশ্রমে সম্ভব নয়; প্রতিভাতেও অসম্ভব। আরও কোন শক্তি তাঁকে না লিখিয়ে নিস্তার দেন নি। এখানে প্রতিভা অর্থে ইংরিজিতে যাকে জিনিয়াস বলে তার কথাই বলেছি। ডঃ গোপীনাথ কবিরাজ বলেছেন যে প্রতিভা হচ্ছে ইনটুইশান; জিনিয়াস নয়। এ যার ওপর ভর করে কেবল সেই জানে যে গাছে যিনি ফুল ফোটান, নদীতে যিনি বান ছোটান, পঙ্গুকে দিয়ে তিনি পর্বত লঙ্ঘন করান; মূককে বাচাল করেন তিনিই।

শুধু কি তাই? বাণীর বরপুত্রকেও তিনি কখনও কখনও স্তব্ধ করিয়ে দেন। আমাদের চোখের সামনেই রয়েছে তার এখনও উজ্জ্বল উদাহরণ,—কাজী নজরুল ইসলাম। কোন কোন মহলে বলা হয়েছে যে দুরারোগ্য ব্যাধির জন্যেই কাজীর এই দুরবস্থা। মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডেভিস বলেছেন: সাধারণ অসুখ এ নয়; অসাধারণ প্রতিভাদের কখনও কখনও এমন অবস্থা হয়। সাধারণ অসুখ হলে, নজরুল এতদিন বাঁচতেন না। নজরুল হচ্ছেন প্রতিভা এবং কেউ কেউ জানে প্রতিভার চেয়ে বড় দুরারোগ্য ব্যাধি আর নেই।

এই যে, কেউ কেউ কোন কোন বাচাল মূক হচ্ছে এবং মূক কখনও কখনও বাচাল হচ্ছে, এর পেছনেও জন্ম-জন্মান্তরের কার্যকারণ রয়েছে। নজরুলের জন্মচক্র কেউ যদি নির্ভুল পড়তে পারে তাহলে এই ব্যাধির কথা সে যথাস্থানে

লিপিবন্ধ করবে নিশ্চয়ই। এমন কি এ ভবিষ্যদ্বাণী করাও বাতুলতা না হতে পারে যে, হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে যাওয়া মানসসরোবর মুখর হতে পারে আবার! আগ্নেয়গিরির মুখে আবার উচ্চারিত হতে পারে অগ্নিময়ী বাণী!

আমাদের প্রত্যেকটি কাজের জবাব দিতে হয়। জন্ম-মুহূর্তে আমাদের গ্রহ-সন্নিবেশ, আমাদের অর্জিত কর্মফলের সূচীপত্র মাত্র। এই সূচীপত্র থেকে বলে দেওয়া যায় যে আমাদের এ জন্মের প্রাপ্তি কতটুকু। মানবদেহ ধারণ করলে এই জন্যে অবতারকেও ফলভোগ করতে হয় কৃতকর্মের। জন্মপত্র বিচার না করেও কেউ কেউ ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারেন। অন্য কেউ তখন সেই কথা ভবিষ্যদ্বক্তার কানে কানে বলে যান। আলিপুরের বোমার মামলা চলার সময় শ্রীঅরবিন্দ সম্পর্কে একজন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, 'আপনাকে ধরে রাখতে পারে এমন কারাগার এখনও তৈরি হয় নি।'

গ্রহের ওপরেও আছে মায়ের অনুগ্রহ। সে-অনুগ্রহ যখন কারুর ওপর নামে তখন তাঁর ওপর আর কোন গ্রহ কাজ করে না। তাঁরা ইচ্ছামৃত্যু বরণ করেন। ইচ্ছা করলে তাঁরা আবার জন্মগ্রহণ করতে পারেন। জন্ম-মৃত্যুর ইচ্ছাধীন নন তিনি; জন্ম-মৃত্যুই তাঁর ইচ্ছার অধীন। কাশীতে এবং অন্যত্র এখনও কোটিতে কোটিতে তেমন আবির্ভাব ঘটে।

জীবন-যুদ্ধে হার-জিতের জন্য লজ্জা এবং অহংকার অর্থহীন। শেষ বিচারে এর জন্যে আমরা দায়ী নই। তবে কি আমরা যা খুশি তাই করতে পারি? না। ততক্ষণ পারি না যতক্ষণ ত্রৈলঙ্গের মতো মল ও পরিমল, গঙ্গাজল ও মূত্র সমান না হয়ে যায়। ভেদবুদ্ধি থাকা পর্যন্ত পাপ-পুণ্য আছে কর্ম অকর্ম, জন্ম-মৃত্যু, স্বর্গ-নরক ততক্ষণ আছে যতক্ষণ এই জ্ঞান জ্যান্ত হয়ে ফুটে না উঠছে যে আমি সে-ই, যে ইচ্ছে করে ভুলেছে সে রাজা কারণ ভিখিরির ভূমিকায় না হলে তার খেলা জমে না। একদম আদিতে কর্ম ছিল না; অকর্মও না। কর্মকে আমরা কুড়িয়ে পেয়েছি পথে; পথেই তাকে ফেলে যেতে হবে। যে তা পারে সে-ই যথার্থ মুক্তপুরুষ। শ্রীঅরবিন্দ ছিলেন এমনই মুক্তপুরুষ। হাওড়ায় কালী কুণ্ডু লেনে ছিলেন আরও একজন,—তাঁর নাম বিজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়; একজন আরও রয়েছেন কাশীতে। তাঁর নাম আনন্দময়ী মা।

॥ একত্রিশ ॥

হাওড়ার একজন প্রতিষ্ঠিত প্রবীণ চিকিৎসকের একটি লৌকিক জিজ্ঞাসার উত্তর অলৌকিক উপায়ে কিভাবে মিলেছে কাশীতে গিয়ে, তার চমকপ্রদ একটি বিবরণ এবার উপস্থিত করছি এই লোককথার সমর্থনে যে—

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।

মানুষের বুদ্ধি ও জ্ঞানের ওপরে এত ব্যাপার ও ব্যাপারী দাঁড়িয়ে আছেন যুগ-যুগ ধরে যে কোনও মানুষের সাধ্য নেই অহৈতুকী কৃপা ছাড়া তাকে উপলব্ধি করবার। জীবন যখন শুকিয়ে যায় তখন করুণাধারায় না এলে তাঁর স্পর্শে, তাঁকে কিছুতেই ছুঁতে পারে না কেউ। সেই করুণার স্পর্শ যার লেখনীতে, তুলিতে, কণ্ঠে কিংবা জীবনে, কেবল সে-ই এই মরলোকে এসেই পারে, ফুল ফুটোতে। বাকি সবাই যতই আঘাত করুক তারা পারবে না, কিছুতেই পারবে না ফুল ফোটাতে। তারা জীবনভোর কেবল কখনও পণ্ডশ্রমের, কখনও শাস্ত্রের, কখনও শস্ত্রের, কখনও ছুৎমার্গের, কখনও জ্ঞান-মার্গের, কখনও দর্শন, বিজ্ঞান তত্ত্বের, কখনও অবিশ্বাসের হুল ফুটোবে।

যাঁকে স্পর্শ না করে সেই অনির্বচনীয় অপরূপ অবাঙ্‌মনসোগোচর, যতক্ষণ না আসে তাঁর আশীর্বাদ, ততক্ষণ হয় না কিছু। সময় না হলে কিছু হয় না, কারুর হয় না। দুঃসময়ই সুসময়। সন্তান-মৃত্যুর দুঃসময়-এর মধ্যে দিয়ে আঘাতের মধ্যে দিয়ে আসে কারুর কারুর জীবনে সেই সুসময়। কেউ আবার হঠাৎ ঘুম থেকে জেগে ওঠে সময়ের সমুদ্রতীরে হঠাৎ, 'বেলা যায়' ডাক শুনে। অর্থাৎ তখন তার সময় হয়েছে, বাসনা থেকে সোনা হবার সময়। তাই 'বেলা যায়' শুনে সে বেরিয়ে পড়ে তার সন্ধানে, ঝড়ের রাতে অভিসার যে পরাণসখা বন্ধুর। কখন তার সময় হবে কেউ জানে না। সময়েই শব,—সব হবে। রত্নাকর হবে বাল্মীকি, জগাই-মাধাই হবে উদ্ধার, মূক বাচাল হবে, গিরিলঙ্ঘন করবে পঙ্গু।

আমরা সাংঘাতিক ভুল বলি, যখন বলি, সময় কারুর জন্যে অপেক্ষা করে না। সময়ই শুধু সব সময় অপেক্ষা করে আছে, কখন শব থেকে তোমার সব হবার সময় হবে। আমরা ভুল করি। আমরা মনে করি, আমরা তাঁকে ডাকি যিনি সাড়া দেন না। তা নয়। তিনিই কান পেতে আছেন কখন আমাদের পদধ্বনি বাজে তাঁর কাছে পোঁছবার জন্যে। ভগবানের জন্যে ভক্তের ব্যাকুলতা, ভক্তের জন্যে ভগবানের আকুলতা অথচ ভক্তে এবং ভগবানে লুকোচুরিই তো লীলা। কৃষ্ণ কংসকে মুক্ত না করা পর্যন্ত কৃষ্ণেরও তৃষ্ণার মুক্তি নেই, কারণ কংসের চেয়ে কৃষ্ণাচ্ছন্ন পুরুষ মথুরায় আর কে!

হাওড়ার প্রবীণ প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসকের একমাত্র পুত্র গৃহত্যাগ করেছিলো কয়েক মাস আগে। কেন করেছিলো সে-বৃত্তান্ত ব্যক্তিগত, তাই সেকথা থাক। সেই একমাত্র পুত্রও চিকিৎসক। তার সন্ধান মেলে না কোথাও। বোম্বাইতে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ এক বন্ধুর কাছে গেছে মনে করে খবর করেন। কিন্তু সেখানে যায় নি বলে জানা যায়। হাল ছেড়ে দেবার আগে ডাক্তারবাবু কাশী গেলেন। যদি কোন মহাপুরুষ বলে দেন, কোথায় চলে গেছে তাঁর ছেলে। কাশীর একজন পরমাশ্চর্য পণ্ডিতের কাছে একজনের নাম শুনে যান তাঁর কাছে। প্রথম দিন দেখা মেলে না। দ্বিতীয় দিন হাতে মিষ্টির বাক্স নিয়ে যেতেই সেই 'একজন' গর্জন করে ওঠেন, সিংহগর্জন : মিষ্টি কেন?

ডাক্তার ঘাবড়ে যান। এত রাগের কারণ বুঝতে না পেরে বলেন : দেব-দ্বিজ-সাধুর কাছে শূন্য হাতে যেতে নেই, তাই—

আমি দ্বিজও নই, সাধুও নই—, মিষ্টি আপনাকে ফেরত নিতে হবে!

তখন কাশীর সেই পরমাশ্চর্য পণ্ডিতের কথা বলেন ডাক্তার। বোধ হয় একটু প্রশমিত হয় রাগ। সেই 'একজন' এবার স্তিমিত গর্জনে বলেন ডাক্তারকে : একটা প্রশ্নের জবাব দেব আপনার ; মাত্র একটার। বলুন আপনার জিজ্ঞাস্য কি?

ডাক্তার আসল প্রসঙ্গ না তুলে জিজ্ঞেস করেন : পুরুষকার কি?

সঙ্গে সঙ্গে সেই একজন এবার লাফিয়ে পড়েন প্রায়! আপনি তা জানতে মোটেই আসেন নি। আপনি জানতে এসেছেন, আপনার ছেলে কোথায়?

বজ্রপাত হলে ঘরের মধ্যে ডাক্তার এত হতবাক হতেন না। তাঁর মনের অবস্থা অবর্ণনীয়।

কিন্তু সেই একজন থামেন না ; বলেন আপনার ছেলে বেঁচে আছে, সুস্থ আছে, সসম্মানে আছে—ডাক্তার অস্ফুট কাৎরান : কিন্তু কোথায় আছে সে?

পুনর্গর্জনে শোনা যায় ফের : বলছি তো আর একটি কথারও জবাব দেব না।

আসবার আগে ডাক্তারকে আর একবার কৃপা করেন তিনি। বলেন : যদি ভেবে থাকেন সে বিবাহিত, তবে ভুল করেছেন।

হাওড়ার এই ডাক্তার আমার কাছে এসেছিলেন। তাঁর ছেলের চোখে যদি এ লেখা পড়ে তা হলে আশা করব তাঁর একটা খবর তিনি দেবেন। বাবাকে না দিন, মাকে অন্তত দেবেন। এই জন্যে আশা করব যে, বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধানো যায়, কিন্তু কাঁদানো যায় না মা-কে।

সাধারণ মানুষ যখন অসাধারণ পুরুষের শরণ নেন, তখন কোন তুচ্ছ জিজ্ঞাসা নিয়ে তাঁদের বিব্রত করা উচিত নয়, একথা কেউ কেউ বলেন। আমি বলি না। তার কারণ সকলেই যদি, যা দিয়ে আমার অমৃতলাভ হবে না ; তা নিয়ে আমি কি করব, এই মহৎ অন্বেষক হয়, তাহলে সাধারণ কথারও কোনও অর্থ থাকে না। আর্ত যারা, যারা নিঃস্ব, যারা ভীত, তাদের কাছে পুত্রের অসুখ অথবা চলে যাওয়া তুচ্ছ ব্যাপার কেন হবে, আমি বুঝি না।

যে মহাপুরুষ নিজেকে আড়াল করতে চান, গৃহীর ছদ্মবেশে যে চিরসন্ন্যাসী বাস করেন, তিনি যদি দূর না করেন সাধারণের সংশয়, দেখলেই দূর দূর করে তাড়িয়ে দেন, তাহলে তৃণাতিতৃণ যারা, দীনাতিদীন যারা তাদের বাঁচাবার জন্য কে আছে দিনদুনিয়ায়। যে জ্ঞানী, যে বৈরাগী, যার ভেতরে জেগেছে মহৎ জিজ্ঞাসা তার চেয়ে ঢের বেশি প্রয়োজন তার যে আছে অন্ধকারে।

তমো থেকে মহত্তমে যদি না নিয়ে যাও তুমি, মৃত্যু থেকে অমৃতে, অসৎ থেকে সতে,—তাহলে তোমাকে ভালোবাসার মানে কি। স্কুলের পরীক্ষায় যে পড়বে সে ফার্স্ট হবে, সে তো জানা। কিন্তু যাঁর কথা জানা যায় না, সেই

অজানাও কি ধুলোমেখে যে আসবে তার কাছে তাকে বলবে ধুলো ঝেড়ে আসতে ?

গায়ে আমার মাটি লেগেছে বলেই সেই 'মা'-টি তো নিজের হাতে আমাকে মুক্ত করবেন মালিন্য থেকে !

তাই জন্যেই তো মা-কে ডাকা, না হলে তোমাকে আমার দরকার কি ? আর কাশীর সেই 'একজন'-কে কিছুতেই বোঝাতে পারি না যে, হুল ফুটলে যেমন রক্ত বেরুবেই, তেমনই ফুল ফুটলে তার গন্ধ ছুটবেই !

হুল আর ফুল এরা কখনও নিজেদের লুকোতেই পারে না।

আরো ডাক্তারকে বলি, হুল যদি ফুটে থাকে তোমার মনে, তাহলে জেনে বেঁচে গেছ তুমি। কারণ, হুল তিনি তাকেই কেবল ফোটান, যার মনে ফুল ফুটোবেন তিনি আরেকদিন !

সেই আরেকদিন যেদিন ডাক্তারের জীবনে আসবে সেদিন আর 'একজন'-এর কাছে যেতে হবে না তাকে। তিনি জানবেন সেদিন, যে, সকলজনের মধ্যেই সেই 'একজন' বাস করেন, ভালোবাসাই যাঁর সবচেয়ে ভালো বাসা।

সেদিন ডাক্তার জানবেন, যে যিনি হুল তিনিই ফুল এবং কেবল তিনিই বিউটিফুল !

॥ বত্রিশ ॥

বিশ্বাস ও সংশয়ের আলোছায়ার পথে তার আসা-যাওয়া যাকে অনাদি-কালের এই বসুন্ধরা খ্যাপার মতো খুঁজে ফেরে আজও। যুক্তি-বিদ্যা-বুদ্ধির বিসর্পিল বিপথে নয় ; সহজ বিশ্বাসের রাজপথে এসে পড়েছে তার মুকুটের আলো ভোরের সূর্যের মতো, বন্ধুর প্রসন্ন হাসির মতো, নীলাকাশ ছাপিয়ে নিরুপম জ্যোৎস্না-যামিনীর মাধুরীর মতো। বিশ্বাসের এই ফুল যে পারে সে এমনিই পারে ফোটাতে। বটানির বিদ্যা দিয়ে বোঁটাতে মিথ্যে আঘাত করে ফুল ফোটাতে পারবে না। ফুলের চেয়েও বিউটিফুল যে ট্রুথ তাকেও দর্শনের পাতায় নয়, চোখের পাতায় দর্শন না করে কেউ অখন্ড পূর্ণ সত্যের আভাস পায় না। বিদ্যা-বুদ্ধি-মুক্তি যাকে বলে আসলে তা আলেয়া ; জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন যাকে মরূদ্যান বলে আসলে তা মরীচিকা। শাস্ত্র-পাঠ-যোগাভ্যাস-ব্রহ্মচর্যায় তাকে পাওয়া না যেতে পারে, আবার ওসবের ধার না মাড়িয়েও কেউ ধরতে পারে তাকে সে নিজে ধরা না দিলে তাকে ধরে ; ধরায় এমন সাধ্য কার !

বিশ্বাসে, বেদনায়, ভালোবাসায় পাগল হও ; আগল খুলে যাবে সেই বন্ধ দরজার।

কিছু চেও না। রূপ নয়, যশ নয়, নয় খ্যাতি, প্রতিপত্তি অর্থ, সামর্থ্য,

শত্রুজনের অভিলাষ কোর না; বোলো না,—মুক্তি চাই। বলো,—শুধু তোমাকে চাই। যে চায় তাকেই নাচায় সে। যে না চায়, তাকে নাচায় কি করে! কাজেই তাকে বাঁচায়। জন্ম-জন্মান্তরের খাঁচায় আর পারে না তাকে পুরতে। ঘুরতে হয় না তাকে আর এই গোলকধাঁধায়। আলেয়াকে আলো বলে, মরীচিকাকে মরুদ্যান বলে সে আর ভুল করে না। ভুল তখন ফুটেছে হুল হয়ে। মুক্তি উঠেছে মা হয়ে।

মাকে চাও, তোমাকে ঠেকাবে কে! শব থেকে সব হবে তুমি।

বিষমুক্ত শ্বাসই হচ্ছে বিশ্বাস। নিঃস্ব হবার প্রার্থনাযুক্ত শ্বাসই হচ্ছে নিশ্বাস। এ বিশ্বাস যতক্ষণ না তোমার নিশ্বাস হয়ে উঠছে ততক্ষণ পুরুষকার বলছ যাকে, আসলে তা কাপুরুষকার। এ বিশ্বাস নিশ্বাস হয়ে উঠছে যেই সেই তোমার অহংকার হয়ে উঠছে অলংকার। তখন এ ধারায় এসেই জানছ তুমিই 'সে'-ই! যেই জানলে সেই আর চাইবার কিছু রইলো না। তখনই জলে-স্থলে-নভোতলে বইলো মধুর স্রোত।

কি করে তা সম্ভব? বুদ্ধি-বিদ্যা-যুক্তিতে অসম্ভব।

বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

পরলোকগত কাউকে মরলোকগত করা যায় আবার, যুক্তিতে এখনও পর্যন্ত এর স্বীকৃতি নেই। কিন্তু তা যে সম্ভব নয় কেবল, অত্যন্ত সহজসাধ্য তার প্রমাণ যে পেয়েছে সে কি তা যুক্তিতে পেয়েছে? কাজী নজরুল ইসলামের ছেলে বুলবুল মারা যাবার পর, লালগোলা স্কুলের স্বর্গত প্রধান শিক্ষক গৃহী-যোগী, বরদাচরণ মজুমদার মহাশয়কে তিনি যখন প্রশ্ন করেন: ছেলেটিকে একবার দেখতে বড় ইচ্ছা হয়। কিন্তু মৃত আত্মা কি পূর্বের স্থূল শরীর ধারণ করে আবার ফিরে আসে?'

সস্নেহে বরদাচরণ বললেন, 'ছেলেকে দেখতে চাও? বেশ, দেখতে পাবে। কিন্তু তার সঙ্গে কথা বলো না।'

'কাল রাত্রি আন্দাজ ন'টার সময় আমি সাধনার জন্যে ধ্যানে বসেছি, তাঁর নির্দেশমতো মন্ত্র জপ করছি,—এমন সময় কার পায়ের শব্দ যেন কানে এল। চেয়ে দেখি, ঘরের মধ্যে বুলবুল। সে ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে তার কচি হাত দিয়ে আলমারিটি খুললো। ঐ আলমারিতে সযত্নে রাখা তার পোশাক-পরিচ্ছদ, খেলনাগুলি নেড়েচেড়ে দেখে আলমারি বন্ধ করলো। শেষে আমার দিকে চেয়ে তার সেই মিষ্টি হাসিটুকু আমাকে উপহার দিয়ে বুলবুল আমার ঘর থেকে উড়ে গেল...' [এই উদ্ধৃতি—নলিনীকান্ত সরকার এর লেখা 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' বই থেকে।

সন্তান-শোকে উন্মাদ হয়েছিলো যে নজরুল, সে আজ অনির্বচনীয় কোনও অপরূপের আনন্দে পাগল কি না কে বলবে!

বই পড়ে বিশ্বাস হয় না। দেখে, ঠেকে, শিখেও হয় না অনেকের। সাধুসঙ্গ করেও কারুর স্বর্গবাস হবেই এমন কথা নেই। লালবাবার কাছে বারো বছর

থেকেও একজন কিছু পায় নি, একথা স্বয়ং লালবাবাই বলেছেন। তিনি যদি ইচ্ছে করেছেন তবে লৌকিক দেহে দর্শন না দিয়েও কারুকে কারুকে করেছেন কৃপা। যেমন বরদাবাবু ছিলেন এমন একজন। একে বলে অহৈতুকী কৃপা। এ কৃপার কোনও কারণ নেই। শাস্ত্র বলেছে, বহু জন্মের সাধনায় এমন সৌভাগ্য কারুর হয়। শাস্ত্রের ওপরে কথা নেই। মনে হয় অহৈতুকী। আসলে হেতু আছে ; হেতু থাকেই। গান বলো, সাহিত্য বলো, বিজ্ঞান বলো, চরমের পরম বিস্ময় যখন কারুর মধ্যে শতদল মেলে দেখা দেয়, তখন তার পেছনে থাকে ; বহু কোটি জন্মের একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। রবীন্দ্রনাথের বেজেছে তখনই জেনেছি, বিশ্বের কবির হাতে স্বয়ং বিশ্বকবির বাঁশি বেজেছে।

রবীন্দ্রনাথকে দিয়েই আমার বক্তব্যের ব্যাখ্যা বিশদতর করি। যে রবীন্দ্রনাথ সাজাহানের লেখক আর যে রবীন্দ্রনাথ সেই কবিতার ব্যাখ্যাকার, তাঁরা দু'জনেই একই লোক। তবু তাঁরা একই আলোক নন কখনই। যিনি লিখেছেন, 'তোমার কীর্তির চেয়ে তুমি যে মহৎ', আর যিনি তার ছাত্রবন্ধু ব্যাখ্যা করেন। তাঁদের মধ্যে একজন বিশ্বকবি ; আরেকজন বিশ্বের এক কবি।

রবীন্দ্রনাথ নিজেও তা জানতেন। জানতেন বলেই তিনি রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, তাঁর লাইফ ডিভাইন হচ্ছে অটো রাইটিং। অর্থাৎ তিনি কলম ধরেছেন, লিখেছে আরেকজন। কেবল রবীন্দ্র বা অরবিন্দের লেখা নয়। বিশ্বের যে কোনও লেখকের যে-কোনও লেখা যখন লেখা হয়ে ওঠে, তখনই তা স্বয়ং বিশ্বকবির রচনা।

কিন্তু কেন বিশেষ একজনের হাত দিয়েই সেই 'এক'-জন লেখেন ? এর উত্তর ওই, প্রাক্তন। বহুকোটি জন্মের সাধনায় একটি শতদল যার নাম রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের বেলায় কাব্যজীবন ; ত্রৈলঙ্গর বেলায় জীবনকাব্য। ত্রৈলঙ্গও আমাদেরই মতো আত্মবিস্মৃত ছিলেন একদিন এবং আরেকদিন তাঁর স্মরণপথে উদিত হয়েছে, তিনি কে। এই স্মরণে উদয় হওয়াকেই বলে সূর্যোদয়। কেউ কেউ সূর্যোদয় হলেই আর থাকে না ; সূর্যাস্ত হয় তৎক্ষণাৎ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন, বিবেকানন্দ যেদিন জানবেন তিনি কে সেদিনই দেহ থাকবে না তাঁর। কেউ কেউ দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেন। কাজ থাকে তাঁদের। যেমন ত্রৈলঙ্গ, যেমন লালবাবা।

'যুক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যার সঙ্গে বিশ্বাসের বিরোধ হচ্ছে সময়ের বিরোধমাত্র। অর্থাৎ সময় না হলে একরকম কথা ; সময় হলে,—অন্যরকম।

তাই কাউকে বোঝানো যায় না যে, যা কিছু হচ্ছে তা হয়ে আছে। এই কথাটা বোঝাবার জন্যেই বারবার এখানে আসা।

অধ্যাপক বিনোদবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়, যাঁর কথা এর আগে বলেছি ; তিনি ঘুরে এসেছেন আবার কাশী থেকে। গতবার যখন গিয়েছিলেন তখনই কাশীতে

একজন বলেছিলেন, আবার কাশী আসতে হবে। যে সময়ে বলেছিলেন, সেই সময়েই গেছিলেন এবার। আরও একটা কারণ ছিলো। এমন একটা কিছু তিনি আধো জাগ্রত, আধো স্বপ্নাবৃত অবস্থায় দেখেছিলেন যাতে তাঁর ধারণা হয়েছিলো, যে তিনি পাঁচই মার্চ, এবছর, মারা যাবেন।

কাশীতে সেই একজন তাঁকে একথা শুনে বলেছেন, ওটা কি দেখলেন? আপনি কবে মারা যাবেন তা জানি। সময় হলে বলব।

কেন এই ভুল দেখা? এর কারণ হচ্ছে খন্ডিত দৃষ্টি, অখন্ড দৃষ্টি নয়। অনেক সময় সাধারণ মানুষের মনে আগামী দিনের অশুভ ছায়াপাত পড়ে। তা কখনও মেলে, কখনও ভুল হয়। জ্যোতিষের সাহায্যেও আশ্চর্য করে দেবার মতো ভবিষ্যদ্বাণী করা যায়। কিন্তু জ্যোতিষবাণীও ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়, গণনার অব্যর্থ শক্তি সত্ত্বেও কেন? কারণ জ্যোতিষের ওপরের কথা আছে। vision থেকে যখন কেউ কথা বলে, তখন যোগী বরদাচরণের মতো সে বলে: ও ভুল হয় না। কিন্তু অসাধারণ যোগীরও ভুল হয়। জগৎ ও ব্যক্তি সম্পর্কে যখন তাঁদের কোনও কথা মেলে না তখন বুঝতে হবে অখন্ড সত্যের, পূর্ণ সত্যের আস্বাদ তাঁরাও পান নি। অষ্ট গ্রহের যোগাযোগে জগৎ ধ্বংসের যে ভবিষ্যদ্বাণী ব্যর্থ হয়েছে তার জন্যে কাউকে দায়ী করে লাভ নেই। অনেক সময়ে ভিসানও ভুল দেখায়। অথবা এমন কিছু ঘটে যায় ইতিমধ্যে যাতে vision মিথ্যে হয়ে যায়। একথা কারুর বলবার উপায় রাখেন নি তিনি যে তার ভুল করবার উপায় নেই। কারুর দম্ভ তিনি রাখেন না। ভীষ্মেরও না; স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরও না। কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে তা প্রমাণ হয়ে গেছে।

অভ্রান্ত কেবল এই শাস্ত্রবাক্য যে, কর্মফলেই জন্মজন্মান্তর। কর্মফলমুক্ত না হলে জন্মমৃত্যু চক্রের বাইরে যাবার উপায় নেই। যদিও মুক্তপুরুষরা আসেন পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করতে বারংবার। তাঁরা নিষ্কর্মা নন। তাঁরাই কর্মী এবং বীর কর্মবীর তাঁরা। শুধু নিরাসক্ত বলে তাঁদের কর্মফল নেই। কখনও কোনও বিশেষ ব্যক্তির জন্যে আসেন, কখনও জগতের জন্যে। তাঁদের সঙ্গে যাঁদের দেখা হয় আমরা মনে করি তা আকস্মিক। একেবারেই তা নয়, ঠিক হয়ে আছে এই সাক্ষাৎকার।

আমার নিকটতম এক প্রতিবেশীর নিদারুণ যুক্তিবাদ। কয়েক বছর আগে শ্মশানে এক সাধুর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় যিনি বলেন, ওই কেওড়াতলাতেই তাঁর সঙ্গে দেখা হবে আবার, নিকট এক আত্মীয়ার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষে। ঠিক দিনে ঠিক বলে প্রমাণ হয় সাধুর কথা। এবারেও তিনি বলেছেন, আবার দেখা হবে এই শ্মশানে তাঁর সঙ্গে। এখনও সে তারিখ আসতে এক বছর চার মাস আছে। কেন এই দেখা হওয়া তিনবার? এর পেছনে এমন কোনও উদ্দেশ্য আছে যা আমাদের পরিভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব।

যোগীপুরুষ বরদাবাবুর কাছে দিলীপকুমার যান নলিনীকান্ত সরকারের

সঙ্গে। বরদাবাবু শরীরের একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন: এখানে ব্যথা আছে?

দিলীপকুমার বলেন: না।

বরদাবাবু বিস্মিত হন: সে কি, ভুল দেখলাম?

কি দেখলেন?

দেখলাম অরবিন্দ ঘোষ দাঁড়িয়ে আছেন আপনার পেছনে; তিনি বলছেন আপনাকে বলতে যে, ওই ব্যথা সেরে গেলে তাঁর কাছে যেতে—

কিন্তু তিনি তো আমাকে গ্রহণ করবেন না।

নিশ্চয় করবেন। সেই কথাই তো তিনি জানাতে এসেছিলেন—

দিলীপকুমার তখন বলেন, ও ব্যথা হার্নিয়ার।

দিলীপকুমার সম্পর্কে বরদাবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, একটি মহিলার সাহায্যে দিলীপকুমারের আধ্যাত্মিক উন্নতি হবে।

বরদাবাবুর এইসব কথা দিলীপকুমার এবং নলিনীকান্ত সরকার দুজনেই লিখেছেন।

জ্যোতিষীরা বলেন অংক কষে; বরদাবাবুরা বলেন ভিসান থেকে। তবু জগৎ যাঁর লীলা তাঁর রহস্য এমনই অনির্বচনীয় যে দুর্ধর্ষ জ্যোতিষীর অংকও ভুল হয়ে যায় এবং যোগীর 'ভিসান'-এরও রিভিসান দরকার হয়।

॥ তেত্রিশ ॥

'পার হবার ব্রত যিনি গ্রহণ করেছেন তিনিই পার্বতী'

এই আশ্চর্য কথা যাঁর মুখ দিয়ে অনায়াসে বেরিয়েছে তিনি এর চেয়েও আশ্চর্যতর মানুষ ছিলেন। পুণ্যবান পরমভক্ত সেই মহৎ মানুষটির নাম, স্বর্গত জিতেন সান্যাল। টালিগঞ্জের মানুষজন তাঁকে সাধুবাবা বলে ডাকতো। সহজ কথা বলাই যে সবচেয়ে কঠিন টালিগঞ্জের সাধুবাবার কথা যে শুনেছে সেই জেনেছে সে বার্তা। গৃহী-সন্ন্যাসী জিতেন সান্যালের কথা আমাকে যিনি বলেছেন তিনি কলিকাতা হাইকোর্টের সবচেয়ে বিচক্ষণ বিচারপতির স্ত্রী-ই কেবল নন, নিজেও কাজের মধ্যে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পরিচয়ের দাবী রাখেন। আমার কাছে সে-কারণে নয়, মানুষ হিসেবেই স্বামী-স্ত্রী দুজনেই আকর্ষণীয় চরিত্র। এই মহিলার অভিজ্ঞতার ইতিবৃত্ত অসাধারণ। আমরা যাকে অলৌকিক বলি, আসলে যা অলীকও নয়, অলৌকিকও নয়, তেমন অঘটন বছর তিনেক আগে পর্যন্ত এঁর অভিজ্ঞতায় প্রায় দৈনন্দিন ব্যাপার ছিলো। জিতেন সান্যালের কাছেও কিছুকাল এই মাননীয়া মহিলা আসা-যাওয়া করেছেন। সম্ভবত এই অভিজ্ঞতার কথা তিনি লিখবেন। লিখলে আমরাও উপকৃত হব।

টালিগঞ্জের সাধুবাবার বৈশিষ্ট্য ছিলো পাখি কিংবা কুকুরকে মানুষের রোগ সারাবার কাজে লাগানো। আমি যাঁর কাছে তাঁর কথা শুনেছি তিনি দু'টি আশ্চর্য রোগমুক্তির কথা আমাকে বলেছেন। তার মধ্যে একজনের ওপর অপারেশান করা প্রায় ঠিক হয়ে গিয়েছিল। জিতেনবাবু বলেছিলেন, অপারেশান করলেই রোগীর মৃত্যু টেবলেই সংঘটিত হবে। একটি ফিঙে পাখি চাই বলে তিনি জানালেন। সেটি জোগাড় হলো অদ্ভুতভাবে। অর্থাৎ একজন যেচে সেরকম একটি পাখি ভদ্রমহিলার কাছে নিয়ে আসে। সেই পাখিকে দিয়েই রোগীকে সারিয়ে তুললেন সাধুবাবা। রোগী প্রথম যখন মারাত্মক অসুস্থ হয়েছিলো এবং অস্ত্রোপচার ছিলো অনিবার্য তখন শুধু তুলসীপাতা মুখে ঠেকাবার বিধান দিয়েছিলেন সান্যালমশাই। তারপর সেই সংকট কেটে গেলে বললেন, একটি ভীমরাজ পাখি ধরতে হবে। ভীমরাজ হচ্ছে ফিঙে। সে পাখি একজন নিজে থেকেই নিয়ে এলো। সেই পাখি যদি রোগীর হাত থেকে খায় কয়েকদিন তবেই রোগী সারবে। যাঁর অসুখ তাঁর এবং তাঁর বাড়ির সবাই-এর এসবে অবিশ্বাস ছিল। তবু রোগী বাঁচবে তাই বাধা টিকলো না। রোগী সেরে উঠতে ভদ্রমহিলা এবং তাঁর স্বামীর ভয় হলো,—পাখিটা মরে যাবে না তো।

কিন্তু আশ্বস্ত করলেন সাধুবাবা ; পাখির কিছু হবে না।

আর একবার আর একটি মেয়ের ক্যান্সার অভ দ্য ব্লাড অসুখে কুশের আংটি পরিয়ে দিতে বলেন। কুশ জোগাড় হলো এক ধোবার বাড়ির পেছনের বাদাড় থেকে। সাধুবাবা বলেছিলেন যে, মেয়েটিকে যদি মুরগি খাওয়ায় কেউ তাহলে আর বাঁচবে না।

সেরে যাবার বেশ কয়েক বছর বাদে, একদিন বাড়ির লোকেরা মুরগি খাইয়ে দেওয়ায় মেয়েটি মারা যায়।

এই দু'টি ঘটনা থেকে একটি সত্যে উপস্থিত হওয়া যায়। সেটি হচ্ছে আমরা নিয়তই নিয়তির দ্বারা শাসিত। ছেলেটি বাঁচেবে বলেই সব ঠিক ঠিক হয়েছে এবং মেয়েটি মারা যাবেই বলে, নিষেধ সত্ত্বেও মুরগি খাওয়ানো হয়েছে। ভাগ্যের হাত থেকে কারুর রেহাই নেই। মহাপুরুষ কিংবা কাপুরুষ কারুরই না। গ্রহের প্রতাপ যাদের ওপর কাজ করে না সেই কোটিকে গোটিকের ক্ষেত্রেও সব আগে থেকে ঠিক হয়ে আছে। এমন কি তাঁরা যদি কাউকে নির্ঘাত মৃত্যু থেকে বাঁচান, সেটাও যে বাঁচবে তার কর্মফল হওয়া চাই। না হলে তা অসম্ভব।

এ বিশ্বাস যার আছে সে কিছুতেই বিচলিত হয় না। বিচলিত হবার, বিগলিত হবার, উত্তেজিত হবার, উদ্বেজিত হবার কিছু নেই। ঠিকুজি-কুষ্ঠি বিচার, হাত দেখিয়ে বেড়ানোরও প্রয়োজন নেই। কারণ, হাত দেখে যখন কেউ কিছু বলে, তখন সে বলছে বলেই সে ব্যাপারটা ঘটেছে তা নয় ;

ব্যাপারটা ঘটবে বলেই সে বলছে এবং কখনও এই বলা মিলে যায়; কখনও মেলে না। তার কারণ, কেউ অভ্রান্ত নয়। দর্পহারী মধুসূদন কারুর দম্ভ বজায় রাখতে দেন না। ভিসান থেকে যাঁরা বলেন তাঁদের কথাও কখনও কখনও গুলিয়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দ দেহত্যাগের কিছুকাল আগে পা ভেঙে ফেলেন পড়ে গিয়ে; এই আঘাত পণ্ডিচেরির 'মাদার'-এর ওপর নামছে বলে তিনি মানসচক্ষে দেখেন। কিন্তু আঘাত শেষ পর্যন্ত তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে যায়। এই আঘাতের গতি পরিবর্তনের রহস্য অজ্ঞাত। সব রহস্য জ্ঞাত হলে সীমার খেলাঘরে অসীমের লীলা ব্যাহত হয় যে!

যোগীদের শক্তিকে আমি অলৌকিক বলি না। এ শক্তি আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। অনভ্যাসে তা জড়ে পরিণত হয়েছে। সমারসেট মহম্‌ তাঁর 'writers' note-book'-এ লিখেছেন, যে একজন ভারতীয় যোগী তাঁকে বলেন একটি দীপশিখার দিকে দৃষ্টি নিবন্ধ করে মনটাকে চিন্তাশূন্য করতে। পনের মিনিট করে এই যোগ ন'মাস ধরে করলে তাঁর কিছু অদ্ভুত দর্শন হবার পর পরবর্তী যোগশিক্ষা দেবেন বলে মহম্‌কে জানান সেই ভারতীয় যোগী।

মহম্‌ নিজে লিখেছেন, প্রথম যেদিন এই যোগে তিনি বসেন, সেদিন তিনি ঘড়ি দেখে বসেছিলেন। যখন তাঁর মনে হলো নির্দিষ্ট পনের মিনিট পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তখন উঠে ঘড়ি দেখলেন মাত্র তিন মিনিট হয়েছে। অতঃপর মহম্‌ এ চেষ্টা আর চালিয়েছিলেন কি না সেকথা তাঁর বইতে লেখা নেই।

আসলে মহমের হবার নয় এ সাধনায় সাফল্য তাই হয় নি। মহম্‌ পরবর্তী জন্মে যোগী হবেন,—একথা বলা যায় এই থেকে যে আপনি যা ইচ্ছা করবেন তাই হবেন। বহু পুরুষের ইচ্ছায় একজন রবীন্দ্রনাথ জন্মায়; আরেকজন,—রকফেলার। এই ইচ্ছার থেকেই জন্ম। এ ইচ্ছাই সংস্কার। মেটিরিয়াল ওব জেক্ট নয় বটে তবে সে-ও কোনও মেটিরিয়াল ওব জেক্ট-এর চেয়েও বাস্তব। এ ইচ্ছায় অঘটন ঘটানো যায়।

মহম্‌ একজন যোগীর কথা লিখেছেন, যাঁকে গাড়িতে বিনা টিকিটে ভ্রমণ করতে না দেবার ফলে সেই যোগী ট্রেন থামিয়ে দেন একবার। তাঁকে গাড়িতে তুলবার পর বিকল ট্রেন মুহূর্তে সচল হয়। মহমের বই থেকে কেবল নয়, অন্য লোকের মুখ থেকেও এ ঘটনা সত্য বলে শুনেছি। কিন্তু একে আমি অলীক বলি না, অলৌকিকও বলি না। বলি না কারণ, ইচ্ছার মহাশক্তিতে আমি বিশ্বাস করি; বিশ্বাস করি যে, মহাশক্তির ইচ্ছাতেই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি ও বিনাশ। অবিনাশ কেবল মহাশক্তিময়ী ইচ্ছা।

মৃত্যুর পর কেউ যে দেখা দেয় তা হয় যে দেখা দেয় তার ইচ্ছায় কিংবা যে দেখা চায় তার ইচ্ছায় ঘটে। মৃত্যুর সঙ্গে সংস্কারের মৃত্যু হয় না। যতক্ষণ ইচ্ছার অধীন ততক্ষণ নয়, যে মুহূর্তে ইচ্ছা আপনার অধীন তদ্দণ্ডেই

আপনি মুক্তপুরুষ। তখন জন্ম এবং মৃত্যু, দুই-ই আপনার ইচ্ছায়। এও অলৌকিক নয়। একজন যোগী যে-কোনও দেহ আশ্রয় করে শতাব্দীর পর শতাব্দী মরলোকে থাকতে পারেন। একজন যোগী বলে দিতে পারেন কবে তিনি যাবেন। কিন্তু আছে একটা এর মধ্যেও। কি সেটা? না, মহাশক্তির ইচ্ছা না হলে কিছু হবার উপায় নেই। বামাখ্যাপা কাউকে বাঁচাতেন, কারুর বেলায় বলতেন, 'ফট্'। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, মা যে মুখ দিয়ে বার করালেন। মা কে? তিনি ঈশ্বরেরও উপাস্য। ঈশ্বর কে? যিনি যোগীশ্রেষ্ঠ। তিনি অসম্ভবকে সম্ভব, সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন। কিন্তু তিনিও উপাসক; উপাস্য নন। উপাস্য কেবল সেই মহাশক্তিময়ী ইচ্ছা। তিনি না ইচ্ছে করলে, 'প্রকাশ' অসম্ভব। তিনিই শুরু, তিনিই সংহার। সব তাঁর ইচ্ছেয়; সব তাঁর অনিচ্ছেয়।

এ সত্যকে, এ শাশ্বতকে যিনি উপলব্ধি করেছেন তিনিই মুক্তপুরুষ। তাঁর মুখেই কেবল এ বাণী মানায়,

'দুঃখেষু নিরুদ্বিগ্নমনা, সুখেষু চ বিগতস্পৃহ।'

এঁরা অন্যকে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে বাঁচান কিন্তু নিজেরা শরশয্যা নেন, দুরারোগ্য ক্যান্সারে। কেন? কারণ, মহাশক্তির ইচ্ছায় তাঁরা দেহলীলা সংবরণ করেন। আমরা যারা এ সত্যের অংশীদার নই, তারা কর্মের অধীন। আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু প্রত্যেকটি পদক্ষেপ বাঁধা আছে। কারুর নিস্তার নেই তার হাত থেকে। এ সত্য উপলব্ধি করবার জন্যে নিজের দিকে তাকালেই চলে। চোখ-কান খোলা রাখলেই হয়। প্রত্যেকটি লোকের জীবন এ সত্যের নির্ভুল প্রমাণ।

শ্রীঅরবিন্দের জীবন পর্যালোচনা করা যাক। বিলেতে মানুষ। আই-সি-এস হবেন,—সুনিশ্চিত। হলেন বিপ্লবী। ফাঁসি হবে সুনিশ্চিত। গণৎকার বললে: আপনাকে বন্দী করে এমন কারাগার আজও তৈরি হয় নি। কর্মযোগী ছিলেন যিনি, তিনি উদ্বুদ্ধ হলেন যোগীর কর্মে।

জেলে উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর চকচকে চুলের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেন: আপনি তেল মাখেন বুঝি?

শ্রীঅরবিন্দ জবাব দেন: আমি তো চান করি না।

তা হলে কতগুলো শারীরিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে যোগক্রিয়ার ফলে নিশ্চয়ই।

শ্রীঅরবিন্দের হাত দেখে যে বলেছিলো, ওই কথা সে বলেছিলো বলেই কথাটা ফলেনি, কথাটা ফলবে বলেই সে বলেছিলো। শ্রীঅরবিন্দের জীবনে যা যা ঘটবে তা ঠিক হয়েছিলো। আমরা যারা শ্রীঅরবিন্দ নই, সেই আমাদের ঠিক হয়ে আছে সব। প্রমাণ? প্রতি পদক্ষেপে এর প্রমাণ পাচ্ছি। তবু বলছি প্রমাণ কই?

ব্যক্তি-অভিজ্ঞতার কথা না তুলে সর্বজন-অভিজ্ঞতার কথাই বলি।

কিরোর ওয়ার্ল্ড প্রেডিকশান খুলে দেখুন, যে সব ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন এবং যে ভাবে তা মিলেছে তা-কে অলৌকিক বললে কিছুই বলা হয় না। তবুও বলছি তা অলৌকিক নয়। একটি বিদ্যা। জটিল অংক এবং ইনটুসানের যোগফল। কিরো যে ভবিষ্যদ্বক্তা হবেন, সে ও আবার তাঁর ভাগ্যে লেখা ছিল।

॥ চৌত্রিশ ॥

পরাধীন ভারতবর্ষের নিষ্ফল নিবীর্য কর্মকীর্তিহীন দু'টি বাহুতে বলসঞ্চার করতে যাঁর অভাবিত আবির্ভাব, তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামী বিবেকানন্দর চেয়ে বড় বিশ্বভারতীয় ব্যক্তিত্ব আর আসেন নি। কাশীতেও তিনি এসেছিলেন। কেবল শ্রীরামকৃষ্ণদেব নন, কাশীও তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছিলো। ভারতবর্ষে এই দ্বিতীয়, অদ্বিতীয়, শংকর বিশ্বনাথ পুত্র বিবেকানন্দ। অবিমুক্ত ক্ষেত্র বিশ্বনাথ-ধাম বারাণসী; সর্বসংস্কারমুক্ত পুরুষ বিশ্বনাথ-তনয় স্বামী বিবেকানন্দ। বিবেকই যাঁর সমস্ত আনন্দের উৎস, আনন্দই যে বিবেকের জীবন ও বাণী, আমার বিবেকানন্দ তিনি। বিবেকানন্দকে দেখে ভয় দূর হয়; বারাণসীতে গেলে ভরসা জাগে। এই জন্যেই ভারতবর্ষের আলো হচ্ছে বিশ্বনাথ-ধাম ও বিশ্বনাথপুত্র।

বিবেকানন্দ এবং বারাণসীর বাণী এক। সে বাণী হচ্ছে: জীবনের চেয়ে বড় কোনও তীর্থ নেই কোথাও; মানুষের চেয়ে বড় সতীর্থ। বারাণসী জীবনের তীর্থক্ষেত্র; বিবেকানন্দ মানুষের বীর সতীর্থ। বরুণা এবং অসি, শক্তি এবং নিরাসক্তির সঙ্গম হচ্ছে কাশী এবং নরেন্দ্র। তীর্থের প্রাণ হচ্ছে কাশী; নরেন ইন্দ্র হচ্ছে নরেন্দ্র। যে কোনও তীর্থে গেলেই পুণ্য হয়; কিন্তু পূর্ণ হই কেবল কাশীতে গেলে। যে কোনও বড় মানুষকে শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি বিবেকানন্দকে। যে 'ONE WORLD' অর্থাৎ 'এক বিশ্ব' এর অনিবার্যতায় পেঁছিতে হবে সারা দুনিয়াকে একদিন বাঁচতে হলে, এই বিশ্বের সেই এক বিস্ময়,—কেবল কাশী। আর সব কিছুরই আদি আছে; অনাদি কেবল কাশী।

পথ হচ্ছে ভারতবর্ষ; পাথেয়,—বিবেকানন্দ; পথের শেষ,—কাশী। বারাণসী,—বার্ধক্যের নয়,—যৌবনের। বিবেকানন্দ জীবনচরিতের নয়,—জীবনের। কাশী কি এবং বিবেকানন্দ কে,—এই দুই-ই কেবল জানার।

যে সাম্য জগতে জোর করে চাপানোর চেষ্টা চলছে তা টিকবে না। যে সাম্যের, যে সৌম্যের স্বপ্ন ভারতবর্ষ দেখেছে কেবল তা-ই সত্য হবে আরেকদিন! শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ,—এ বাণীই কেবল জীবনের জয়বাণী। মানুষকে

ভেতর থেকে বদলে দিতে না পারলে জগৎকে বদলানো যাবে না। গায়ের জোরে যে সাম্যের প্রতিষ্ঠা, গায়ের জোরেই তা গুঁড়ো হবে। ভালোবাসার জাদুতে যে 'এক'-এর তপস্যা, জয়যুক্ত হবে কেবল সেই। ভালোবাসার চেয়ে ভালো বাসা আজও তৈরি হয় নি।

ভেলকি নয়, নয় অলীক অথবা অলৌকিক। রূপকথা নয়,—বিবেকানন্দ হচ্ছেন মানুষের মহত্তম অপরূপকথা।

দু'টি লোক, না, দুই অদ্বিতীয় আলোকে চেয়ে দেখো এই ভারতবর্ষকে। সেই দুই অদ্বিতীয় হলেন, রবীন্দ্রনাথ আর বিবেকানন্দ। একজন চিরজীবী; আরেকজন চিরসুখী। একজন রথে চেপে, আরেকজন পথে হেঁটে দেখছেন ভারতবর্ষকে। দুই দেখাই সত্য। কল্পধেনুর অমৃতদুগ্ধ দোহন করেছেন মনে একজন; আরেকজন বহু-রূপের মধ্যে জ্যান্ত প্রত্যক্ষ করেছেন এক অপরূপকে। আর একজনকেও দেখাও দেখি যে বলেছে এমন করে: মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ; আর একজনকেও দেখাও দেখি যে বলেছে এমন করে: সাহসে যে দুঃখ দৈন্য চায়—মৃত্যুরে যে বাঁধে বাহুপাশে,—।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যজীবন এবং বিবেকানন্দর জীবনকাব্য যার বুকে বেজেছে কেবল সে-ই বুঝবে আমার এই কথা যে, রবীন্দ্রনাথ এবং বিবেকানন্দ,—এই বরুণা আর অসি-ই ভারতবর্ষের বারাণসী!

বিশ্বনাথপুত্র বিবেকানন্দকে জানলেই বিশ্বনাথ-ধাম বারাণসীকে জানা হয়। যে হিন্দু মানুষের মধ্যে নারায়ণকে সত্যি সত্যি প্রত্যক্ষ করে, সে হিন্দুরই শ্রেষ্ঠ তীর্থ বারাণসী। সে-ই হিন্দুরই শ্রেষ্ঠ সন্তান বিবেকানন্দ। জীবন ও মৃত্যুর সীমানা ছাড়িয়ে যে জীবন বিবেকানন্দ তারই দীপ্ত, দৃপ্ত জীবন্ত বাণীমূর্তি; দেশ ও কালের গণ্ডী পেরিয়ে যে ক্ষেত্র কাশী তারই চিরন্তন অপরিবর্তনীয় মূর্ছনা। যে হিন্দু সকল যুগের সব সাধনার ধারাকে মেলাতে চেয়েছে গঙ্গা ও যমুনার ধারায়, তারই ধেয়ানদীপ্ত ধূর্জটির তনু হিমালয়; তার 'অন্তরাত্মা-পুরুষের' বাস বারাণসীতে; তার আরেক নাম নটরাজ, যার একটি পা ভূমিতে, আরেকটি ভূমায়। সৃষ্টি ও সংহার, জীবন ও মৃত্যু, ইহলোক ও পরলোক, ক্ষণকাল ও চিরকাল-এর স্বপ্ন আর সাধনভূমি এই ভুবনমনোমোহিনী এই ভারতবর্ষ। দু'টিকে মেলানো নিয়েই তার খেলা। বিবেকানন্দ সেই খেলারই সূচনা আর কাশী সেই সাধনার কুরুক্ষেত্র!

['এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'—বিবেকানন্দ]

১৮৯৬, আজ থেকে প্রায় ৭০ বছর আগে, এই বিবেকানন্দ ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন: যে আগামী কালে যে নব যুগের সূচনা হবে তা রাশ্যা কিংবা চীন দেশে, কোথায় ভূমিষ্ঠ হবে তা স্পষ্ট দেখছি না, কিন্তু ওই দু'টি দেশের যে কোনও একটিই হবে সেই বিপ্লবের ধাত্রী। এই বিবেকানন্দরই অভ্রান্ত বাণী হচ্ছে: আগামী যুগ শ্রমিক অথবা শূদ্রের। সেই যুগে, সাধারণ শিক্ষার প্রসার ঘটবে।

কিন্তু অসাধারণ প্রতিভা বিরল হবে। প্রথম তিন যুগের অবসানে, শ্রমিক যুগের সূচনায় স্বামীজী বলেছেন : আমি নিজে একজন সোস্যালিস্ট,—এ ব্যবস্থা সর্বাঙ্গসুন্দর, এ জন্যে নয় ; পুরো রুটি না পাবার চেয়ে অর্ধেক রুটি পাওয়াও ভালো।

এই বিবেকানন্দর আদর্শ রাষ্ট্র হচ্ছে : পুরোহিত যুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয় যুগের সংস্কৃতি, বৈশ্যদের যোগাযোগ ও বণ্টন বিদ্য ও শূদ্র যুগের সাম্য, তার দোষগুলো বাদ দিয়ে যদি কোনও রাষ্ট্রের আধার হতে পারে, তবে সেই হবে আদর্শ রাষ্ট্র।

এ রাষ্ট্র-কল্পনার কবি যে বিবেকানন্দ, এ কল্পনার কেন্দ্র যে ভারত, সে আজও অনাবিষ্কৃত। এই সাম্যের স্বপ্ন প্রথম দেখেছে ভারতবর্ষ। তার মুখ দিয়েই প্রথম বেরিয়েছে এ-বাণী : বিশ্বের সকল মানুষই অ-মৃতের সন্তান। এর চেয়ে সত্য, সুন্দর ও সহজ কথা কোনও দেশে কোনও কালে উচ্চারিত হয় নি। এ বাণী বুদ্ধি দিয়ে নয়, অনুভব দিয়ে যারা জেনেছে কেবল তারাই বলতে পেরেছে শ্রাদ্ধ-বাসরে যে, জগতের কোথাও এমন কোনও হতভাগ্য যদি কেউ থাকে যে অপুত্রক, যাকে জল দেবার কেউ নেউ, তাহলে তার উদ্দেশেও এখন অর্পণ করছি শ্রদ্ধাঞ্জলি। যারা হিন্দুকে মনে করে গোঁড়া, তারা জানে না হিন্দুকে এবং হিন্দুধর্ম কী, তাই আগাগোড়া ভুল বলে।

ভারতের কর্মী বিবেকানন্দ, ভারতের কবি রবীন্দ্রনাথ, ভারতের তীর্থ কাশী, এই তিনের কথা এক : 'বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো!' নিজেকে বাড়াতে বাড়াতে, ছড়াতে ছড়াতে, ছাড়াতে ছাড়াতেই মানুষ,—যথার্থ মানুষ। কারণ, বহুর মধ্যে এক-কে, রূপের মধ্যে অপরূপকে প্রত্যক্ষ করাই জীবন ও ধর্ম। এই বীণাই,—বিশ্ববাণী ; বিস্ময় বাণীও এই।

বিবেকানন্দ যত কাজ করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কাজ হচ্ছে, বৃন্দাবনে মেথরের হাত থেকে তামাক নিয়ে খাওয়া। রবীন্দ্রনাথ যত কথা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে : মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। কাশী সম্পর্কে যত বক্তব্য আছে তার মধ্যে সবচেয়ে বড় বক্তব্য হচ্ছে : বিশ্বনাথের এই ভূমিতে কেউ অভুক্ত থাকবে না ; এখানে যার দৈহিক মৃত্যু ঘটবে, সে সুনিশ্চিত মুক্তি পাবে।

ক্ষুধার অন্ন কেবল নয়, বসুধার সমস্ত সুধীর অধিকারী না হওয়া পর্যন্ত মানুষের মুক্তি নেই। বিশ্বের যতেক অনাথ যতক্ষণ না খেতে পাচ্ছে, বিশ্বের সকল পাপী যতক্ষণ না মুক্ত হচ্ছে, জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে ততক্ষণ বিশ্বনাথের পূজা হচ্ছে না সাঙ্গ।

ত্রৈলঙ্গর কারণে নয় কেবল, নয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যে, বিশ্বনাথের মন্দির ধন্য বলেও নয়, কাশী এই বিশ্বের বাইরে আরেক বিশ্ব শুধু এই কারণে যে, এখানে মানুষের দৈহিক ও পারত্রিক মুক্তির প্রতিশ্রুতি উচ্চারিত। মুক্ত পুরুষের মূল্য

কি। যতক্ষণ না পৃথিবীর সকল স্ত্রী-পুরুষ মুক্ত হচ্ছে? বিশ্বনাথ তিনি কখন্? যখন বিশ্বের সমস্ত অনাথ মুক্ত হচ্ছে জন্ম-জন্মান্তরের গ্লানি থেকে।

এই কথাটা কেবল বলা নয়, এই উদ্দেশ্যে কাজ করার কারণেই বিবেকানন্দ এত বড়। বিবেকানন্দ কী এবং কে একথা বোঝা যায় যখন শুনি: 'যদি যথার্থ স্বদেশের বা মনুষ্যকুলের কল্যাণ হয়, শ্রীগুরুর পূজা ছাড়া কি কথা, কোনও উৎকট পাপ করিয়া খৃস্টানদের অনন্ত নরক ভোগ করিতেও প্রস্তুত আছি।'

এই উক্তি মর্ম যার চর্ম ভেদ করে ভেতরে পোঁছায় নি কেবল তার পক্ষেই বলা সম্ভব যে, বিবেকানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাবে না পড়লে কাল মার্কস্ হতেন। বিবেকানন্দ ওই কথা যে বলেছিলেন তার মানে হচ্ছে যে তাঁর স্বদেশপূজা বা মানবপূজার জন্যে মহত্তম মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ পূজা ছাড়বার প্রয়োজন হয় না। বস্তুত, বিবেকানন্দ যখন নির্বিকল্প-সমাধি প্রার্থনা করেন তখন স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করে বলেন: ছিঃ! কোথায় বটগাছের মতো তোর ছায়ায় কত লোককে আশ্রয় দিবি, না, তুই-ই নিজের মুক্তির জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছিস?

মানুষের এত বড় সতীর্থ আর কে? মানুষের জন্যে মুক্তি কামনাই তো শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন। এ মুক্তি কেবল দৈহিক ক্ষুধা থেকে মুক্তি নয়, মানুষের সর্ববিধ বন্ধন থেকে মুক্তি! প্রত্যেক মানুষের সমস্ত পাপ যতক্ষণ দূর না হচ্ছে ততক্ষণই যথার্থ পুরুষ মুক্ত হতে চায় না। বিবেকানন্দও চান নি। তিনি ভাঙতে আসেন নি; এসেছিলেন গড়তে ['I have come to fulfil, not to destroy']।

কাশী সেই মানুষের মুক্তি ক্ষেত্র। বিশ্বের মধ্যে থেকেও বিশ্বের বাইরে।

কয়েকজন মানুষের মোক্ষ বিশ্বেশ্বরের অভিপ্রেত নয়। তিনিই বিশ্বনাথ যিনি বিশ্বের যতেক অনাথ যতক্ষণ না নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে ততক্ষণ প্রতীক্ষা করে আছেন। এই জন্যে কাশী তীর্থ। না হলে ওর মূল্য কি? এক বিশ্বের জন্যে সেই এক বিশ্বনাথের প্রতীক্ষার অবসানে আসবে নবযুগ। কেবল বিজ্ঞান নয়, মানুষের জন্যে চাই নতুন বিশ্বাস।

আজ থেকে শতাব্দীরও সুদীর্ঘ পূর্বে, নির্জন নিরুপম, নিস্তব্ধ প্রসন্ন এক পরমাশ্চর্য প্রভাতে এই কাশীর গঙ্গার ঘাট সূর্যোদয়ের আনন্দধারায় স্নান করছিলো। সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছিলেন এক বাঙালী মহিলা। তাঁর সিঁথির সিঁদুরের রঙ শিশু সূর্যের চেয়েও অনেক, অনেক বেশি উজ্জ্বল লাল। উঠে আসতে আসতে পা ফসকে ঘাটের ওপরই পড়ে তিনি জ্ঞান হারালেন। সে পথ দিয়ে যাচ্ছিলো এক সন্ন্যাসী, সূর্যালোকের চেয়েও প্রসন্নানন, প্রভাতের চেয়েও উদ্ভাসিত। তিনি দেখতে পেলেন মূর্ছিতাকে। তাকে তুলে এনে শুইয়ে দিলেন মন্দিরের সিঁড়িতে। জ্ঞান হবার পর চেয়ে দেখলেন সেই মহিলা,— সন্ন্যাসী তাঁর স্বামী,—দুর্গাচরণ। বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত রমণী বুঝি

জ্ঞান হারালেন আবার। আর দুর্গাচরণ চললেন দ্রুতপদে নিজের পথে। মুখ দিয়ে উচ্চারিত হলো: কেবল মায়া! মায়া!

এই দুর্গাচরণ পঁচিশ বছর বয়সে স্ত্রী ও এক পুত্রকে রেখে সংসার ত্যাগ করেন। সন্ন্যাস জীবনে একবার কলকাতায় এসে ওঠেন এক বন্ধুর বাড়িতে। তাঁকে বারণ করেন তাঁর আগমনবার্তা তাঁর পরিবারের কানে তুলতে। বন্ধুটি সে বারণ মানতে না পেরে বলে দেয় দুর্গাচরণের বাড়ির লোককে। তারা এসে দুর্গাচরণকে জোর করে নিয়ে গিয়ে তোলে স্বগৃহে। সেখানে একটা ঘরে তাঁকে বন্দী করে রাখে, যাতে দুর্গাচরণ আবার না পালান। তিনদিন অন্নজল স্পর্শ না করার পর, তারা ঘরের দরজা খুলে দিতে বাধ্য হয়। দুর্গাচরণ নিজের পথ ধরেন। (The Life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples)

সেই দুর্গাচরণের সঙ্গে কাশীর ঘাটে তাঁর স্ত্রীর সাক্ষাৎ হবার কয়েক দিন আগে নৌকো থেকে গঙ্গার জলে পড়ে যায় দুর্গাচরণের পুত্র বিশ্বনাথ। দুর্গাচরণেয় স্ত্রী লাফিয়ে পড়েন জলে। চেপে ধরেন ছেলের হাত। এমন জোরে চেপে ধরেন যে বিশ্বনাথের নরম চামড়ায় অনেক দিন সে দাগ ছিলো। দুর্গাচরণের একমাত্র পুত্র বিশ্বনাথ বড় হবার পর যাকে বিবাহ করেন তাঁর নাম ভুবনেশ্বরী।

বিশ্বনাথ এবং ভুবনেশ্বরী,—স্বামী বিবেকানন্দের জনক ও জননী হবার তাঁদের চেয়ে যোগ্যতর নাম আর কার ছিলো? বিবেকানন্দ, স্বয়ং বিশ্বনাথ এবং বিশ্বভুবনের যিনি অধিশ্বরী—তাঁদের ছাড়া আর কার হতে পারতেন সন্তান? বাঘের বাচ্ছা বাঘ হয়, সিপাহীর ঘোড়া পুরো না হোক, কিছু হয়ই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু পৃথিবীতে এই প্রথম, বাপের বিবেক আর মায়ের আনন্দ, বিশ্বভুবনের যতেক মূঢ়, মূক ম্লান মুখে ভাষা দিতে এলো বিবেকানন্দ হয়ে।

ভাষায় এমন কোন শব্দ আছে যা দিয়ে বোঝানো সম্ভব বিবেকানন্দ কি, বিবেকানন্দ কে? বিশ্বনাথধাম বিশ্বনাথপুত্র ছাড়া আর কার। সূর্য আর তার আলো, গোলাপ আর তার গন্ধ, তরবারি আর তার তীক্ষ্ম ধার, এর মধ্যে বিভেদ ঘটাবে কে? বিশ্বনাথধাম আর বিশ্বনাথ তো আলাদা নয়, এ দুই আসলে এক। আসলে এক মানুষের মহত্তম সতীর্থ।

বারাণসী দর্শন আর বিবেকানন্দর দর্শন অভিন্ন:

বহুরূপে সম্মুখে তোমার
ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?

বিশ্বের যিনি নাথ, ভুবনের যিনি ঈশ্বরী, তাঁদেরই প্রত্যক্ষ সন্তান যিনি মানুষের চেয়ে বড় কোনও ঈশ্বর তিনি মানেন নি। এই জন্যই বিশ্বনাথধাম আর বিশ্বনাথ-পুত্রর চেয়ে বড় কোনও তীর্থ মানুষের নেই।

কেবল দক্ষিণে ঈশ্বর নন, যেদিকে তাকাও দক্ষিণে, উত্তরে, পূবে, পশ্চিমে,

ঊর্ধ্বে, অধে, মানুষের মধ্যে চেয়ে দেখো মানুষের ভগবান কেবল বলছেন : প্রত্যেক নরের মধ্যেই আছেন তিনি, যিনি নরেন্দ্র।

ইতিহাসে মানুষ—তৈমুর আর নাদির ; মানুষের ইতিহাস,—রামকৃষ্ণ আর বিবেকানন্দ। বিবেকানন্দ সেই বিহঙ্গ, রামকৃষ্ণ যার সুর, রামকৃষ্ণ সেই আগুন, বিবেকানন্দ যার আভা ; বিবেকানন্দ সেই বীর, ঈশ্বর যাঁর সারথি ; রামকৃষ্ণ সেই গঙ্গা, বিবেকানন্দ যার ঢেউ।

এক ধর্ম, এক মানুষ, এক বিশ্ব,—এক বিশ্বনাথ, এই একমাত্র সত্য। কালে আর সব মিথ্যা বলে প্রমাণিত হবে।

সেই আগামীকালের সূচনা আজ আণবিক প্রলয়ের মধ্যে সূচিত করছে আর এক মানবিক অভ্যুত্থানের। সেই এক বিবেকানন্দের আর একবার আসবার সময় কি আজও হয় নি ? বিশ্বনাথধামে সেই এক বিশ্বনাথ-পুত্রের।

বিশ্বনাথ-ঘরনী ভুবনেশ্বরীর ঘরে কোনও সন্তান আসেনি তখনও। একটি পুত্র—ছিলো সকল মায়ের মতোই ভুবনেশ্বরীরও প্রার্থনা। সমস্ত সংসারের কাজকর্ম করতে করতে মনে মনে নিরন্তর চলে সেই উচ্চারণ। কাশীতে থাকেন দত্তদের এক খুড়ি, তাঁরই কাছে জানান বীরেশ্বর শিবের পুজো দিতে। পুজো দেবার খবর এলে স্থির অপেক্ষায় অতিবাহিত করেন দিনযাত্রা ভুবনেশ্বরী। জানেন প্রার্থনার উত্তর পাবেন। সারাদিন মনে মনে যেন বীরেশ্বর শিবের নাম। যেন দেখতে পান, শিবের মাথায় গঙ্গাজল ঢালছেন দত্তদের সেই খুড়ি কাশীতে : ফুলপাতা দিয়ে পুজো করছেন বিশ্বেশ্বরের প্রতীককে।

তারপর একদিন রাত্রে জীবনের পরমাশ্চর্য রূপে দেখেন তিনি, যে স্বয়ং বীরেশ্বর তাঁর যোগাচ্ছন্নতা থেকে জাগ্রত হয়ে এক বীর শিশুর বেশে আসছেন ভুবনেশ্বরীর আলয়ে। স্বপ্ন সত্য হবে জানতেন বিবেকানন্দ-জননী। শিব স্বয়ং দিয়েছেন সাড়া।

বিশ্বনাথ-আলয় ভরে গেলো বিশ্বনাথ আলোয়। ১৮৬৩, জানুয়ারি ১২। তখন ভোর হচ্ছে। ভোরের আকাশ ভরে দিচ্ছে গানে গানে প্রভাতের প্রথম বিহঙ্গেরা। তারা বলতে চাইছে, এমন কেউ আজ আসছে এই পৃথিবীতে যে স্বয়ং বীরেশ্বর : যার জন্যে দত্তবাড়ির দুয়ার হতে অদূরে অপেক্ষা করে আছেন স্বয়ং দক্ষিণেশ্বর। [The life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples Vol I]

সেদিন মকর সংক্রান্তি, এই কেবল জানতো সকলে। ওই তারিখ যে একটি যুগেরও সংক্রান্তি, সে কথা সেদিন কে জানতো, বালক-বীরের বেশে বিশ্বজয় করতে এসেছে যে, সে ছাড়া ('আরেক বিবেকানন্দ এলে সে বুঝতো এ বিবেকানন্দ কি করেছে')! না ; আরও একজন জানতো, কে এই বীরেশ্বর। তিনি দক্ষিণেশ্বরে ঘোষণা করেছিলেন নরেন্দ্রনাথকে দেখে যে, 'নরেনের মধ্যে আঠারোটা সূর্য জ্বলতে দেখছি।' দক্ষিণেশ্বরের কথা শুনে বীরেশ্বর সংকুচিত হয়েছিলেন,

বলেছিলেন দক্ষিণেশ্বরকে, কী যা তা বলছেন? আমি তো এক অখ্যাত সাধারণ যুবক—।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন : মা যে তাই দেখিয়ে দিলে—

দেখায় ভুল হয়নি। হয়নি কারণ এ তো টেলিভিশান নয়, এ যে ভিসান। এ তো হাত দেখা নয়, এ তো জন্ম-জন্মান্তর দেখা (ও যেদিন জানবে ও কে সেদিনই নরেনের আর দেহ থাকবে না)।

অনেক মূঢ় পণ্ডিতের মুখে শোনা যাবে যে ভুবনেশ্বরীর স্বপ্নদর্শন,—ও অলৌকিক ঘটনা। এ কথা উত্তর দেবার অযোগ্য। অলৌকিক ব্যাপারটা অলীক নয়। এবং শেষ বিচারে অলৌকিকও নয়। জগতে যেখানেই ঐশ্বর্যের আলোক সেখানেই জগদীশ্বরের আবির্ভাব। এ ঐশ্বর্য রূপের এবং অপরূপের, অর্থের এবং পরমার্থের, খ্যাতির এবং বৈরাগ্যের। মহাশক্তি ইচ্ছে না করলে কোনও শক্তির ক্ষমতা নেই, গাছের একটা পাতা একটু নড়ায়।

যে নরেন দক্ষিণেশ্বরে এসেছিলেন, সে কি তাঁর নিজের খেয়ালে? না। এ সাক্ষাৎকার সুনিশ্চিত ছিলো। সে কথা যখন দক্ষিণেশ্বরের মুখে শুনি :

'অবাঙমনসোলোকে প্রবেশ করবার পর দেখলাম, সাত ঋষি ধ্যানমগ্ন। দেবতাদেরও ঈর্ষাযোগ্য সেই সপ্তর্ষিকে যখন অবলোকন করে আশ্চর্য হচ্ছি তখন সেই জ্যোতির্মণ্ডলের একটি ছটা এক শিশুর মূর্তি নিলো। এবং শিশুটি এসে জড়িয়ে ধরলো সপ্ত ঋষির একজনের গলা। বলল : আমি নীচে যাচ্ছি তুমিও এসো—[The Life of Swami Vivekananda]।

এবং যখন জানি যে, শিশুটি দক্ষিণেশ্বর এবং ঋষিটি বীরেশ্বর, তখন তা মানি না। মানি না যে, সে-ও আমার ইচ্ছেয় নয় ; মানতে দেবে না বলেই মানি না : মানতে দেবে না বলেই জানি না যে, জানতে পারি না।

যাঁরা বলেন, ঠাকুরের কাছে গিয়ে নরেন্দ্রনাথ যা হতে পারতেন তা হননি, তাঁরা ঠিক বলেন না। দক্ষিণেশ্বর এবং বীরেশ্বর ; ওঁরা একজন আর একজনের জন্যে নির্ধারিত পুরুষ। ঠাকুর নরেনকে দেখেই বলেছিলেন তুমি এসেছ? এত দেরি করতে হয়?

দুনিয়াদারী কথা শুনতে শুনতে কানদুটো ঝালাপালা হয়ে গেলো। কার কাছে মনের গহন অবারিত করব তবে?

তারপর দুহাত জোড় করে বলছেন দক্ষিণেশ্বর বীরেশ্বরকে? তুমি তো সেই অনাদিলোক নবরূপে নারায়ণের আলোক, মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্যে আসছ অনেক দূর থেকে।

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে না গেলে নরেন্দ্রনাথ অদ্বিতীয় কার্লমার্কস হতেন, একথা যাঁরা বলেন, তাঁরা দক্ষিণেশ্বরকেও জানেন না, বিবেকানন্দকেও জানেন না। নরেন্দ্রনাথ যমন নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনা করেছিলেন, তখন ঠাকুর করেছিলেন তীব্র, তীক্ষ্ম, তির্যক তিরস্কার : ছিঃ কোথায় তোর ছায়ায় ভেবেছিলাম কত

লোক আশ্রয় পাবে, বিরাট বট গাছের মতো হবি তুই। আর তুই তুচ্ছ নির্বিকল্প সমাধি চাইছিস নিজের জন্যে ?

নরের জন্যে নারায়ণের দেহ ধারণের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ঠাকুর। নরেন্দ্রর বিবেক হয়েছিলো আনন্দিত। সেই মুহূর্তে জন্ম নিয়েছিলেন নরেন্দ্রের মধ্যে বিবেকানন্দ। মানুষের দুঃখ দূর করার যে ব্রত বিবেকানন্দের তা আসলে শ্রীরামকৃষ্ণেরই মিশন, বিবেকানন্দর মধ্যে দিয়ে রূপায়িত। মানুষের দুঃখে কার্ল মার্কসের চেয়ে দক্ষিণেশ্বর এবং বীরেশ্বর কেউ কম বিচলিত ছিলেন না। পার্থক্য কেবল এই যে, মার্কসের মধ্যে এক শ্রেণীর মানুষের বিরুদ্ধে ছিলো ভয়ংকর রাগ, আর ঠাকুরের মধ্যে রাজা এবং প্রজা, সাধু এবং পাপী, পণ্ডিত এবং মূঢ়ের জন্যে অসাধারণ অনুরাগ।

তদ্বিরের এই বসুন্ধরায় বীর ওই একজন,—বিবেকানন্দ। কৃষ্ণের যেমন অর্জুন, দক্ষিণেশ্বরের তেমনই বীরেশ্বর। নিষিদ্ধ মাংস খেয়ে এসে নরেন্দ্র বলেছেন পরমহংসকে: মহাশয়, আজ হোটেলে যা খেয়ে এলাম তা খাওয়া হিন্দুর বারণ—। ঠাকুর তাতে বিন্দুমাত্র বিচলিত হননি। নিত্য সিদ্ধদের পক্ষে নিষিদ্ধ বলে কিছু নেই। সাধারণ নর আর নরেন এক নয়। অসাধারণ নরের মধ্যে নরেন্দ্র অনন্য। কোটির মধ্যে ওই একটি। ঈশ্বর কোটি নরেন দক্ষিণেশ্বর কোটির মধ্যে।

নরেন যা পারে অন্যে তা পারবে কেন ? নরেনের জন্যে ঠাকুর যা পারেন, আর কারুর জন্যে তা পারবেন কেন ? নরেনের মধ্যে নিষিদ্ধ বস্তু খাবার কথা শুনে আবার বললেন শ্রীরামকৃষ্ণ: ঈশ্বরে যার মন অবিচল, গোমাংস ভক্ষণ তাকে অশুচি করে না: গো-মাংস তখন হবিষ্যান্নর মতোই প্রার্থিত খাদ্য। কিন্তু নিরামিষ আহার করে কেউ যদি কামিনীকাঞ্চন করে তাহলে সেই নিরামিষ খাদ্যই তখন গো-মাংস।

নরেন খেলে দোষ নেই। কিন্তু আর কেউ খেলে দক্ষিণেশ্বর তাদের স্পর্শ পর্যন্ত সহ্য করতে অক্ষম।

আমাদের বিচারে দক্ষিণেশ্বরের এই ব্যবহার হচ্ছে পক্ষপাতিত্বের নমুনা নিশ্চয়। কিন্তু আমাদের বিচারই শেষ বিচার নয়। তারও পরে কথা আছে সেই অশেষ কথাই ঠাকুরের শেষ কথা। তাঁর কথামত। তিনি বলছেন অশুচি কেউ তাঁকে কিছু দিলে তিনি সইতে পারেন না। নরেন্দ্র তাঁর সেকথা বাজিয়ে নিয়েছেন। যাঁদের হাত থেকে ঠাকুর একটু জলও নিতে পারেন নি; জল খাবার আগে গড়িয়ে পড়ে গেছে, নরেন্দ্র তাদের প্রত্যেকের ইতিহাস তন্ন তন্ন করে দেখেছেন। ঠাকুরের ইতিহাসে কোথাও ভুল হয়নি। তারা প্রত্যেকে খারাপ লোক।

অথচ এই ঠাকুরই বিনোদিনীকে আশীর্বাদ করেছিলেন: চৈতন্য হোক।

তাহলে ঠাকুরের ওই পরিহাস এবং এই আশীর্বাদ কি স্ববিরোধ ? না। কী তবে এ ব্যাপার ? কেন এই দু রকম ব্যবহার ? এর কারণ, কর্মফল। কেউ পাবে,

কেউ পাবে না। মনুষ্য দেহ ধরেছেন যাঁরা তাঁদের কারুর উপায় নেই কর্মফলকে এড়াবার। পরশপাথর তাই কেউ ছুঁয়ে দেবে : তাদের বাসনা যাবে সোনা হয়ে। আবার কেউ পরশপাথরের খোঁজ পাবে কিন্তু ছুঁতে পাবে না ; তাদের সোনা রইবে বাসনা হয়েই।

প্রারব্ধ, যা আমরা করেছি, তার ফল আমাদের পেতেই হবে। গত জীবনের কর্ম এ জীবনের ফল। এ জীবনের কর্ম আগামী জীবনের ফল। সাধারণত একজন মানুষের মৃত্যুর পর আবার জন্মগ্রহণ করতে পাঁচ থেকে পঁচিশ হাজার বছর লাগে। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অর্থাৎ এখন যাঁরা বেঁচে আছে তারা প্রায়ই দ্বাপরের লোক। কিন্তু সেকথা এখন না হয় থাক।

নরেন্দ্র যখন ঠাকুরের কাছে প্রথম আসেন তখন তিনি মূর্তি পূজায় অবিশ্বাসী ছিলেন। ঠাকুর কৃষ্ণের জন্যে রাধার আকুলতার কথা বললে, নরেন আপত্তি করেন। নরেনের মতে এ কাহিনীর কোনও ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই ; তা ছাড়া কৃষ্ণের রাধাশক্তি স্থূল ও অসামাজিক এবং অন্যায়। ঠাকুর বলেন : মানলাম যে রাধা অনৈতিহাসিক চরিত্র এবং রাধাকৃষ্ণের লীলা কোনও ভগবৎ-প্রেমিকের কল্পনা ; তবুও রাধা এবং গোপীদের দুর্নিবার পুরুষোত্তম প্রার্থনা, —সে কি মিথ্যে ? সে কি অনৈসর্গিক নয় ? রাধাকৃষ্ণ নিয়ে যে কাহিনী তাকে অস্বীকার কর, কিন্তু কৃষ্ণাচ্ছন্ন অবস্থাকে অস্বীকার করবে কেন ? নরেন যে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, মানতে চায় না সহজে, ঠাকুরের তা ভালো লাগে। ঠাকুর তাকে অদ্বৈত ব্রহ্মের কথা বললে নরেন আরও উত্তেজিত হন। যা কিছু দৃশ্যমান সব ব্রহ্ম ; আমি, তুমি, যে, মানুষ, পশু, জড়, সব ব্রহ্ম। এ কেমন করে হবে ?

তখনই ঠাকুর স্পর্শ করেন নরেনকে। নরেন্দ্রের চোখের ওপর থেকে উঠে যায় স্তব্ধ নীল যবনিকা। গানের ওপারে, জ্ঞানের ওপরে যিনি তিনি সহসা প্রকাশিত হন। নরেন্দ্র দেখেন সব এক। যেখানে চোখ পড়ে সেখানটাই 'সে'-ই এসে দাঁড়ায়। দ্রষ্টা, দৃশ্য ও দর্শন,—সব একাকার। দুই বলে কিছু নেই ; সব অদ্বিতীয়, সব অদ্বৈত ব্রহ্ম।

এই স্পর্শ ছাড়া, শ্রীরামকৃষ্ণের এই সংস্পর্শ কোনও নর কখনও নরেন্দ্র হয় না। নরেন্দ্র হয় না কখন বিবেকানন্দ।

বিদ্যা, বুদ্ধি, প্রতিভার অহংকার নয়। পরশপাথর পাওয়া চাই। না হলে সাধ্য কার, তাঁকে জানে।

কিন্তু কেবল বীরেশ্বরেরই দক্ষিণেশ্বরকে প্রয়োজন নয়, দক্ষিণেশ্বরেরও দরকার বীরেশ্বরকে। কেবল বীরেশ্বরই যাচাই করেন নি দক্ষিণেশ্বরকে, দক্ষিণেশ্বরও যাচাই করেছিল বীরেশ্বরকে। ঠাকুর একদিন, যে ঠাকুর তিরস্কার করেছিলেন নরেনকে নির্বিকল্প সমাধি প্রার্থনার কারণে, সেই ঠাকুরই আরেকদিন অকারণে বলে ওঠেন ; সুকঠোর সাধনার ফলে আমার অনেক সিদ্ধই সঞ্চিত হয়েছে।

কিন্তু ও নিয়ে আমি কি করব ? মায়ের অনুমতি পেলে আমি তোকে ওসব দিয়ে দিই। মা বলেছেন তোকে দিয়ে তাঁর অনেক কাজ হবে; আমি যদি তোকে আমার সাধনার ফল দিয়ে দিই, তাহলে প্রয়োজনমতো তা কাজে লাগাতে পারিস। তুই কি বলছিস ?

নরেন কী বলবেন ঠাকুর তা জানতেন। নরেন সেই জানা জবাবই আবার জানায়: না। আগে আমি তাঁকে জানি, তবে জানব ওই সিদ্ধাইতে আমার দরকার আছে কি না। তার আগে ক্ষমতা পেলে যার জোরে এই ক্ষমতা তাঁকে ভুলে যাব। (The life of Swami Vivekananda by His Eastern and Western Disciples. Vol. I.)

দক্ষিণেশ্বর এবং বীরেশ্বর কী এবং কে, তা দুজনেই জানতেন। তবু কেন এই না-জানার ভান ? এর নামই লীলা। এই লীলা জগতে কতবার হলো; আরও কতবার হবে, তা কে বলবে।

যৌবনে বেনারসী আর বুড়ো বয়সে বেনারস যারা করে, তারা কোনওদিন তার সন্ধান পায় না, কাশী যার জন্যে কাশী। রসে না মজলে, শুধু লোক দেখানো ঈশ্বর ভজলে কী হবে ? রামকৃষ্ণ মজেছিলেন ওই এক ধ্যানে তাই তাঁর হয়েছিলো। এখনও ভারতবর্ষে এমন মানুষ আছেন যিনি ভগবৎরসের রসিক। অসুখ সারাবার জন্যে, মামলা জেতবার কারণে, চাকরি পাবার লোভে, সন্তান কামনায়, হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে ফিরে পাবার প্রার্থনায় কাশী-কাঞ্চী কর তাই পাবে। যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী। রূপের বাসনা নিয়ে মরো; মরজগতে ফিরবে রূপবান হয়ে। রূপো চাও, কুবের হবে। কিন্তু যা অর্থ নয়, নয় রূপযৌবন, বরং যা নাহলে অর্থও অর্থহীন, রূপযৌবন বৃথা, তুমি যখন তার কাঙাল হবে, তখনই তোমার ছুটি। তার আগে পর্যন্ত কেবল ছুটোছুটি। মৃত্যুরাখাল তোমাকে কেবলি তাড়িয়ে নিয়ে নিয়ে বেড়াবে, নব নব জন্মের চারণক্ষেত্রে। সময় না হলে কারুরই দুঃসময় ঘোচবার নয়।

ভারতবর্ষে এক সাধুকে জিজ্ঞেস করেছিলেন সমারসেট মম্ যে সবাই মদ্য, স্ত্রীলোক মাংসে যখন মজে আছে, তখন এর থেকে দূরে থাকার জন্যে সাধুর কোনও 'রিগ্রেট' আছে কি না ? সাধু হেসেছিলেন! পণ্ডিতের মূঢ়তায় সে হাসি সূর্যমুখে জ্বলে ওঠে রোজ যাবার সময়। ফকির মমকে বলেছিলেন : না। অনুতাপ থাকবে কেন ? কোনও একজন্মে আমিও এসব চুটিয়ে করে নিয়েছি।

এই হচ্ছে একমাত্র উত্তর। মণিকে না মানার অধিকার তখনই আসবে যখন নীলমণিকে জানবে।

কাশীতে মৃত্যু হলেই হবে না। কালী মন্দিরে মানৎ করলেও না। গঙ্গায় সকালে স্নান করলে দেহ শুদ্ধ হবে কিন্তু সন্দেহ যতক্ষণ না দূর হচ্ছে ততক্ষণ

গঙ্গাস্নানে পাপ যাচ্ছে না। পাপ কি? পাপ হচ্ছে অনুতাপ। কোনও কাজ করে গ্লানি হলেই জানবে, সে কাজ তোমার নয়। তাহলে চোর, ডাকাত, খুনী, যারা অনায়াসে একটার পর একটা অন্যায় করে যায়, তারা কি গ্লানি বোধ করে? এর উত্তর হচ্ছে,—করে।

যে চোর ধরা পড়ে জেলে যায়, তার শাস্তি ক'দিনের? চুরি করে যে ধরা পড়ে না, তার যন্ত্রণা দুর্বহ। দস্তয়ভস্কির 'ক্রাইম এণ্ড পানিশমেণ্ট'—এ তার খণ্ড ছবি আছে। এর অখণ্ড রূপ দেখা যাবে জগাই-মাধাই-এর মুখে। যাকে তুমি আঘাত করছ সে যদি তোমায় আলিঙ্গন করে, তাহলে জেনো তার চেয়ে সেই নির্মমতর কোনও কশাঘাত।

আমরা ছেলের পৈতে দিই, পরলোকগতের শ্রাদ্ধ করি, লোকে কী বলবে, এই ভয়ে। নাহলে দেখতে পেতাম যাঁর উদ্দেশে পিণ্ড নিবেদন, তিনি তা সাগ্রহে গ্রহণ করবার জন্যে এসে দাঁড়িয়েছেন শ্রাদ্ধ-বাসরে।

অতি সম্প্রতি মুখার্জি পদবীযুক্ত একজন অত্যন্ত উচ্চপদস্থ মাননীয় ভদ্রলোক হঠাৎ মারা গেছেন। তাঁর পুরো নাম এখানে বললে, অনেকেই চিনবে। তাঁদের পরিবারের অনুমতি নেওয়া নেই বলে, এখানে তাঁর পুরো নাম উল্লেখ করলাম না। আমার এক চিকিৎসক বন্ধু, এই ঘটনা আমাকে জানিয়েছেন।

ঘটনাটি হচ্ছে এই। মুখার্জি যখন জীবিত ছিলেন, তখন অফিস থেকে ফিরে একটা পার্টিশানের ওপারে জামা কাপড় ছাড়তেন; তার প্রিয় পোষা কুকুর তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে থাকতো। এবং তারপর যখন খাবার টেবিলে এসে বসতেন মনিব, তখনও তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতো প্রিয় পোষ্যটি।

মুখার্জির মৃত্যুর পর তার কাজের দিনও প্রথমে পার্টিশানের ওপারে, তারপর খাবার টেবলের নীচে চুপ করে বসে কুকুরটি চেয়ে আছে যেন কার মুখের দিকে। মুখার্জির সবচেয়ে ছোটো, বাচ্চা একটা মেয়ে হঠাৎ বলে উঠলো: মা, বাবা এসেছে,—

কেবল প্রিয় কুকুর এবং আদরের ছোটো মেয়েই মুখার্জিকে দেখতে পেলো কেন? তার কারণ, আকর্ষণ। মুখার্জির পরিবারের আর সকলেও তো মুখার্জিকে দেখতে পেলে খুসি হতেন। তা হতেন? তাহলে? তবুও কেবল দুজন যে দেখতে পেলো, একজন বলতে পারলো আর আরেকজন বলতে পারলো না যে, তার মূলে আছে জন্মান্তরের আকর্ষণ। যাকে কুকুর বলছি, সে কুকুর নয়। সৃষ্টির রহস্য রক্তিম জটিল, বিচিত্র ছলনাজালে তার পথ আকীর্ণ। অনায়াসে সে উপেক্ষা করতে পারে এই ছলনা, কেবল সেই পায় শান্তির অক্ষয় অধিকার।

এই ছলনা যে ভেদ করতে পেরেছেন তেমন লোকের কাছে কাশী-কলকাতা এক। তিনি কোথায় থাকেন, বনে কিংবা বড়লোকের বাড়ির আরামকেদারায় এহ বাহ্য। তিনি কি পরেন? কৌপীন কিংবা ড্রেস-স্যুট, এও অগ্রাহ্য। তিনি কি আহার করেন? পবন কিংবা অনবরত ধূমপান করেন, এতে কী যায় আসে?

ভোলে বাবার কথা বলেছি। হোটেলে নাচছেন ডিনারস্যুটে। ধরা পড়ে যাবার পর জিজ্ঞাসুকে প্রশ্ন করেছেন: তাহলে এই ডিনার স্যুটটাকেই বলছ,—'আমি'? কলকাতার কাছেই জগদীশবাবুর কথা শুনেছি, কালীপদ গুহরায়কে চোখে দেখেছি; ঘণ্টার পর ঘণ্টা সিগারেট চলছে। চর্মচক্ষে যে দেখবে সে মনে করবে বিলাসী। মর্মচক্ষে যে দেখবে, সে জানবে ওই ধূম্রজালের আড়ালে যার বাস, সকল ছলনাজাল সে ছিন্ন করেছে।

কালীপদ গুহরায়ের কথা বললে কালী যদি খুশি হন, কালীপদ স্বয়ং হন ক্রুদ্ধ। তিনি নিজের কথা বলতেও চান না, অন্য কেউ বলে, চান না তাও। লোকে গেলেই বলেন: আমি সাধু-টাধু নই। আমাকেও প্রথম দর্শনে তাই বলেছিলেন। সবিনয়ে উত্তর করেছিলাম: আমি অত্যন্ত অসাধু, সাধুতে আমার দরকার কি? মুখে বলিনি। বলেছিলাম মনে মনে। তারপর এক সময়ে সেই অনন্ত জীবন-নির্ঝর নিজেরই আনন্দের আবেগে হয়েছিলো ঊর্ধ্বমুখ ফোয়ারা।

সেই ফোয়ারায় কালীপদর ভেতর থেকে বিচ্ছুরিত আভা যখন আলোছায়ার হোলিখেলায় মাতে তখন যার চোখ আর কান আছে তার কাছে যে যায় সেই দরজা, যে দরজা খুলে গেলে তবেই জানা যায় যে, কাশী সত্যি সত্যি জগতের বাইরে। জগৎ বলতে যদি শুধু খ্যাতি, অর্থ, উত্তেজনা বুঝি তাহলে সেই জগতের বাঁইরে দাঁড়িয়ে আছে আসল কাশী। সেই কাশীর বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন কালীপদ গুহরায়।

কালীপদ গুহরায়ের কাছে গেলে বোঝা যায় কতখানি আমি জানি না; কিন্তু জীবনের বোঝা যে নেমে যায় অনেকখানি তা জানি। সে বোঝা কখনও অবিদ্যার; কখনও অবুদ্ধির। আমি নিজেই তার সঙ্গে তর্ক করেছি কতবার, কতবার বলেছি, ইহলোকই একমাত্র সত্য। কতবার সেই আশ্চর্য দুই চোখে পড়েছি এ বার্তা যে, না, কথা আছে এর পরেও। আমরা যাদের বিদেহী বলি, তারা আছে; তাঁরা আসে।

বলবার সময় যে বিশ্বাস জ্বলে উঠতে দেখেছি তার প্রত্যেকটি অক্ষরের সঙ্গে, তারই ছেঁদো ইংরিজি হচ্ছে, Conviction। প্রতিভার যথার্থ ইংরিজি যেমন Genius নয়, intuition,—বলেছেন ডক্টর গোপীনাথ কবিরাজ, তেমনই কালীপদ গুহরায়ের কথার পেছনে যার আভা তা তুচ্ছ কনভিকশান নয়, তা হচ্ছে ভিসান।

কালীপদ গুহরায় আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে আমি আমার স্বর্গত স্নেহময়ী মা-কে দেখতে চাই কি না? এমন কথা আজ পর্যন্ত আমি আর-কারুর মুখে শুনিনি। একথা ছাপার অক্ষরে বললেই কালীপদ ক্রুদ্ধ হন। কারণ, লোকে বিরক্ত করে। লোককে বোঝানো যায় না কিছুতেই যে ব্যাপারটা হালকা কৌতূহল মেটানোর ব্যাপার নয়। যিনি দেখাতে পারেন, তিনিই বুঝবেন কারুর প্রয়োজন সত্যি সত্যি আছে, না, কেবলই একটা ম্যাজিকের মতো কিছু

দেখবার বাসনা। কালীপদ গুহরায়কেও সেকথা বলে আমি বোঝাতে পারি না, যে, ফুল ফুটলে তার গন্ধ ছুটবেই। কালীপদ কী করে সিগারেট আর চায়ের আড়ালে ঢাকবেন যে, তিনি তার খোঁজ পেয়েছেন যা পেলে ক্ষোভ মিটে যায়। কিছুর জন্যে আক্ষেপ করাই মনে হয় নিছক অনর্থক।

আমি গুহরায়ের কাছে আমার মৃত মা-কে দেখতে চাইনি। কেন? তার কারণ, কোনওদিন মা যদি দেখা দেওয়া দরকার মনে করেন তিনি নিজেই দেবেন। জাগতিক প্রয়োজনের জন্যে লোকের কাছে সাহায্য নিতেই হয়। কিন্তু জীবনের যা পরমাশ্চর্য অবলম্বন তা যদি নিজের ভেতর থেকে না যোগায় তাহলে নাই পেলাম তার সন্ধান। এই মুহূর্ত পর্যন্ত আমার মনে চিন্তা হচ্ছে এই।

কালীপদর কাছে বিপদে পড়ে কাঁদতে আমার লজ্জা নেই। কিন্তু নিজের মাকে দেখবার জন্যে কালীপদ নয় কেবল স্বয়ং মা কালীকে কিছু বলতেও আমার বাধে।

জন্মান্তরের ব্যাপারে যাদের আস্থা কম তাদের বলতে পারি, ব্যাপারটা অলৌকিক নয়; সম্পূর্ণ লৌকিক। খুব তাড়াতাড়ি এমন দিন আসছে যখন এর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা উপস্থিত করা যাবে। পরলোকগতরা যে এ পৃথিবীতে সূক্ষ্মদেহে বিচরণ করছেন তার প্রমাণ এখন ব্যক্তিগত নয়; বহু লোকের সামনে দেবার জন্যে উদ্যোগী হয়েছে প্রতীচ্য। এটাও অলৌকিক নয়; এটাও লৌকিক। বহুদূরবর্তী কোনও ঘটনা যে বহুদিন আগে বলে দেওয়া যায় তার কারণ সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটে আছে। নতুন করে কিছু ঘটছে না। আমি আগেও বলেছি, এখনও বলছি, গতকাল, আজ এবং আগামীকাল বলে কিছু নেই। ঘড়ির দাগের মতোই ওটা আমরা নিজেদের সুবিধের জন্যে করেছি। সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত দুই-ই অবৈজ্ঞানিক প্রস্তাব।

শ্রীঅরবিন্দ দিলীপকুমারকে মহাত্মা গান্ধী নিহত হবার অন্তত পনের বছর আগে, যেভাবে গান্ধীজী মারা যাবেন, তার বর্ণনা দিয়েছিলেন। মহাভারতে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ বন্ধু অর্জুনকে মুখ হাঁ করে দেখিয়েছিলেন যে তিনি আগেই মেরে দিয়েছেন যতেক মহা-ভারতীয়কে। কাজেই অর্জুনের বিমর্ষ হবার কারণ নেই; আত্মীয় হননের তিনি উপলক্ষ মাত্র। তাঁর এই উপলক্ষ হওয়াও তাঁরই জন্ম-জন্মান্তরের কর্মফল।

স্বয়ং শ্রীরাম এবং শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরামকৃষ্ণ কারুরই রেহাই নেই এর হাত থেকে।

জন্মান্তরবাদ ব্যাপারটাও লৌকিক। আমরা সবাই জন্মের পর কিছু সময় সমস্তই মনে রাখি। কেউ কেউ তার পরেও। বড় হবার পরও যে মনে রাখে তাকেই আমরা 'বিস্ময়' জ্ঞান করি। কিন্তু জাতিস্মর কোনও বিস্ময়কর ব্যতিক্রম নয় এবং তার স্মৃতি কোনও অস্বাভাবিক ঘটনা বা দুর্ঘটনা নয়। আমরা শরীরের অনেক অংশ নিজের থেকে আর নড়াতে পারি না; একদিন পারতাম।

হাত যে কাজ করে দেয় সে কাজ আর শরীরের অন্য অংশ করতে পারে না। যার হাত নেই সে অনেক কাজ পা দিয়ে সারে। মুখে পেন্সিল চেপে খাতায় লিখতে পারাটা অভ্যাস, পরিশ্রম এবং দুর্বার ইচ্ছাশক্তির যোগফল।

কিন্তু একজনের হাত আছে এবং আরেকজনের হাত নেই,—এর মূলে আছে তার কর্মফল। এই ফল তার নিজেরই কর্ম। গতজন্মের কর্ম এ জন্মের অদৃষ্ট; এ জন্মের কর্ম আগামীবারের অদৃষ্ট। সৃষ্টির শুরুতে কোনও কর্ম ছিলো না। সৃষ্টি-ধর্মের মধ্যপথে আমরা কর্মচক্রে জড়িয়েছি। তারপর পাকের পর পাক; রাজার ছেলে ভিখারীর ভূমিকার অভিনয় করবে বলেই তাকে ভুলতে হয়েছে যে সে স্বয়ং রাজপুত্র। অভিনয়ধারা সম্পূর্ণ না হলে এ চক্র, এ চক্রান্ত ভেদ করবার উপায় নেই।

স্ত্রীলোক, মদ্য, অত্যাচার, আরাম, দারিদ্র্য দেহকষ্ট ইত্যাদি সকলকেই ভোগ করতে হবে এবং ভোগান্তে ফিরতে হবে স্ব-ভূমিকায়। ঠাকুর এই জন্যেই বলতেন; সবাই খেতে পাবে। কেউ সকাল সকাল, কেউ বেলায়।

এবং এই জন্যেই কারুকে তিরস্কার করার কিংবা পুরস্কার দেবার কোনও মানে হয় না। যে মদ খেয়ে রাস্তায় গড়াগড়ি দিচ্ছে আর যে মা-মা করে কাঁদছে দিনরাত, এদের সংস্কারই এমন করাচ্ছে। ধ্রুবকে নৌকায় যেতে যেতে কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করেছিলেন একটা বিশেষ স্তূপের দিকে অঙ্গুলি-সংকেত করে: এটা কি বলো তো?

ধ্রুব বলেছিলেন: পাহাড়।

শ্রীকৃষ্ণ তার উত্তরে বলেছিলেন আবার, না। ওটা তোমার অসংখ্য পূর্ব-জন্মের অস্থির স্তূপ। এতবার জন্মাবার পর তবে তুমি এবার জন্মমাত্রই আমার নাম নিতে পেরেছ।

ধ্রুবর বেলায় যে দৈববাণী সত্য, তোমার আমার সকলের বেলাতেই তা ধ্রুব সত্য।

এ সত্য জানবার জন্যে কাশী দৌড়তে হয় না এবং এ সত্য অজানা রইলে কাশী গিয়েও কোনও লাভ হয় না। কাশী নয়, এই কলকাতায় চিত্রজগতের এক ধনীব্যক্তি বেন্টিংক স্ট্রীট থেকে টালিগঞ্জে যাবার জন্যে জীপ গাড়িতে উঠতে গিয়ে উঠলেন না! হঠাৎ তিনি চোখের সামনে তাঁর মাকে দেখতে পান। তাঁর মনে হয় যেন মা জীপে করে যেতে বারণ করছেন। জীপ ছেড়ে দিয়ে কিছুক্ষণ পর তিনি ট্যাক্সি করে বেরোন এবং টালিগঞ্জে যাবার পথে দেখেন, জিপ উলটে পড়ে আছে রাস্তায়।

সুনিশ্চিত মৃত্যুর অথবা সাংঘাতিক আঘাতের হাত থেকে বেঁচে যাওয়াও কর্মফল। ওই জীপে উঠতে গিয়ে মায়ের দেখা পাওয়া এবং জীপে না ওঠা, ওই অসম্ভব সম্ভব হয়েছে কেবল এখনও সুস্থ, সবল, ভাগ্যবান ব্যক্তির আয়ু ছিলো বলেই।

মহাত্মা শংকর কোনও এক সময়ে জ্যোতিষচর্চাও করেছিলেন। এক ভদ্রলোক এসে তাঁকে বলেন যে, একজন জ্যোতিষী সেই ভদ্রলোকের অকস্মাৎ মৃত্যুর তারিখ দিয়ে দিয়েছেন। শংকর তাঁর আয়ু বিচার করে বলেন যে, না, মৃত্যুর ভয় নেই। জ্যোতিষী স্বয়ং এসে শংকরকে সেই ভদ্রলোকের আয়ু বিচার করে দেখান যে, মৃত্যু অবধারিত। শংকর মেনে নেন সেকথা। কিন্তু যেহেতু শংকর-বাক্য মিথ্যে হবার নয়, সেইহেতু শংকর স্বয়ং তাকে রক্ষা করেন বজ্রাঘাত থেকে।

শংকর, চৈতন্য, শ্রীরামকৃষ্ণ, ত্রৈলঙ্গ, বামাক্ষেপা, এঁরা পারেন হাঁ-কে না-করতে ; না-কে হাঁ-করতে। কিন্তু সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচারে যিনি বেঁচে যাবেন তাঁর কর্মফল এইরকম হওয়া চাই। না হলে তাঁকে আয়ু দান করতে হলে যিনি দান করবেন, তাঁর আয়ু খানিকটা বাদ দিতেই হবে। মহাত্মারা যখন কাউকে বাঁচিয়ে দেন সর্পাঘাত থেকে তখন সাপের বিষ তাঁকে গলাধঃকরণ করতেই হয়। ঠাকুরের কর্কট রোগ আসলে কারুর রোগ সারানোর প্রতিক্রিয়া বটে, কিন্তু ঠাকুরের গ্রহ-সংস্থান দেখলে এ সত্য পাওয়া যাবে যে, কর্কট রোগেই ঠাকুরের দক্ষিণেশ্বর-লীলার সাময়িক সংবরণ ঘটবে।

কর্মফলের সূচীপত্র হচ্ছে জাতকের জন্ম-মুহূর্তের গ্রহসংস্থান।

সেই কথাই কাশীর বিখ্যাত ভবিষ্যদ্বক্তা স্বর্গত সুধীর ভাদুড়ী বলেছিলেন পল ব্রান্টনকে। দ্বাদশ গ্রহের অবস্থান আমার রাশিচক্রে নির্দেশ করছে, আমি কী করেছি, সেই কর্মফল। এ জন্মে কোনও পুরস্কার না পেলেও আসছে কোনও জন্মে তা পেতে হবে ; শাস্তি এড়িয়ে গেলেও এবার, আসছেবার তা পিঠে পড়বে।

কর্মচক্রের বন্ধন অতিক্রম করাই মানবজীবনের উদ্দেশ্য।

কেবল কাশীর স্বর্গত সুধীর ভাদুড়ী নন, কলকাতার স্বর্গত সত্য গাঙ্গুলি-মশাইও জানতেন, অব্যর্থ বলতে পারতেন কেবল মুখ দেখে। ইউনাইটেড ব্যাংকে কাজ করে আমার এক বন্ধু। ছেলে বয়সে মায়ের সঙ্গে গেছিলো সত্যবাবুর কাছে তাবিজের জন্যে। বিখ্যাত এক অ্যাটর্নি ঢুকতেই সেই সময়ে, সত্যবাবু বললেন : আপনি বাড়ি যান ; আপনার বাড়িতে এখনই এমন একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে যাতে সমাজে খ্যাতির চুড়ো থেকে পড়ে আপনি গুঁড়ো হয়ে যাবেন।

তারপর যা ঘটেছিলো সেটা আমিও শুনেছিলাম। একটি পারিবারিক কলঙ্ক অ্যাটর্নি ভদ্রলোককে প্রায় চুরমার করে দিয়েছিলো।

ভারতবিখ্যাত পরলোকগত এক মার্কসিস্ট লেখক ঠাট্টা করেছিলেন ফলিত জ্যোতিষকে। সত্য গাঙ্গুলি তাঁকে তৎক্ষণাৎ বলেন : আপনার ছদ্মনাম নয় ; আসল নামের আদ্যক্ষর 'ক'।

ভদ্রলোক তাতে খুব উৎসাহিত হন না।

তখন সত্যবাবু আবার বলেন : আপনি এক-সময়ে হ্যারিসন রোডে এক মাড়োয়ারির দোকানে খাতা লিখতেন। এবারে বিদ্রূপকারী নড়ে-চড়ে ওঠেন।

তারপরও সত্যবাবু মুখ খোলেন। এবারে তিনি বলেন যে, এখন আপনাকে যা বলব, তা সাধারণত আমি কাউকে বলি না। তবে আপনি জ্যোতিষ শাস্ত্রকে নিন্দা করেছেন অতএব শাস্ত্রের সম্মান রক্ষায় আমাকে বলতে হচ্ছে যে, ওই মাড়োয়ারির প্রাপ্য তিন টাকা বারো আনা আপনি আত্মসাৎ করেন অভাবের তাড়নায়। সেই মার্কসিস্ট লেখক পরবর্তীকালে সত্যবাবুর কাছে কয়েকবার যান।

সত্যবাবুর ভবিষ্যদ্বাণী সব মেলেনি তাঁরও কথা কখনও কখনও ভুল হয়েছে কেন?

তার কারণ জ্যোতিষী, মহত্তর জ্যোতিষীরও দৃষ্টি খণ্ডিত। গ্রহের হিসেবে মানুষ মাত্রেরই ভুল হতে পারে। এবং ভারতবর্ষে তার উজ্জ্বলতম উদাহরণ বরাহমিহির। গ্রহের ওপরে বিগ্রহের পরেও কথা আছে। হিসেবের বাইরে আছে আরেক হিসেবে। গ্রহ কাজ করে না, এমন লোক, এমন আলোকও পৃথিবীতে আছেন।

শ্রীঅরবিন্দের মতো যোগী একবার দেখেছিলেন যে একটি দৈহিক আঘাত পণ্ডিচেরির 'মাদার'-এর ওপর আসছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু আঘাত পান স্বয়ং শ্রীঅরবিন্দ। দেহাবসানের কিছু আগে তাঁর পা একবার ভেঙে যায়। শ্রীঅরবিন্দ দেখেছিলেন অভ্রান্ত। তবুও লোক বদলে গেল কেন? ওইটাই হিসেবের বাইরে।